চিঙ্গিস আইৎমাতভ

পাহাড় ও স্তেপের আখ্যান

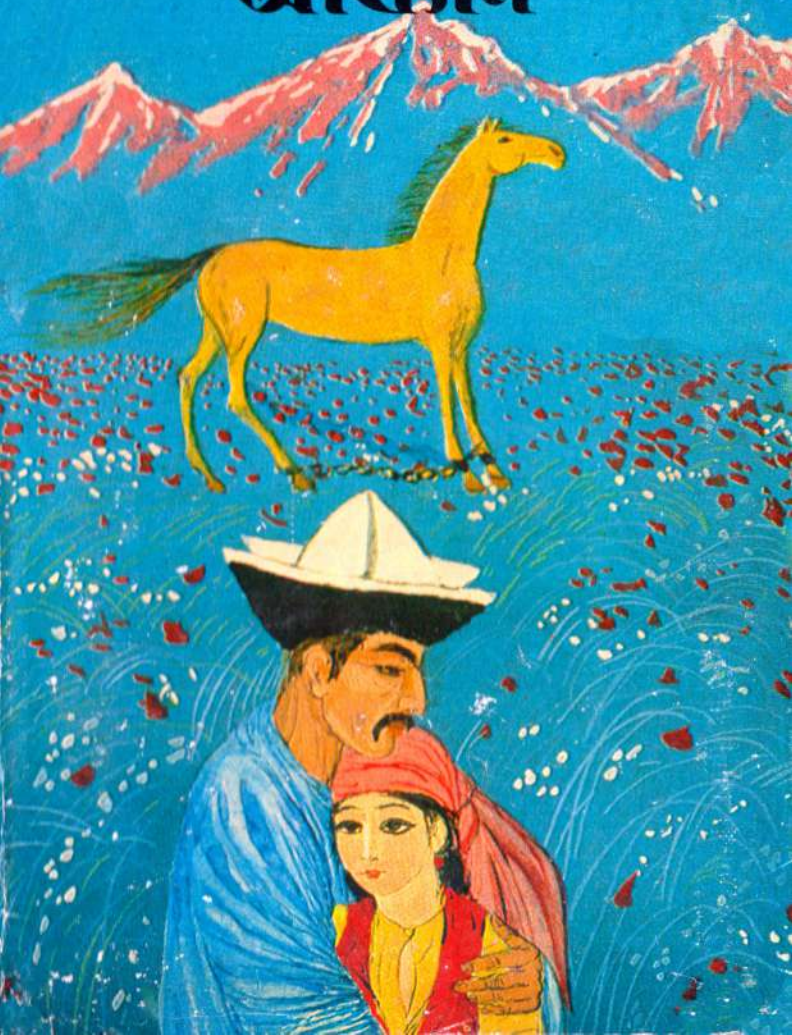

প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত হয় চিঙ্গিস আইৎমাতভের প্রথম উপাখ্যান 'জামিলা'। তা সত্ত্বেও রচনাটির প্রতি পাঠকসমাজের আগ্রহ এতটুকু হ্রাস পায় নি। নিজের সুখের অধিকার রক্ষার জন্য নারীর সংগ্রামের এই কাব্যময় কাহিনী পৃথিবীর বহু দেশে পরিচিত। ফরাসী লেখক লুই আরাগ' 'জামিলা'কে 'সবচেয়ে সুন্দর প্রেমের কাহিনী' বলে অভিহিত করেছেন।

কির্গিজিয়ায় সোভিয়েত শাসনক্ষমতার প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষক মহাশয় দিউইশেনের প্রভাবে পাহাড়ী পল্লীর একটি মেয়ের ভাগ্য পরিবর্তন, জীবনের পথাবিষ্কার — এই হল 'প্রথম শিক্ষক' উপাখ্যানের বিষয়বস্তু। আইৎমাতভের অন্যতম রচনা 'বিদায় গুলসারি' — যৌথখামারকর্মী তানাবাইয়ের জটিল পরিস্থিতিপূর্ণ কঠিন জীবনের কাহিনী, সমস্ত দুঃখকষ্ট ও অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তানাবাইয়ের পথসঙ্গী এক ঘোড়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের মর্মস্পর্শী বিবরণ।

ISBN 5-05-001765-3

চিঙিস আইতমাতভ

পাহাড় ও স্তেপের আখ্যান

চ. আইৎমাতভ · পাহাড় ও স্তেপের আখ্যান

চিঙ্গিস আইংমাতভ

পাহাড়
ও স্তেপের
আখ্যান

চিঙ্গিস আইৎমাতভ

পাহাড় ও স্তেপের আখ্যান

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অঙ্গসজ্জা: ব. আ. মার্কেভিচ

Чингиз Айтматов

ПОВЕСТИ ГОР И СТЕПЕЙ

На языке бенгали

Chinghiz Aitmatov

TALES OF THE MOUNTAINS AND STEPPES

In Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$A\frac{4702280200-005}{031(01)-88}$ 098–88 ISBN 5-05-001765-3

সূচি

জামিলা (অনুবাদ: খালেদ চৌধুরি) ৭

প্রথম শিক্ষক (অনুবাদ: মামুদ হায়াৎ) ৯১

বিদায় গুলসারি (অনুবাদ: অরুণ সোম) ১৯১

জামিলা

আবার দাঁড়ালাম সাধারণ ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছবিটার সামনে। আগামীকাল সকালে গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করব; অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ম মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছি ছবিটার দিকে — ছবিটা যেন এই সফরের জন্যে আমাকে বিদায়কালীন শুভকামনা দিতে পারে।

ছবিটা কখনও কোন প্রদর্শনীতে দেখাই নি। তাছাড়া, গ্রাম থেকে আত্মীয়েরা কেউ এলে আমি ছবিটা সরিয়ে রাখি — যাতে তাদের চোখে না পড়ে। লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই, যদিও এটা আসলে কোন শিল্পকার্য নয়। ছবিটাতে যে মাটি আঁকা রয়েছে, ছবিটা তারই মত সাদামাঠা।

ছবিটার পটভূমিতে আছে শরতের এক টুকরো বিবর্ণ আকাশ, দ্বিবর্ণ মেঘেরা দূরের পর্বতমালার উপর দিয়ে বায়ুর তাড়নে দ্রুত ধেয়ে চলেছে। পুরোভাগে পিঙ্গল সোমরাজে আচ্ছাদিত স্তেপ, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে ভেজা কাল পথ, শুকনো ভাঙা ঘাসের ঝোপ পথের পাশে ভিড় করে আছে। বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত চাকার

দাগ ধরে দু'জন পথিকের পদচিহ্ন এগিয়ে চলেছে। দূরে নিলীয়মান পথে তাদের পদচিহ্ন ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, যদি আর এক-পা এগোয়, তবেই যেন তারা ছবির ফ্রেমের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাদের একজন... না, আগে থাকতেই আভাস দিয়ে আমি গল্পটাকে পন্ড করে ফেলছি।

ব্যাপারটা যখন ঘটে আমি তখনও কিশোর। যুদ্ধের তৃতীয় বছর। দূরে কোথাও, কুর্স্ক আর ওরিওলে আমাদের বাপ এবং বড় ভাইয়ের বয়সীরা দুশমনের বিরুদ্ধে লড়ছে আর আমরা, পনেরো বছরের কিশোরেরা কাজ করছি যৌথখামারে। আমাদের কচি বিশীর্ণ কাঁধে বইতে হচ্ছে পরিণতবয়সী মানুষের পুরো কাজের বোঝাটা। ফসল তোলার সময়টাই ছিল সবচাইতে কঠিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমাদের কেটেছে গৃহ থেকে অনেক দূরে, দিবারাত্র খাটতে হয়েছে মাঠে, শস্য মাড়াই করার জায়গায় আর রেল স্টেশানের দিকে পথে শস্য পেঁছে দেওয়ার কাজে।

ফসল কাটতে কাটতে আমাদের কাস্তেগুলি যখন তেতে লাল হয়ে উঠেছে, তেমনই একটা রোদে পোড়া দিনে স্টেশান থেকে আমার খালি ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে ফিরবার পথে স্থির করলাম, একবার বাড়ি হয়ে যাব।

সড়কের শেষ প্রান্তে হাঁটু-জল নদীর কাছে টিলার উপর রোদ-পাকা ইঁটের মজবুত পাঁচিলঘেরা দুটি বাড়ি; পাঁচিলের বাইরে দীর্ঘদেহী পপলারের সারি। এ-দুটিই আমাদের বাড়ি। বহু বছর ধরে আমাদের পরিবারগুলি পাশাপাশি বাস করেছে। আমি বড় বাড়ির ছেলে। আমার আরও দুই ভাই আছে, দু'জনেই আমার চেয়ে বড়, অবিবাহিত, রণাঙ্গনে লড়াই করছে, বহুদিন তাদের কোন চিঠি-পত্র আসে নি।

আমার বাপ একজন বৃদ্ধ ছুতার। ফজরের নামাজ পড়ার পর

তিনি কাজ করতে গেছেন সাধারণ কর্মাঙ্গনে, ছুতার-কারখানায়। তিনি সেখানে থাকেন সন্ধ্যার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত।

আমার মা আর ছোট বোন থাকেন বাড়িতে।

পাশের বাড়ির বাসিন্দারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। গাঁয়ের লোকে ওই বাড়িটিকে বলে ছোট বাড়ি। আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহরা অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধ প্রপিতামহরা সহোদর ছিলেন; কিন্তু, আমি পাশের বাড়ির বাসিন্দাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলছি, কারণ আমরা বাস করেছি একটি অভিন্ন পরিবার হিসাবে। যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাযাবর ছিলেন, যখন আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহরা একসঙ্গে তাঁবু খুলে নিতেন আর একসঙ্গে পশুপাল চালনা করতেন, তখন থেকেই এ রকম চলে আসছে। আমরাও এই ঐতিহ্য অটুট রেখেছি। যখন আমাদের গ্রাম যৌথীকৃত হল আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করলেন। আসলে আমরা সবাই ছিলাম একই গোত্রের — সমগ্র আরালস্কায়া সড়কের দু'পাশে, নদী পর্যন্ত প্রসারিত সমগ্র গ্রামটিতে আমাদের স্বজনদেরই বসতি।

আমরা যৌথখামারে যোগ দেওয়ার কিছুকাল পরই, স্ত্রী আর দুটি ছোট ছেলে রেখে ছোট বাড়ির কর্তা মারা গেলেন। আমাদের গ্রামের লোকেরা তখনও গোত্রের পুরানো প্রথা মান্য করত। কোন পুত্রবতী বিধবা গোত্র ছেড়ে চলে যাবে, এটা তখন নিষিদ্ধ ছিল। তাই, স্থির হল, আমার বাবা ছোট বাড়ির এই সদ্যবিধবাকে বিয়ে করবেন। পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য বাবার যে কর্তব্য ছিল, তা-ই তাঁকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছিল; কারণ তিনি ছিলেন মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়।

এ ভাবেই আমাদের একটি দ্বিতীয় পরিবার হল। ছোট বাড়িকে একটি আলাদা বাড়ি মনে করা হত, তাদের আলাদা

জমি ছিল, আলাদা গবাদি পশু ছিল। কিন্তু আসলে আমরা বাস করতাম একই সঙ্গে।

ছোট বাড়ির দুই ছেলেও যুদ্ধে গিয়েছে। বড় ছেলে সাদিক যুদ্ধে গেছে তার বিয়ের কিছুদিন পরই। আমরা তাদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, যদিও অল্প ক'টি মাত্র এবং বেশ কিছুদিন পর পর।

ছোট বাড়িতে থাকেলেন মা, যাকে আমি বলতাম 'কিচি-আপা' (ছোট মা) আর তাঁর ছেলের বউ — সাদিকের স্ত্রী। দু'জনেই সকাল-সন্ধ্যা কাজ করতেন যৌথখামারে। আমার ছোট মা ছিলেন দয়াবতী, প্রশান্ত আর কোমল স্বভাবের মানুষ। সবকিছুতেই তিনি কাজ করতেন অল্পবয়সী মেয়েদের সমান তালে — সেটা সেচের খাত খোঁড়াই হোক বা জমিতে জল দেওয়াই হোক — এক কথায় হাতদুটোয় তিনি শক্তভাবে কোদাল ধরেছেন। ভাগ্যবলে তিনি কঠোর পরিশ্রমী বৌ পেয়েছিলেন। সবকিছুতেই জামিলা ছিল শাশুড়ীর যোগ্য বৌ। মেজাজের দিক থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের হলেও সে ছিল ক্লান্তিহীন আর খুব চট্‌পটে।

আমি জামিলাকে খুব ভালবাসতাম; সেও আমাকে ভালবাসত। গভীর বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা একে অপরকে নাম ধরে ডাকতাম না। অন্য পরিবারের লোক হলে আমি ওকে অবশ্যই জামিলা বলে ডাকতাম। জামিলা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী বলে তাকে আমি ডাকতাম 'দ্‌জেনে' বলে আর সে আমাকে ডাকত 'কিচিনে বালা' অর্থাৎ ছোট্ট ছেলে — যদিও আমি মোটেই ছোট ছিলাম না আর ওর সঙ্গে আমার বয়সের তফাতও ছিল খুবই কম। কিন্তু, আমাদের গ্রামের প্রথানুসারে গৃহবধূরা দেবরদের 'কিচিনে বালা' বলেই ডাকত।

দুই বাড়িই দেখাশোনা করতেন আমার মা। আমার ছোট বোন, ফিতে-বাঁধা বেণী, খুবই আমুদে, মাকে সাহায্য করত।

তখনকার দুর্যোগের বছরগুলিতে ও যে কী কঠোর পরিশ্রম করত সে কথা আমি কখনও ভুলব না। দুই বাড়ির ভেড়ার বাচ্চা আর বাছুরগুলিকে মাঠে নিয়ে যেত, বাড়িতে যাতে জ্বালানির অভাব না হয় সে জন্য গোবর আর শুকনা ডালপালা কুড়াত। আমার এই বোঁচা-নাক ছোট বোনটিই মায়ের নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে হাসিখুশিতে ভরিয়ে রাখত, লড়াইয়ের ময়দানে হারিয়ে-যাওয়া ছেলেদের সম্পর্কে মায়ের মনে যে বিষণ্ন ভাবনার মেঘ ভিড় করত সে-ই তা দূরে সরিয়ে রাখত।

আমাদের বিরাট পরিবারে যে প্রাচুর্য আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ছিল, সেটা আমার মায়েরই প্রচেষ্টার ফল। তিনি ছিলেন দুই বাড়িরই একচ্ছত্র কর্ত্রী। আমাদের যাযাবর পিতামহদের পরিবারে তিনি এসেছিলেন খুবই অল্প বয়সে; তাঁদের স্মৃতির প্রতি সব সময়ে শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, পরিবার চালনা করেছেন অপক্ষপাতে। যেমন শুভবুদ্ধি, ন্যায়পরতা আর দক্ষতা নিয়ে তিনি নিজের পরিবার চালনা করতেন, তাতে গ্রামের সবাই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। বাড়িতে সবকিছুই ছিল মায়ের দায়িত্বে। সত্য বলতে, গাঁয়ের লোক আমার বাবাকে কখনও পরিবারের কর্তা মনে করত না। বলত: 'আরে, উস্তাকা-র (কারিগরদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য আমাদের ভাষায় এই শব্দ ব্যবহৃত হয়) কাছে গিয়ে কিছু হবে না, কুড়াল ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। ওদের বড় মা-ই বাড়ির সবকিছু চালান। তাঁর কাছে গেলেই কাজ হবে...'

এখানে বলতে হয় যে বয়স কম হলেও সংসারের ব্যাপারে আমাকে প্রায়ই নাক গলাতে হত, আর সেটা ছিল শুধু আমার বড় ভাইয়েরা সবাই যুদ্ধে চলে গিয়েছিল বলেই। বেশির ভাগই রসিকতার সূত্রে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃত অর্থেও, আমাকে বলা হত দুই পরিবারের অবলম্বন, রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক। এতে

আমার গর্ব হত, একটা গভীর দায়িত্ববোধ অনুভব করতাম। তা ছাড়া, আমার মাও এই দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন আমি যেন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ভাল মানুষ হই, যেন বাবার মত না হই — বাবা সারাদিন চুপচাপ রেঁদা করতেন আর করাত দিয়ে কাঠ কাটতেন।

গাড়িটা উইলোর ছায়ায় রেখে লাগাম ঢিলে করে দিয়ে উঠানের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের দলনেতা ওরোজ্‌মাত্‌কে দেখতে পেলাম। ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন, জিনের সঙ্গে ক্রাচ্‌ বাঁধা — যেমন সব সময়েই থাকে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার মা। কী নিয়ে যেন তর্ক চলছে। কাছে যেতে শুনতে পেলাম মা বলছেন:

'হতেই পারে না! তোমার কি আল্লার ভয় নেই? কে কবে শুনেছে মেয়েরা ঘোড়ার গাড়িতে করে গমের বস্তা নিয়ে যায়? না গো ভাল মানুষের ছেলে, তুমি আমার ছেলের বৌকে এর মধ্যে জড়িয়ো না, এখন যেমন কাজ করছে তা-ই করতে দাও। এখন আমি দিনের আলোই ভাল করে দেখতে পাই না। দু-দুটো বাড়ি সামলানো যে কী ঝামেলা, একবার নিজে চেষ্টা করে দেখলে বুঝতে পারতে! কপাল ভাল মেয়েটা একটু বড় হয়েছে, কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে... প্রায় সাত দিন হল বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারি নি, ব্যথায় পিঠ টন্‌টন্‌ করছে। মনে হয় আমি যেন ফেল্ট তৈরি করছিলাম। ভুট্টাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ, ডাঁটাসুদ্ধ শুকাচ্ছে জল ছাড়াই!' মা উত্তেজিতভাবে কথা বলছিলেন পাগড়ির প্রান্ত জামার কলারের নীচে গুঁজতে গুঁজতে — এটা তাঁর রাগের লক্ষণ।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হতাশার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওরোজ্‌মাত্‌ বললেন: 'আপনি কেন বুঝতে পারছেন না? আপনি কি ভাবছেন এই কাঠের পায়ের জায়গায় আমার নিজের

পা থাকলে আমি আপনাকে বলতে আসতাম? আমি নিজেই গাড়িতে বস্তা তুলে চাবুক মেরে ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতাম — যেমন আগে করতাম!.. জানি এটা মেয়েদের কাজ নয়, কিন্তু ব্যাটাছেলে আমি পাচ্ছি কোথায়?.. সে জন্যই আমরা সৈন্যদের বৌদের বলব বলে স্থির করেছি। আপনি নিজের ছেলের বৌকে যেতে দিতে চান না, কিন্তু এদিকে খামারের চেয়ারম্যান আমারে ধাড় চেপে ধরে রেখেছেন... সৈন্যদের রুটি দরকার, অথচ আমরা পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছি। কথাটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?'

চাবুকটাকে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে টানতে টানতে আমি তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখামাত্র ওরোজ্‌মাতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুঝলাম তাঁর মাথায় কোন বুদ্ধি খেলেছে।

'বৌয়ের জন্য অত ভয় পাওয়ার কোনই কারণ দেখি না, তার এই দেবরটি কোন লোককেই তার সঙ্গে ফাজলামো করতে দেবে না,' দেখিয়ে তিনি বেশ খুশি হয়ে বললেন। 'কোন ভয় করবেন না, আমাদের সেইত্‌ চমৎকার ছেলে। ওর মত ছেলেরাই আমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, ওরাই আমাদের ভরণপোষণকারী, সব সময় আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে।'

মা ওরোজ্‌মাতের কথা শেষ হতে দিলেন না।

আমার উদ্দেশে প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন: 'হা আল্লা! ওরে বাউন্ডুলে একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ! চুল হয়েছে ঘোড়ার কেশরের মত!.. তোর বাবাও আচ্ছা লোক — নিজের ছেলের চুলটা ছেঁটে দেওয়ার সময়ও তিনি পান না...'

'আপনার ছেলে তাহলে আজ বাড়িতেই বিশ্রাম করুক,

মাথা কামিয়ে নিক,’ মায়ের কথার রেশ ধরে ওরোজ্‌মাত্‌ বললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: ‘সেইত্‌, তুমি আজ বাড়িতেই থাক, ঘোড়াগ‍ুলিকে খাওয়াও, কাল সকালে আমরা জামিলাকে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেব। তোমরা একসঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু, মনে রেখো, জামিলার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে! আপনি ভয় পাবেন না বাইবিচে,* সেইত্‌ জামিলা সম্পর্কে ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে। তা ছাড়া, দানিয়ারকেও পাঠাব ওদের সঙ্গে। আপনি ত তাকে চেনেন, সেই যে ছেলেটি ক'দিন আগে সেনাবাহিনী থেকে খালাস পেয়ে এসেছে, খ‍ুবই নিরীহ। স্টেশানে শস্য পে'ৗছে দেওয়ার জন্য ওরা তিনজনে যদি একসঙ্গে যায় তবে কেউ আপনার বৌয়ের সঙ্গে ফাজলামো করতে পারবে না। আমি ঠিক বলছি কি-না? তুমি কী বল সেইত্‌? আমরা জামিলাকে কোচোয়ান বানাতে চাই, কিন্তু তোমার মা সে কথা শ‍ুনতে চান না। তুমি একটু মাকে বোঝানোর চেষ্টা কর।’

ওরোজ্‌মাত্‌ যে আমার প্রশংসা করেছে আর আমার সঙ্গে পরামর্শ করছে — যেমন করা যায় বড়দের সঙ্গে — তাতে আমি বেশ আত্মপ্রসাদ অন‍ুভব করলাম। তা ছাড়া, আমি সঙ্গেসঙ্গেই অন‍ুভব করলাম জামিলার সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে স্টেশানে যেতে কী মজাই না হবে। খ‍ুব গম্ভীর ভাব করে মাকে বললাম:

‘জামিলার কোন বিপদ হবে না মা, পথে কোন নেকড়ে নেই।’

পেশাদার কোচোয়ানের মত দাঁতের ফাঁক দিয়ে অন্যমনস্কভাবে থ‍ুথ‍ু ফেলে চাব‍ুকটাকে পেছনে টানতে

---

* বাইবিচে — বাড়ির বড় বৌ। — সম্পাঃ

টানে খুব একটা ভারিক্কি ভাব নিয়ে আমি ইতস্তত হে'টে বেড়াতে লাগলাম।

'শোন ছেলের কথা!' বিস্মিত হয়ে মা চে'চিয়ে বললেন। তাঁকে একটু খুশিও মনে হল, কিন্তু তখনই রাগত স্বরে বললেন: 'নেকড়ের তুই কী জানিস রে মূর্খ!'

আবার যদি মা বিগড়ে বসেন সে-ভয়ে ওরোজ্মাত্ বললেন:'ও না জানলে আর জানবে কে — ও হচ্ছে দুই পরিবারের প্রতিপালক; এই ছেলের জন্য গর্ব করতে পারেন আপনি!'

মা কোন প্রতিবাদ করলেন না। তাঁকে হঠাৎ খুব ক্লান্ত মনে হল; গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন:

'ও মোটেই তা নয়। এখনও শিশু, কিন্তু তবু তো কাজ করছে দিনরাত... আল্লাই জানেন আমাদের প্রিয় দজিগিত্-রা* এখন কোথায়। আমাদের বাড়িগুলি এখন হয়েছে যেন এক একটা পরিত্যক্ত শিবির...'

আমি একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম, এর পর মা কী বলেছেন তা আর আমি শুনতে পাই নি। ঘরের কোণায় চাবুক মেরে ধুলো উড়িয়ে গর্বিতভাবে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে; বোনটি যে আমাকে দেখে হাসল তার কোন উত্তরও দিলাম না। সে উঠানে ঘুঁটে দিচ্ছিল হাতের তালুতে গোবর থেসে থেসে। দরজার কাছে উবুড় হয়ে বসে কলস থেকে জল গড়িয়ে ধীরে ধীরে হাত ধুয়ে নিলাম। তার পর ঘরে ঢুকে একবাটি টক দুধ খেয়ে আর একবাটি টক দুধ জানালার ধারির উপর রেখে খানিকটা রুটি গুঁড়ো করে তার উপর ফেললাম।

---

* দজিগিত্ — কুশলী ঘোড়সওয়ার। — সম্পাঃ

মা আর ওরোজ্‌মাত্‌ তখনও উঠানে; এখন আর তর্ক করছেন না; শান্তভাবে নিচুগলায় কথা বলছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই আমার ভাইদের কথাই বলছেন। দেখলাম ওরোজ্‌মাতের কথায় অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে মা আস্তিনে চোখ মুছছেন। বোঝা যাচ্ছে ওরোজ্‌মাত্‌ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। মা তাকিয়ে রইলেন দূরের গাছের চূড়ার উপর দিয়ে, যেন তাঁর ঘোলাটে দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছবে তাঁর ছেলেদের কাছে।

মনে হল বিষণ্ণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে তিনি যেন অবশেষে ওরোজ্‌মাতের প্রস্তাবে রাজি হলেন। কাজ হাসিল হওয়াতে খুশি হয়ে ওরোজ্‌মাত্‌ ঘোড়াটিতে চাবুক মেরে প্রস্থান করলেন।

বলা বাহুল্য, এর পরিণাম কী হবে তা তখন আমি কিংবা আমার মা, আমরা কেউ জানতাম না।

জামিলা যে একটা দুই-ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পারবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। জামিলা ছিল ওস্তাদ-ঘোড়সওয়ার; ওর বাবা ছিলেন পাহাড়ী গ্রাম বাকাইর-এর একজন অশ্ব-প্রজনক। আমাদের সাদিকও ছিল অশ্ব-প্রজনক। বসন্তকালের ঘোড়দৌড়ে সে নাকি জামিলার কাছে হেরে গিয়েছিল। হয়ত তাই হবে। কিন্তু, লোকে বলে সেই ঘটনার পরই অপমানিত সাদিক নাকি জামিলাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে। অন্যেরা অবশ্য বলে এটা প্রেমের বিয়ে। তা সে যা-ই হোক, ওদের বিয়ের মাত্র চার মাস পরেই যুদ্ধ শুরু হয় এবং সাদিক রণাঙ্গনে চলে যায়।

জানি না কেন — হয়ত শৈশব থেকেই জামিলা তার বাবার সঙ্গে ঘোড়া চরিয়েছিল বলেই — কারণ সে ছিল বাবার একমাত্র

সন্তান, একাধারে ছেলে-মেয়ে দুই-ই — জামিলার কেমন যেন একটা পুরুষালি ভাব ছিল; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণতা এমন কি রূঢ়তাও দেখা যেত; কাজ করত পুরুষের মত খাছোড়বান্দাভাবে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার বেশ বনিবনাও ছিল, কিন্তু কেউ তার অন্যায় সমালোচনা করলে সে তাকে ছাড়ত না কিছুতেই; রাগের বশে অন্য মেয়ের চুলও সে টেনেছে একাধিকবার।

প্রতিবেশীরা নালিশ জানাতে আসত:

'কেমন বৌ এনেছেন ঘরে? মাত্র ত সেদিন এল, এরই মধ্যে তার গলা শোনা যায় এক মাইল দূর থেকে! গুরুজনকে মান্যি করে না, ভদ্রতা জানে না!'

উত্তরে আমার মা বলতেন: 'ও ওই রকম বলেই আমি খুশি! আমাদের বৌ সত্যি কথা বলে লোকের মুখের ওপরেই। দু-মুখো হওয়ার চাইতে এটা ঢের বেশি ভাল। তোমাদের গুলো তো খুব ভালোমানুষির ভান করে — আসলে ওসব ভালোমানুষি হচ্ছে পচা ডিমের মত: ওপরটা বেশ সুন্দর, কিন্তু ভেঙ্গে দেখলেই দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।'

শ্বশুর-শাশুড়ীর যেমন কড়া হওয়া উচিত, আমার বাবা আর ছোট মা জামিলার প্রতি কখনও তেমন ছিলেন না। তাঁরা ওকে খুব ভালবাসতেন; তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বৌ যেন আল্লা আর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

আমি তাঁদের মনের ভাব বুঝতাম। চার-চারটি ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়ে তাঁরা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন জামিলার মধ্যে: জামিলা ছিল দুই বাড়ির একমাত্র বৌ, আর সে জন্যই জামিলার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁরা এত বেশি দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু, আমার নিজের মাকে আমি বুঝতে পারতাম না। অমনি অমনি কাউকে ভালবেসে ফেলার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। মার

ছিল কড়া মেজাজ আর কর্তৃত্ব করার স্বভাব। তিনি নিজের নিয়মে চলতেন, কখনও নিয়ম ভঙ্গ করতেন না। যেমন, উঠানের মাঝে বসন্তের শুরুতে মা কখনও পুরানো যাযাবরদের তাঁবু — যেটা বাবা তৈরি করেছিলেন তাঁর যৌবনে — খাটাতে এবং তার ভেতরে জুনিপারের ডাল জ্বালাতে ভুলতেন না। তিনি আমাদেরও গড়ে তুলেছিলেন কঠোর পরিশ্রমী করে আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে; তিনি চাইতেন পরিবারের প্রতিটি মানুষ তাঁর কথা মেনে চলবে একবাক্যে।

সাধারণত যা হয়, জামিলা তেমন বৌ ছিল না শুরু থেকেই। এ কথা খুবই সত্য, সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করত, মান্যও করত; কিন্তু তাঁদের সামনে নিচু হয়ে থাকত না। এ কথাও সত্য, আড়ালে ফিসফিস করে গুরুজনদের নিন্দাও সে করত না — অন্য সব তরুণী বৌয়েরাই যেটা করত। জামিলা যা ভাবত সর্বদা সোজাসুজি তা-ই বলত, নিজের মত প্রকাশ করতে কখনও ভয় পেত না। মা প্রায়ই ওকে সমর্থন করতেন, কিন্তু চূড়ান্ত কথাটা বলতেন তিনি নিজেই।

আমার মনে হত সরলতা আর পক্ষপাতহীনতার জন্য মা জামিলাকে নিজের সমান মনে করতেন আর মনে মনে স্বপ্ন পোষণ করতেন জামিলাকে তিনি নিজের মতই একজন ক্ষমতাশালী গৃহকর্ত্রী ও বাইবিচে করে গড়ে তুলবেন।

মা প্রায়ই বলতেন: 'মেয়ে, আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাস যে তুই এমন একটা জমজমাট আর আল্লার রহমৎভরা পরিবারে এসেছিস। এটা তোরই সৌভাগ্য। সন্তানের মা হওয়া আর সচ্ছল পরিবারে বাস করার মধ্যেই মেয়ে মানুষের সুখ। আমরা বুড়ো মানুষেরা যা কিছু গড়ে তুলেছি, আল্লার রহমতে তার সব কিছু তুইই পাবি: কিছুই আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব না। সুখ তাদেরই কপালে ঘটে যারা নিজেদের মর্যাদা আর

বিবেক নির্মল রাখে। একথা মনে রাখবি আর হুঁশিয়ার থাকবি!..'

কিন্তু জামিলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তার শাশুড়ীদের উদ্বিগ্ন রাখত: জামিলা ছিল খুবই তেজী মেয়ে। মনে হত সে যেন শিশুই রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই আনন্দে উচ্চস্বরে হেসে উঠত। যখন কাজ থেকে ফিরত শান্তভাবে হাঁটার বদলে উঠানে ঢুকত ছুটে সেচ-পরিখার উপর দিয়ে লাফিয়ে। তার পরে, অকারণেই, দুই শাশুড়ীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে থাকত।

গান গাইতে ভালবাসত। সব সময়ই কিছু একটা গুণগুণ করত, গুরুজনদের উপস্থিতিতে মোটেই বিরত হত না। বৌদের আচরণ সম্পর্কে আমাদের গ্রামে যে প্রথাসিদ্ধ ধারণা ছিল, জামিলার আচরণ মোটেই তেমন ছিল না। কিন্তু দুই শাশুড়ীই সান্ত্বনা পেতেন এই ভেবে যে, সময় এলে জামিলা আপনিই শান্ত হয়ে যাবে — অল্প বয়সে তাঁরা নিজেরাও কি ওই রকমই ছিলেন না? আমার নিজের মনে হত জামিলার চাইতে ভাল সারা দুনিয়ায় কেউ নেই। আমরা একসঙ্গে অনেক মজা করতাম, সারা উঠানময় পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াতাম আর অবিরাম হাসতাম।

জামিলা খুবই সুন্দরী ছিল। শ্রীমণ্ডিত সুগঠিত দেহ, দুটি শক্ত ভারী বেণীতে বাঁধা অকুঞ্চিত কেশদাম; মাথায় শাদা রুমাল বাঁধত একটু তেরচা করে — বাদামি দেহবর্ণের জন্য সেটা খুবই শোভন লাগত। হাসলে ওর পটল-চেরা চোখ দুষ্টুমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত; যখন হঠাৎ দুষ্টুমিভরা গ্রাম্য গান গেয়ে উঠত, ওর সুন্দর চোখদুটিতেও সমানভাবে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যেত।

প্রায়ই লক্ষ্য করতাম তরুণ দ্‌জিগিত্‌রা, বিশেষ করে

যুদ্ধফেরত পুরুষেরা জামিলার প্রতি খুব আকৃষ্ট হত। জামিলা রসিকতা উপভোগ করত, কিন্তু কেউ সীমা ছাড়িয়ে এগোনোর চেষ্টা করলে জামিলা তক্ষুনি তাকে থামিয়ে দিত। ওর প্রতি কারও আচরণে অশোভন কিছু লক্ষ্য করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতাম। জামিলা সম্পর্কে আমার খুব ঈর্ষা ছিল — বোন সম্পর্কে ছোট ভাইদের যেমন থাকে; কোন তরুণ জামিলার বেশি কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করলে আমি সর্বোপায়ে বাধা দিতাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণার দৃষ্টিতে সেই তরুণের দিকে তাকাতাম — যার ভাবার্থ ছিল: "সাবধান! জামিলা আমার ভ্রাতৃবধূ, মনে করো না যে ওকে রক্ষা করার কেউ নেই!"

এসব সময়ে, জামিলার প্রণয়প্রার্থীদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে, দরকারে অদরকারে আমি ওদের কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে পড়তাম একটু বাড়াবাড়ি ধরনের অন্তরঙ্গতার ভাব নিয়ে। এতে ব্যর্থ হলে আমি আত্মসংযম হারিয়ে ফেলতাম, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ফোঁসফোঁস করতে থাকতাম।

তরুণেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত:

'ওর ভাবটা একবার দেখ! জামিলা নিশ্চয়ই ওর দুজেনে। বেশ মজার ব্যাপার, তাই না! আমরা কখনও বুঝতেই পারতাম না!'

নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতাম, কিন্তু অনুভব করতাম কান জ্বলছে, চোখে জমে উঠছে আহত অশ্রু। কিন্তু জামিলা, আমার দুজেনে, আমাকে বুঝত। ভেতর থেকে বুদ্বুদের মত ঠেলে-আসা হাসি চেপে রেখে গম্ভীর ভাব করে দুর্বিনীতভাবে বলত:

'তোমরা কি ভাবছ চাইলেই দুজেনে পাওয়া যায়? তোমরা যেখান থেকে এসেছ হয়ত সেখানে তা-ই হয়, কিন্তু এখানে

তেমন হয় না! চলে আয় কিচিনে বালা, আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলব না!' তরুণদের সামনে সদম্ভে উদ্ধতভাবে মাথা পেছনে হেলিয়ে উদাসীনভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে নিয়ে হেঁটে চলে আসত আর নিঃশব্দে হাসত।

সেই হাসিতে বিরক্তি আর আনন্দ দুইই থাকত। হয়ত ও ভাবত: "বোকা ছেলে! আমি যদি ইচ্ছা করি, তুই কি ভাবিস কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? সারা পরিবার আমার ওপর গোয়েন্দার মত চোখ রাখলেও আমার যা ইচ্ছা আমি তা-ই করব!" এ রকম অবস্থায় আমি অনুতপ্তভাবে চুপ করে থাকতাম। জামিলা সম্পর্কে আমি যে ঈর্ষা পোষণ করতাম এ কথা সত্যি, আমি ওকে পূজা করতাম, ও যে আমার দুজেনে সে জন্য আমি গর্ব বোধ করতাম, ওর স্বাধীন আর বেপরোয়া প্রকৃতির জন্যও গর্ব বোধ করতাম। আমরা ছিলাম পরস্পরের প্রিয়তম বন্ধু, একে অপরের কাছে কোন কথা গোপন রাখতাম না।

যুদ্ধের বছরগুলিতে গ্রামে পুরুষ ছিল খুবই কম। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু যুবক খুবই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, মেয়েদের সঙ্গে আচরণ করত অবজ্ঞার সঙ্গে। তাদের ভাব ছিল অনেকটা এই রকম: "যদি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেই যে কোন মেয়ে ছুটে আসে তবে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?"

একবার, খড় তোলার সময়ে, আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওসমান জামিলার সঙ্গে অশোভন আচরণ শুরু করে। যারা ভাবে কোন মেয়েই তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না, ওসমান ছিল সেই ধরনের লোক। খড়ের গাদার ছায়ায় জামিলা জিরিয়ে নিচ্ছিল, ওসমান ওর দিকে হাত বাড়াতেই জামিলা ক্রোধের সঙ্গে তার হাত ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গুমটভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জামিলা বলল: 'চলে যাও

এখান থেকে! তোমার মত ঘোড়ার বাচ্চার কাছ থেকে এ ছাড়া আর কী আশা করা যেতে পারে!'

ওসমান খড়ের গাদার নীচে গড়িয়ে শুয়ে পড়ল, তার ভেজা ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঁচকে গেল।

'নাগালের বাইরে মাংস থাকলে বিড়াল তা সব সময়েই অবজ্ঞা করে... অত দাম-দেখানো ভাব করছ কেন? আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি আসলে খুবই ইচ্ছুক — তাহলে অত দেমাক কিসের?'

জামিলা ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'হতে পারে, আমি ইচ্ছুক! কিন্তু আমাদের ভাগ্যই এ রকম। ও রকম কুৎসিত হাসি ছাড়া অন্য কিছু যদি তোমার মাথায় না আসে তবে তুমি নেহাতই বোকা। সৈনিকের ঘরে-ফেলে-যাওয়া বৌ হয়ে এক শ' বছর কাটালেও আমি তোমার মত লোকের ওপর থুতুও ফেলতে যাব না — তোমাকে দেখলেই ঘেন্নায় গা রি রি করে। যুদ্ধের সময় না হলে আমি দেখতাম কে তোমার দিকে তাকায়!'

বোকার মত হেসে ওসমান বলল: 'আরে আমিও ত তা-ই বলছি! এটা যুদ্ধের সময় আর স্বামীদের চাবুক না খেয়ে তোমাদের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে! আমার বৌ হলে তোমাকে অন্যভাবে কথা বলতে হত।'

জামিলা বাঘিনীর মত প্রায় ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর মত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার কোন মানে হয় না অনুভব করে সে আর কিছুই বলল না। জামিলার চোখ থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। ঘৃণাভরে থুতু ফেলে আঁকশি তুলে নিয়ে জামিলা সেখান থেকে সরে এল।

আমি ছিলাম খড়ের গাদার পিছনে একটা গাড়ির উপর। আমাকে দেখতে পেয়ে, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেয়ে

জামিলা ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। আমার মনে হচ্ছিল যেন জামিলা নয়, আমিই অপমানিত হয়েছি। নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি ওকে তিরস্কার করলাম:

'এ ধরনের লোককে তুমি কাছে ভিড়তে দাও কেন? ওদের সঙ্গে কথাই বা বল কেন?'

জামিলা সারাদিন মুখ অন্ধকার করে থাকল; আমার সঙ্গে কথা বলল না, সব সময় যে রকম হাসত তেমন হাসলও না। আমি গাড়িটাকে ওর কাছে নিয়ে এলে ও আঁকশি দিয়ে খড় তুলে এমনভাবে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল যাতে ওর মুখটা থাকে খড়ের আড়ালে। ও যে নিদারুণ যন্ত্রণা গোপন করছিল আমি যাতে সে বিষয়ে কোন কথা না বলতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই ও ওই রকম করছিল। গাড়িতে খড় ছুঁড়ে ফেলেই ও আবার ছুটে যাচ্ছিল গাদার দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মনমরাভাবে আঁকশির হাতলের উপর ভর দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছে সে। একটু পরেই দেখলাম গা ঝাড়া দিয়ে ও আবার কাজ শুরু করেছে।

আমরা শেষ গাড়িটা বোঝাই করার পর সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জামিলা, মনে হল ও যেন জগতের আর সবকিছু ভুলে গিয়েছে। নদীর ওপারে দূরে, কাজাখ স্তেপের প্রান্তে নবান্নের নিস্তেজ সূর্যকে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত তন্দুরের মুখের মত। প্রাকসন্ধ্যার নীলাভ ছায়া ছোট ছোট উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়েছে; ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের গায়ে লাল রঙ মাখিয়ে নীল-বেগনি স্তেপের উপর শেষ রশ্মিমালা ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে দিগন্তের অন্তরালে। জামিলা সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ পরমানন্দিতভাবে, যেন কোন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। তার মুখ কোমলতায়

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঈষৎ ফাঁক করা ঠোঁটে মধুর হাসি শিশুর মত। তার পর, যে ভর্ৎসনার বাক্য আমি তখনও উচ্চারণ করি নি কতকটা যেন তারই উত্তরে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে, আমাদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল তার সূত্র ধরে বলল:

'ওর কথা আর ভাবিস নে কিচিনে বালা, তাকিয়েও দেখিস নে ওর দিকে। ও কি একটা মানুষ?..' জামিলা চুপ করে গেল, পাটে বসা সূর্যের বিলীয়মান প্রান্তভাগের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চিন্তান্বিতভাবে বলল: 'মানুষের আত্মার মধ্যে কী আছে তা ওসমানের মত লোকেরা কি করে জানবে? কেউ তা জানতে পারে না। সম্ভবত সারা দুনিয়ায় তেমন মানুষ একজনও নেই...'

আমি ঘোড়াদুটিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম, জামিলা কয়েকটি মেয়ের দিকে ছুটে গেল, আমি ওদের আনন্দমুখর কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। জামিলার এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা দুষ্কর — হয়তো সূর্যাস্তের দৃশ্য ওর মন শান্ত করে দিয়েছে, অথবা হয়তো সারা দিনের কাজের পর এখন ও সুখী বোধ করছে। খড়ের গাড়ির ওপরে বসে জামিলার দিকে তাকালাম। মাথার শাদা রুমাল খুলে নিয়েছে, খড়-কেটে-নেওয়া মাঠের ওপর দিয়ে হাতদুটো ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে বান্ধবীর দিকে, বাতাসে উড়ছে ওর বসনপ্রান্ত। হঠাৎ মনে হল আমার দুঃখবোধ যেন আর নেই: "কেন ওই বাজে লোক ওসমানের কথা ভাবছি!"

'জোর্‌সে চল!' ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকালাম।

আমাদের দলনেতার পরামর্শ মত সেদিন বাড়িতেই থাকলাম, যাতে বাড়ি ফিরে বাবা আমার চুল ছেঁটে দিতে

পারেন। আমার ভাই সাদিকের চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। এ ব্যাপারেও কিছু অলিখিত বিধান ছিল: আমার ভাইয়েরা চিঠি পাঠাত বাবার নামে, গ্রামের পিওন সে সব চিঠি দিত আমার মায়ের কাছে, আর সেগুলি পড়ে শোনানো এবং উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার। চিঠি খুলে দেখার আগেই আমি অক্ষরে অক্ষরে জানতাম সাদিক কী লিখেছে। কারণ, পালের মধ্যে সব ভেড়ার বাচ্চাকেই যেমন এক রকম দেখায়, সাদিকের চিঠিগুলিও তেমনি — প্রতিটিই অন্য যে কোনটির মত। তার সব চিঠিই শুরু হত সকলের সুস্থতা কামনা করে, তার পর সে লিখত: 'আমি ডাক মারফৎ এই চিঠি পাঠাচ্ছি আমার আত্মীয়দের কাছে, যারা বাস করে তালাস্-এর সুগন্ধময় পুষ্পিত ভূমিতে: আমার পরম প্রিয় পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা দ্জোল্চুবাই-এর কাছে...' তার পর কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সে লিখত যথাক্রমে আমার মা, তার মা এবং আমাদের আর সকলের কথা। তার পর আমাদের গোত্রের সকল আক্সাকাল* এবং আমাদের সকল নিকট আত্মীয়ের সুস্থতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে অপরিহার্য প্রশ্নাবলী। আর চিঠির একেবারে শেষভাগে, অনেকটা যেন তাড়াহুড়ার ভাবে সাদিক লেখে: 'আর আমার স্ত্রী জামিলাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো...'

স্বভাবতই, যেখানে বাবা মা জীবিত আছেন, গ্রামেও আক্সাকাল আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ, সেখানে স্ত্রীর নামে চিঠি দেওয়া তো দূরের কথা, চিঠির শুরুতে স্ত্রীর কথা উল্লেখ করারও প্রশ্ন ওঠে না — সেটা রীতিবিরুদ্ধও

* আক্সাকাল — কিরগিজ ভাষায় বৃদ্ধদের সম্ভাষণের ভদ্র রীতি রূপে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। — সম্পাঃ

বটে। সাদিক একা নয়, আত্মমর্যাদাশীল প্রতিটি মানুষই এই মত পোষণ করত। এটা ছিল একটা প্রতিষ্ঠিত রীতি, এ ব্যাপারে কেউ কখনও প্রশ্ন তুলত না, কোন আলোচনাও হত না — এটা উচিত কি অনুচিত সে আমরা কখনও ভাবতাম না। তা ছাড়া প্রতিটি চিঠিই ছিল দীর্ঘপ্রতীক্ষিত, প্রতিটি চিঠির প্রাপ্তিই ছিল আনন্দজনক ঘটনা।

আমার মা প্রতিটি চিঠি আমাকে দিয়ে অনেকবার করে পড়িয়ে নিতেন। তার পর তিনি চিঠিটি তুলে নিতেন খেটে খেটে শক্ত হয়ে যাওয়া হাতে পবিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে; এমনভাবে ধরতেন যেন চিঠিটা একটা পাখি, একটু ঢিল দিলেই উড়ে পালাবে। তার পর শক্ত আঙ্গুলে অনেক চেষ্টা করে অবশেষে চিঠিটাকে ভাঁজ করতেন ত্রিভুজের মত করে।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলতেন: 'আহা রে সোনার বাছারা, তোদের চিঠি আমরা রাখব তাবিজের মত যত্ন করে! বাবা মা আত্মীয়েরা কেমন আছে, জানতে চায়... আমাদের আবার কী হবে? আমরা আছি নিজেদের বাড়িতে, নিজেদের গ্রামে! কিন্তু, তুই ওখানে কেমন আছিস? শুধু একটা কথা লিখে জানা যে তুই বেঁচে আছিস। তা-ই যথেষ্ট, আমরা এর বেশি আর কিছু চাই না...'

আমার মা সেই চিঠির ত্রিভুজের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। তার পর সেটাকে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে রেখে ব্যাগটাকে রাখতেন সিন্দুকের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে।

তখন জামিলা বাড়িতে থাকলে তাকেও চিঠি পড়তে দেওয়া হত। আমি লক্ষ্য করতাম ত্রিভুজের মত ভাঁজ করা চিঠির কাগজটা হাতে ধরার সময়ে প্রতিবারই জামিলা লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। পড়তে শুরু করত সে গভীর আগ্রহ নিয়ে।

কিন্তু পড়তে পড়তে ওর কাঁধ ঝুলে পড়ত, গাল থেকে লজ্জার রক্তিমাভাও ধীরে ধীরে অপসৃত হত। কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠত, শেষের পংক্তি ক'টি না পড়েই চিঠি ফিরিয়ে দিত আমার মায়ের হাতে এমন উদাসীনভাবে, যেন ধার করা কোন জিনিস ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আমার মা, স্বভাবতই, পুত্রবধূকে বুঝতেন নিজের মত করেই এবং সেভাবেই তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইতেন।

সিন্দুক বন্ধ করতে করতে তিনি বলতেন: 'কী হল রে? এই দেখ কেমন ভেঙ্গে পড়েছে, আরে, তোর তো খুশি হওয়ার কথা! তুই কি ভাবছিস একা তোর স্বামীই গেছে লড়াই করতে? শুধু তোর একারই বিপদ হয় নি, সারা জাতিরই রক্ত ঝরছে। অন্যদের মত তোকেও সইতে হবে। ভাবছিস, আর কোন মেয়ে একা একা বোধ করছে না, স্বামীর জন্য ব্যাকুল হচ্ছে না?.. মনে যত কষ্টই থাক, প্রকাশ পেতে দিবি না — নিজের কষ্ট নিজের মনের ভেতরেই রাখবি।'

জামিলা কিছুই বলত না; কিন্তু ওর বিষণ্ণ একগুঁয়ে ভঙ্গি যেন বলতে চাইত: ''আঃ, মা, তুমি কিছুই বোঝ না!''

আগের মত এবারেও সাদিকের চিঠিতে ডাকঘরের সীলে মুদ্রিত ছিল 'সারাতভ'। সাদিক সারাতভের একটি হাসপাতালে রয়েছে। লিখেছে, আল্লাহ্‌র রহমতে শরৎকালে বাড়ি আসবে। এ কথা সে আগেও লিখেছে। সে কারণেই, আসন্ন পুনর্মিলনের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম।

সেদিন শেষ পর্যন্ত আমি আর বাড়িতে থাকলাম না — চলে গেলাম গোলাবাড়িতে, সাধারণত যেখানে আমি রাতে ঘুমাতাম। লুসার্ন ঘাসের মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘোড়াদুটিকে ঢিলেভাবে জোড়া করে পা বেঁধে ছেড়ে দিলাম। যৌথখামারের চেয়ারম্যান লুসার্নের মাঠে আমাদের গবাদি পশু চরানোর

অনুমতি দেন নি; কিন্তু আমি নিয়মভঙ্গ করতাম। কারণ, আমি চাইতাম, আমার ঘোড়াদুটি যেন পেট ভরে খেতে পায়। উপত্যকার একটা নির্জন জায়গা আমার চেনা ছিল — তা ছাড়া রাতের বেলা কেউ তো আর লক্ষ্য করবে না। আমার ঘোড়াদুটি ছেড়ে দিয়েই লক্ষ্য করলাম, কে যেন আগেই চারটি ঘোড়াকে সেখানে ছেড়েছে ঘাস খাওয়ানোর জন্য। আমার একটু রাগ হল। হাজার হোক, আমি দুই ঘোড়ার একটা গাড়ির দায়িত্বশীল কর্তা তো বটেই — আর সে জন্যই রাগ করার অধিকারও আমার আছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে আমি স্থির করলাম, অচেনা ঘোড়াগুলিকে তাড়িয়ে দেব আর আমার এলাকায় বেআইনীভাবে প্রবেশকারী দুষ্ট লোকেটাকে বেশ একটা শিক্ষা দিয়ে দেব। হঠাৎ দানিয়ারের দুটি ঘোড়া আমি চিনতে পারলাম। আমাদের দলনেতা সে দিন ওর কথাই বলছিলেন। পর দিন সকাল থেকে ও আর আমি একসঙ্গে কাজ করব, এ কথা মনে পড়ায় আমি ওর ঘোড়াদুটিকে কিছু না করে গোলাবাড়িতে ফিরে গেলাম।

সেখানে দানিয়ারের দেখা পেলাম। নিজের গাড়ির চাকাগুলিতে তেল দেওয়া শেষ করে সে তখন স্পোক্ টাইট্ করে নিচ্ছিল।

'দানিয়ার, মাঠের ঘোড়াগুলো কি তোমার?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ধীরে মাথা ঘুরিয়ে সে উত্তর দিল:

'দুটি আমার বটে।'

'আর অন্য দুটি?'

'ওগুলো হচ্ছে, কী ওর নাম, জামিলার ঘোড়া। জামিলা কে? তোমার দুজেনে?'

'হ্যাঁ!'

'দলনেতা নিজেই ঘোড়াদুটিকে ওখানে রেখে গিয়েছেন আর আমাকে বলেছেন ওগুলোর ওপর চোখ রাখতে...'

ঘোড়াগুলিকে তাড়িয়ে না দিয়ে ভালই করেছি!

রাত নামল। শান্তভাবে বইতে লাগল পাহাড়ী সান্ধ্য বাতাস। গোলাবাড়ি সম্পূর্ণ নিঃশব্দ। একটা খড়ের গাদার নীচে দানিয়ার শুয়ে আছে আমার পাশে। অল্পক্ষণ পরেই দানিয়ার উঠে পড়ল, হেঁটে চলে গেল নদীর দিকে। নদীর উঁচু পাড়ের একেবারে প্রান্তে গিয়ে সে থামল, নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; হাতদুটি পিছনে, মাথা একদিকে কাত করা। আমি দেখতে পেলাম তার পিঠ। চাঁদের কোমল আলোয় তার দীর্ঘ কৌণিক দেহটাকে দেখাচ্ছিল অযত্নে খোদাই করা মূর্তির মত। মনে হচ্ছিল সে যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে নদীপ্রপাতের শব্দ শুনছে। রাতের বেলা শব্দটা শোনা যায় খুবই স্পষ্টভাবে। সম্ভবত দানিয়ার শুনছিল এমন কোন শব্দ, যা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। "আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, দানিয়ার পণ করেছে রাতটা নদীর পাড়েই কাটাবে আবার!" এ কথা ভেবে আমি আপন মনে বোকার মত হাসলাম।

দানিয়ার আমাদের গ্রামে নবাগত। একবার একটি ছেলে মাঠে ছুটে এসে চীৎকার করে ঘোষণা করল যে, একজন আহত সৈনিক আমাদের গ্রামে এসেছে। কিন্তু, সৈনিকটির পরিচয় কিংবা সৈনিকটি কোত্থেকে এসেছে, ছেলেটি তা বলতে পারল না। দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হল! রণাঙ্গন থেকে কেউ ফিরে এলে তার করমর্দন করার জন্য, কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না জানার জন্য আর সর্বশেষ সংবাদ শোনার জন্য সবাই ছুটে যেত তার কাছে। এবারে লোকজনের

চীৎকার হয়ে দাঁড়াল অবর্ণনীয় রকমের। প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল: "বোধ হয় আমাদের কোন ভাই কিংবা শ্বশুর পক্ষের কেউ এসেছে!" ঘাসুড়েরা সবাই ছুটে চলল গ্রামের দিকে।

আমরা জানতে পেলাম দানিয়ার আসলে আমাদের গ্রামেরই ছেলে। বড়রা বললেন শিশু অবস্থায়ই দানিয়ার অনাথ হয় এবং প্রায় তিন বছর এ-বাড়ি সে-বাড়ি থাকার পর অবশেষে চাক্‌মাক্‌ স্তেপের কাজাখদের কাছে চলে যায় — যেহেতু তার মাতৃপক্ষের আত্মীয়েরা ছিলেন কাজাখ। আমাদের গ্রামে দানিয়ারকে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার মত কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল না, তাই অল্পকালের মধ্যেই তার কথা সবাই ভুলে যায়। নিজের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পর তার জীবন কীভাবে কেটেছে প্রশ্ন করা হলে দানিয়ার পাশ-কাটানো ধরনের উত্তর দিল। বোঝা গেল, একটি অনাথ বালকের জীবনে যে সব দুঃখ-দুর্দশা ঘটতে পারে সবকিছুরই অভিজ্ঞতা তার ঘটেছে। জীবন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে গড়ানো পাথরের মত। চাক্‌মাকের লোনা জলায় দীর্ঘ দিন সে ভেড়া চরিয়েছে; একটু বড় হওয়ার পর মরুভূমিতে খাল কেটেছে, নতুন রাষ্ট্রীয় কার্পাস খামারে এবং পরে তাশখন্দের নিকটবর্তী আনগ্রেন খনিতে কাজ করেছে। শেষোক্ত স্থান থেকেই সে রণাঙ্গনে চলে যায়।

সবাই দানিয়ারের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন অনুমোদন করল। বড়রা বললেন: 'নানান বিদেশে যতই ঘুরে বেড়াক না কেন, অবশেষে ও ফিরে এসেছে এবং তার মানে হচ্ছে স্বগ্রামের ঝরনার জল খাওয়া ওর কপালে লেখা ছিল। নিজের ভাষা ও ভোলে নি; ভালই বলে — যদিও মাঝে মাঝে কাজাখ শব্দও দুয়েকটা বলে।'

বৃদ্ধ আক্সাকালেরা বললেন: 'তুল্পার* নিজের দলে ফিরে আসবেই — যদি সেটা দুনিয়ার অপর প্রান্তে হয়, তবুও। স্বদেশ আর স্বজন সব মানুষেরই হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতম ধন। তুমি ফিরে এসে খুব ভাল করেছ। আমরা খুশি হয়েছি, তোমার পূর্বপুরুষদের আত্মাও সন্তুষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা জার্মানদের শেষ করে দেব এবং আবার শান্তিতে জীবন যাপন করব। অন্য সবার মত তোমারও সংসার হবে, তোমার উনানের ধোঁয়াও আকাশে উঠবে!'

দানিয়ারের পূর্বপুরুষদের বিবরণ পর্যালোচনা করে কারা তার আত্মীয় তা নির্ধারিত হয়ে গেল। এভাবেই এক 'নতুন আত্মীয়' দানিয়ারের আবির্ভাব ঘটল আমাদের গ্রামে।

তার পর এই দীর্ঘদেহী, কাঁধঝোলা, খোঁড়া সৈনিকটিকে ওরোজ্মাত্ নিয়ে এলেন মাঠে। ওভারকোটটি কাঁধে ফেলে দানিয়ার দ্রুত হাঁটছিল — যাতে ওরোজ্মাতের ঘোড়ার ছোট ছোট পদক্ষেপের চাইতে সে পিছিয়ে না পড়ে। দীর্ঘদেহী দানিয়ারের পাশে আমাদের বেঁটে দ্রুতগামী দলনেতাকে দেখাচ্ছিল চঞ্চল কাদাখোঁচা পাখির মত। দুজনকে পাশাপাশি দেখে ছেলেরা হাসছিল।

দানিয়ারের ঘা তখনও সারে নি, পা তখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে সে ঘাসুড়ে বলে কাজে যোগ দিতে পারবে না। তাকে নিয়োগ করা হয় আমাদের সঙ্গে, ঘাস-কাটার যন্ত্রগুলি দেখাশোনা করার কাজে। সত্য বলতে কি, আমরা দানিয়ারকে পছন্দ করতাম না। প্রথমত, তার গাম্ভীর্য আমাদের ভাল লাগত না। কথা বলত খুবই কম; যখন বলত, মনে হত যেন ভাবছে এমন কিছু যার সঙ্গে তার কথার কোন সম্পর্ক

---

* তুল্পার — কিংবদন্তীয় ঘোড়াবিশেষ। — সম্পাঃ

নেই — মনে হত যেন মগ্ন হয়ে আছে নিজেরই ভাবনায়। দেখা যাবে ও হয়ত তাকিয়ে আছে সোজা আপনার দিকেই চিন্তাপূর্ণ স্বপ্নিল চোখে, কিন্তু আপনি হলপ করে বলতে পারবেন না যে, ও আপনাকেই দেখছে।

বড়রা বলতেন: 'আহা, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার পর ছেলেটা এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না!'

কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই অবিরাম স্বপ্নমগ্নতার মধ্যেও দানিয়ার কাজ করত দ্রুত ও নিপুণভাবে। প্রথম দর্শনে তাকে মনে হত সদয় ও অকপট ধরনের মানুষ। সম্ভবত, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ শৈশবই তাকে শিখিয়েছে নিজের ভাবনা আর আবেগ গোপন রাখতে এবং তাকে করে তুলেছে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষে। খুবই সম্ভব।

মুখের দুই কোণে গভীর রেখা সৃষ্টি করে দানিয়ারের ঠোঁটজোড়া সব সময়েই শক্তভাবে চাপা থাকে; চোখদুটি বিষণ্ন, গম্ভীর; শুধু চঞ্চল ভ্রুজোড়াই তার বেদনাহত ক্লান্ত চেহারায় সজীবতার প্রমাণ দেয়। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ চকিত হয়ে উঠত, যেন এমন কিছু শুনতে পেয়েছে যা আমরা শুনতে পাচ্ছি না; তখন তার ভ্রু উপরের দিকে উঠে যেত, চোখে দেখা দিত অদ্ভুত আগুনের ঝিলিক। তার পর অনেকক্ষণ ধরে তার মুখে ফুটে থাকত আনন্দের মৃদু হাসি। আমাদের সবার কাছেই এটা খুব অদ্ভুত মনে হত। দানিয়ারের আরও অনেক কিছুই ছিল অদ্ভুত ধরনের। সন্ধ্যায় ঘোড়ার বাঁধন খুলে তাঁবুতে ফিরতাম সবাই — পাচক আমাদের রাতের খাবার প্রস্তুত করত; কিন্তু দানিয়ার উঠে যেত পাহারার পাহাড়ে*, অন্ধকার গভীর হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকত।

* পাহারার পাহাড় — যাযাবরদের আক্রমণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কিরগিজিয়ায় এই পাহাড়টির এ-ই নাম। — সম্পাঃ

'ও ওইখানে কী করছে, পাহারা দিচ্ছে নাকি?' আমরা হাসতাম।

একবার, কৌতূহলবশে, দানিয়ারকে অনুসরণ করে আমি পাহাড়ে উঠেছিলাম। অসাধারণ কিছুই চোখে পড়ল না। দূর দিগন্তের পর্বতমালা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে প্রদোষের স্তেপ পুষ্পিত লাইলাকের সম্ভার নিয়ে। ঝাপ্সা কালো জমি যেন ধীরে গলে মিশে যাচ্ছে স্থির নিঃশব্দের মধ্যে।

দানিয়ার আমার প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিল না। হাঁটু জড়িয়ে বসে তাকিয়ে রইল দূরের গভীরে ভাবাকুল চোখে। আরেকবার আমার মনে হল সে একান্ত মনোযোগে শুনছে এমন কোন শব্দ যা আমি শুনতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে হঠাৎ চকিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে কী যেন দেখার চেষ্টা করছিল। কী যেন ওকে বিব্রত করছিল। আমার মনে হচ্ছিল দানিয়ার এক্ষুনি উঠে নিজের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবে (অবশ্যই আমার কাছে নয় — আমাকে ও দেখেই নি) আমার অজানা মহান বিশাল কোন কিছুর কাছে। মুহূর্তের পরে তাকিয়ে আমি দানিয়ারকে চিনতেই পারলাম না: দানিয়ার বসে আছে নিস্তেজ বিষণ্ণভাবে; যেন সারা দিনের কাজের পর বিশ্রাম নিচ্ছে মাত্র।

আমাদের যৌথখামারের ঘাস শুকানোর জায়গাটি ছিল কুর্কুরেউ নদীর বন্যার এলাকায়। আমাদের গ্রামের কাছেই গভীর গিরিসঙ্কট থেকে বেরিয়ে নদীটি উপত্যকায় পড়েছে বাঁধনছেঁড়া খরস্রোত নিয়ে। পাহাড়ী নদীতে বান ডাকার সময়েই ঘাস শুকিয়ে খড় করা হয়। সন্ধ্যার দিকে কর্দমাক্ত ফেনিল জলের উত্থান শুরু হয়। নদীর স্ফীতির ভয়ঙ্কর শব্দে তাঁবুর ভেতরে মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। দেখতাম আকাশের নীলে তারারা জ্বল জ্বল করছে, শান্ত

রাত্রি উঁকি দিচ্ছে, ঠাণ্ডা বাতাস — মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া; পৃথিবী ঘুমোচ্ছে, খরগতি নদী যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ভয়াবহভাবে। নদী খুব কাছে নয়, তবু আমার মনে হত জল অতি নিকটে এসে পড়েছে। কেমন একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসত — এই বুঝি তাঁবু ভেঙ্গে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমার বন্ধুরা তখন গভীরভাবে ঘুমাত, ঘাস কাটা মেহনতীরা যেমন ঘুমায়, কিন্তু আমি অস্থির হয়ে উঠতাম, তাঁবুর বাইরে চলে যেতাম।

কুর্কুরেউর বন্যা-এলাকার রাত্রি একাধারে সুন্দর আর ভয়ঙ্কর। চারণভূমির এখানে-সেখানে পা-বাঁধা ঘোড়ার কালো ছায়া দেখা যায়। শিশিরভেজা ঘাস পেট পুরে খেয়ে ওরা ঝিমোচ্ছে সতর্কভাবে মৃদু নাক ডাকিয়ে। আরও দূরে, ভেজা রোজ-উইলো প্রবলভাবে নুইয়ে কুর্কুরেউ ছুটে চলেছে জলগর্ভের পাথর গড়িয়ে নিয়ে ফাঁপা শব্দ করে। অশান্ত নদী রাত্রিকে ভরিয়ে তুলেছে অপার্থিব, ভয়াবহ শব্দে।

এরকম রাতে দানিয়ারের কথা আমার মনে পড়ত। সাধারণত সে ঘুমাত জলের কাছে একটা খড়ের গাদার নীচে। ও কি ভয় পায় না? নদীর প্রবল শব্দ ওর কানে তালা ধরিয়ে দেয় না কি? ও কি সত্যিই ঘুমাতে পারে ওখানে? ও কেন নদীর পাড়ে একা রাত কাটায়? কোন্ শক্তি দানিয়ারকে টেনে নিয়ে যায় ওখানে? অদ্ভুত মানুষ, ও যেন অন্য জগতের মানুষ! এখন ও কোথায়? চার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কাউকে দেখা গেল না। নদীর তীর নেমে গেছে দূরে ঢালু পাহাড়ের মত; অন্ধকারে পর্বতমালাকে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট। সেখানে চূড়াগুলিতে শুধু নিঃশব্দ আর তারার মেলা।

লোকে হয়ত ভাবতে পারে দানিয়ার ইতোমধ্যে গ্রামে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। কিন্তু, সে ছিল আগের মতই নিঃসঙ্গ;

বন্ধুত্ব, শত্রুতা, সহানুভূতি, ঈর্ষা প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থই যেন সে জানত না। নিজেকে এবং নিজের বন্ধুদের সমর্থন করা, ভাল কাজ করা, মাঝে মাঝে দুয়েকটা খারাপ কাজ করা, পালে-পার্বণে আক্সাকালদের সমানে সমানে দাঁড়িয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা — এ সব না করলে গ্রামে দ্জিগিত্ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, মেয়েদের নজরেও পড়া যায় না।

কিন্তু, দানিয়ারের মত যারা আত্মমগ্ন হয়ে থাকে, গ্রামের প্রাত্যহিক ব্যাপারাদিতে যোগ দেয় না, লোকে তাদের হয় উপেক্ষা করে, নয় তো তাদের সম্পর্কে অনুকম্পার সুরে বলে:

'লোকটা কারও সাতে-পাঁচে থাকছে না। নিজে নিজেই চলছে; বেশ তাই চলুক...'

সাধারণত এ ধরনের লোকেরা সব রকমের পরিহাসের আর কৃপার পাত্র হয়ে থাকে। আমরা তরুণেরা, আমাদের চাইতে বেশি বয়সীদের মত ভাব করতাম, চেষ্টা করতাম যাতে খাঁটি দ্জিগিত্রা আমাদের মনে করে তাদের সমান বলে। আমরা সব সময় আড়ালে দানিয়ারকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম; কিন্তু কখনও তার সামনে তেমন কিছু করার সাহস পেতাম না। তার ফৌজী শার্টটা যে নিজে ধুত, তা নিয়েও আমরা হাসাহাসি করতাম। ধুয়ে নিয়ে শার্টটা সে ভেজা অবস্থায়ই গায়ে পরত; কারণ তার আর কোন শার্ট ছিল না।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, দানিয়ার দেখতে শান্ত এবং গম্ভীর ধরনের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কখনও তার সঙ্গে অতি পরিচিতের মত ব্যবহার করতে সাহস পেতাম না। এটা তার বয়স আমাদের চাইতে বেশি হওয়ার জন্য নয় — তিন-চার বছরের তফাৎ আর এমন কি? দানিয়ার রূঢ় বা রাশভারিও ছিল না — যা অনেক সময় একটা শ্রদ্ধার মত ভাব

জন্মায়। আসলে তার নিঃশব্দ বিষণ্ণ চিন্তাচ্ছন্নতার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যার নিকটস্থ হওয়া যায় না; সেটাই আমাদের সরিয়ে রাখত, যদিও কাউকে নিয়ে হাসি তামাশা করার সুযোগ পেলে আমরা সব সময়েই খুশি হতাম।

আমার মনে হয় একটা বিশেষ ঘটনার জন্যই তার প্রতি আমাদের মনোভাব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি খুবই অনুসন্ধিৎসু ছিলাম এবং প্রায়ই আমার অশেষ প্রশ্ন দিয়ে লোকজনকে বিরক্ত করতাম। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসা সৈন্যদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল অদম্য। দানিয়ার আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আসার পর থেকেই আমি তার কাছ থেকে কিছু কথা বের করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

একদিন সন্ধ্যায়, কাজের পর রাতের খাবার খেয়ে আমরা শিবিরাগ্নির চারদিকে বৃত্তাকারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

আমি বললাম: 'দানিয়ার, আমরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে যুদ্ধের কথা আমাদের কিছু বল।'

প্রথমে সে কিছুই বলল না; মনে হল যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে সে আমাদের দিকে তাকানোর জন্য মাথা তুলল।

বলল: 'যুদ্ধের কথা?' তারপর, যেন নিজের মনোগত প্রশ্নের উত্তরে রূঢ় এবং সংক্ষিপ্তভাবে বলল: 'না, যুদ্ধ সম্পর্কে কোন কিছু না জানা-ই তোমাদের পক্ষে সবচাইতে বেশি ভাল!'

দানিয়ার ঘুরে বসল, কিছু শুকনো পাতা আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে সেগুলিতে ফুঁ দিতে থাকল আমাদের দিকে না তাকিয়ে।

দানিয়ার আর কিছু বলল না। কিন্তু, ঐ অল্প ক'টি শব্দেই আমাদের অনুভব করিয়ে দিল যে, যুদ্ধ এমন বিষয় নয়

না সম্পর্কে লঘুভাবে কথা বলা যায় — যুদ্ধ বিছানায় শুয়ে শোনার মত গল্প নয়। যুদ্ধ ওর হৃদয়ের গভীরে জমাট রক্তের মত শুকিয়ে আছে; যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলা ওর পক্ষে সহজ নয়। আমি লজ্জিত বোধ করলাম; আর কখনও ওকে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করি নি।

গাঁয়ের লোকেরা যেমন অল্পকালের মধ্যেই দানিয়ার সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, আমরাও সেদিনের সন্ধ্যার কথা তেমনি অল্পকালের মধ্যেই ভুলে গেলাম।

পরদিন খুব সকালে দানিয়ার আর আমি ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এলাম গোলাবাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জামিলাও এসে গেল। দূর থেকে আমাদের দেখে চেঁচিয়ে বলল:

'এই কিচিনে বালা, আমার ঘোড়াদুটিকে এখানে নিয়ে আয়! ঘোড়ার সাজ কই?' গাড়ি এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন সারা জীবনই ও কোচোয়ান ছিল — চাকাগুলিতে লাথি মেরে দেখল বুশিং ঠিক আছে কি-না।

আমরা গাড়ি চালিয়ে কাছে যেতে ও আমাদের চেহারা দেখে খুব মজা পেল। দানিয়ারের লম্বা সরু পায়ে বিশাল একজোড়া তেরপলের জুতো, যেন যেকোন মুহূর্তে খসে যাবে; আর আমি আমার ঘোড়াকে তাড়া দিচ্ছিলাম জুতোর কঠিন গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে আঘাত করে।

মাথা ঝাঁকিয়ে জামিলা বলল: 'আহা, যেন মাণিকজোড়!' পর মুহূর্তেই সে হুকুমদারি শুরু করে দিল: 'তাড়াতাড়ি কর! আমাদের স্তেপ পেরোতে হবে তাপ বেড়ে যাওয়ার আগেই!'

শক্ত হাতে লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে ঘোড়াগুলিকে গাড়ির সঙ্গে জুততে শুরু করে দিল। এটাও জামিলা নিজেই করল, শুধু একবার আমাকে দেখিয়ে দিতে বলল লাগাম কীভাবে

লাগাতে হয়। দানিয়ারকে ও দেখছিলই না — যেন দানিয়ার সেখানে ছিলই না।

জামিলার একগংয়ে বেপরোয়া ভাব আর আত্মবিশ্বাস দেখে দানিয়ার হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শক্তভাবে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়েছিল দানিয়ার; তার চোখের দৃষ্টিতে প্রতিকূলতার ভাব থাকলেও একটা লুকানো প্রশংসার ভাবও ছিল। সে দাঁড়িপাল্লার উপর থেকে একবস্তা শস্য তুলে নিয়ে নিঃশব্দে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। জামিলা তাকে বকুনি দিল:

'ভাবছ আমরা সবাই একা একা কাজ করব? না বন্ধু, সেটা হবে না। এই যে, এখানে হাত লাগা দেখি! হাঁ করে দেখছিস কী কিচিনে বালা? গাড়িতে ওঠ, বস্তাগুলো সাজিয়ে রাখ!'

জামিলা দানিয়ারের হাত ধরল। বাঁকানো হাতে ওরা যখন একটা বস্তা তুলল, দানিয়ার লজ্জায় লাল হয়ে গেল। পরস্পরের কব্জি শক্ত করে ধরে ওরা বস্তা বয়ে নিয়ে আসছিল, পরস্পরের মাথা প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবারই লক্ষ্য করছিলাম দানিয়ার কী ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে, বিব্রতভাবে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, জামিলার মুখের দিকে না তাকানোর জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করছে। কিন্তু জামিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না; দানিয়ারকে ও যেন লক্ষ্যই করছিল না — রসিকতা করছিল দাঁড়িপাল্লার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির সঙ্গে। গাড়িগুলি বোঝাই হয়ে গেলে আমরা যখন লাগাম তুলে নিলাম, হেসে দুষ্টুভাবে চোখ টিপে জামিলা বলল:

'এই তোমার নাম কী! দানিয়ার? দেখতে তো তোমাকে মানুষের মতই লাগছে, আগে আগে গাড়িও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বোধ হয়!'

এবারেও কিছু না বলে লাগামে ঝাঁকুনি দিয়ে দানিয়ার

গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি মনে মনে বললাম: "আহা বেচারা! লজ্জায় তুমি কাবু হয়ে পড়েছ!"

সামনে দীর্ঘ পথ: স্তেপের উপর দিয়ে পনের মাইল, তারপর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে স্টেশানের দিকে। একমাত্র ভাল দিকটা হচ্ছে এই যে, সমগ্র পথটাই অবিরামভাবে নীচের দিকে ঢালু, তাতে ঘোড়াগুলির কষ্ট কম হয়।

আমাদের গ্রামটি কুর্কুরেউ নদীর তীরে বড় পাহাড়ের একটা ঢালের উপর। গিরিখাত পর্যন্ত সমগ্র পথটি থেকেই কালো বৃক্ষচূড়াশোভিত গ্রামটি দেখা যায়।

আমরা দিনে মাত্র একবার শস্য নিয়ে যেতাম। খুব সকালে বেরিয়ে স্টেশানে পৌঁছুতাম বিকেলে।

রোদ তেতে উঠত নির্মমভাবে; স্টেশানে এত ভিড় যে তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হত দুষ্কর। উপত্যকার সব জায়গা থেকে মাল বোঝাই হয়ে আসত নানা ধরনের গাড়ি; খচ্চর আর গোরু আসত পাহাড়ি যৌথখামারগুলি থেকে মাল নিয়ে। সে সব চালিয়ে নিয়ে আসত অল্পবয়সী ছেলেরা আর সৈন্যদের বৌয়েরা। রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া একেকটি মুখ, পরনে বিবর্ণ জামাকাপড়, পাথুরে পথে হেঁটে হেঁটে নগ্ন পা কঠিন হয়ে গিয়েছে, তাপ আর ধুলোয় ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে।

শস্য তোলার কপিকলের পাশে একটা বিরাট শ্লোগান: 'শস্যের প্রতিটি দানা রণাঙ্গনের জন্য!' চাতালে নানা ধরনের গাড়ির চালকদের উত্তেজনা, ঠেলাঠেলি, চীৎকার অবর্ণনীয়। কাছেই, একটা নীচু দেওয়ালের পেছনে, শক্ত গিঁটের মত দেখতে গরম বাষ্প উদ্‌গীরণ করে, পোড়া ধাতুর গন্ধ ছড়িয়ে একটা এঞ্জিন নিজের অবস্থান ঠিক করে নিচ্ছিল। প্রচণ্ড শব্দে ট্রেন চলাচল করছে। উঠে দাঁড়াতে অনিচ্ছুক উটগুলো

লালাভর্তি মুখ সক্রোধে ব্যাদান করে মরিয়া গর্জন করছে।

রিসিভিং স্টেশানে আগুনের মত তপ্ত লোহার ছাদের নীচে শস্যবোঝাই করে রাখা হচ্ছে পাহাড়ের মত উঁচু করে। বস্তাগুলিকে নিয়ে যেতে হচ্ছিল কাঠের ঢালু তক্তার উপর দিয়ে ঠিক ছাদের নীচ পর্যন্ত। শস্যের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছে, ধুলোয় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

অনিদ্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু রিসিভিং এজেণ্ট নীচ থেকে চীৎকার করে বললেন: 'এই, শুনছ! সাবধানে হাঁট! বস্তাগুলো উপরে নিয়ে যাও, একেবারে উপরে!' তিনি মুঠি ঝাঁকিয়ে গালাগালি দিচ্ছিলেন।

লোকটা গালি পাড়ছে কেন? বস্তাগুলি কোথায় রাখতে হবে সে তো আমরা জানিই এবং রাখবও। আমরা বস্তাগুলিকে এনেছি সেই সব মাঠ থেকে, যেখানে মেয়েরা, বুড়ো মানুষেরা, ছেলেপিলেরা গম রোপণ করেছে আর আহরণ করেছে, যেখানে শস্য তোলার ভরা মরশুমে অনেক কালের জীর্ণ পুরানো মেশিন নিয়ে কম্বাইন অপারেটাররা কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, যেখানে তাতানো কাস্তে হাতে পিঠ নুইয়ে মেয়েরা কাজ করে চলেছে অবিরাম, যেখানে কমবয়সী ছেলেছোকরাদের হাত প্রতিটি পড়ে যাওয়া শস্যের দানা তুলে নিচ্ছে সযত্নে।

আমার এখনও মনে আছে কী ভারী ছিল সেই গমের বস্তাগুলি। ওগুলি বহন করা ছিল শক্তসমর্থ পুরুষদের কাজ। ভারে ঝুলেপড়া তক্তাগুলিতে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হত; পিঠের উপর থেকে বস্তা যাতে পড়ে না যায় তার জন্য বস্তার একটা কোণ দাঁতে চেপে ধরে অনেক কষ্ট করে আমাকে এগিয়ে যেতে হত সেই সব তক্তার উপর দিয়ে। ধুলায় কণ্ঠনালীতে চুলকানি ধরত, ভারে পাঁজরায় ব্যথা হত, চোখের সামনে সরষে

ফুলের নাচ দেখতাম। অনেক সময় মাথা ঘোরাত, বুঝতাম বস্তা পিঠের উপর থেকে পড়ে যাবেই, কেবলই মনে হত বস্তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে যাব। কিন্তু আমার পেছনে আরও লোক থাকত। আমার মতই অল্পবয়সী ছেলে অথবা সৈন্যদের স্ত্রী — আমার মত ছেলেদের মা। তারাও বস্তা বহন করত। যুদ্ধ না বাধলে এমন বোঝা তাদের কে বহন করতে দিত? মেয়েরাও আমারই মত কাজ করছিল, তাই আমার পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার সামনে সামনে চলত জামিলা। তার ঘাগরা গুটোনো থাকত হাঁটুর উপর। সুন্দর বাদামি পায়ের মাংস পেশীগুলিতে কী ভীষণ টান পড়ত আর বস্তার ভারে বেঁকে যাওয়া কোমল দেহটাকে সে কী প্রবল চেষ্টায় দৃঢ় করে রাখত, তা আমি দেখতে পেতাম। মাঝে মাঝে মুহূর্তেকের জন্য জামিলা থামত — যেন বুঝতে পারত যে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই আমি দুর্বলতর হয়ে পড়ছি।

'ঘাবড়াস নে কিচিনে বালা, আমরা প্রায় এসে গেছি!'

কিন্তু ওর নিজের স্বরই ফাঁপা আর নিষ্প্রাণ শোনাত।

বস্তা খালাস করে ফিরে এসে আমরা দেখতে পেতাম দানিয়ার উঠে আসছে। তক্তার উপর দিয়ে বলিষ্ঠ মাপা পায়ে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল, বরাবরের মতই নিঃসঙ্গ ও চুপচাপ। আমরা তার পাশ দিয়ে নেমে আসার সময়ে দানিয়ার জামিলার দিকে তাকাত বিষাদমাখা জ্বলন্ত চোখে। নামতে নামতে জামিলা নিজের ক্লান্ত পিঠ সোজা করে নিত; ভাঁজ-পড়া কাপড় টেনে সোজা করত। দানিয়ার প্রতিবারই এমনভাবে তাকাত যেন জামিলাকে প্রথমবার দেখছে; জামিলা বরাবরকার মতই দানিয়ারকে উপেক্ষা করত।

এটা একটা ছকের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল: জামিলা নিজের

মেজাজ অনুসারে দানিয়ারকে হয় পরিহাস করত নয়ত একেবারেই উপেক্ষা করত। এমন হত, আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি, জামিলা হঠাৎ চেঁচিয়ে আমাকে বলত: 'এই চল্ আমরা তাড়াতাড়ি যাই!' মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে সে প্রবলভাবে ঘোড়া ছোটাত। আমার গাড়ি ছুটত ওর পেছনে। ভারী ধুলার মেঘে আচ্ছন্ন করে আমরা দানিয়ারকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতাম। সে ধুলার মেঘ পথের উপর থিতিয়ে বসতে বেশ সময় লাগত। রসিকতার ভাবে করা হলেও খুব কম লোকেই হয়ত এটা সহ্য করত। কিন্তু মনে হত দানিয়ার কিছু মনে করছে না। আমরা যখন ওর গাড়ির পাশ কাটিয়ে প্রবলভাবে এগিয়ে যেতাম, গাড়ির উপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো হাস্যময়ী জামিলার দিকে দানিয়ার তাকাত হাসিহীন প্রশংসার দৃষ্টিতে। পিছন ফিরে দেখতাম ধুলার ভেতর দিয়ে দানিয়ার তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা সদয় এবং সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়ার ভাব থাকত; তবু আমি যেন একটা একগুঁয়ে বিষণ্ণতার ভাব দেখতে পেতাম।

পরিহাস বা উপেক্ষা কোনটা দিয়েই জামিলা কখনও দানিয়ারকে চটাতে পারে নি। যেন দানিয়ার সবকিছু সহ্য করার শপথ নিয়েছিল। প্রথম প্রথম দানিয়ারের জন্য দুঃখ হত, প্রায়ই জামিলাকে তিরস্কার করে বলতাম: 'কেন ওকে নিয়ে তামাশা কর দুজেনে? ও তো খুবই শান্ত আর নিরীহ মানুষ!'

হেসে হাত নাড়িয়ে জামিলা বলত: 'আরে আমি এমনই এর সঙ্গে তামাশা করি, ওর মত কাঁকড়ার কিছুই হবে না কখনও!'

অল্পকালের মধ্যেই আমিও দানিয়ারকে নিয়ে রসিকতা শুরু করে দিলাম। তার অদ্ভুত সনির্বন্ধ দৃষ্টিতে আমি উদ্বিগ্ন

বোধ করতাম। জামিলা যখন পিঠে বস্তা তুলে নিত, দানিয়ার কেমন অদ্ভুতভাবে তাকাত জামিলার দিকে! একথা অবশ্য ঠিক যে, রিসিভিং স্টেশানের ঠেলাঠেলি, হট্টগোল, কর্কশ চীৎকার আর ছোটাছুটির মধ্যে জামিলার শান্ত, সংযত ও লঘু পদক্ষেপে চলাফেরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত; মনে হত সে যেন রয়েছে এই চাতালের বাইরে কোথাও।

জামিলার দিকে তাকিয়ে না দেখা রীতিমত দুষ্কর ব্যাপার ছিল। গাড়ি থেকে পিঠের উপর বস্তা তুলে নেওয়ার জন্য জামিলা দু'হাত ছড়িয়ে কাঁধ সামনের দিকে এনে মাথা এমনভাবে পেছনে হেলিয়ে দিত যে, তাতে ওর সুন্দর কণ্ঠদেশ অনাবৃত হয়ে পড়ত আর রোদরাঙা বেণী যেন মাটি ছুঁয়ে যেত। দানিয়ার থামত, যেন বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু তার চোখ জামিলাকে অনুসরণ করত দরজা পর্যন্ত। দানিয়ার নিশ্চয়ই ভাবত ওকে কেউ দেখছে না। কিন্তু আমি সবকিছুই দেখতাম, বিরক্ত হতাম, এমন কি অপমানিতও বোধ করতাম। কারণ, দানিয়ারকে আমি কখনও জামিলার যোগ্য মনে করতাম না।

রাগে গজ গজ করতাম: "ব্যাপার দেখ! দানিয়ারের মত লোকও জামিলার দিকে তাকাচ্ছে এভাবে — অন্যদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে!" শিশুদের মত একটা ভাব, যা আমি তখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি, আমার মধ্যে ভয়ঙ্কর ঈর্ষা জ্বালিয়ে দিত। নিজের প্রিয়জন অন্যের প্রতি মনোযোগী হলে শিশুরা সর্বদাই সেটা অপছন্দ করে। তাই, দানিয়ারের জন্য দুঃখ হওয়ার বদলে তার উপর আমার তীব্র বিরাগ জন্মাল — কেউ ওকে নিয়ে হাসি-তামাশা করলে আমার বেশ ভাল লাগত।

কিন্তু একবার আমাদের তামাশার পরিণাম হল খুবই দুঃখজনক। আমরা যেসব বস্তা নিয়ে যেতাম তাদের একটা

কাঁচা পশমের বস্তায় থাকত ২৮০ পাউন্ড গম। একা কারও নেওয়ার পক্ষে খুব বেশি ভারী হওয়ায় এই বস্তাটা আমরা নিতাম একসঙ্গে ধরাধরি করে। একদিন গোলাবোড়িতে বসে আমরা স্থির করলাম যে, দানিয়ারের সঙ্গে একটা চালাকি করব। সেই বিশাল বস্তাটাকে দানিয়ারের গাড়িতে তুলে সেটার উপর অন্যান্য বস্তা রাখলাম। স্টেশানে যাওয়ার পথে জামিলা আর আমি একটা রুশ গ্রামে থেমে একজনের ফলের বাগান থেকে কিছু আপেল ছিঁড়ে নিলাম। সারা পথ আমরা হাসতে হাসতে গেলাম আর জামিলা দানিয়ারের দিকে আপেল ছুঁড়তে লাগল। তারপর আমরা বরাবরকার মতই প্রচুর ধুলা উড়িয়ে দানিয়ারের গাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। গিরিখাত পার হয়ে রেল-ক্রসিঙের কাছে দানিয়ার আমাদের ধরে ফেলল; কারণ রেল-ক্রসিঙের বার তখন নামানো ছিল। সেখান থেকে আমরা স্টেশান পর্যন্ত গেলাম একসঙ্গেই। সেই পশমের বস্তাটার কথা আমাদের মনে পড়ল একেবারে মাল নামানো শেষ হওয়ার পর। জামিলা দুষ্টুভাবে কনুইয়ের গুঁতা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দানিয়ারের দিকে। দানিয়ার গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে পশমের বস্তাটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিতভাবে; কী করবে ভাবছে। তার পর চারদিকে তাকিয়ে জামিলাকে হাসি গোপন করতে দেখে, ব্যাপার বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

জামিলা চেঁচিয়ে দানিয়ারকে বলল: 'তোমার প্যাণ্ট টেনে ওপরে তোল, নয়ত খসে পড়ে যাবে!'

দানিয়ার আমাদের দিকে তাকাল ক্রুদ্ধভাবে। তার পর, সে কী করতে যাচ্ছে আমরা সেটা অনুমান করার আগেই সে বস্তাটাকে টেনে গাড়ির প্রান্তে এনে লাফিয়ে নীচে নামল এবং এক হাত দিয়ে বস্তাটাকে সোজা করে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে দানিয়ার হাঁটতে শুরু করল। প্রথমে আমরা মনে করতে চাইলাম

ও যা করছে সেটা বিশেষ ধরনের কিছু নয়। অন্যরা নিশ্চয়ই কিছু লক্ষ্য করে নি: একটা লোক বস্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে — সে তো সবাই বইছে, এতে বিশেষ করে লক্ষ্য করার কীই বা আছে। দানিয়ার গ্যাংওয়ের কাছে আসতে জামিলা ওর দিকে এগিয়ে গেল।

'বস্তাটা ছেড়ে দাও, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম শুধু!'

'সরে যাও!' স্পষ্ট করে বলে দানিয়ার তক্তায় পা দিল।

'দেখ, ও বস্তাটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে!' জামিলা চেঁচিয়ে বলল যেন নিজের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্যই। জামিলা তখনও হাসছে কোমলভাবে; কিন্তু ওর হাসিটাকে দেখাচ্ছে খুব কৃত্রিম — যেন জোর করে হাসছে।

আমরা লক্ষ্য করলাম দানিয়ারের খোঁড়া ভাবটা বাড়তে শুরু করেছে। ছি ছি, এটা আমরা আগে ভাবি নি কেন? সে দিনের সেই আহাম্মুকি কৌতুকের জন্য আমি আজ পর্যন্ত নিজেকে ক্ষমা করতে পারি নি। আমি, এই নির্বোধ আমিই সেই কৌতুকের ফন্দি এঁটেছিলাম!

'ফিরে এস!' জামিলা চেঁচিয়ে বলল। জামিলার অদ্ভুত হাসিটা শোনাল ফাঁপা শব্দের মত। কিন্তু দানিয়ারের ফেরার উপায় ছিল না — ওর পিছনে আরও লোক ছিল।

তার পর যে কী হয়েছিল, তা আর আমার স্পষ্ট মনে নেই। দেখলাম বিপুল ভারে দানিয়ার কুঁজো হয়ে গিয়েছে, মাথা নীচের দিকে, দাঁত ঠোঁটের উপর প্রায় বসে গিয়েছে। আহত পা সাবধানে ফেলে অতি কষ্টের সঙ্গে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি পদক্ষেপেই তার এমন ব্যথা হচ্ছিল যে, তার মাথা পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে উঠছিল এবং তাকে মুহূর্তেকের জন্য থামতে হচ্ছিল। যতই উপরে উঠছিল ততই সে দুলছিল।

বস্তার ভারে সে টলছিল। আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ভয় আর লজ্জায়। ভয়ে জমে গিয়ে শরীরের প্রতি কোষে কোষে আমি অনুভব করছিলাম সেই বস্তাটার ওজন আর দানিয়ারের আহত পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা। দানিয়ার আবার থামল, পেছন দিকে মাথা ঝাঁকাল — আমার চোখের সামনে সবকিছু কেমন যেন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল, সবকিছু কালো হয়ে গেল, আমার পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে গেল।

সংবিৎ ফিরে পেলাম হাতে ইস্পাতের মত কঠিন একটা চাপ অনুভব করে। জামিলাকে আমি সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম না। জামিলা কাগজের মত শাদা হয়ে গিয়েছে, চোখের মণি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঠোঁট তখনও বাঁকা হয়ে আছে একটু আগের হাসির ভঙ্গিতে। ততক্ষণে রিসিভিং এজেন্ট সহ অন্য সবাই ছুটে গিয়েছে গ্যাংওয়ের গোড়ায়। দানিয়ার আরও দু'পা এগোল; বস্তাটাকে পিঠের উপর ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করল, তার পর সহসা এক হাঁটুর উপর যেন বসে পড়তে শুরু করল। জামিলা দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল।

'ছেড়ে দাও! বস্তাটা ছেড়ে দাও!' জামিলা চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু দানিয়ার বস্তা ছাড়ল না — যদিও পেছনের লোকেদের উপর না ফেলার উদ্দেশ্যে সহজেই বস্তাটা সে একপাশে ফেলে দিতে পারত। জামিলার কণ্ঠস্বর শুনে দানিয়ার হঠাৎ সামনের দিকে ঝোঁক নিল, পা সোজা করল, এক পা এগোল — তার পর আবার দুলতে লাগল।

রিসিভিং এজেন্ট ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠলেন: 'এই কুত্তার বাচ্চা, বস্তাটা ফেলে দে!'

সবাই চেঁচিয়ে বলতে লাগল: 'ফেলে দাও!'

আবার দানিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'না, ও ছাড়বে না!' কেউ একজন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলল। যারা দানিয়ারের পেছনে ছিল আর যারা নীচে ছিল সবাই অনুভব করল বস্তাসমেত নিজে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ও বস্তাটাকে ছাড়বে না। জায়গাটা চাপা উত্তেজনায় একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেওয়ালের ওপার থেকে এঞ্জিনের তীব্র চীৎকার শোনা যেতে লাগল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দুলতে দুলতে গ্যাংওয়ের ঝুলে-পড়া তক্তার উপর দিয়ে অবর্ণনীয় কষ্টসহকারে দানিয়ার এগিয়ে যেতে লাগল আগুনের মত তেতে ওঠা ছাদের দিকে। ভারের সমতা ঠিক করার জন্য প্রতি দু'পা অন্তর থেমে, একটু শক্তি আহরণ করে সে উপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। পেছনের লোকেরা ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে লাগল — ও থামলে সবাইকেই থামতে হয়। এতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল, তাদের শক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত ফুরিয়ে যেতে লাগল; কিন্তু কেউ রাগ করল না, গালি দিল না। অতীব কষ্টের সঙ্গে তারা উপরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল এমনভাবে যেন অদৃশ্য কোন রজ্জুতে একই সঙ্গে বাঁধা, যেন তারা চলেছে এমন একটা বিপজ্জনক পথ ধরে যেখানে একের জীবন নির্ভর করছে অপরের উপরে। তাদের নিঃশব্দ আর একঘেয়ে দোলার মধ্যে ছিল একটিমাত্র ভারী ছন্দ। দানিয়ারের পেছনে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এক-পা এক-পা করে।

গন্তব্য আর সামান্য মাত্র দূরে; কিন্তু দানিয়ার আবার দুলে উঠল, আহত পা'টি যেন আর তার আদেশ মানতে রাজি নয়। মনে হল, বস্তা ফেলে না দিলে এবার সে নিশ্চয় পড়ে যাবে।

জামিলা চেঁচিয়ে আমাকে বলল: 'দৌড়ে যা, পেছন থেকে

বস্তাটা ধর!' অসহায়, যন্ত্রচালিতবৎ সামনের দিকে হাত প্রসারিত করল জামিলা — যেন ও নিজেই বস্তাটা ধরার চেষ্টা করছে।

আমি গ্যাংওয়ের উপর দিয়ে ছুটলাম। বস্তাবাহী মানুষদের ঠেলে ঠুলে অবশেষে আমি পৌঁছুলাম দানিয়ারের কাছে। হাতের তলা দিয়ে দানিয়ার তাকাল আমার দিকে। ওর ভেজা বাদামি কপালে শিরাগুলি দপ্ দপ্ করছে, রক্তিম দুই চক্ষু জ্বলছে ঘৃণায়। আমি পেছন থেকে বস্তাটা ধরতে চাইলাম।

'সরে যাও!' কঠোরভাবে ভাঙা গলায় বলে সে এগিয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অবশেষে যখন সে নীচে নেমে এল তখন তার হাতদুটি ঝুলছিল দুদিক থেকে। লোকে সরে গিয়ে ওকে নেমে আসার জায়গা দিল; কিন্তু রিসিভিং এজেণ্ট নিজেকে সামলাতে না পেরে চীৎকার করে বললেন:

'তুমি কি পাগল? আমাকে কি মানুষ বলে মনে হয় না তোমার? তোমার কি মনে হয় না যে আমি তোমাকে ওই বস্তাটা নীচেই খালাস করতে দিতাম? এরকম বস্তা কেন তুমি বয়ে নিয়ে গেলে?'

'সেটা আমার কাজ, আমিই বুঝব,' দানিয়ার শান্তভাবে উত্তর দিল।

একপাশে থুথু ফেলে সে এগিয়ে গেল তার গাড়ির দিকে। আমরা লজ্জিত হয়েছিলাম, চোখ তুলতে সাহস পেলাম না; রাগ হচ্ছিল দানিয়ারের উপর — আমাদের বোকা রসিকতাটাকে ও এমন গুরুতরভাবে নিল কেন।

আমরা সারারাত গাড়ি চালিয়ে এলাম নিঃশব্দে। দানিয়ার

স্বভাবতঃই চুপচাপ থাকে বলে আমরা বুঝতে পারলাম না সে তখনও আমাদের উপর রাগ করে আছে কি-না, অথবা সম্পূর্ণ ঘটনাটাই ভুলে গিয়েছে কি-না। আমরা বিবেকের দংশন অনুভব করছিলাম, নিজেদের খুবই হতভাগ্য মনে হচ্ছিল।

পরদিন সকালে আমরা যখন গোলাবাড়িতে বস্তায় গম বোঝাই করছিলাম, জামিলা সেই কাঁচা পশমের বস্তাটার একপ্রান্তে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে অন্য প্রান্ত ধরে সজোরে টান মেরে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলল।

বিস্মিত কয়ালের পায়ের কাছে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জামিলা বলল: 'এই নাও তোমার ছেঁড়া ন্যাকড়া! দলনেতাকে বলো, যেন এরকম জিনিস আমাদের আর না দেয়!'

'তোমার হল কী? ব্যাপার কী?'

'কিছু না!'

পরদিন দানিয়ার সারাক্ষণ কাজ করল বরাবরকার মত শান্তভাবে, কোন রকমভাবেই নিজের রাগ প্রকাশ করল না। তার খোঁড়া ভাবটা আগের চাইতে বেশি করে চোখে পড়ছিল — বিশেষ করে বস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে। ওর পুরনো ঘা'টা নিশ্চয় আবার কাঁচা হয়ে উঠেছে। ওর এই অবস্থা আমাদের অপরাধের কথা অবিরামভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তবু ও যদি একটু হাসত বা রসিকতা করত, আমাদের মনোকষ্ট হয়ত দূর হয়ে যেত।

জামিলাও ভান করছিল যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নি। গরবিনী মেয়ে জামিলা আগের মতই হাসছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম ও কত অস্বস্তি বোধ করছে।

স্টেশান থেকে গ্রামের দিকে যাত্রা করতে সেদিন আমাদের

দেরী হয়ে গিয়েছিল। দানিয়ারের গাড়ি যাচ্ছিল আগে আগে। আগস্টের অপরূপ সুন্দর রাত্রি; উজ্জ্বল তারাগুলি কত দূরে অথচ কত কাছে! এই রাত কে না চেনে! একটি তারার প্রান্ত যেন তুষারজমাট; অন্ধকার আকাশ থেকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে নীচের পৃথিবীর দিকে, ওর তুষারভেজা রশ্মিগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করছে। গিরিখাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তারাটির দিকে। গ্রামে ফেরার জন্য ঘোড়াগুলি ব্যাকুল, চলেছে দুলকি চালে, গাড়ির চাকার নীচে নুড়ির শব্দ। স্তেপ থেকে ভেসে-আসা পুষ্পিত সোমরাজের গন্ধ আর শীতল প্যাকা গমের হালকা ঘ্রাণ আলকাতরা আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমাদের মাথা হালকা করে তুলেছে।

পথের এক পাশে বনগোলাপে ছাওয়া কালো পাহাড়, অন্য পাশে, অনেক নীচে রোজ-উইলো আর তরুণ পপলারের কুঞ্জ থেকে দ্রুত ধেয়ে চলেছে অশান্ত কুর্কুরেউ। মাঝে মাঝে দূরের সেতুর উপর দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে প্রবল গর্জন করে; গাড়ি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও তার চাকার শব্দ শোনা যেতে থাকে।

শীতল হাওয়ায় গাড়ি চালাতে, চলমান ঘোড়ার পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখতে, আগস্ট রাত্রির শব্দ শুনতে আর সেই রাত্রির ঘ্রাণে শ্বাস নিতে বড় ভাল লাগছিল। জামিলার গাড়ি চলছিল আমার সামনে। সে লাগাম ছেড়ে দিয়েছে, কোমল স্বরে গান গাইছে, চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের চুপচাপ ভাবটা ওর ভাল লাগছে না। এরকম রাতে চুপ করে থাকা অসম্ভব — এই রাত আসে গানেরই জন্য।

জামিলা গান গাইতে শুরু করল। সম্ভবত আমাদের মধ্যকার

আগের সেই সহজ ভাবটা ফিরিয়ে আনার একটা উপায় খ‍ুঁজছিল বলেই এবং নিজের অপরাধের অন‍ুভূতিটা কাটিয়ে উঠতে চাইছিল বলেই জামিলা গান গাইছিল। অন‍ুরণিত, পরিহাসতরল কণ্ঠে ও গাইছিল সাধারণ গ্রাম্য গান: 'তোমার যাবার বেলায় ওড়াব র‍ুমালখানি', 'প্রিয়তম মম গিয়াছে অনেক দ‍ূর'। ও অনেক গান জানত; সরলভাবে আবেগের সঙ্গে গাইত সেগ‍ুলি, শ‍ুনতে বেশ লাগত। হঠাৎ গান থামিয়ে জামিলা উচ্চস্বরে বলল:

'এই দানিয়ার, তুমি একটা কিছ‍ু গাইছ না কেন? তুমি কি দ‍ুজিগিত্ নও?'

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে হতচকিতভাবে দানিয়ার বলল: 'তুমি গাও জামিলা, আমার কান একনিষ্ঠভাবে শ‍ুনছে।'

'তোমার কি মনে হয় না আমাদেরও কান আছে? তোমাকে কেউ জোর করতে যাচ্ছে না, ইচ্ছে না থাকলে তোমার গেয়ে কাজ নেই!' বলে জামিলা আবার গাইতে শ‍ুর‍ু করল।

কে জানে কেন জামিলা দানিয়ারকে গান গাইতে বলল! হয়ত নেহাতই একটা খেয়াল, অথবা জামিলা হয়ত দানিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা শ‍ুর‍ু করতে চাইছিল। সম্ভবত কথাবার্তাই শ‍ুর‍ু করতে চাচ্ছিল। কারণ, একটু পরেই সে আবার চেঁচিয়ে বলল:

'দানিয়ার, তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?' বলেই জামিলা হেসে ফেলল।

দানিয়ার কিছ‍ু বলল না, জামিলাও চুপ করে গেল।

আমি মনে মনে বললাম: "আর লোক পেল না, দানিয়ারকে বলল গান গাইতে! আচ্ছা রগড়, যা হোক!"

ছোট নদীটা পার হওয়ার সময়ে ঘোড়াগ‍ুলি গতি কমিয়ে দিল! ভেজা র‍ুপালী পাথরে ঘোড়ার খ‍ুরে ঠন্ ঠন্ শব্দ

উঠছে। আমরা নদী পার হওয়ার পর দানিয়ার তার ঘোড়াদ্বটিকে চাব্বক মেরে হঠাৎ গাইতে শ্বর্ব করল চাপা স্বরে — পথের প্রতিটি ঝাঁকানিকে তার স্বর ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

আমার সাধের পাহাড় রে,
নীলচে সাদা পাহাড় রে!
বাপ-পিতেরম'র দ্যাশের ও তুই পাহাড় রে!

এর পর অনিশ্চিতভাবে খানিক গ্বণ্ গ্বণ্ করে পরের দ্ব'-লাইন গাইল গভীর, সামান্য গম্ভীর স্বরে:

আমার সাধের পাহাড় রে,
নীলচে সাদা পাহাড় রে।
তোর ব্বকেতে জন্ম নিলাম...

আবার থামল, কিছ্বতে যেন ভয় পেয়েছে, চুপ করে গেল।

কল্পনায় আমি দানিয়ারের বিব্রত ভাবটা বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলাম। কিন্তু তার এই থেমে থেমে নিস্তেজভাবে গাওয়ার মধ্যেও কিছ্ব এমন একটা ছিল যা শ্রোতার মনকে গভীরভাবে ন্যাড়া দেয়; সম্ভবত দানিয়ারের গানের গলা খ্ববই ভাল। এই গায়ককে দানিয়ার বলে বিশ্বাস করাই কঠিন!

'ভালো, খ্বব ভালো!' আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম।

জামিলা উচ্চস্বরে বলল: 'তুমি আগে কখনও গাও নি কেন? গাও! তুমি সত্যিই খ্বব ভাল গাইতে পার!'

সামনেই আলো, গিরিখাত শেষ হল। উপত্যকা থেকে ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। দানিয়ার আবার গাইতে শ্বর্ব করল। আগের মতই নিস্তেজ আর অনিশ্চিতভাবে গাইতে শ্বর্ব করলেও ধীরে ধীরে ওর আওয়াজ খ্বলতে লাগল; গিরিখাতে

যেন পূর্ণ হয়ে উঠল ওর গানের সুরে, দূরের গিরিপার্শ্বে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই সুর।

সুরের আবেগ আর আগুনে আমি একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কীভাবে সেই গানের বর্ণনা দেওয়া যায় আমি তখনও জানতাম না, এখনও জানি না; এটা কি শুধু কণ্ঠস্বর না আরও মহৎ কিছু, এমন কিছু যা আসে মানুষের আত্মার গভীর থেকে, যা একই আবেগ সঞ্চারিত করতে পারে অন্য মানুষের মনে, যা মানুষের অন্তরতম ভাবনাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে — আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না।

আমি যদি কোন উপায়ে দানিয়ারের গানটিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে পারতাম! গানে কথার অংশ ছিল খুবই কম; কিন্তু কথা ছাড়াই সে গান একটি মহৎ মানবিক হৃদয়কে অভিব্যক্তি দিয়েছে। আগে বা পরে কখনও এমন গান আমি আর শুনি নি: কিরগিজও নয় কাজাখও নয়, অথচ দুয়েরই কিছু কিছু ছিল তাতে। পরস্পর সম্পৃক্ত দুই জাতির উত্তম সুরলালিত্য দানিয়ার এমন অদ্ভুতভাবে মিশিয়েছে যার কখনও পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়। পাহাড় আর স্তেপের সেই গান কিরগিজ পাহাড়ের মত কখনও ধেয়ে যাচ্ছিল আকাশের দিকে কখনও বিশাল বিস্তারে গাড়িয়ে যাচ্ছিল কাজাখ স্তেপের মত।

যত শুনছিলাম ততই অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম: "তা হলে এই হচ্ছে দানিয়ারের আসল চেহারা! কেউ কি কখনও এটা কল্পনাও করতে পারত?"

আমরা স্তেপ পার হচ্ছিলাম নরম, নিয়মিত পথ ধরে। দানিয়ারের কণ্ঠস্বর উদাত্ত হয়ে উঠতে লাগল, একের পর এক নতুন সুর খেলতে লাগল তাতে আশ্চর্য মহিমায়। দানিয়ারের এমন প্রতিভা? ওর আজ হয়েছে কী? মনে হচ্ছে যেন এই দিনের, এই মুহূর্তের জন্যই সে অপেক্ষা করে ছিল!

দানিয়ারের সেই অদ্ভুত ভাব, তার স্বপ্নাবিষ্টতা, নৈঃসঙ্গপ্রিয়তা, তার নির্বাকতা — যা দেখে লোকে মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকাত — সেই সবকিছুর মর্ম যেন আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম। আমি বুঝতে পারলাম কেন সে সন্ধ্যা কাটাত সেই পাহারার পাহাড়ে, রাত কাটাত নদীর তীরে একা, কেন সে অবিরামভাবে শুনত এমন কিছু যা অন্য কেউ শুনতে পায় না, কেন তার চোখ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠত, সাধারণত ঝুলে থাকা ভ্রূ কেন হঠাৎ বেঁকে যেত। এটা হচ্ছে গভীরভাবে প্রেমে পড়া মানুষের ভাব। অন্য কোন একজন মানুষের জন্য এই প্রেম নয়, এটা অন্য ধরনের, অতি প্রবল ভালবাসা — জীবনের জন্য, পৃথিবীর জন্য ভালবাসা। এই প্রেম সে গোপন রেখেছিল নিজের মধ্যে, তার গানের মধ্যে — এটা ছিল তার দিশারী আলোক। কণ্ঠস্বর যত মধুরই হোক, কোন উদাসীন মানুষ ওর মত গাইতে পারত না।

যখনই মনে হচ্ছিল একটা সুরের শেষ অংশ গাওয়া হয়ে গিয়েছে, তখনই আরেকটা নতুন, মোহকরী সুরের তরঙ্গ জাগিয়ে তুলছিল ঘুমন্ত স্তেপকে। স্তেপভূমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শুনছিল সেই গায়কের গান, যার প্রিয় স্বদেশী সুর সোহাগের মত মধুর। পাকা হলুদ গমে ছোট ছোট তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল সরোবরের বুকের মত, মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল উষার প্রথম আলোর আভাস। বিরাট সৈন্যবাহিনীর মত ময়দা-কারখানার কাছে প্রবীণ উইলো গাছগুলির পাতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, নদীর ওপারে কৃষিকর্মীদের শিবিরাগ্নি নিভে আসছে, গ্রামের দিকে নদীর তীর ধরে দুলকি চালে নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ছায়ার মত এক ঘোড়সওয়ার, কখনও ফলবাগানের আড়ালে চলে যাচ্ছে কখনও আবার দেখা দিচ্ছে। আপেলের গন্ধ, পুষ্পিত ভুট্টার উষ্ণ দুধের মত ঘ্রাণ

আর শুকনো ঘুঁটের গন্ধ বাতাস ভারী করে তুলেছে।

সবকিছু ভুলে দানিয়ার গেয়েই চলেছে, মন্ত্রমুগ্ধ আগস্ট-রাত্রি নিঃশব্দে শুনছে। পাছে এই আবেশ কেটে যায় সেই ভয়ে ঘোড়াগুলিও যেন বহুক্ষণ ধরে চলার ছন্দ বদলায় নি।

সহসা, অনুরণিত স্বরগ্রামে দানিয়ার গান থামিয়ে দিল; ঘোড়াগুলিকে তাড়া দিয়ে চাবুক কষাল। ভেবেছিলাম জামিলার গাড়িও বুঝি দ্রুত ছুটবে দানিয়ারের গাড়ির পিছনে; আমিও তৈরী ছিলাম দ্রুত জামিলার গাড়ি অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু জামিলা নড়ল না। যেন বাতাসে অনুরণিত সুরের শেষ কণাগুলি তখনও শুনছে, এমনই ভাবে ঘাড় কাত করে সে বসেই রইল। দানিয়ার দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। গ্রামে না ফেরা পর্যন্ত আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। কথা বলার কোন প্রয়োজনও ছিল না; কথা কি মানুষের সব অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে...

সেই দিন থেকেই আমাদের জীবনে যেন একটা পরিবর্তন এল। আমি যেন চিরকাল অপেক্ষা করে ছিলাম বিস্ময়কর এবং অতিবাঞ্ছিত কিছু একটা ঘটার জন্য। এর পর থেকে সকাল বেলাগুলিতে গাড়িতে গমের বস্তা বোঝাই করে স্টেশানে যাব আর ফিরবার জন্য তাড়া করব — ফিরতি পথে দানিয়ারের গান শুনব বলে। দানিয়ারের কণ্ঠস্বর যেন আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে উঠেছে, সেই স্বর আমাকে অনুসরণ করছে সর্বত্র। শিশিরভেজা লুসার্ন ঘাসের উপর দিয়ে সকাল বেলা যখন ছুটে যাচ্ছিলাম পা-বাঁধা ঘোড়াগুলির দিকে, তখনও সেই স্বর আমাকে অনুসরণ করছিল; পাহাড়ের পিছন থেকে সহাস্য সূর্য তখন উপরে উঠে আসছিল আমাকে অভিনন্দিত করার জন্য। আমি দানিয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম শস্য ঝাড়ার পুরানো যন্ত্রটা থেকে বাতাসে ওড়ানো গমের তুষের

সোনালি বৃষ্টির কোমল মর্মরে; স্তেপের আকাশের অনেক উঁচুতে নিঃসঙ্গ ঈগলের সুন্দর বৃত্তাকার উড্ডয়নে। দানিয়ারের গান আমি কল্পনা করছিলাম চোখে দেখা কানে শোনা সবকিছুর মধ্যেই।

সন্ধ্যায় গিরিখাতের মধ্য দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফেরার সময়ে আমি অনুভব করতাম যেন অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছি। দানিয়ারের গান শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসত, সামনে ভেসে উঠত শৈশবাবধি জানা অতি চেনা সব দৃশ্য: তাঁবুর অনেক উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া বসন্তের কোমল, ধোঁয়াটে-নীল মেঘ; প্রতিধ্বনিময় মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে ঘোড়ার পাল — দীর্ঘ চূর্ণকেশর আর চোখে বন্য কালো আগুনের ঝিলিক নিয়ে তরুণ অশ্বগুলো গর্বিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোটকীদের ছাড়িয়ে; পাহাড়ের গা বেয়ে লাভার মত নামছে ভেড়ার পাল; গিরিপার্শ্বের উপর থেকে নীচে আছড়ে পড়ছে জলপ্রপাত — শাদা ফেনিল জল চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে; সূর্য আলতোভাবে ডুবে যাচ্ছে নদীর ওপারের ঘাসঝোপের আড়ালে, দিগন্তের অগ্নিময় প্রান্তের উপর দিয়ে ছুটছে নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার — যেন হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে সূর্যকে — তারপর সেই ঘোড়সওয়ারও মিলিয়ে যাচ্ছে প্রদোষের অন্ধকারে ঘাসঝোপের আড়ালে।

নদীর ওপারে প্রশস্ত কাজাখ স্তেপ। নিজের জায়গা করার জন্য স্তেপভূমি পাহাড়গুলিকে সরিয়ে দিয়েছে। পাহাড়পরিবেষ্টিত স্তেপভূমি প্রসারিত হয়ে আছে অনমনীয়, নির্জন...

সমরাগ্নির প্রথম স্মরণীয় গ্রীষ্মকাল স্তেপকে পুড়িয়ে দিয়ে

গিয়েছে; সামরিক ঘোড়ার পালের গরম ধুলোয় মেঘে স্তেপ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল — সওয়ারেরা ছুটে গিয়েছিল সর্বদিকে। আমার মনে আছে, জনৈক কাজাখ নদীর ওপার দিয়ে ছুটতে ছুটতে রাখালদের মত ভারী গলায় চীৎকার করে বলেছিল:

'কিরগিজেরা! ঘোড়া সাজাও — শত্রু এসে গেছে!' তার পর সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ধুলোর মেঘ আর গরম বাতাসের তরঙ্গের মধ্যে।

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য সবাই রুখে দাঁড়িয়েছিল: আমাদের প্রথম অশ্বারোহী ডিভিশানগুলি পাহাড়ের উপর থেকে নেমে উপত্যকার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে গম্ভীর এবং প্রচণ্ড গুরুগুরু শব্দ উঠেছিল। হাজার হাজার রেকাব ঝনঝনিয়ে উঠেছিল, ঘোড়ায় চেপে বসেছিল হাজার হাজার দ্জিগিত্; তাদের সামনে দণ্ডের উপর উড়ছিল লাল নিশান, পিছনে, ঘোড়ার খুরে ওড়ানো ধুলোর আড়ালে তাদের মা আর স্ত্রীদের বিষণ্ণ, মহৎ বিলাপ প্রহৃত হচ্ছিল মাটির বুকে: 'স্তেপ তোমাদের রক্ষা করুক! আমাদের মহান যোদ্ধা মানাস্-এর আত্মা তোমাদের রক্ষা করুক!'

যে পথ দিয়ে ছেলেরা যুদ্ধে গেছে, সেই পথ তিক্ত হয়ে আছে...

দানিয়ারের গান আমার চোখ খুলে দিয়েছে পার্থিব সৌন্দর্য আর যাতনার এই মহান জগতের দিকে। এসব গান সে কোথায় শিখেছে? কার কাছে শুনেছে? আমি অনুভব করেছিলাম, যে মানুষ বহু বছর ধরে স্বদেশকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে আকুলভাবে আর যাতনা সয়েছে সেই ভালবাসার জন্য, শুধু সে-ই এমন গান গাইতে পারে। দানিয়ার যখন গান গাইত, আমি নিজের মনের চোখে দেখতাম, দানিয়ার যেন একটি ছোট ছেলে — হেঁটে বেড়াচ্ছে স্তেপের পথে পথে। সেই সময়েই

কি স্বদেশের এসব গান জেগে উঠেছিল তার আত্মার মধ্যে? না-কি যুদ্ধের অগ্নিময় পথে পথে চলার সময়ে?

দানিয়ারের গান শুনে আমার ইচ্ছা করত শুয়ে পড়ে মাটিকে আলিঙ্গন করি পুত্রস্নেহে কেবল এইজন্য যে তাকে এমন ভালবাসা যায়, সেই কৃতজ্ঞতায়। এ ধরনের মুহূর্তগুলিতে আমি অনুভব করতাম যেন নতুন একটা কিছু জেগে উঠছে আমার ভেতরে, যা আমি ভাষায় বলতে পারি না, যাকে রোধ করা যায় না — একটা অদম্য আবেগ নিজেকে প্রকাশ করার, হ্যাঁ, নিজেকে প্রকাশ করারই, জগতকে শুধু নিজে দেখা আর অনুভব করা নয়, বরং নিজের দেখাটাকে, নিজের ভাবনা আর আবেগকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করার, আমাদের পৃথিবীর সৌন্দর্যসম্পদের কথা মানুষকে মহিমান্বিতভাবে জানানোর — দানিয়ার যেমন পারে। সম্পূর্ণ অজানা কিছু একটার ভয় আর আনন্দে আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতাম; কারণ, জীবনে আমার পথ যে ছবি আঁকা, সেটা আমি তখনও উপলব্ধি করি নি।

শৈশব থেকে আঁকতে ভালবাসতাম। পড়ার বইয়ের ছবি নকল করতাম; ছেলেরা সবাই বলত: 'হুবহু নকল'। আমাদের দেয়াল পত্রিকার জন্য যে সব রেখাচিত্র আঁকতাম, শিক্ষকেরা সেগুলির প্রশংসা করতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ বেধে গেল, আমার ভাইয়েরা যুদ্ধে গেল, স্কুল ছেড়ে দিয়ে আমার বয়সের অন্য সব ছেলের মত আমিও কাজ করতে গেলাম যৌথখামারে। রঙ আর তুলির কথা একেবারে ভুলে গেলাম, সেগুলির কথা আর কখনও মনে পড়বে বলেও মনে হয় নি। কিন্তু দানিয়ারের গান আমার আত্মাকে আলোড়িত করেছে। আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিভ্রান্তভাবে, যেন সবকিছুই আমি দেখছি এই প্রথম।

জামিলার মধ্যেও হঠাৎ বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মনে হয় সেই সজীব, মুখরা, হাস্যময়ী মেয়েটির যেন অস্তিত্বই ছিল না কখনও। জামিলার কুয়াশার মত চোখদুটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে চকচকে বাসন্তী বিষণ্ণতায়। স্টেশানে যাওয়ার দীর্ঘ পথের সবটাই সে কাটাত অন্যমনে কী এক ভাবনায়। একটা অনিশ্চিত, স্বপ্নিল হাসি ওর অধরোষ্ঠ ছুঁয়ে যেত, মৃদুভাবে খুশি হয়ে উঠত এমন কিছু সম্পর্কে যা শুধু ও নিজেই জানত। অনেকবার এমন হয়েছে যে, পিঠের উপর ভারী বস্তা নিয়ে জামিলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে, যেন হঠাৎ একটা নিস্তেজ ভাব চেপে বসেছে ওর উপর, যেন ও দাঁড়িয়ে আছে কোন খরস্রোতা নদীর তীরে — বুঝতে পারছে না পার হবে কি হবে না। ও দানিয়ারকে এড়িয়ে চলছিল, সরাসরি দানিয়ারের মুখের দিকে তাকাত না।

একবার, গোলাবাড়িতে জামিলা অসহায় বিরক্তির সঙ্গে বলল:

'তোমার শার্টটা খুলে দাও — আমি ধুয়ে দেব।'

নদীতে ধোয়ার পর শুকোনোর জন্য ছড়িয়ে দিয়ে শার্টটার পাশে জামিলা বসে পড়ল; ভাঁজগুলি বহুক্ষণ ধরে যত্নের সঙ্গে টেনে দিতে লাগল, কাঁধের ছেঁড়া জায়গাগুলি দেখার জন্য শার্টটা রোদের দিকে তুলে ধরল, মাথা নাড়াল, তার পর আবার শান্ত, বিষণ্ণভাবে ভাঁজগুলি টেনে দিতে থাকল।

সেই সময় শুধু একবার জামিলা হেসেছিল আগের মত উচ্চস্বরে আর সংক্রামকভাবে, ওর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আগের মত। একদিন, যুদ্ধ থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েকজন দর্জিগিত্ আর তরুণীদের একটি দল লুসার্ন ঘাস গাদা করার কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে গোলাবাড়িতে এল।

'এই যে, ব্যাই-রা, শাদা রুটি কি শুধু তোমরাই খাবে! আমাদের কিছু দাও, নইলে তোমাদের ফেলে দেব নদীতে!' চেঁচিয়ে বলল দর্জিগিত্‌রা, রসিকতা করে পিচ্‌ফর্ক্‌ ছুঁড়ে মারার ভাণ করল।

জামিলা খুশির স্বরে উত্তর দিল: 'আমাদের ভয় দেখতে এসো না! মেয়েদের আমি কিছু দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের ভাবনা তোমাদের!'

'তাই যদি হয়, তোমাদের সবাইকেই নদীতে ফেলে দেব!'

তরুণেরা আর মেয়েরা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। চীৎকার আর হাসির হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে ওরা একে অপরকে জলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

কৌশলে প্রতিপক্ষের হাত এড়িয়ে, হেসে, অন্য সবার চাইতে বেশি জোরে চেঁচিয়ে জামিলা বলছিল: 'ওদের ধর! টেনে ফেলে দাও!'

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, দর্জিগিত্‌দের সবারই চোখ ছিল শুধু জামিলারই দিকে। সবাই তাকে ধরার চেষ্টা করছিল, আলিঙ্গন করতে চাইছিল। সহসা তিনজন তরুণ জামিলাকে ধরে ফেলল এবং তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল নদীর তীরে।

'আমাদের চুমো খাও, নইলে জলে ফেলে দেব!'

'এসো আমরা জামিলাকে দোলাতে থাকি!'

জামিলা হাত মুচড়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল, হাসছিল আর বান্ধবীদের ডাকছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু বান্ধবীরা তখন দারুণ আমোদে নদীর তীরে ওঠা-নামা করছে দ্রুতবেগে, রুমাল ছুঁড়ে ফেলছে জলে — আবার তুলে নিচ্ছে। জামিলাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দর্জিগিত্‌রা আমোদে হেসে উঠল। ভেজা চুলে, আগের চাইতে আরও সুন্দর হয়ে জামিলা জল থেকে উঠে এল। ভেজা সুতী পোষাক ওর গায়ে লেপটে

গেছে, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ওর সুগোল নিতম্ব আর নবীন স্তন; কিন্তু জামিলা কিছুই লক্ষ্য করছে না, শুধু হাসছে, সামনে-পেছনে দুলছে, লজ্জারাঙা মুখের উপর দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

'আমাদের চুমো খাও!' দ্জিগিত্রা জেদ ধরল।

জামিলা ওদের চুমো খেল, কিন্তু আবার ও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ভারী চুলের গুচ্ছ মুখের উপর থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে আবার হাসল।

অল্পবয়সীদের আমুদে দুষ্টুমি দেখে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। যে সব বৃদ্ধ কাজ করছিল, তারা কোদাল ফেলে দিয়ে চোখের জল মুছল। তাদের বাদামি মুখের বলিরেখাগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ক্ষণেকের জন্য তাদের মুখে যেন ফিরে এল যৌবনের তেজ। দ্জিগিত্দের হাত থেকে জামিলাকে রক্ষা করার যে পবিত্র দায়িত্ব আমার ছিল তা ভুলে গিয়ে আমিও হাসছিলাম প্রাণ খুলে।

শুধু একা দানিয়ারই চুপ করে ছিল। হঠাৎ ওকে লক্ষ্য করলাম, আমারও হাসি থেমে গেল। দু'পা অনেকখানি ফাঁক করে দানিয়ার একা দাঁড়িয়ে ছিল গোলাবাড়ির এক প্রান্তে। আমার মনে হল দানিয়ার যেন ছুটে গিয়ে দ্জিগিত্দের হাত থেকে জামিলাকে ছিনিয়ে আনতে চাইছে। ও তাকিয়ে ছিল জামিলার দিকে একদৃষ্টিতে। বিষণ্ণতা আর প্রশংসায় মেশানো সেই দৃষ্টিতে সুখ আর বেদনা দুই-ই ছিল। জামিলার সৌন্দর্য দানিয়ারের কাছে ছিল সুখ আর শোকের উৎসস্বরূপ। দ্জিগিত্রা যখন একের পর এক করে জামিলাকে ঘনভাবে জড়িয়ে ধরছিল আর ওদের প্রত্যেককে চুমো খেতে বাধ্য করছিল, তখন দানিয়ার চোখ নামিয়ে নিল, চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল কিন্তু গেল না।

ইতোমধ্যে জামিলাও দানিয়ারকে লক্ষ্য করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাসি থেমে গিয়েছিল, মাথা ঝুলে পড়েছিল।

'যথেষ্ট আমোদ হয়েছে, আর না!' জামিলা উদ্দাম দ্‌জিগিত্‌দের হঠাৎ থামিয়ে দিল।

একজন দ্‌জিগিত্‌ জামিলাকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করল।

'সরে যাও!' বলে জামিলা তাকে পেছনে ঠেলে দিল। অপাঙ্গে অপরাধী দৃষ্টিতে দানিয়ারকে একবার দেখে নিয়ে জামিলা ছুটে গেল ঝোপের মধ্যে কাপড় নিঙড়ানোর জন্য।

ওদের দু'জনের সম্পর্কের অনেককিছুই আমি বুঝতে পারতাম না; সত্যি বলতে কি, ওই বিষয়টি ভাবতেও আমি ভয় পেতাম। তবু, দানিয়ারকে এড়িয়ে চলার জন্য জামিলা নিজেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। জামিলা যদি দানিয়ারকে নিয়ে আগের মত পরিহাস করত তাহলেই যেন ভাল হত। সেই সঙ্গে আবার রাতে স্টেশান থেকে গ্রামে ফেরার পথে দানিয়ারের গানের শব্দ ওদের দু'জনেরই সুখ কামনার একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলত আমার মনে।

ফিরতি পথে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জামিলা গাড়িতে উঠত, কিন্তু স্তেপের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে হাঁটত গাড়ির পাশে পাশে। আমিও তাই করতাম; কারণ হেঁটে হেঁটে গান শুনতে বেশি ভাল লাগত। প্রথমে আমরা হাঁটতাম নিজের নিজের গাড়ির পেছনে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই, আমাদের অলক্ষ্যেই যেন একটা অজানা শক্তি আমাদের টেনে নিয়ে যেত দানিয়ারের কাছে। আমরা দানিয়ারের মুখ আর চোখের অভিব্যক্তি দেখতে চাইতাম — এই গায়ক কি সত্যিই সেই বিষণ্ণ, অসামাজিক দানিয়ার!

প্রতিবারই লক্ষ্য করতাম, জামিলা একই সঙ্গে স্তব্ধ আর মোহিত হয়ে পড়ত, ওর হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত দানিয়ারের দিকে। কিন্তু দানিয়ার তা দেখতে পেত না; কারণ দানিয়ারের দৃষ্টি তখন ছড়ানো থাকত বহুদূরে, হাত দুটি থাকত মাথার পেছনে, এবং দুলত এপাশ থেকে ওপাশে। তার পর জামিলার হাত অসহায়ভাবে নেমে আসত গাড়ির প্রান্তদেশে। জামিলা চমকে উঠত, ঝাঁকানি দিয়ে হাত সরিয়ে নিত, দাঁড়িয়ে পড়ত। হতাশ, হতচেতন, পথের মাঝে দাঁড়ানো জামিলার চোখ দানিয়ারকে অনুসরণ করত বহুক্ষণ; তার পর জামিলা আবার হাঁটতে শুরু করত।

মাঝে মাঝে আমার মনে হত জামিলা আর আমি যেন অভিন্ন আর সমান অতল অনুভূতির যাতনায় পুড়ে মরছি। তবে কি, আমাদের আত্মার গভীরে বহুকাল ধরে যে অনুভূতি গোপন ছিল, তাকে জীবন্ত করে তোলার সময় এসে পড়েছে?

জামিলা তখনও নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারছিল; কিন্তু গোলাবাড়িটার চার দিকে বসে বিশ্রাম নেওয়ার বিরল মুহূর্তগুলিতে ও খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। শস্য ঝাড়ার জায়গাটার কাছে দাঁড়াত; কখনও সহজ, সুন্দর ভঙ্গিতে কয়েক বেল্চা গম ছুঁড়ে দিত বাতাসে, তার পর হঠাৎ বেল্চা ফেলে দিয়ে চলে যেত খড়ের গাদার দিকে। ছায়ায় বসত এবং যেন একা থাকতে ভয় পাচ্ছে বলেই আমাকে ডাকত:

'এখানে আয় কিচিনে বালা! আয়, দুজনে একসঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকি।'

আমি সব সময়েই ভাবতাম, ও আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবে এবং কী ওকে উদ্বিগ্ন করছে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। কিন্তু ও কিছুই বলত না। নিঃশব্দে আমার মাথা কোলে নিয়ে চোখের দৃষ্টি দূরে ছড়িয়ে দিয়ে জামিলা আঙুল

চালাত আমার শক্ত লোমের মত খাড়া খাড়া চুলের মধ্যে আর আমার মুখে আস্তে আস্তে টোকা দিত ওর গরম, কাঁপা কাঁপা হাতে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম ওর আপাদমস্তক, ওর অনিশ্চিত উদ্বেগ আর আকুল আকাঙ্ক্ষায় ভরা মুখের দিকে — ওর মুখে যেন দেখতে পেতাম নিজেকেই। কিছু একটা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল, কিছু একটা জমে উঠছিল আর পরিণত হয়ে উঠছিল ওর আত্মার মধ্যে, সেটা প্রকাশ পেতে চাইছিল এবং জামিলা সেটাকে ভয় পাচ্ছিল। ও নিদারুণ যন্ত্রণার সঙ্গে কামনা করছিল অথচ সমান যন্ত্রণার সঙ্গেই, নিজের কাছে এটা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছিল না যে ও প্রেমে পড়েছে — ঠিক যেমন আমি একই সঙ্গে চাইতাম এবং চাইতাম না যে ও দানিয়ারকে ভালবাসুক। যতই হোক, জামিলা তো আমার পিতামাতার পুত্রবধূ, আমার ভাইয়ের বৌ।

কিন্তু এসব ভাবনা ছিল ক্ষণস্থায়ী, আমি ওগুলোকে মন থেকে দূর করে দিতাম। আমি ওর শিশুর মত আধখোলা অধরোষ্ঠ আর অশ্রুভেজা চোখ দেখেই সবচাইতে বেশি আনন্দ পেতাম। জামিলা কত মধুর, কত সুন্দর, কী প্রেরণা আর আবেগে দীপ্ত ওর মুখ! এটা আমি অনুভব করেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি। এখনও মাঝে মাঝে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি: প্রেম কি মানুষের মধ্যে এমন কোন প্রেরণার ভাব সৃষ্টি করে, যেমন হয় শিল্পী অথবা কবিদের মধ্যে? জামিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার ইচ্ছা করছিল স্তেপের মধ্যে ছুটে গিয়ে আকাশ আর পৃথিবীকে প্রশ্ন করি আমার ভেতরের এই দুর্বোধ্য উদ্বেগ আর আনন্দকে কেমন করে নিবারণ করব। আমার মনে হয় একবার আমি এর উত্তর পেয়েছিলাম।

বরাবরকার মতই, আমরা ফিরছিলাম স্টেশান থেকে। রাত্রি

নেমেছে, মৌমাছির ঝাঁকের মত তারারা ছড়িয়ে আছে আকাশে, স্তেপভূমি ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেছে; শুধু দানিয়ারের গান নিঃশব্দকে ভেঙ্গে দিয়ে অনুরণিত হচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের কোমল অন্ধকারে। জামিলা আর আমি দানিয়ারকে অনুসরণ করে চলেছি।

সে রাতে দানিয়ারের উপর কী ভর করেছিল জানি না — তার স্বরে এমন গভীর, কোমল বিষণ্ণতা আর এমন নিঃসঙ্গতার বেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল, যা আমাদের চোখে এনে দিয়েছিল সহানুভূতি আর করুণার অশ্রু।

জামিলা হাঁটছে দানিয়ারের গাড়ির পাশে পাশে, গাড়ির একটা প্রান্ত ধরে রেখেছে শক্ত হাতে, মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে। দানিয়ারের কণ্ঠ আবার যখন তারাগ্রামে উঠল, জামিলা মাথা ঝাঁকিয়ে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে দানিয়ারের পাশে বসে পড়ল। জামিলা বসে রইল যেন পাথরের মূর্তি, দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করা। ওদের দু'জনকে আরও ভাল করে দেখার জন্য দ্রুত একটু এগিয়ে গিয়ে আমি দানিয়ারের গাড়ির পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। দানিয়ার গেয়েই চলেছে, জামিলার অবস্থান সে যেন টেরও পায় নি। দেখলাম, জামিলার হাত ঝুলে পড়ল, দানিয়ারের দিকে একটু কাত হয়ে জামিলা আলতোভাবে মাথা রাখল দানিয়ারের কাঁধের উপর। মুহূর্তের জন্য, ঘোড়া যেমন চাবুক খেয়ে চলার ছন্দ বদলায়, তেমনইভাবে দানিয়ারের স্বর কেঁপে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তা আবার বেজে উঠল আগের চাইতে আরও জোরে। দানিয়ার গাইছিল প্রেমের গান!

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে স্তেপভূমি যেন স্পন্দিত হয়ে উঠল, স্ফীত হয়ে উঠল; স্তেপের বিশাল প্রান্তরে আমি প্রেমমুগ্ধ দু'জন মানুষকে দেখলাম।

ওরা আমাকে দেখে নি, আমার কোন অস্তিত্বই ছিল না যেন। আমি ওদের পাশে পাশে হাঁটছিলাম, দেখছিলাম যেন পৃথিবীর সবকিছু ভুলে গিয়ে ওরা দু'জনে দুলছে গানের সুরে। আমি ওদের চিনতে পারলাম না। এ সেই দানিয়ার, পরনে সৈনিকের জীর্ণ শার্ট, গলার কাছে খোলা, কিন্তু অন্ধকারে ওর চোখ যেন জ্বলছে। এ সেই জামিলা, আমার জামিলা, এত কোমল আর ভীরু, সবলে জড়িয়ে ধরে আছে দানিয়ারকে, চোখের পল্লবে চিক্‌চিক্‌ করছে অশ্রুবিন্দু। যেন দু'জন নবজাত মানুষ, ওদের সুখ অপূর্ব। এ-ই কি সুখ নয়? স্বদেশের জন্য দানিয়ারের যে মহৎ প্রেম, যা সৃষ্টি করেছে এই আবেগপূর্ণ সঙ্গীতকে, তা-ই কি দানিয়ার সঞ্চারিত করছে না জামিলার মধ্যে? হ্যাঁ, দানিয়ার জামিলার জন্যই গাইছিল, জামিলার কথাই গাইছিল।

আরেকবার আমি মোহিত হয়ে পড়লাম অদ্ভুত উত্তেজনায়, দানিয়ারের গান আমার মধ্যে যা সব সময়েই জাগিয়ে তুলত। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম আমি কী চাই। আমি ওদের ছবি আঁকতে চাই।

নিজের আকাঙ্ক্ষায় নিজেই ভীত বোধ করলাম; কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার ভয়ের চাইতেও বেশি শক্তিশালী। ঠিক যেমনটি ওদের দেখতে পাচ্ছি, সেভাবেই ওদের ছবি আঁকব — পরম সুখে মগ্ন দু'টি মানুষ! হ্যাঁ, ঠিক যেভাবে আছে ওরা এই মুহূর্তে! কিন্তু, আমি কি আঁকতে পারব? ভয় আর আনন্দে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। হাঁটতে লাগলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। আমি নিজেও খুব সুখী বোধ করছিলাম, কারণ আমি তখনও জানতাম না এই অপরিণামদর্শী আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে আমাকে কতখানি বিপদে ফেলবে। নিজেকে বললাম, পৃথিবীকে দেখা উচিত যেভাবে দানিয়ার দেখেছে,

ওর গানের মত করেই আমি রঙ দেব ছবিতে। ওর গানের মতই আমার ছবিতেও থাকবে পাহাড়, স্তেপভূমি, মানুষ, ঘাস, মেঘ আর নদী। তখন আমার মনে ভাবনাও এল: রঙ কোথায় পাব? স্কুল থেকে কেউ আমাকে রঙ দেবে না, কারণ সে রঙ ওদেরই লাগবে! এমনভাবে ভাবছিলাম, যেন এটাই প্রধান সমস্যা।

দানিয়ার হঠাৎ গান থামিয়ে দিল। জামিলা দুহাত দিয়ে দানিয়ারকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরে ছিল; গান থামার সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেল, মুহূর্তেক নিশ্চল হয়ে থাকল, আরও সরে গেল, তার পর লাফিয়ে নীচে নামল। দানিয়ার দ্বিধার সঙ্গে বল্গা টেনে ধরল। ঘোড়াগুলি থেমে গেল। জামিলা দাঁড়িয়ে পথের উপর, পিঠ দানিয়ারের দিকে ফেরানো। জামিলা হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল, অপাঙ্গে দানিয়ারকে দেখল, অশ্রুভেজা স্বরে বলল:

'কী দেখছ?' এক মুহূর্ত থেমে কঠোর স্বরে বলল: 'আমার দিকে তাকিয়ো না, যাও!' জামিলা নিজের গাড়ির দিকে চলল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল: 'কী দেখছিস হাঁ করে? গাড়িতে ওঠ্, লাগাম ধর! ওহ্, তুই আমার জান খারাপ করে তুলেছিস!'

ঘোড়াগুলিকে চালিয়ে নিতে নিতে আমি ভাবলাম: "ওর হল কী?" অবশ্য অনুমান করা দুষ্কর নয়: জামিলা চরম দুর্দশায় পড়েছে; ও বিবাহিতা, স্বামী জীবিত এবং সারাতভের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু আমি ওর কঠিন সমস্যার মীমাংসা আর খুঁজতে চাইলাম না। আমার রাগ হল ওর উপর আর আমার নিজের উপর। যদি জানতাম দানিয়ার আর গান গাইবে না, তার কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনতে পাব না, তা হলে আমি সত্যি জামিলাকে ঘৃণা করতে শুরু করতাম।

আমার সারা দেহ ব্যথায় টন্ টন্ করছিল, ফিরে গিয়ে

খড়ের উপর শুয়ে পড়ার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। চলমান ঘোড়াগুলির পিঠ দুলছে অন্ধকারে, গাড়িটা ঝাঁকোচ্ছে অসহ্যভাবে, বার বার বল্গা খসে পড়ছে আমার হাত থেকে।

গোলাবাড়িতে ফিরে গিয়ে কোন রকমে ঘোড়ার সাজ খুলে গাড়ির নীচে ছুঁড়ে দিলাম। খড়ের গাদায় গিয়েই আমি গড়িয়ে পড়লাম। এবার দানিয়ার নিজেই ঘোড়াগুলিকে চরাতে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে জেগে উঠলাম খুব খুশি মনে। জামিলা আর দানিয়ারের ছবি আঁকব। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করলাম ঠিক কীভাবে ওদের আঁকব। মনে হল এখন রঙ আর তুলি পেলেই আমি শুরু করতে পারি।

ছুটে গেলাম নদীর পারে। মুখ ধুয়ে সেখান থেকে ছুটে গেলাম পা-বাঁধা ঘোড়াগুলির কাছে। ঠাণ্ডা, ভেজা লুসার্ন ঘাস ঝাপট মারছিল আমার নগ্ন পায়ে, পায়ের তলার ফাটা চামড়ায় বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম আনন্দের চঞ্চলতা। ছুটবার সময়ে চারপাশের ঘটমান সবকিছুই লক্ষ্য করছিলাম। সূর্য বেরিয়ে আসছিল পাহাড়ের আড়াল থেকে, সেচ-খালের কাছে কোনরকমে শিকড় ছড়ানো একটি সূর্যমুখী ফুল প্রসারিত হয়ে আছে সূর্যের দিকে। ফুলটির চার ধারে লোভীর মত ভিড় করেছে শাদা-মাথা আগাছারা; কিন্তু হলুদ জিহ্বা দিয়ে তাদের কাছ থেকে রোদ কেড়ে নিয়ে নিজের আঁটসাঁট আর ভারী বীজের টুপিটিকে পুষ্ট করছে সূর্যমুখী। গাড়ি চলাচলের রাস্তায় নদী পার হওয়ার জায়গাটিতে চাকার সঙ্গে উঠে আসা কাদা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। এক পাশে কোমর সমান উঁচু সুগন্ধি পুদিনার একটা দ্বীপের মত। আমি ছুটছি স্বদেশের মাটির উপর দিয়ে, মাথার

উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে চড়ুইয়েরা — আহ্! যদি প্রভাতের সূর্য, নীল-শাদা পাহাড়, শিশির-ধোয়া লুসার্ন ঘাস আর সেচ-খালের ধারে গজিয়ে ওঠা নিঃসঙ্গ সূর্যমুখীকে ধরে রাখার মত রঙ থাকত আমার কাছে!

গোলাবাড়িতে ফিরেই আমার খোশ মেজাজটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। জামিলাকে দেখলাম। মনমরা, ক্লিষ্ট চেহারা, চোখের নীচে কালো দাগ; সম্ভবত রাতে ঘুমোয় নি। আমাকে দেখে হাসলও না, কথাও বলল না, কিন্তু ওরোজ্মাত্ এলে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণ না করে জামিলা বলল:

'আপনার গাড়িটা ফিরিয়ে নিন! আমাকে অন্য যেকোন কাজে দিন, আমি স্টেশানে শস্য পৌঁছে দিতে আর যাব না!'

ওরোজ্মাত্ বিস্মিত এবং সদয় কণ্ঠে বললেন: 'কী হয়েছে বাছা? তোমাকে কি ডাঁশে কামড়েছে?'

'ডাঁশে কামড়ায় বাছুরদের! কী হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! বলেছি তো আর যাব না আমি; এটাই আমার শেষ কথা!'

ওরোজ্মাতের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'তুমি কী চাও তাতে কিছু এসে যায় না! তোমার কাজ তোমাকে করতেই হবে!' ওরোজ্মাত্ রাগতভাবে ক্রাচ্ ঠুকলেন মাটিতে। 'যদি কেউ তোমার কোন ক্ষতি করে থাকে সে কথা আমাকে বল, আমি তার মাথায় এই ক্রাচ্ ভাঙব! আর যদি তেমন কিছু না হয়ে থাকে তবে এই আহ্লাদেপনা ছাড়: তোমরা যা স্টেশানে দিয়ে আসছ সেটা সৈনিকের রুটি, তোমার নিজের স্বামীও তো আছে তাদের মধ্যে!' হঠাৎ ঘুরে ওরোজ্মাত্ চলে গেলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

জামিলা বিব্রত বোধ করল, লজ্জায় লাল হল, দানিয়ারের দিকে তাকিয়ে কোমলভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। দানিয়ার দাঁড়িয়ে

ছিল একটু দূরে জামিলার দিকে পেছন ফিরে, ঘোড়ার কলারে হেম-স্ট্র্যাপ বাঁধছিল ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে। জামিলা আর ওরোজমাতের কথাবার্তা সে শুনতে পেয়েছিল। যেখানে ছিল, আঙ্গুল দিয়ে চাবুক নাড়তে নাড়তে কিছুক্ষণ জামিলা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার পর বেপরোয়াভাবে হাত ঝাঁকিয়ে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সেদিন আমরা ফিরে এলাম অন্যান্য দিনের তুলনায় আগেই। দানিয়ার সারা পথ তার ঘোড়াগুলিকে ছুটিয়ে এনেছে খুব দ্রুত বেগে। জামিলা ছিল নিশ্চুপ আর বিষণ্ণ। পোড়া, কালো স্তেপ দেখে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মাত্র গতকালও এই স্তেপেরই চেহারা ছিল কত ভিন্ন। তখন মনে হয়েছিল আমি যেন এই স্তেপের কথা শুনেছি রূপকথার গল্পে, মনে হয়েছিল সুখের যে ছবি আমার চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে তা এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছেড়ে যাবে না। জীবনের উজ্জ্বলতম প্রান্তটিকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, তার প্রতিটি অংশকে নিজের কল্পনায় নতুন করে সৃষ্টি করে চলেছিলাম — যতক্ষণ না আমার সকল ভাবনা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল শুধু ওই একটি উপলব্ধির আড়ালে। কয়ালের কাছ থেকে এক টুকরো ভারী শাদা কাগজ চুরি না করা পর্যন্ত সেদিন আমি স্থির হতে পারি নি। ছুটে গিয়ে লুকিয়েছিলাম একটা খড়ের গাদার আড়ালে। সেখানে একটা কোদালের মসৃণ পিঠের উপর কাগজটাকে বসালাম — কোদালটা আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। উত্তেজনায় আমার প্রচণ্ড হৃৎকম্প হচ্ছিল।

ফিস ফিস করে উচ্চারণ করলাম: 'আল্লাহর রহ্‌মত নাজেল হোক এর উপর!' আমাকে প্রথমবার ঘোড়ার উপর বসিয়ে বাবা এই রকম বলেছিলেন। তারপর পেন্সিল দিয়ে কাগজে

রেখা টানতে শুরু করলাম। এগুলিই আমার জীবনে কারো-না-শেখানো প্রথমতম রেখা। কিন্তু, কাগজের উপর দানিয়ারের মুখটি রেখায় রেখায় ফুটে উঠতেই আমি অন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। আমি কল্পনা করলাম সেই আগস্ট-রাত্রির স্তেপভূমি, কল্পনা করলাম আমি ওর গান শুনছি, দেখলাম ওর মাথা হেলানো পেছনের দিকে, গলার কাছটা খোলা, দেখলাম জামিলা কাত হয়ে আছে ওর কাঁধের উপর। দেখলাম গাড়ির উপর ওরা দু'জন, বল্গা ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ির সামনের দিকে, অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠ ওঠা-নামা করছে, সামনে স্তেপভূমি, দূরে আকাশের তারা। এটা ছিল আমার নিজে-আঁকা প্রথম চিত্র।

আমি আঁকায় এমন মগ্ন হয়ে ছিলাম যে বাইরের কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছিলাম না: হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম।

'কালা না-কি?'

জামিলা। ওকে দেখে খুবই বিব্রত আর লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু যথাসময়ে ছবিটাকে লুকিয়ে ফেলতে পারলাম না।

'গাড়ি বোঝাই করা হয়ে গেছে অনেক আগে; আমরা এক ঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে মরছি তোর জন্যে! কী করছিস এখানে? এটা কী?' বলেই ছবিটা তুলে নিল জামিলা। সক্রোধে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল: 'হুম্!'

আমার ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি মরে যাই। অনেক অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে জামিলা বিষণ্ণ, ভেজা চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে।

'এটা আমাকে দিয়ে দে কিচিনে বালা... এটাকে আমি যত্ন করে রেখে দেব স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে...' কোমল স্বরে বলল জামিলা। কাগজটাকে ভাঁজ করে রেখে দিল ব্লাউজের ভেতরে।

আমরা চলতে শুরু করেছি, কিন্তু তখনও আমি যেন ফিরে আসতে পারি নি বাস্তব জগতে। মনে হচ্ছিল সবই যেন একটা স্বপ্ন। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আমি এমন কিছু এঁকেছি যা মিলে যাচ্ছে আমার দেখা কোন ঘটনার সঙ্গে। তবু আমার হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন একটা অকপট আনন্দ জেগে উঠেছিল, তেমন একটা গর্ব অনুভব করছিলাম, বহু স্বপ্নের শোভাযাত্রা চলেছিল মনের মধ্যে — প্রতিটি স্বপ্নই আগেরটির চাইতে বেশি দুঃসাহসিক, প্রতিটিই আগেরটির চাইতে বেশি উত্তেজনাকর — সব মিলিয়ে আমার মাথা যেন ভাসছিল বাতাসে। আরও বহু ছবি আঁকার আগ্রহ বোধ করছিলাম। সেগুলি সবই হবে বর্ণলিপ্ত ছবি, শুধু পেন্সিলের ড্রইং নয়। আমরা যে খুবই দ্রুত বেগে চলছিলাম, সে দিকে আমি মোটেই লক্ষ্য করছিলাম না। দানিয়ারই ঘোড়া ছুটিয়েছিল খুব জোরে। জামিলা পিছনে পড়ে থাকে নি। জামিলা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, মাঝে মাঝে ওর মুখে ফুটে উঠছিল মর্মস্পর্শী, আত্মসচেতন হাসি। আমিও হাসলাম। কারণ, ওর হাসি দেখে বুঝলাম ও এখন আর আমাদের উপর রাগ করে নেই। মনে হল, ও যদি বলে দানিয়ার হয়ত আজ আবার গান গাইবে...

সেদিন আমরা স্টেশানে পেণছিলাম অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগে; ঘোড়াগুলির মুখে ফেনা উঠে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ি থামতে থামতেই দানিয়ার মাল তুলতে শুরু করল। ওর আজ হয়েছে কী? এত ওর তাড়া কিসের? মাঝে মাঝে থেমে চিন্তিত দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখছিল প্রবল গর্জনে ধাবমান রেলগাড়ির দিকে। ও কী ভাবছে সেটা বুঝবার জন্য জামিলাও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করছিল।

দানিয়ারের দিকে তাকিয়ে জামিলা বলল: 'এখানে এস।

ঘোড়ার এই নালটা ঢিলে হয়ে গেছে। এটা খ্ৰলতে আমাকে সাহায্য কর।'

দ্ৰই হাঁটুর মধ্যে ঘোড়ার পা চেপে ধরে ঢিলে নালটা টেনে খ্ৰলে ফেলে দানিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ালে জামিলা তার চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলল:

'তুমি অমন করছ কেন? তুমি কি ব্ৰঝতে পারছ না?.. না কি আমিই সারা দ্ৰনিয়ায় একমাত্র মেয়ে?..'

দানিয়ার অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল, উত্তর দিল না।

জামিলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: 'তুমি কি ভাবো আমার দিক থেকে ব্যাপারটা খ্ৰবই সোজা?'

দানিয়ারের ভ্ৰ কুঞ্চিত হল, জামিলার ম্ৰখের দিকে তাকালো গভীরভাবে -- প্রেম আর বিষণ্ণতা মেশানো দ্ৰষ্টিতে, তার পর উত্তর দিল এত অন্ৰচ্চ স্বরে যে, আমি তার কথা শ্ৰনতে পেলাম না। তার পর দ্ৰত হেঁটে চলে গেল ওর গাড়ির কাছে; ওকে যেন একটু খ্ৰশিই মনে হল। হাঁটতে হাঁটতে দানিয়ার খ্ৰলে নেওয়া ঘোড়ার নালটির উপর ম্ৰদ্ৰভাবে হাত ব্ৰলাচ্ছিল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ব্ৰঝতে পারলাম না: জামিলার কথায় কী সান্ত্বনা পেল দানিয়ার? যদি কেউ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে: "তুমি কি ভাবো আমার দিক থেকে ব্যাপারটা খ্ৰবই সোজা!.." তবে তা শ্ৰনে কেউ কি সান্ত্বনা পেতে পারে?

মাল নামানো শেষ করে আমরা যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত তখন মাল নামানোর চাতালে প্রবেশ করল পাটভাঙ্গা ওভারকোট পরা শ্ৰকনো-চেহারা একজন আহত সৈনিক, কাঁধে ন্যাপস্যাক। কয়েক মিনিট আগেই একটা ট্রেন স্টেশানে ভিড়েছিল। চারদিকে তাকিয়ে সৈনিকটি চেঁচিয়ে বলল:

'এখানে কুর্কুরেউ গ্রামের কেউ আছে কি?'

উত্তরে বললাম: 'আমি আছি!' ভাবতে লাগলাম লোকটি কে হতে পারে?

আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সৈনিকটি বলল: 'তুমি কার ছেলে?' হঠাৎ জামিলার দিকে চোখ পড়তেই সৈনিকটির মুখ বিস্ময় আর আনন্দের হাসিতে ভরে গেল।

জামিলা চেঁচিয়ে বলল: 'করিম? তুমি?!'

জামিলার হাতে সজোরে চাপ দিয়ে সৈনিকটিও চেঁচিয়ে বলল: 'জামিলা!'

সৈনিকটি জামিলাদের গ্রামের লোক।

'কী সৌভাগ্য! ভাগ্য ভাল বলেই আমি এখানে খোঁজ নিতে এসেছি!' সৈনিকটি উত্তেজিতভাবে বলল। 'আমি সাদিকের কাছ থেকে আসছি, হাসপাতালে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম, আল্লাহর রহমতে দুয়েক মাসের মধ্যেই ও ছাড়া পাবে। হাসপাতাল ছাড়ার সময়ে সাদিককে বললাম বৌয়ের কাছে একটা চিঠি লিখে দে, আমি পৌঁছে দেব... এই নাও, দস্তখত আর সীল করা।' করিম জামিলাকে একটা তিনকোণা খাম দিল।

জামিলা চিঠিটা নিল ছোঁ মেরে, মুখে লজ্জার ভাব দেখা গেল, তার পর ওর মুখ সাদাটে হয়ে গেল, সাবধানে অপাঙ্গে তাকালো দানিয়ারের দিকে। দানিয়ার দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির পাশে, গোলাবাড়িতে সেদিন যেমন ছিল — গাড়ির পাশে একটা নিঃসঙ্গ মূর্তির মত। সোজা তাকিয়ে ছিল জামিলার দিকে — দানিয়ারের চোখ বন্য হতাশায় পূর্ণ।

ততক্ষণে চার দিক থেকে লোক এসে জমায়েত হতে শুরু করেছে; সৈনিকটি ভিড়ের মধ্যে নিজের বন্ধু ও আত্মীয় আবিষ্কার করেছে এবং তার প্রতি অসংখ্য প্রশ্নের বৃষ্টি হচ্ছে। চিঠির জন্য জামিলা সৈনিকটিকে ধন্যবাদ জানানোর একটা সুযোগ পাওয়ার আগেই দানিয়ারের গাড়িটি চাতাল থেকে

যেন উড়ে বেরিয়ে গেল ধ্বলার মেঘ স্বৃষ্টি করে, গাড়ির চাকার চাপে অবদমিত পথে প্রবল ঝাঁকানি খেতে খেতে।

লোকেরা চেঁচাল: 'পাগল না-কি!'

সৈনিকটিকে নিয়ে ভিড় অপস্বৃত হল; আমি আর জামিলা চাতালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম দ্রুত অপস্বৃয়মান ধ্বলার মেঘের দিকে তাকিয়ে।

বললাম: 'চল দ্বজেনে।'

জামিলা তিক্তভাবে বলল: 'তুই যা, আমাকে একা থাকতে দে!'

এই প্রথম আমরা গ্রামের পথে যাত্রা করলাম একা একা। দম-আটকানো গরম আমার শ্বকনো ঠোঁটদ্বটিকে যেন প্বড়িয়ে দিচ্ছিল। ফাটা, পোড়া মাটি সাদা হয়ে গিয়েছিল দিনের তাপে, এখন যেন ঠান্ডা হচ্ছে, লোণা ধ্বসর গ্বঁড়ায় আব্বত হতে শ্বর্ব করেছে। অস্থির, নিরাকার স্বর্য যেন কাঁপছে লোণা সাদা কুয়াশার মধ্যে। দ্বরে, অস্পষ্ট দিগন্তে কমলার মত লাল ঝোড়ো মেঘ জমতে শ্বর্ব করেছে। শ্বষ্ক দমকা হাওয়া ঘোড়াগ্বলির নাকে সাদা ধ্বলো জমিয়ে তুলছে, ঘোড়ার কেশর দ্বলিয়ে দিচ্ছে, ঢেউ তুলছে টিলার উপরে সোমরাজের ঝোপে ঝোপে।

ভাবলাম: 'মনে হচ্ছে যেন ব্বষ্টি হবে।'

খ্ববই নিঃসঙ্গ আর উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম! ঘোড়াগ্বলি গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটতে শ্বর্ব করেছিল, জোরে চাব্বক হাঁকালাম। অস্থিসার, লম্বা-পা পক্ষিরাজদ্বটি হেলাফেলা করে চলছিল গিরিখাতের মধ্য দিয়ে। প্রবল বায়্বর তাড়নে ভাঁটুই গাছের পাতা উড়ে যাচ্ছিল দিগ্বিদিকে। আমাদের দিকে ভাঁটুই গাছ নেই: পাতাগ্বলি নিশ্চয় উড়ে এসেছে কাজাখ এলাকা থেকে। স্বর্য অস্ত গেল। কোন দিকে কোন জনমনিষ্যি দেখা যায় না, শ্বধ্ব দেখা যায় তাপদগ্ধ স্তেপভূমি।

গোলাবাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বায়ু নিথর, গতিহীন। দানিয়ারের নাম ধরে ডাকলাম।

চৌকিদার বলল: 'সে নদীতে গেছে। কী গুমট! সবাই বাড়ি গেছে। বাতাস না থাকলে গোলাবাড়িতে করার মত কোন কাজ থাকে না!'

ঘোড়াগুলিকে চরতে দিয়ে ভাবলাম নদীর ধারে যাব। পাহাড়ের পাশে দানিয়ারের প্রিয় জায়গাটা আমার জানা ছিল।

দেখলাম দানিয়ার সেখানে বসে আছে কুঁজো হয়ে, মাথা হাঁটুর উপরে রাখা, নীচের ধাবমান জলের শব্দ শুনছে। ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে মন ভাল করার মত দুয়েকটা কথা বলি। কিন্তু, কী বলতে পারি আমি? এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, অবশেষে ফিরে এলাম। তারপর মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে খড়ের উপর শুয়ে থাকলাম বহুক্ষণ, ভাবতে লাগলাম জীবন এত জটিল আর দুর্বোধ্য কেন?

জামিলা এখনও ফেরে নি। ওর কী হল? যারপরনাই ক্লান্ত হয়েও আমিও ঘুমোতে পারছিলাম না। পাহাড়ের উপর দিয়ে মেঘের গহনে সন্ধ্যারাগ ঝলমলিয়ে উঠল।

দানিয়ার যখন গোলাবাড়িতে ফিরে এল আমি তখনও জেগে ছিলাম। পথের দিকে নজর রেখে দানিয়ার উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ইতস্তত হেঁটে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ শুয়ে পড়ল খড়ের উপর আমার পাশে। আমি নিশ্চিত অনুভব করছিলাম দানিয়ার চলে যাবে, এই গ্রামে ও কিছুতেই আর থাকবে না! কিন্তু কোথায় যাবে ও? নিঃসঙ্গ, গৃহহীন; ওর জন্য কোথাও তো কেউ অপেক্ষা করে নেই। তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পেলাম একটা গাড়ি যেন গোলাবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বোধ হয় জামিলা ফিরছে এতক্ষণে...

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না; ঘুম ভাঙল খড়ের মর্মর

শব্দে। কে যেন আমার কাছ দিয়ে হে'টে গেল, মনে হল যেন একটা ভেজা ডানা আমার কাঁধে বুরুশ বুলিয়ে গেল। চোখ মেললাম। জামিলা। নদী থেকে এসেছে, ঠান্ডা, ভেজা বসন। জামিলা থামল, চার দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে দেখল, তার পর বসে পড়ল দানিয়ারের পাশে।

কোমল স্বরে জামিলা বলল: 'দানিয়ার, আমি এসেছি, আমি নিজেই এসেছি তোমার কাছে!'

চরাচর নিঃশব্দ। একটা বজ্র পতিত হল পৃথিবীর দিকে, নিঃশব্দে।

'তুমি রাগ করেছ? খুব বেশি রাগ করেছ?'

আবার নিঃশব্দ। তার পর একতাল আলগা মাটি খসে গিয়ে জলে পড়ার মত শব্দ হল কোমলভাবে।

'আমার ভুল শুধু? তোমার ভুল নয় একটুও?..'

বজ্র গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে। জামিলার মুখের পরিলেখ যেন খোদাই হয়ে গেল বিদ্যুতের আলোয়। চার দিকে তাকিয়ে দেখল, সবলে আঁকড়ে ধরল দানিয়ারকে। জামিলার কাঁধ ফুলে উঠেছে, কাঁপছে দানিয়ারের আলিঙ্গনের মধ্যে। তার পর জামিলা শুয়ে পড়ল খড়ের উপর দানিয়ারের পাশে।

একটা গরম বাতাস বয়ে এল স্তেপ থেকে। ইতস্তত খড় উড়িয়ে দিল, আছড়ে পড়ল গোলাবাড়ির প্রান্তে জীর্ণ একটা তাঁবুর উপর, চলে গেল পথের উপর দিয়ে খেয়ালি লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। আবার বাজ ফাটার শুষ্ক শব্দ; মেঘের বুক চিরে গেল নীল বিদ্যুতের ঝলকে। একাধারে ভয় আর উত্তেজনা — ঝড় আসছে, গ্রীষ্মের শেষ ঝড়।

জামিলা আবেগে ফিস ফিস করে বলছে:

'তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার চেয়ে ওকে বেশি পছন্দ

করব? কখনও না, কখনও না, কখনও না! ও আমাকে কখনও ভালবাসে নি। চিঠির শেষ দিকে শুধু এক লাইন লিখত আমাকে। আমি ওকে চাই না, অনেক-দেরিতে-আসা ওর প্রেমও চাই না; লোকে কী বলবে আমি তার পরোয়া করি না! আমার নিঃসঙ্গ প্রিয়তম, আমি কখনও তোমাকে যেতে দেব না! আমি যে তোমাকে ভালবাসছি অনেক অনেক কাল থেকে। যখন তুমি আসো নি, তোমাকে যখন জানতাম না, আমি তখন থেকেই তোমাকে ভালবেসেছি, তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি — তুমি যেন জানতে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি!'

ভাঙা ভাঙা বাঁকা হালকা-নীল বিদ্যুৎরেখা ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ের পাশে নদীতে। তীর্যক, হিমশীতল বৃষ্টির ফোঁটা মন্ত্রপাঠের মত শব্দ করে পড়তে লাগল খড়ের উপর।

কাজাখ আর কিরগিজ ভাষার প্রিয়সম্ভাষণের সকল শব্দ উচ্চারণ করে আবেগে ফিস ফিস করে দানিয়ার বলছিল: 'জামিলা, আমার প্রিয়তমা জামিলা! আমিও তোমাকে ভালবেসেছি অনেক অনেক কাল থেকে! আমি তোমার স্বপ্ন দেখেছি ট্রেঞ্চে, আমি জানতাম স্বদেশেই পাব আমার প্রিয়তমাকে। সে তো তুমিই, আমার জামিলা! এ দিকে ফের, আমাকে তোমার চোখে চোখ রাখতে দাও!'

ঝড় নেমে এসেছে আমাদের উপর।

ঝড়ের হাওয়ায় তাঁবুর ফেল্টের আচ্ছাদন ছিঁড়ে গিয়ে আহত পাখির ডানার মত ঝাপটাচ্ছে। নীচের থেকে ঝঞ্ঝার চাবুক খেয়ে বৃষ্টি নেমেছে মুষল ধারায়, যেন চুমো খাচ্ছে মাটিকে। বজ্রধ্বনিরা গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশের গা বেয়ে হিমানী-সম্প্রপাতের মত। বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝলকে পাহাড়েরা আলোকিত হয়ে উঠেছে, ক্ষিপ্ত গর্জনে বাতাস বয়ে যাচ্ছে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে।

মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। খড়ের ভেতর লুকিয়ে শুয়ে রইলাম, মনে হচ্ছিল আমার নিজের হৃৎপিন্ডও যেন ঝড়ের মত দাপাদাপি করছে আমার বুকের মধ্যে। খুবই সুখী বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘদিন রোগে ভুগবার পর রোদের আলো দেখতে বেরিয়ে এসেছি। বৃষ্টি আর বিদ্যুতের আলো দুই-ই আমার নাগলে পাচ্ছিল খড়ের নীচে, কিন্তু সুখাবেশে হাসিমুখে ঘুমিয়ে পড়লাম — বুঝতে পারলাম না, যে শব্দ কানে আসছিল সেটা খড়ের উপর মৃদু বৃষ্টির মর্মর না দানিয়ার আর জামিলার প্রণয়গুঞ্জন।

বর্ষা প্রায় এসে গেছে। শীঘ্রই আসবে শরৎ ঋতু। বাতাসে শারদ সোমরাজ আর ভেজা খড়ের গন্ধ। শরতে কী ঘটবে আমাদের ভাগ্যে? কি জানি কেন সেকথা আমি তখন ভাবি না।

সেবার শরতে, দু'বছর বিরতির পর আমি আবার স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলের পড়ার শেষে আমি প্রায়ই যেতাম খাড়া নদীর পাড়ে, কর্মহীন, নির্জন গোলাবাড়ির কাছে কিছুক্ষণ বসতাম। এখানেই এঁকেছিলাম আমার প্রথম স্কেচগুলি জল রঙ দিয়ে। মনে পড়ে, তখনও অনুভব করতাম আমার আঁকা মোটেই ভাল হচ্ছে না।

ভাবতাম: "এই রঙগুলি মোটেই ভাল নয়! যদি সত্যিকার ভাল রঙ পেতাম!" যদিও 'সত্যিকার' রঙ যে কেমন সে ধারণা তখন আমার একেবারেই ছিল না। ছোট ছোট সীসার টিউবভরতি খাঁটি রঙের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলাম অনেক পরে। সে যা-ই হোক, আমার শিক্ষকেরা ঠিকই বলতেন যে আঁকতে আমার শেখা দরকার। তবে, সেটা ছিল কেবলই স্বপ্নমাত্র। আমার ভাইদের তখনও কোন সংবাদ ছিল না; আর আমার মা তাঁর 'এই দুই-পরিবারের রোজগেরে দ্‌জিগিত্‌কে' কিছুতেই দূরে কোথাও গিয়ে পড়াশোনা করতে

দিতেন না। এ বিষয়ে কথা তুলতেও আমার সাহস হত না। যেন আমাকে আরও বেশি করে কষ্ট দেওয়ার জন্যই সে বছরের শরৎঋতু এত সুন্দর হয়ে উঠেছিল, যেন কাঁদছিল চিত্রিত হওয়ার জন্য।

হিমশীতল কুর্কুরেউর জল কমে গেল, নদীপ্রপাতের জায়গাগুলিতে পাথরের মাথায় মাথায় ঘন সবুজ আর কমলা রঙের শেওলা জমে উঠল। তুষারের ঋতুর শুরুতে রোজ-উইলোর কোমল, নম্র ডাঁটাগুলি লাল হয়ে গেল, কিন্তু ছোট ছোট পপলারেরা তখনও আঁকড়ে ধরে রাখল নিজেদের শক্ত খাটো হলুদ পাতাগুলিকে।

তৃণভূমির লালচে নাড়া-কুটার উপর পশুপালকদের ধোঁয়াটে, বৃষ্টিধোয়া তাঁবু কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে; কটু নীল ধোঁয়ার ফিতা কুঞ্চিত হচ্ছে চিমনিগুলির উপর। মাদী ঘোড়াগুলি এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, পেশল মদ্দা ঘোড়াগুলি উচ্চ হ্রেষাধ্বনি করে নালিশ জানাচ্ছে; মাদী ঘোড়াগুলিকে বসন্তকাল পর্যন্ত পালে রাখা দুষ্কর হবে। পাহাড় থেকে নেমে আসা গবাদি পশুর পাল খোঁটা খোঁটা নাড়া-কুটার উপর চরে বেড়াচ্ছে। পায়ে-চলা পথ ক্রুশের মত ছাপ ফেলেছে শুষ্ক, কালচে স্তেপের উপর।

অচিরেই স্তেপ-বায়ু বইতে শুরু করল, আকাশ কাদাটে হল, তুষারপাতের পুরোগামী শীতল বৃষ্টি শুরু হল। বালুকায় গজিয়ে ওঠা পাহাড়ী অ্যাশ গাছের একটি পরমোৎসাহী ঝোপের আকর্ষণে, বেশ প্রসন্ন একটি দিনে আমি নদীর পাড়ে গেলাম। নদীর যেখানটা হেঁটে পার হওয়া যায়, তার অদূরে রোজ-উইলোর ঝোপের নীচে বসলাম। অন্ধকার নেমেছে। সহসা দু'জন মানুষ দেখতে পেলাম। ওরা বোধ হয় নদী হেঁটে পার হয়েছে। মানুষ দু'টি দানিয়ার

আর জামিলা। ওদের উত্তেজিত, সংকল্পকঠোর মুখ থেকে আমি দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না। দ্রুত হাঁটছে দানিয়ার, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ন্যাপস্যাক, খোলা ওভারকোটের প্রান্ত বার বার ঠেকছে ওর জীর্ণ তেরপলের জুতোর উপর। জামিলার মাথায় বাঁধা সাদা রুমাল ঝুলছে পেছনে। জামিলা পরেছে ওর সবচেয়ে ভাল ছাপার পোশাকটা — যেটা ও পরতে ভালবাসত মেলা বা পরবের দিনে; তার উপরে পরেছে গোলাপোশের মত ভেলভেটের জ্যাকেট। ওর এক হাতে ছোট একটা ব্যাণ্ডিল, অন্য হাতে ধরে আছে দানিয়ারের ন্যাপস্যাকের একটা স্ট্র্যাপ। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কী নিয়ে যেন কথা বলছে।

ঘাসঝোপের মধ্য দিয়ে ওরা হাঁটছে গিরিখাতের পথ ধরে। কিংকর্তব্য বুঝতে না পেরে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওদের ডাকব কি? কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দই বের করতে পারলাম না।

পর্বতমালার উপরে দ্রুত ধাবমান মেঘরাশির গায়ে শেষ গাঢ় লোহিত রশ্মির ছোপ লেগেছে; সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে ক্ষিপ্রভাবে। একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে শাখা-রেলপথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দানিয়ার আর জামিলা। ঝোপের মধ্য থেকে ওদের মাথা দেখা গেল দুয়েকবার, তার পর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলাম: 'জামিলা-আ-আ-আ!'

অভাগা প্রতিধ্বনি ফিরে এল: 'আ-আ-আ!'

'জামিলা-আ-আ-আ!' আবার চীৎকার করে ডাকলাম; ওদের দিকে পাগলের মত ছুটলাম নদীর উপর দিয়ে একেবারে জল ডিঙিয়ে।

হিমশীতল জলের ছিটা লাগল আমার মুখে। কাপড় ভিজে গিয়েছিল, কিন্তু আমি ছুটেই চললাম — পায়ের নীচের

মাটিও চোখে পড়ছিল না। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। মাথা না তুলে পড়ে রইলাম, উষ্ণ অশ্রুর ধারা বইতে লাগল সারা মুখের উপর দিয়ে। অন্ধকার যেন ভারী হয়ে চেপে বসল আমার কাঁধের উপর। শুনতে পেলাম ঘাসের নমনীয় ডাঁটাগুলি শোকে হালকা শীস দিচ্ছে।

'জামিলা! জামিলা!' আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।

বিদায় জানাচ্ছিলাম এমন দু'জন মানুষকে, যারা আমার ঘনিষ্ঠতম, প্রিয়তম। সেখানে মাটির উপর পড়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ উপলব্ধি করলাম আমি জামিলাকে ভালবেসেছিলাম। হ্যাঁ, জামিলাই আমার প্রথম প্রেম, আমার কৈশোরের প্রেম।

অশ্রুসিক্ত বাহুতে মুখ লুকিয়ে সেখানে পড়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। শুধু দানিয়ার আর জামিলাকেই নয়, আমি বিদায় দিচ্ছিলাম আরও কিছু একটাকে — বিদায় দিচ্ছিলাম আমার কৈশোরকে।

অবশেষে অনেক দেরীতে, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরে দেখলাম উঠানে বহু লোকের ভিড়; রেকাবের ঝনৎকার শোনা যাচ্ছে, অনেকে ঘোড়া সাজাচ্ছে, মাতাল ওসমান ঘোড়ার উপর বসে আস্ফালন করছে, গলা কাটিয়ে চীৎকার করে বলছে:

'ওই ভ্রষ্ট জারজটাকে অনেক আগেই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল! এটা আমাদের সমগ্র গোষ্ঠীর অপমান! যদি কখনও আমার চোখে পড়ে, আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গেই খুন করব! তাতে আমার জেল-ফাঁসি যাই হোক আমি পরোয়া করি না — ভবঘুরেরা এসে আমাদের মেয়েদের চুরি করে নিয়ে যাবে এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না! এস দুজিগিতেরা, ওকে আমরা পালাতে দেব না, স্টেশানেই ওকে ধরে ফেলব!'

ভয়ে আমার রক্ত জমে যাওয়ার অবস্থা হল: তারা কোন পথ ধরে যাবে? কিন্তু, যখন দেখলাম তারা শাখা-রেলপথের দিকে গেল না, গেল বড় সড়ক ধরে স্টেশানের দিকে, তখন আমি নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাবার ভেড়ার চামড়ার কোটটা গায়ের উপর ছড়িয়ে গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে পড়লাম, মাথাটা এমনভাবে ঢেকে রাখলাম যেন আমার চোখের জল কেউ দেখতে না পায়।

এর পর গ্রামে কত যে গল্পগুজব হল! জামিলাকে ধিক্কার দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

'জামিলার মত বোকা আর হয় না; এমন পরিবার আর এমন সুখ পায়ে দলে গেল!'

'কী দেখে মজল জানতে ইচ্ছে হয়। ওর থাকার মধ্যে তো আছে ঐ ওভারকোট আর ছেঁড়া বুটজোড়া।'

'উঃ গোরু-ভেড়ার পালে উঠান একেবারে উপছে পড়ছে কি না! তিন কুলে কেউ নেই, একটা ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে — গায়ে যা আছে ও-ই তো সম্বল! ভেবো না গো, সুন্দরীর জ্ঞান হবে ঠিকই, তবে তখন আর করার কিছু থাকবে না!'

'আমিও তা-ই বলি! সাদিকের দোষটা কোথায়? স্বামী হিসাবে ও কি বেশ ভাল মানুষ নয়? ও তো এই গাঁয়ের সবচেয়ে ভাল দ্‌জিগিত্‌!'

'আর ওর শাশুড়ীর কথাই ধর; অমন শাশুড়ী ক'জনের হয়! অনেক মুল্লুক খুঁজলে তবে হয়তো এমন আরেকজন বাইবিচে পাওয়া যাবে! বোকা মেয়েটা নিজের জীবন ধ্বংস করল একেবারে অকারণে!'

সম্ভবত একমাত্র আমিই আমার প্রাক্তন দ্‌জেনে জামিলাকে ধিক্কার দিই নি। দানিয়ারের পরনে পুরনো

ওভারকোট আর ছেঁড়া বুটজোড়া থাক না কেন আমি তো জানতাম ওর আত্মার সম্পদ আমাদের যে কারও চাইতে বেশি। দানিয়ারের সঙ্গে থেকে জামিলা অসুখী হবে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু দুঃখ বোধ করছিলাম আমার মায়ের জন্য। মনে হচ্ছিল জামিলা চলে যাওয়ার পর মায়ের যেন আগের মত শক্তি আর ছিল না। মাকে কেমন যেন ভাগ্যহত আর খেপাটে দেখাচ্ছিল। এখন বুঝতে পারি, নিয়তি যে পুরানো জীবনের সবগুলি ছককে এমন প্রবলভাবে ভেঙ্গে দিতে পারে এই সত্যটা মা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। যদি কোন বিশাল বৃক্ষ ঝড়ে আমূল উপড়ে পড়ে যায়, তবে তা আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। আগে মায়ের আত্মসম্মানবোধ এত প্রবল ছিল যে, তিনি ছুঁচে সুতো পরানোর জন্যও কখনও কারও সাহায্য নিতেন না। কিন্তু, একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি মায়ের হাত কাঁপছে, তিনি সুচের ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন না, কাঁদছেন।

'এই সুচটায় সুতো পরিয়ে দে তো,' বলে মা গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'জামিলার ভাল হবে না... কি ভাল ঘরনীই না ও হতে পারত! কিন্তু ও তো চলে গেছে... আমাদের ত্যাগ করে গেছে... কেন গেল? এখানে কি ওর এতই কষ্ট হচ্ছিল?..'

ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে ভরসা দিয়ে বলি দানিয়ার সত্যিই কত ভাল মানুষ। কিন্তু বলার সাহস পাই নি — কারণ, তাতে মা জীবনভর অপমানিত বোধ করতেন।

কিন্তু, এই গোটা ব্যাপারটায় আমি যে কিছু-না-জানার অভিনয় করছিলাম, একদিন সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল...

অচিরেই সাদিক ফিরে এল। স্বভাবতই, খুবই দুঃখ পেল সব শুনে — যদিও নেশার ঘোরে ওসমানকে বলল:

'মাগী গেছে, বাঁচা গেছে! কোথাও বস্তিতে পচে মরবে। মেয়ের কি অভাব আছে নাকি! এমন কি কোন সোনালী চুলের মাগীও তো সবচেয়ে অপদার্থ ছোঁড়ার যোগ্য নয়।'

উত্তরে ওসমান বলল: 'অবশ্যই! আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে ছোঁড়াকে ধরতে পারলাম না, খুন করতাম সঙ্গে সঙ্গেই! আর ওই মাগীর চুল বাঁধতাম আমার ঘোড়ার লেজের সঙ্গে! ওরা বোধ হয় গেছে দক্ষিণে, তুলার খামারে, অথবা কাজাখদের কাছে। ছোঁড়া তো ভবঘুরে আগে থেকেই। কিন্তু এটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না — ব্যাপারটা ঘটতে পারল কেমন করে? কেউ কিছু জানতে পারল না; আর এরকম একটা সন্দেহও কি কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল? ওই কুত্তিটা নিজেই সব ঠিক করেছিল নিশ্চয়! যদি হারামজাদীকে একবার ধরতে পারতাম!..'

এমন লম্বা চওড়া কথা শুনে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল: "সেদিন মাঠে জামিলা তোমাকে কিভাবে অবজ্ঞা করেছিল তা নিশ্চয় ভুলে যাও নি! কত নীচ তোমার মন!"

একদিন বাড়িতে বসে স্কুলের দেয়াল-পত্রিকার জন্য ছবি আঁকছি। মা চুল্লি নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ সাদিক ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। মুখ বিবর্ণ, বিদ্বেষে কুঞ্চিত চোখ, আমার দিকে ছুটে এসে এক টুকরো কাগজ ছুঁড়ে দিল আমার মুখের উপর।

'এটা তুই এঁকেছিস?'

একেবারে বোবা হয়ে গেলাম যেন। এটা আমার সেই প্রথম ড্রইং। দানিয়ার আর জামিলাকে মনে হল যেন জীবন্ত, কাগজের বুক থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'হ্যাঁ, আমি এঁকেছি।'

কাগজটাতে খোঁচা দিয়ে বলল: 'এটা কে?'

'দানিয়ার।'

সাদিক চীৎকার করে উঠল: 'বিশ্বাসঘাতক!'

ড্রইংটাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে পায়ে দলিত করে প্রচন্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল সে।

দীর্ঘ বিষণ্ণ নৈঃশব্দের পর মা জিজ্ঞেস করলেন:

'তুই জানতি ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ।'

মা দাঁড়িয়েছিলেন চুল্লির গায়ে হেলান দিয়ে, চোখে আতঙ্ক আর ভর্ৎসনার দৃষ্টি। তার পর যখন বললাম 'আমি ওদের ছবি আবার আঁকব!' মা বিষণ্ণভাবে আর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

মেঝের উপর ছড়িয়ে থাকা কাগজের টুকরাগুলির দিকে তাকালাম; এ আঘাত আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ভাবুক ওরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক। আমি কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? আমার পরিবারের সঙ্গে? আমার গোষ্ঠীর সঙ্গে? কিন্তু জীবনের সত্যের সঙ্গে, ওই দুটি মানুষের সত্যের সঙ্গে তো আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি! আমি এ কথা বলতে পারি নি; কারণ আমার নিজের মা-ও এটা বুঝতে পারতেন না।

আমার চোখের সামনে সবকিছু ভেসে বেড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কাগজের টুকরাগুলি জীবন্ত, যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে মেঝের উপর। কাগজের টুকরাগুলি থেকে দানিয়ার আর জামিলার স্মৃতি এত স্পষ্টভাবে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে, আমি যেন হঠাৎ দানিয়ারের গান শুনতে পেলাম — যে গানটি সে গেয়েছিল আগস্টের সেই স্মরণীয় রাত্রিতে। গ্রাম থেকে ওদের চলে যাওয়ার কথা মনে পড়ায় দূরে কোথাও চলে যাওয়ার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল আমার মধ্যে।

সুখের দুস্তর পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমিও বেরিয়ে পড়ব ওদের মত, দৃঢ়তা আর সাহসের সঙ্গে।

মাকে বললাম: 'আমি পড়তে যেতে চাই দূরে কোথাও... বাবাকে বলো। আমি শিল্পী হতে চাই!'

আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে মা আমাকে ভর্ৎসনা করবেন এবং আমার যে ভাইয়েরা যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের কথা মনে করে কাঁদবেন। কিন্তু আমি অবাক হলাম, মা কাঁদলেন না। কোমল, বিষণ্ণ স্বরে বললেন:

'বেশ, তাই কর যদি তোর ইচ্ছে হয়ে থাকে... আমার পাখিরা সবাই বেশ শক্তসমর্থ হয়েছে, যার যার ইচ্ছামত দিকে উড়ে যাচ্ছে... কী করে জানব তুই-ই বা কতদূর উড়বি? হয়তো তোর কথাই ঠিক। যেতে যদি চাস, যা... অভীষ্ট স্থানে গিয়ে হয়তো তোর মত পাল্টাবে। আঁকিবুকি আর রঙ লাগানো কোন কাজের কাজ নয়... চেষ্টা করে দেখ গে ওতে কিছু হয় কিনা... শুধু আমাদের একেবারে ভুলে যাস নে...'

সেদিন থেকেই ছোট বাড়ির সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটল। এর অল্পকাল পরেই আমি পড়াশোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়লাম।

গল্পটি এই পর্যন্তই।

চারুকলা বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে আমি একাডেমীতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেলাম। ডিপ্লোমার জন্য যে ছবিটা আঁকলাম, সেটা আঁকার স্বপ্ন দেখছিলাম বহু দিন থেকে।

সেটা যে দানিয়ার আর জামিলার ছবি তা অনুমান করা খুবই সহজ। ছবিটিতে ওরা হাঁটছে স্তেপের উপর দিয়ে প্রসারিত শরতের পথ ধরে। ওদের সামনে বিশাল, উজ্জ্বল দিগন্ত।

আঁকার কৌশল সহজে আয়ত্ত হয় না, তাই আমার এই

ছবিটি নিখুঁত হয় নি। তবু আমি ছবিটিকে রেখেছি পরম যত্নে। কারণ, এটিই আমার প্রথমতম খাঁটি সৃষ্টির অভিজ্ঞতা।

মাঝে মাঝে আমি নিজের কাজে খুশি হতে পারি না। এমন কঠিন মুহূর্ত আসে যখন নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তখন আমি গিয়ে দাঁড়াই আমার সেই প্রিয় ছবিটির সামনে, দানিয়ার আর জামিলার সামনে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে, প্রতিবারই কথা বলি ওদের সঙ্গে।

তোমরা এখন কোথায়, কোন্ পথ ধরে চলেছ? কাজাখস্তানের স্তেপ, আলতাই আর সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে এখন আমাদের অনেক নতুন পথ হয়েছে! বহু সাহসী মানুষ সেসব জায়গায় কাজ করছে। তোমরাও কি তেমনই কোথাও আছ? আমার জামিলা, বিস্তৃত স্তেপের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে তুমি একবারও পেছনে তাকাও নি। তুমি কি ক্লান্ত, নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি? দানিয়ারের কাঁধে মাথা রাখ, ও তোমাকে প্রেম, পৃথিবী আর জীবনের গান গেয়ে শোনাক। স্তেপে সে গান প্রতিফলিত হোক, সকল বর্ণে পুষ্পিত হয়ে উঠুক! মনে কি পড়ে সেই আগস্টের রাত্রিকে! চলতে থাক, জামিলা, যা করেছ তার জন্য অনুতাপ করো না — তুমি পেয়েছ দুষ্প্রাপ্য সুখ!

ওদের দিকে তাকিয়ে আমি দানিয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। দানিয়ার আমাকে ডাকছে বেরিয়ে পড়ার জন্য — তার মানে আমার এখন যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হয়েছে। স্তেপ পার হয়ে আমি যাব নিজের গ্রামে, সেখানে অনেক অনেক নতুন রঙের সন্ধান পাব।

আমার তুলির প্রতিটি আঁচড়ে যেন প্রতিধ্বনিত হয় দানিয়ারের গান! আমার তুলির প্রতিটি আঁচড়ে প্রতিধ্বনিত হোক জামিলার হৃদয়ের স্পন্দন!

প্রথম শিক্ষক

জানালাগুলো আমি পুরো খুলে দিলাম। ঘরে এক ঝলক টাটকা হাওয়া এসে ঢুকলো। নীলচে হালকা আঁধারে আমি আমার শুরু করা ছবিটার জন্যে করে রাখা প্রাথমিক স্কেচ ও নক্সাগুলোর উপর চোখ বুলোতে লাগলাম। সংখ্যায় ওগুলো অনেক, আমি বহুবারই ফের গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করি। এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে নি ছবিটায়। এখনো আমি সেই আসল বস্তু খুঁজে পাই নি যা কিনা হঠাৎ অনিবার্যভাবে গ্রীষ্মকালীন এই ভোরগুলোর মতো অতি স্বচ্ছতায় ও ঔজ্জ্বল্যে এসে আবির্ভূত হয়, প্রাণ কোনো এক অধরা অনুভবে ভরে ওঠে। রাত্রিশেষের নিঃশব্দে আমি সারা ঘর পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম আর মাথায় শুধু চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা। প্রত্যেক বারই ঠিক এরকমই হয়। আর প্রত্যেক বারই আমি আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাই যে, আমার ছবি — এখনও ধারণা মাত্র।

ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ

বন্ধুবান্ধবের কাছেও গল্প করার পক্ষপাতী আমি নই। তার কারণ এই নয় যে, আমি আমার ছবির ব্যাপারে খুব ঈর্ষাকাতর, — কারণটা সোজা: যে-ছেলে এখনো দোলনায় দুলছে বড়ো হলে সে কী হবে তা আন্দাজ করা বেশ কঠিন বলেই আমার ধারণা। অসমাপ্ত কোনো রচনা বিচার করার মতোই তা কঠিন। যাই হোক, অন্তত এবারটার জন্যে আমি আমার নিয়ম ভঙ্গ করবো — আমি চাই যে সবাই আমার কথাটা শুনুক, অদ্যাবধি না-আঁকা ছবিটি সম্পর্কে আমার ধারণায় অন্যেরাও অন্তত অংশ নিক।

না, এ আমার কোনো খেয়াল নয়। এ ছাড়া অন্য কিছু করা অসম্ভব আমার পক্ষে, কেননা আমার ধারণা — এ ভার আমি একা বহন করতে পারবো না। যে কাহিনী শুনে আমার সমুদয় কল্পনা উজ্জীবিত, যে-কাহিনীর ফলে হাতে তুলি নিতে হয়েছে আমাকে, তা এত বিশাল ও গভীর যে আমার একার পক্ষে তা ধারণ করা সম্ভব নয়। আমার ভয়, যদ্দুর নেয়ার কথা তদ্দুরে নিয়ে যেতে পারবো না, আমার ভয় কানায় কানায় ভরা চা-র পেয়ালা ছলকে পড়ে যাবে। আমি চাইছি — অন্যান্যেরা তাদের উপদেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুক, কী করা দরকার একটু বলে দিক আমাকে, এমন কি কল্পনাতেও যদি তারা এসে আমার পাশে দাঁড়ায়, আমার এই ইজেলের সামনে, তারা আমার এই অনুভূতির অংশভাক হোক।

আপনার উষ্ণ হৃদয়ের একটু স্পর্শ দিতে কার্পণ্য করবেন না আমাকে, আসুন, আরো কাছে এসে বসুন, আপনাকে এ-কাহিনী শোনানো আমার কর্তব্য...

অজস্র ঝর্ণার কলমন্দ্রিত পর্বতের পাদদেশে সুবিস্তৃত এক মালভূমির উপরে আমাদের কুর্কুরেউ গ্রাম। গ্রামের নিচে

এখানে-ওখানে শিং উঁচনো কৃষ্ণপর্বতসহ বিশাল কাজাখ স্তেপ — হরিদ্রা উপত্যকা; দূর দিগন্তে কালো রেখা চলে গেছে রেল লাইনের, পশ্চিম পানে, প্রান্তরভূমি পার হয়ে।

আর গ্রামের উপরে, একটা বড়ো টিলায়, দুটো বিশালাকার পপলার বৃক্ষ দণ্ডায়মান। যতদিন থেকে আত্মস্মৃতি আমি মনে করতে পারি, ততদিন থেকে ওগুলোও মনে আছে আমার। যেদিক দিয়েই আপনি আমাদের কুর্কুরেউ গাঁয়ে আসুন না কেন, সবচেয়ে আগে ও দুটো পপলার আপনার চোখে পড়বেই, সব সময়েই ওদের দেখা যায় পাহাড়চূড়োয় কোনো আলোকস্তম্ভ যেন। কীভাবে যে ব্যাখ্যা করি তা ঠিক বুঝতে পারছি না — হয়তো বা এ-জন্যে যে, লোকের কাছে শিশু মনের ছাপ বিশেষভাবে মূল্যবান, কিংবা আমার চিত্রশিল্পী-বৃত্তির সাথে এর সম্পর্কও হয়তো একটা কারণ; তবে, প্রত্যেক বারই যখন ট্রেন থেকে নেমে আমি স্তেপ পার হয়ে গ্রামের দিকে এগুতে থাকি, তখন দূর থেকে প্রথম আমার চোখ যা খুঁজে বেড়ায় তা হলো আমার এই পরমাত্মীয় পপলারে।

ওরকম দীর্ঘদেহী ওরা যদি না হতো, অত দূর থেকে সঙ্গে সঙ্গে ওদের আমি দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ আছে, তবু আমার কাছে ওরা ছিল সর্বদাই অনুভববেদ্য, সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর।

কতবারই না এরকম হয়েছে যে আমি কোনো দূর জায়গা থেকে ফিরে আসছি কুর্কুরেউ-তে, আর সর্বদাই শঙ্কিত প্রাণে ভেবেছি: "ফের ঐ জোড়া-পপলার দেখতে পাবো তো আমি? একটু জলদি করে যদি ফেরা যেত গাঁয়ে, আরো দ্রুত গিয়ে উঠতে পারতাম ঐ ঢিবিতে আমার পপলারের কাছে। তারপর কেবল ঐ বৃক্ষদ্বয়ের নিচে গিয়ে দাঁড়ানো শুধু, আর দীর্ঘক্ষণ মহা আনন্দ-আবেশে তাদের পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনি শোনা।"

আমাদের গাঁয়ে যত খুশি আপনি সব রকমের গাছ পাবেন, কিন্তু এই পপলারগুলো ছিল তাদের মধ্যে সবিশেষ — ওদেরই ছিল বিশেষভাবে স্বকীয় কোনো ভাষা, এবং অবশ্যই কোন্-না-কোন্ নিজেদের স্বতন্ত্র, সঙ্গীতময় প্রাণও। যখনই এখানে আপনি আসবেন, তা সে দিন হোক কিংবা রাত, দুলতে থাকবে তারা, ডালপালা নিয়ে বাতাসের ঝাপটা দেবে আপনাকে, নানা সঙ্গতে অবিরাম তার মর্মরধ্বনি বাজবে। এই মনে হবে জোয়ারের শান্ত জলচ্ছল যেন আছড়ে পড়ছে বালুরাশিতে, এই মনে হবে — ডালে ডালে তার অদৃশ্য লেলিহানের উদ্দীপ্ত উষ্ণ মৃদু ফিসফিস, তো হঠাৎ মুহূর্তখানেক নিথরতার পরে আন্দোলিত সমস্ত পত্রপল্লবে ছড়িয়ে পড়লো গভীর দীর্ঘশ্বাস — কার জন্যে যেন মন-কেমন-করা। আর যখন বজ্রগর্ভ কৃষ্ণ মেঘ এসে জমা হয় মাথার উপরে, ডালগুলো দুমড়েমুচড়ে দিয়ে ঝড় এসে পাতা ঝরিয়ে দেয় তাদের, তখন পপলারেরা, ছিন্ন-জ্যা ধনুকের মতো তীব্র আন্দোলনে তীক্ষ্ণনাদী গর্জনে ফোঁসে — যেন কোনো ক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা।

পরে, বহু বৎসর চলে গেলে, এই দুই পপলারের রহস্য আমি জেনেছি। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল উঁচু টিলায়, সব দিক থেকে হাওয়ার কাছে খোলা, মৃদুতম বাতাসেও সাড়া দিত ওরা, তাদের প্রতিটি পাতা গভীর সংবেদনে কাঁপতো সামান্যতম হাওয়ার হিল্লোলেও।

কিন্তু এই সরল সত্যের আবিষ্কারে আমার কখনও মোহভঙ্গ ঘটে নি, সেই শৈশবী অনুভব যা অদ্যাবধি চিরঞ্জীব আমার নিকটে তা থেকেও বঞ্চিত হই নি। টিলার উপরে ঐ দুই পপলার এখনো আমার বিস্ময়কর, প্রাণস্পন্দিত মনে হয়। সেখানে, তাদের কাছে, আমি রেখে এসেছি আমার শৈশব, যেন রঙীন কোনো মায়াবী কাঁচের কিছু টুকরো...

গরমের ছুটির ঠিক আগে স্কুলের শেষ দিনটায় আমরা ছেলেপিলেরা পাখির বাসা ভাঙবো বলে দৌড়ে গেলাম সেখানে। প্রত্যেক বার যখনই আমরা লাফাতে লাফাতে, শিস দিতে দিতে দৌড়ে গেছি টিলাটায়, দীর্ঘদেহী পপলার একবার এদিকে একবার ওদিকে আন্দোলিত হতে হতে আমাদের যেন স্বাগত জানিয়েছে তার হিমেল ছায়া ঢেলে, পত্রপল্লবের সোহাগভরা মর্মরধ্বনি দিয়ে। কিন্তু আমরা, খালি-পা, দুষ্টুর দঙ্গল একে অন্যের উপরে হুমড়ি খেতে খেতে ঠিকই গাছ বেয়ে উঠে গেছি উপরে তার ডালপালায়, মহা হৈচৈ বাধিয়ে বসেছি সেই পক্ষীসাম্রাজ্যে। ভয় পেয়ে পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে আমাদের মাথার উপরে উড়তে শুরু করেছে। তাতে আমাদের ভারি বয়েই গেছে... কিন্তু গেল কোথায়? আমরা উপরে, আরো উপরে উঠছি তো উঠছিই — দেখাই যাক কে সবচেয়ে সাহসী আর বাহাদুর! — আর অমনি সেই সুদূর উচ্চতা থেকে, পাখিদের উড়াল দেয়ার মহা উচ্চতা থেকে, যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক কুহকে আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে গেল অপরূপ এক বিশ্ব — মহাশূন্যতা ও আলোকের পৃথিবী।

পৃথিবীর ঐ বিশালত্ব স্তম্ভিত করে দিলো আমাদের। রুদ্ধশ্বাসে আমরা যে যার ডালে নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইলাম, পাখির বাসা, পাখি — সব ভুলে গেলাম। যৌথখামারের আস্তাবল — যে বাড়িটাকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দালান মনে করতাম, সেটাকে ওখান থেকে আমাদের মনে হলো নেহাৎই একটা চালাঘর। আর গাঁয়ের পিছনে বিস্তীর্ণ ছড়িয়ে আছে বিশাল অক্ষত স্তেপ, অস্পষ্ট হতে হতে দূরে হারিয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। আমরা তার নীলাভ দূরান্তে তাকিয়ে রইলাম, যতদূর চোখ যায়, আরো অনেক-অনেক জমি দেখতে

পেলাম আমরা যার অস্তিত্ব বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা করি নি কখনো, দেখতে পেলাম নদ-নদী যা আগে কখনো জানি না। দিগন্তে সরু রুপোলি রেখায় চিকচিক করছে নদীগুলো। গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরে আমরা ভাবলাম: এটা কি দুনিয়ার শেষ, না কি এর পরেও আছে এরকমই আরো আকাশ, এরকমই কালো মেঘ, স্তেপ আর নদী? গাছের ডালপালা আঁকড়ে আমরা শুনতে লাগলাম হাওয়ার অপার্থিব গুঞ্জনধ্বনি, আর তার উত্তরে পাতার হার্দ ফিসফিস — নীলাভ দূরান্তের ওপারে প্রলুব্ধক, রহস্যভরা কোন্ জগতের ঠিকানা।

পপলারের গুঞ্জন আমি শুনেছিলাম। অবিরাম পল্লবমর্মরের ভিতরে আমি সেই দূরদূরান্তকে উপলব্ধির চেষ্টা করতেই ভয়ে, আনন্দে বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ি পিটতে লাগলো। কেবল একটা ব্যাপার কিন্তু কখনো মনে আসে নি: এই জায়গায় এই গাছ পুঁতেছিল কে? গাছদুটোর বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে কোন্ স্বপ্ন দেখেছিল সেই অজানা লোক, কথা বলেছিল কী নিয়ে, কোন্ আশায় এদের সে এখানে, এই পাহাড়ে, বড়ো করে তুলেছিল?

এই টিলাকে, যেখানে পপ্লার দুটো দাঁড়িয়ে আছে, কী কারণে জানি না সবাই 'দিউইশেনের পাঠশালা' বলে ডাকতো। মনে পড়ে, যদি এমন ঘটতো যে কেউ তার হারানো ঘোড়া খুঁজতে বেরিয়ে কারো দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে: 'দাদা, আমার লালচে ঘোড়াটা দেখেছো না কি?' তো প্রায়শঃই যে-উত্তর সে শুনতো, তা হলো: 'ঐ তো ওপরে, দিউইশেনের পাঠশালার ওখানে রাতে ঘোড়া চরছিল কয়েকটা, যাও দেখি, হয়তো তোমারটাও পেয়ে যাবে ওখানে।' বড়োদের দেখাদেখি আমরাও, ছেলেপিলেরা, কিছু না ভেবেচিন্তেই পুনরুক্তি করেছি ও-কথার: 'এ-ই, চ'না ভাই, দিউইশেনের পাঠশালায়

যাই, ঐ পপলারের ওখানটায় — চড়ুইগুলোকে একটু মজা দেখাই!'

লোকে বলে, কবে কোন্ কালে না কি এই টিলার উপরে একটা পাঠশালা ছিল। আমরা তার চিহ্ন পর্যন্ত দেখি নি। ছোটো বেলায় আমি কতবার যে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি — হোক না না-হয় ভাঙ্গাচোরা, ঘুরে বেড়িয়েছি কত, খুঁজেছি, কিন্তু কিচ্ছুটি আবিষ্কার করতে পারি নি। তারপর আমার আরো যা অবাক লাগছিল তা এই, টিলাটা ন্যাড়া অথচ ডাকা হয় 'দিউইশেনের পাঠশালা'। বুড়ো লোকজনদের একবার জিজ্ঞেস করলাম, এই যে লোকটা, মানে দিউইশেন, তা সে কে? তাদের মধ্যে একজন তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়েছিল: 'দিউইশেন লোকটা কে? আরে, ঐ যে লোকটা, এখনো তো বেঁচে আছে, ঐ যে সেই ল্যাংড়া ভেড়া বংশের। সে অনেকদিনের কথা, ও সময়ে দিউইশেন ছিল কম্‌সমোল্ সভ্য। আর এই টিলাটায় ছিল কার যেন এক ভাঙাচোরা চালাঘর। দিউইশেন এখানে পাঠশালা খুললো, বাচ্ছাদের পড়াতে লাগলো। ওটা আবার পাঠশালা ছিল না কি, — মানে ঐ নামেই যা! ঈশ্, কী দিনকালই না ছিল তখন! তখন কেউ কোনো ঘোড়ার কেশর বাগিয়ে ধরেছে আর রেকাবে পা গলাতে পেরেছে তো, ব্যস, নিজেই নিজের রাজা। দিউইশেনের ব্যাপারও ছিল তাই। মাথায় একটা কিছু ঢুকলো, তো করেই ছাড়বে। আর এখন সেই চালাঘরের একটা ইঁটও খুঁজে পাবে না তুমি, লাভ ঐ একটাই হয়েছে — মানে ঐ নামটাই রয়ে গেছে আর কি!..'

দিউইশেনকে আমি প্রায় চিনতামই না। যা মনে পড়ে তা হলো — বয়েস হয়ে যাওয়া একটা লোক, বেশ লম্বা-চওড়া, ত্যাড়চাটে, ঝোপড়া ভুরু বেশ তীক্ষ্ন। তার ঘর ছিল নদীর ওপারে, দু-নম্বর ব্রিগেড রাস্তায়। আমি তখনো গাঁয়েই থাকি,

দিউইশেনকে দেখেছি যৌথখামারে মিরাবের* কাজ করতো আর মাঠেই মাঠেই পড়ে থাকতো সারাটা সময়। কদাচিৎ সে আমাদের রাস্তায় চলাফেরা করতো, ঘোড়ার জিনে সর্বদাই একটা ইয়া বড়ো কেৎমেন্** বাঁধা, আর ঘোড়াটাও কোনখানে যেন দেখতে ছিল তার প্রভুরই মতো — একই রকম হাড় জিরজিরে, লিকলিকে পা। পরে, দিউইশেন তখন আরো বুড়িয়েছে, একদিন শুনতে পেলাম — সে ডাক-পিওন হয়েছে। তবে, ও সবই কথার কথা। আসল ব্যাপার অন্য। কম্‌সমোল্‌ সভ্য বলতে তখনকার দিনে আমার ধারণা — প্রচণ্ড পরিশ্রমী এবং তুখোড় ঘোড়সওয়ার, গাঁয়ের ভিতরে সবচেয়ে জঙ্গী, জমায়েতটমায়েতে সর্বদাই কথা বলবে আর খবরের কাগজটাগজে নিষ্কম্মা আর চোরছ্যাঁচোড়দের কথা লিখবে। আমি কখনো ভাবতেই পারি নি যে ঐ দাড়িওলা চুপচাপ লোকটা কস্মিনকালেও কখনো কম্‌সোমল সংগঠনের সভ্য হতে পারে, আর তার চাইতেও যা তাজ্জবের — নিজেই যে প্রায় লেখাপড়া জানে না, সে কি না ছেলেপিলেদের মাস্টারী করেছে। নাঃ, এ ব্যাপারটা কখনো আমার মাথাতেই ঢুকতো না! খোলাখুলি বলতে গেলে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আমাদের গ্রামে চালু অসংখ্য গালগল্পের এটিও একটি। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল, না, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়...

গত হেমন্তে গ্রাম থেকে একটা টেলিগ্রাম পাই আমি।

---

* মিরাব — শস্যক্ষেত্রে জলসেচ-প্রণালীতে যে-ব্যক্তি প্রয়োজন মাফিক বাড়িয়ে-কমিয়ে জলের তোড় নিয়ন্ত্রণ করে। — সম্পাঃ

** কেৎমেন্ — কৃষিকর্মে ব্যবহৃত কোদাল জাতীয় এক প্রকার হাতিয়ার। — সম্পাঃ

যৌথখামারীদের নিজ হাতে তৈরী নতুন একটা স্কুলের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে পাড়াপড়শীরা নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে। তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললাম — যাবো, আমাদের গাঁয়ের এমন একটা আনন্দের দিনে কী করে ঘরে বসে থাকা যায়। এমন কি দিন কয়েক আগেই আমি গিয়ে পেঁছুলাম। ঘুরে বেড়াবো ভেবেছিলাম, চারদিক একটু দেখবো, নতুন কিছু ছবিটবি আঁকবো। দেখতে পেলাম নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে সকলে একাডেমিশিয়ান সুলাইমানভার অপেক্ষা করছে। আমাকে জানানো হলো যে, দু-একদিন তিনি এখানে কাটিয়ে তারপর মস্কো চলে যাবেন।

আমি জানতাম যে, এই স্বনামধন্যা মহিলা তাঁর শৈশবেই আমাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিলেন। শহরবাসী হওয়ায় আমিও তাঁর পরিচিত ছিলাম। ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে প্রৌঢ়ত্বে এসে পেঁছেছেন, শরীর ভারি হয়েছে, সুবিন্যস্ত ঝকঝকে চুলে পাক ধরেছে ঘন হয়ে। আমাদের এই বিখ্যাত পড়শীনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের কর্ত্রী, দর্শন পড়ান, একাডেমীতে কর্মরতা ছিলেন, প্রায়ই বিদেশে যেতে হয় তাঁকে। এক কথায়, তিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ; ফলে তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নি, কিন্তু প্রত্যেকবার যখনই যেখানে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, সর্বদাই আমাদের গাঁয়ের খবরাখবর বিষয়ে তিনি উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং অনিবার্যতঃই, যত সংক্ষেপেই হোক না কেন, আমার কাজ সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। একবার আমি তাঁকে বলেই ফেলেছিলাম:

'আলতিনাই সুলাইমানভা, আপনি গাঁয়ে যাওয়া-আসা করলে, পাড়াপ্রতিবেশীদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগ রাখলে কী ভালই না হতো। আপনাকে সব্বাই জানে, আপনাকে

নিয়ে কত গর্ব তাদের, কিন্তু সবই প্রায় লোকমুখে শুনে শুনে, এমনও ঘটে যে বলাবলি করে তারা — আমাদের এই নামকরা বিজ্ঞানীটি, দেখা যাচ্ছে, ছেড়েই দিয়েছেন আমাদের, নিজের কুর্কুরেউ গাঁয়ের রাস্তা ভুলেই গেছেন একেবারে।'

'নিশ্চয়ই, যাওয়ার দরকার তো বটেই,' মনমরা হাসি হেসেছিলেন আলতিনাই সুলাইমানভা। 'আমি নিজেও কতদিন ধরে ভাবছি যে একবার কুর্কুরেউ যাবো, কত যুগ যে যাই নি। আমার আত্মীয়স্বজন কেউ আর নেই ওখানে, ঠিকই। কিন্তু কথা সেটা নয়। অবশ্যই যাবো একবার, যেতে আমাকে একবার হবেই, ছেলেবেলার জায়গাগুলোর জন্যে বড্ড মন কেমন করে।'

স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রায় শুরু হয় হয় এমন সময় একাডেমিশিয়ান সুলাইমানভা গাঁয়ে এসে পেঁৗছেছিলেন। যৌথখামারীরা জানালা দিয়ে তাঁর গাড়ি দেখতে পেয়েছিল আর ভিড় করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলে। চেনা এবং অচেনা, বৃদ্ধ এবং তরুণ — সকলেরই ইচ্ছে গিয়েছিল একবার করমর্দন করতে। হয়তো-বা আলতিনাই সুলাইমানভা এরকম অভ্যর্থনা আশা করেন নি; আমার মনে হয়েছিল, তিনি একটু অপ্রস্তুতও হয়েছিলেন বুঝি। বারবার বুকের উপর হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে তিনি অভিবাদন করেছিলেন জনতাকে এবং বেশ কষ্টের সাথেই ভিড় ঠেলে মঞ্চে গিয়ে উপবেশন করেছিলেন।

কোনো সন্দেহ নেই, আলতিনাই সুলাইমানভা তাঁর জীবনে বহু সভা-সম্মেলনেই গেছেন এবং একাধিকবার গেছেন, আর নিঃসন্দেহে সর্বদাই সে-সব জায়গায় সম্মান ও আনন্দই লাভ করেছেন, কিন্তু এখানে, এই সাধারণ গ্রাম্য একটা স্কুলে, স্বজনপ্রতিবেশীর আন্তরিকতা এত আলোড়িত করলো তাঁকে,

এত আবেগভারাতুর, যে চোখের জল লুকোতে বড়ো কষ্ট করতে হলো তাঁকে।

অনুষ্ঠানে ভাষণপর্ব শেষে পাইওনীয়াররা তাদের প্রিয় অতিথির গলায় লাল রুমাল* বেঁধে দিলো, উপহার দিলো ফুল এবং নতুন স্কুলের ভিজিটর্স বুক তাঁর বাণী দিয়েই শুরু করলো। এর পরে ছিল স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৈরী সৌখিন দলের গীতানুষ্ঠান, খুবই চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দোজ্জ্বল; আর তারপর স্কুলের পরিচালক আমাদের — অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও যৌথখামারের সক্রিয় কর্মীদের — ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ওখানে।

আর সেখানে — আলতিনাই সুলাইমানভার আগমনে আনন্দ প্রকাশের ভাষা যেন তারা খুঁজে পেল না। অলংকৃত গালিচা সবচেয়ে সম্মানীয় আসন তাঁকে দেয়া হলো বসবার জন্যে, যত রকমে সম্ভব নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে তারা চেষ্টা করে গেল। এরকম অবস্থায় সব সময়েই যা হয়ে থাকে, হৈচৈতে ভরে গেল সেখানটা, অতিথিরা সব সোৎসাহে গল্প করতে লাগলেন, বারংবার টোস্ট প্রপোজ করতে লাগলেন। এমন সময় স্থানীয় একটি ছেলে ঘরে ঢুকে বাড়ির কর্তাকে এক গোছা টেলিগ্রাম দিলো। হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো টেলিগ্রামগুলো: নতুন স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা পাড়াপড়শীদের অভিনন্দন জানিয়েছে।

'শোন তো বাপু, টেলিগ্রামগুলো আমাদের বুড়ো দিউইশেন নিয়ে এসেছে, তাই না?' স্কুলের পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।

---

* যুব সংগঠনের সভ্য রূপে পাইওনীয়াররা প্রতীকচিহ্ন হিসেবে গলায়, সাদা জামার উপরে, লাল রুমাল পরে থাকে। — সম্পাঃ

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ছেলেটি। 'বলছিল যে, সারাটা পথ চাবুক মারতে মারতে এসেছে ঘোড়াটাকে যাতে সভার আগে আসতে পারে, সবাই পড়তে পায়। একটুখানি দেরী করে ফেলেছে আমাদের আক্সাকোল, খুব মন খারাপ তার।'

'তা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন শুধু শুধু, ঘোড়া থেকে নেমে আসুক। ডেকে আন তো!'

ছেলেটি দিউইশেনকে ডেকে আনতে বেরিয়ে গেল। আলতিনাই সুলাইমানভা আমার পাশেই বসেছিলেন, জানি না কী কারণে চমকে উঠলেন একবার, আর কেমন-যেন একটু অদ্ভুতভাবে, যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, কোন্ দিউইশেনের কথা হচ্ছে।

'ও আমাদের খামারের পিওন, আলতিনাই সুলাইমানেভা। বুড়োকে কি আপনি চেনেন না কি?'

দ্ব্যর্থবোধকভাবে মাথা নাড়লেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক সে-মুহূর্তেই ওদিকে জানালার কাছে খটাখট শব্দে কে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল; ছেলেটি ফিরে এসে খবর দিলো গৃহস্বামীকে:

'আমি ডাকলাম স্যার, কিন্তু সে চলে গেল, বললো — আরো চিঠি তাকে বিলি করতে হবে।'

'করুক বিলি, অযথা ধরে রাখা কেন! পরে বুড়োদের কাছে বসে গল্প করতে পারবে'খন।' একটু বিরক্ত হয়েই কে যেন বলে উঠলো।

'ওহ, আমাদের দিউইশেনকে চেনো না! একেবারে নিয়মের দাস। যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ ক্ষান্তি নেই।'

'খাঁটি কথা, অদ্ভুত লোক বটে! যুদ্ধের পর তো হাসপাতাল থেকে বেরুলো, ঘটনাটা ইউক্রেনের, তারপর সেখানেই বসবাস শুরু করলো। বছর পাঁচেক হলো মাত্তর ফিরে এসেছে। বলে

যে, দেশের মাটিতে মরার জন্যে ফিরে এসেছে। সারা জীবন এরকম একাই কাটিয়ে দিলো...'

'তবু এখন একটিবার এলেই পারতো ও... যাক্‌গে, কী করা!' হাতের এক ভঙ্গি করলেন গৃহকর্তা।

'আচ্ছা, কারো মনে আছে, আমরা কিন্তু সেই কোন্‌কালে দিউইশেনের পাঠশালেই পড়তে যেতাম।' গ্রামের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের একজন তাঁর গ্লাস তুলে ধরলেন, 'আর এদিকে নিজে সে বর্ণপরিচয়ের সব ক'টা অক্ষরই চিনতো না।' বক্তা ব্যক্তিটি এ-কথা বলেই চোখ টিপে মাথা নাড়াতে লাগলেন। সব মিলিয়ে তাঁর কথায় বিস্ময় ও ব্যঙ্গের ছোঁয়া লাগলো।

'যা বলেছেন, ডাহা খাঁটি।' গলায় গলা মিলিয়ে বেশ কয়েকটি কণ্ঠ শোনা গেল।

হাসির রোল উঠলো চারদিক থেকে।

'আর বলো কেন? সে সময় দিউইশেন কত কী-ই না করতে চেয়েছে! আর আমরা কী সিরিয়াসলিই না তাকে পণ্ডিত ভাবতাম!'

হাস্যরোল একটু প্রশমিত হলে ভদ্রলোক তাঁর সুরাপাত্র তুলে ফের শুরু করলেন:

'যা বলছিলাম। আর এখন আমাদের কালে যারা বেড়ে উঠেছে তাদের দিকে একবার তাকাও দেখি। একাডেমিশিয়ান আলতিনাই সুলাইমানভা আমাদের সারা দেশে কী রকম বিখ্যাত হয়েছেন। এখন আমাদের প্রায় সকলেই মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেছে, তাছাড়া আরো কত জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, ভাবো তো। আমরা যে আজ আমাদের গাঁয়ে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খুললাম, কেবল এই একটা ব্যাপারই দেখ না, প্রমাণ পাবে আমাদের জীবন যে কী সাংঘাতিকভাবে পাল্টে গেছে। আচ্ছা, হয়েছে — এবার আসুন তো ভাইসব, একটু পান করা

যাক এই আশায় যে, আমাদের কুর্কুরেউ গ্রামের ছেলেমেয়েরা সব সময়েই যেন তাদের কালের সেরা লোক হয়!'

পুনরায় গুঞ্জন উঠলো ঘরময়, পরম সৌহার্দ্যে সবাই টোস্ট করলো; শুধু এক আলতিনাই সুলাইমানভা আরক্তিম হলেন, কেমন একটু হতবিহ্বল, মদের গ্লাস একবারটি খালি ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। কিন্তু উৎসবমুখর লোকজন, গালগল্পে মশগুল, ভালো করে লক্ষ্যই করলো না তাঁর এ অবস্থা।

আলতিনাই সুলাইমানভা বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। পরে যখন অতিথিরা ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় এলেন একবার, আমি দেখলাম যে তিনি সকলের থেকে আলাদা একা দাঁড়িয়ে আছেন আরিকের* এক পাশে, নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন টিলার দিকে, সেখানটায়, যেখানে হেমন্তে হলুদ হয়ে আসা পপলার আন্দোলিত হচ্ছে বাতাসে। সূর্য অস্তগামী — দূরে বিস্তীর্ণ গোধূলিকালীন স্তেপে লাইলাক রঙের নক্সা ফুটে আছে যেন। সূর্য তার ম্লান আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে ওখান থেকে, পপলারের শীর্ষদেশ ম্লান করুণ রক্তিমাভায় রঞ্জিত।

আমি আলতিনাই সুলাইমানভার কাছে এগিয়ে গেলাম।

'এখন পাতা ঝরবে ওদের। আপনি বসন্তে ফুলের মরশুমে এই দুটো পপলার যদি দেখতেন!' তাঁকে বললাম আমি।

'আমি তো সে কথাই ভাবছি।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন আলতিনাই সুলাইমানভা, তারপর একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, নিজেকেই উদ্দেশ্য করে যেন: 'ঠিকই, জীবন্ত সবারই একটা নিজস্ব বসন্ত আছে, নিজস্ব হেমন্তও।'

---

* আরিক — নালা। নর্দমা অর্থে নয়। স্বচ্ছসলিলা এই নালাগুলো জলসেচের ব্যাপারে যেমন কাজে লাগে, তেমনি প্রখর মধ্য-এশীয় রৌদ্রতাপে জনবসতিগুলো ঠাণ্ডা রাখে। — সম্পাঃ

মৃদু বলিরেখাঙ্কিত তাঁর চোখের চারপাশ, ম্লান তাঁর মুখাবয়ব — এদের উপর করুণ, চিন্তাক্লিষ্ট একটা ছায়া ভেসে সরে গেল। খুবই মেয়েলি ধরনের শোকার্ত দৃষ্টিতে পপলার দুটোর পানে তাকিয়ে রইলেন তিনি। হঠাৎ মনে হলো আমার, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একাডেমিশিয়ান সুলাইমানভা নন, একজন সামান্য সাধারণ কির্গিজ রমণী, কি সুখে কি দুঃখে বড়োই সাদামাটা। এই বৈজ্ঞানিক মহিলা, মনে হলো, সে মুহূর্তে ফিরে গেছেন নিজ শৈশবে — সেই শৈশব, আমাদের গানে যেমন আছে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়চূড়ো থেকে ডাকলেও যে কখনো সাড়া দেয় না। মনে হলো, পপলারের দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু-যেন বলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই, নিশ্চিতঃই অন্যতর কিছু ভাবলেন, এতক্ষণ হাতে ধরে রেখেছিলেন যে চশমা সবেগে ফের সেটা চোখে দিলেন তিনি।

'মস্কোর ট্রেন এখানে পেঁছিয়, মনে হয়, এগারোটায়, না?'

'হ্যাঁ, রাত এগারোটায়।'

'তার মানে, গোছগাছ শুরু করতে হয় এবার।'

'সে কী, এত হঠাৎ করে? আলতিনাই সুলাইমানভা আপনি যে বলেছিলেন বেশ ক'টা দিন কাটিয়ে যাবেন এখানে। লোকে আপনাকে ছাড়বে না, দেখবেন।'

'না, না, আমার জরুরী কাজ পড়ে আছে। আমায় যে করেই হোক এখন বেরুতেই হবে।'

পাড়াপ্রতিবেশীরা কত অনুরোধই না করলো, কত গভীরভাবেই না নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করলো তারা কিন্তু আলতিনাই সুলাইমানভার দয়া হলো না।

অন্ধকার হয়ে আসছে তখন। দুঃখিত গ্রামবাসী তাঁকে গাড়িতে তুলে দিলো, কথা আদায় করে নিল যে পরের বার

এলে কমপক্ষে এক সপ্তাহ কিংবা তার ওপরে। আলতিনাই সুলাইমানভাকে ট্রেনে উঠিয়ে বিদায় জানাবার জন্যে আমি স্টেশান অবধি গেলাম।

আলতিনাই সুলাইমানভা এমন তাড়াহুড়ো করলেন কী জন্যে? গ্রামবাসীদের মনঃক্ষুণ্ণ করা — বিশেষভাবে এমন একটি দিনে, আমার কাছে স্রেফ অবিবেচনা বলে মনে হয়েছিল। রাস্তায় বেশ কয়েকবারই তাঁকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়েছিল আমার, কিন্তু সাহস হলো না। ভয় এ-জন্যে নয় যে, কায়দা করে কথাটা উত্থাপন করতে পারবো না; আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি এ ব্যাপারে কিচ্ছুটি বলবেন না। সারাটা পথ তিনি চুপ করে রইলেন, কিছু একটা নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন যেন।

তবু, স্টেশানে তাঁকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম:

'আলতিনাই সুলাইমানভা, আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন, কেউ কি আঘাত দিয়েছে আপনাকে?'

'না, না, কী যে বলো! কী করে ভাবতে পারলে অমন? বিরক্ত হবো কার ওপর? হলে নিজের ওপরই। তা-ই, রাগ করতে হলে নিজের ওপরই করতে হয় হয়তো।'

এরপর চলে গিয়েছিলেন আলতিনাই সুলাইমানভা। আমিও শহরে ফিরলাম, আর তার দিন কয়েক পরে হঠাৎ করে তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলাম একটা। তিনি যে-রকম ভেবেছিলেন তার চেয়েও বেশি দিন মস্কোয় থাকবেন, এ-কথা জানিয়ে আলতিনাই সুলাইমানভা লিখেছেন চিঠিতে:

'আমার বহু দরকারী ও জরুরী করণীয় কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি সব একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে তোমাকে এ চিঠি লিখতে মনস্থ করলাম... আমি যা লিখছি তা যদি তোমার কাছে তাৎপর্যময় মনে হয়, তাহলে আমার একান্ত অনুরোধ —

যে-কাহিনী আমি বলতে যাচ্ছি, লোকে যাতে তা জানতে পারে, পারলে তার একটা কিছু ব্যবস্থা কোরো। আমার ধারণা, আমাদের গাঁয়ের লোকজনেরই শুধু নয়, সকল লোকেরই — বিশেষত তরুণদের তা কাজে লাগবে। বহু ভাবনাচিন্তার পরে আমি এই সিদ্ধান্তেই এসেছি। জনগণের কাছে এ আমার স্বীকারোক্তি। আমার ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে। যত বেশি লোক জানবে এ-ব্যাপারে, আমার বিবেকদংশন ততই কমবে। পাছে আমি কোনো লাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই, সে-ভয় কোরো না। কিচ্ছুটি গোপন করো না...'

তাঁর চিঠির ঘোরেই বেশ ক'টা দিন কেটে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত আলতিনাই সুলাইমানভার নিজের জবানীতে সবটুকু বলা ছাড়া আর তো কোনো উৎকৃষ্ট পন্থা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২৪ সালে। হ্যাঁ, ঠিক ঐ বছরই...

এখন যেখানে আমাদের যৌথখামার, ওখানে তখন ছিল গরিব চাষাভুষোর একটা ছোটো বসতি। সে-সময়ে আমার বয়েস বছর চৌদ্দর মতো হবে, আমার পরলোকগত পিতার এক চাচাত ভাইয়ের বাড়িতে মানুষ হচ্ছিলাম আমি। আমার মা-ও বেঁচে ছিলেন না।

সেবার হেমন্তের শুরুতে, একটু অবস্থাপন্নেরা পাহাড়ের ওপরে তাদের শীতের ডেরায় চলে যাবার ঠিক পরপরই আমাদের গাঁয় ফৌজী কোট পরে একটা অচেনা লোক এসেছিল। তার কোটটা আমার মনে আছে, কেননা সেটা কী-কারণে জানি না কালো বনাত দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। রাস্তা থেকে দূরে, পাহাড়ের পদপ্রান্তে নিশ্চুপ আমাদের গ্রামে

সরকারি ছাপ মারা সেই পোষাক পরা লোকটির আবির্ভাব রীতিমতো একটা ঘটনা হয়ে উঠেছিল।

প্রথমে লোকে বলাবলি করেছে যে, সৈন্যবাহিনীতে কম্যান্ডার ছিল সে, আর সেজন্যে গ্রামেও নিশ্চয়ই সে বেশ হোমরাচোমরা কেউ হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল, সে কম্যান্ডার জাতীয় কোনো কিছু ছিল না তো বটেই, এমন কি আমাদের ঐ তাশ্‌তান্‌বেকের ছেলে সে — যে কি না বহু বছর আগে ক্ষিধের জ্বালায় গাঁ থেকে চলে গিয়েছিল রেলের কাজ নিয়ে, তারপর একদম বেপাত্তা। আর এই লোকটি তারই ছেলে — দিউইশেন, এ-গাঁয়ে এসেছে একটা ইশকুল খুলে বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবে বলে।

সে-যুগে ও-ধরনের শব্দ — 'ইশকুল', 'লেখাপড়া', ওগুলো ছিল একেবারে আনকোরা, লোকে ভালমতো বুঝে উঠতে পারতো না জিনিসগুলো। গুজবটা বিশ্বাস করলো কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার বুড়োদের গালগপ্পো মনে করে উড়িয়ে দিলো কথাটা। আর সত্যি বলতে, ইশকুলটিশকুলের কথা ভুলেই যেত সবাই, যদি না তড়িঘড়ি করে একটা মিটিং ডাকা হতো। আমার চাচা তো বহুক্ষণ ধরে সমানে বক্‌বক্‌ করলো: 'হুঁঃ, বলি মিটিং-ফিটিং আবার কিসের! যত আজেবাজে ব্যাপারে তোমার কাজ পণ্ড করা, যত্তো সব!' পরে অবশ্য ঠিকই নিজের ঘোড়াটায় জিন পরিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল মিটিংয়ে, ঠিক সেভাবে গৃহস্বামীদের যেমনটি মানায়। আর তার পিছনপিছন দৌড়ুলো পাড়াপড়শীর ছেলেমেয়েরা, আর সেই সঙ্গে আমিও।

যখন আমরা হাঁপাতে-হাঁপাতে টিলাটার উপরে, সাধারণত যেখানে মিটিং বসে, সেখানটায় গিয়ে উঠলাম তখন ঘোড়সওয়ারি আর পায়ে হেঁটে আসা লোকগুলোর সামনে

ঐ কালো কোটপরা ফ্যাকাসে চেহারার লোকটা তার বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। আমরা তার কথা ভালোমতো শুনতে পাচ্ছিলাম না, তাই আরেকটু কাছে আমরা এগিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই ছেঁড়াখোঁড়া একটা ফারকোট গায়ে এক ঝুনো বুড়ো ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে যেন জেগে উঠে ধাঁ করে বাধা দিলো তার বক্তৃতায়।

'বলি বাপু, শোনো,' তোতলাতে তোতলাতে তড়বড় করে বলতে লাগলো সে, 'আগে তো মোল্লারাই ছেলেপুলেগুলোকে পড়াশুনো শেখাতো, আর তোমার বাপকেও তো আমরা ভালই জানি বাছা: তারও তো সেই আমাদের মতোই তেমনিই সম্বল। তা, এখন বল্ দেখি বাপু, তুই কেমন করে ঐ মোল্লাদের বিদ্যেটা শিখে ফেল্‌লি, একটু শুনি আমরা।'

'আমি তো মোল্লা নই, আক্‌সাকাল, আমি কম্‌সমোলের সদস্য,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো দিউইশেন, 'এখন থেকে ছেলেপুলেরা আর মোল্লাদের কাছে পড়বে না, পড়বে মাষ্টারের কাছে। পল্টনে থাকার সময় আমি লিখতে পড়তে শিখেছি, আর তার আগেও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানতাম আমি। এখন দেখুন, কেমন ধারা মোল্লা আমি!'

'তা ভালো, তবে কিনা...'

'শাবাশ্!' সমস্বরে সবাই প্রশংসা করে উঠলো।

'ব্যাপারটা এ-ই, কম্‌সমোল্ সংগঠন থেকেই আমাকে পাঠানো হয়েছে, আপনাদের ছেলেপুলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। আর তার জন্যে একটা জায়গাটায়গা তো দরকার। একটা ইশকুলঘর তোলার ইচ্ছে আছে আমার, অবশ্য আপনাদের সকলের সাহায্য নিয়েই, ঐ যে টিলাটায় যেখানে পুরনো আস্তাবল আছে, ওখানটায়। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী, বলুন।'

সকলে আমতা-আমতা করতে লাগলো, যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সবাই: কোন্ দিকে তাদের ঠেলে দিচ্ছে সে, এই নবাগত আগন্তুক? প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলো হল্লাবাজ সাতিম্কুল্; তার একগুঁয়ে মেজাজের জন্যে এ-নামেই ডাকা হতো তাকে। ঘোড়ার উপর বসে বসেই এতক্ষণ ধরে সে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল আর মাঝেমধ্যে যখন-তখন দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্পিচ্ করে থুতু ফেলছিল।

'রোসো, রোসো, ওহে ছোকরা!' সাতিম্কুল্ বলে উঠলো, কুঁচকে উঠলো তার চোখ, ঠিক যেন সে শরসন্ধান করছে এমনিভাবে। 'তার চেয়ে বরং আগে বল তো হে, বলি এতে আমাদের দরকারটা কি, মানে এই ইশ্কুলে?'

'দরকার কী, মানে?' একেবারে হকচকিয়ে গেল দিউইশেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!' ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠলো কে যেন।

আর তৎক্ষণাৎ ফের সবাই কথাবার্তা বলা শুরু করে দিলো একসঙ্গে, মহা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল।

'কোন্ আদ্যিকাল থেকে আমরা তো চাষবাস করেই খাচ্ছি, এক কেৎমেন্ই আমাদের খোরাক জুগিয়ে আসছে। আমাদের ছেলেপুলেরাও ঐ একইভাবে জীবন কাটাবে, লেখাপড়ায় কী কাঁচকলাটা হবে শুনি! অফিসারটফিসার হতে গেলে লেখাপড়ার দরকার হয়, তা আমরা বাপু সাদামাটা লোক। এটা ওটা করে আমাদের মাথা বিগড়ে দিও না বলছি।'

সোরগোল কমে এলো ধীরে ধীরে।

'আপনাদের ছেলেপুলেকে লেখাপড়া শেখানোর বিপক্ষে কি সত্যিই আপনারা?' চারপাশে লোকজনদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হতভম্ব দিউইশেন এই প্রশ্নটা করে বসলো।

'বিপক্ষেই যদি হই, এ্যাঁ, বলি — তাহলে কি জোর খাটাবে না কি? সে সব দিন চলে গেছে। আমরা এখন পুরোপুরি স্বাধীন, বুঝেছ, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে থাকবো!'

দিউইশেনের মুখ থেকে সব রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে সে তার কোটের আংটা হেঁচকা টানে খুলতে লাগল, জামার পকেট হাতড়ে চার-ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বের করে আনলো, দ্রুত খুলে ধরলো কাগজটা, তারপর মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগলো:

'তার মানে, এই-যে, এই-যে কাগজটা, এর বিরুদ্ধে আপনারা — এতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার কথা বলা হয়েছে, সোভিয়েত সরকারের রীতিমতো সীল দেয়া, — এর আপনারা বিরুদ্ধে? বলি, এই যে ক্ষেতখামার, জল, আপনাদের স্বাধীনতা — বলি, এসব কে দিয়েছে আপনাদের? ঠিক আছে, সোভিয়েত সরকারের বিপক্ষে কারা আছেন, বলুন এবার? কৈ জবাব দিন!'

'জবাব দিন' কথাটা সে এত তীক্ষ্মভাবে, প্রচণ্ড ক্রোধে, সজোরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল যে, তা যেন তীক্ষ্ম শরের মতো সেই হৈমন্তী নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে ছুটে গিয়েছিল, প্রতিধ্বনি উঠেছিল তার পাহাড়ের গায়ে গায়ে। কারো মুখ থেকে একটা কথা সরলো না। সকলে মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলো।

'আমরা গরিবগুর্বো লোক,' দিউইশেন আস্তে আস্তে ফের বলতে শুরু করলো। 'চিরটাকাল আমাদের দাবিয়ে রেখেছে পায়ের নিচে, হেনস্তা করেছে। একেবারে আঁধারের মধ্যে পড়ে থেকেছি আমরা এতদিন। আর এখন, সোভিয়েত সরকার চায় যে, আমরা একটু আলোর মুখ দেখি, আমরা লিখতে

শিখি, পড়তে শিখি। আর তার জন্যে দরকার লেখাপড়া শেখানো ছেলেমেয়েদের...'

দিউইশেন চুপ করলো, উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে রইলো। আর তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ছেঁড়াখোঁড়া ফারকোট পরা, যে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে মোল্লা হলো কী করে, সে বিড়বিড় করে আপোষের ভঙ্গিতে বলতে লাগালো:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, লেখাপড়া শেখাও না বাপু, এতই যদি মন চায়... আমরা কি আর আইন-টাইনের বিরুদ্ধে না কি!'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো আপনাদের সাহায্য চাইছি। পাহাড়ের ওপরে বাইদের ঐ আস্তাবলটা মেরামত করা দরকার, নদীর ওপরে একটা পুল দিতে হবে, তারপর ইশকুলের জন্যে জ্বালানি কাঠ...'

'রয়ে-সয়ে, একটু রয়ে-সয়ে দ্জিগিত্, বড়োই তড়বড় করো হে তুমি!' একগুঁয়ে সাতিম্কুল্ থামিয়ে দ্যায় দিউইশেনকে।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ করে থুতু ফেলে সে, যেন কোনো লক্ষ্যভেদ করতে যাচ্ছে এমনভাবে ফের সে তার চোখ দুটো কুঁচকে আনে।

'খু-ব তো পাড়া মাৎ করে দিলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে: "ইশকুল খুলবো!" কিন্তু ছিরি যা দেখছি — তোমার না আছে একটা ফারকোট, না একটা চাপবার ঘোড়া, না এক চিলতে চাষবাসের জমি, এমন কি জলজ্যান্ত গরুছাগলও যদি বাঁধা থাকতো উঠোনে! বলি দোস্ত, বেঁচে থাকবে কী খেয়ে ভাবছ শুনি? অন্য লোকজনের ঘোড়াটোড়া চুরিচামারি করে বুঝি... তবে দুঃখের কথা, ওসব তো আমাদের নেই। ঘোড়া যদি কারো থেকেও থাকে তো সেগুলোও — পাহাড়ে।'

দিউইশেনের ইচ্ছে হলো একটা কড়া জবাব দ্যায়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিল সে, মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলো:

'টিকে থাকবো কোনো রকমে। মাইনে পাবো আমি।'

'আ-আ, এই রকম কথা!' সাতিম্‌কুল্‌ খুব খুশি নিজের ওপরে, সে জিনের ওপরে বিজয়ীর ভঙ্গিতে টান টান হয়ে বসে রইলো। 'এতক্ষণে বোঝা গেল স-ব। দ্‌জিগিত্‌, তুমি বাপু নিজেই সব কাজ করো গে, নিজের মাইনেয় ছেলেপিলেদের পড়াও গে। সরকারি ট্যাঁকশালে পয়সার তো আর কমতি নেই। আমাদের বাপু একটু শান্তিতে থাকতে দাও, তাঁর ইচ্ছায় আমাদের নিজেদের চিন্তারই ব'লে থই নেই...'

এই কথাগুলো বলেই সাতিম্‌কুল্‌ তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। অন্যেরাও তার পিছু নিল। আর দিউইশেন একা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেভাবেই, হাতে সেই কাগজখানি ধরা। বেচারা দিউইশেন, বুঝতেই পারলো না সে এখন কী যে করবে...

আমার খুব খারাপ লেগেছিল দিউইশেনের জন্যে। পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি, যতক্ষণ না আমার চাচা পাশ দিয়ে যেতে যেতে খেঁকিয়ে উঠেছিল আমাকে দেখে:

'আরে, তুই! হতচ্ছাড়ী কোথাকার, এখানে কি রে? হাঁ করে কী দেখা হচ্ছে এখানে, এ্যাঁ? যা, বাড়ি যা শিগ্‌গির!' আমি ততক্ষণে সবাইকে নিয়ে তো দৌড়। — 'ঈশ্‌, কান্ড দ্যাখো দেখি, ছেলেপুলেগুলোও কি না শেষতক মিটিংয়ে আসছে!'

পরের দিন যখন আমরা মেয়েরা জল আনতে গেছি, তখন নদীর ধারে দিউইশেনের সাথে আমাদের দেখা। সে পায়ে

হে'টে নদী পার হচ্ছে, সঙ্গে একটা বেলচা, কেৎমেন্, কুড়ুল আর হাতে-ধরা কবেকার কোন্ পুরনো একটা বালতি।

ও-দিন থেকে প্রত্যেক সকালে দেখা যেত কালো কোট পরা দিউইশেনের সেই একক নিঃসঙ্গ চেহারা পাহাড় বেয়ে সেই পরিত্যক্ত আস্তাবল পানে উঠে যাচ্ছে। সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এলে তবে নিচে গ্রামে যাওয়ার জন্যে নামতো দিউইশেন। প্রায়ই তাকে দেখা যেত শুকনো ঘাস কি খড় বোঝা বেঁধে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকেরা দূর থেকে তাকে দেখেই রেকাবে পা রেখে উ'চু হয়ে খাড়া হয়ে উঠতো, ভুরুর ওপরে হাত তুলে চোখ আড়াল করে দাঁড়াতো, আশ্চর্য হয়ে কথা বলাবলি করতো তারা:

'আরে, এটা আমাদের দিউইশেন মাষ্টার না — বোঝা বয়ে নিচ্ছে?'

'হ্যাঁ, সে-ই তো।'

'আহা, বেচারি। দেখা যাচ্ছে, মাষ্টারি করাও বড়ো সহজ কাজ নয়।'

'তা নয় তো কি! তাকিয়ে দ্যাখো দেখি কী বোঝাটাই না তুলেছে, বাই-দের চাকরবাকরের চেয়ে মোটেই কম নয়।'

'আর তার বক্তিমা শুনে দেখো একবার, বাস্‌রে — সে-ই বা কে আর...'

'তা বটে, তবে তার কারণ হলো, ওর কাছে সীলমোহর মারা কাগজ আছে যে: ওটার ক্ষমতাতেই তো সব।'

একদিন হয়েছে কি, ঝুলিভর্তি শুকনো গোবর কুড়িয়ে আমরা যখন ঘরে ফিরছি — গাঁয়ের পিছন দিকে পাহাড়ে প্রায়ই এগুলো কুড়োতে যেতাম আমরা — তখন ইশকুলের রাস্তায় মোড় ফিরলাম: মাষ্টারসাহেব কী করছে দেখাই যাক্ না মজা করে। মাটির এই চালাঘরটি এককালে ছিল বাই-য়ের

আস্তাবল। বাচ্চা সহ মাদী ঘোড়াগুলো এখানে শীতকালে রাখা হতো। সোভিয়েত রাজ চালু হবার পরে বাই-রা সব কোথায় কেটে পড়েছে; কিন্তু আস্তাবলটি সেভাবেই থেকে গেছে ওখানটায়। কেউ আসত না এখানে, জায়গাটায় চারপাশে শেয়ালকাঁটা গজিয়ে ভরে উঠেছিল। এখন আগাছাগুলো সব গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে, একপাশে জড়ো করে রাখা আছে সেগুলো, সামনের জমিটা পরিষ্কার করা হয়েছে। বাদলায় ভেঙে-যাওয়া, ধ্বসে পড়া দেয়াল মাটি দিয়ে লেপে ঠিকঠাক করা হয়েছে, দরজাটা যেটা হেলে থাকতো সব সময়, চিরকাল ধরে একটা কব্জায় লড়লড় করে ঝুলতো, দেখা যাচ্ছে মেরামত হয়ে যথাস্থানে অবস্থান করছে সেটা।

একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে আমরা আমাদের ঝুলি মাটিতে রেখেছি মাত্র, এমন সময়ে দিউইশেন দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো, কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে সে। আমাদের দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল, তারপর মুখ থেকে ঘাম মুছে নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে অভ্যর্থনাজ্ঞাপক হাসি হাসলো সে।

'এই যে খুকীরা, তোমরা কোত্থেকে?'

আমাদের ঝোলাঝুলির পাশে আমরা বসে পড়েছিলাম, হতচকিত হয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলাম। দিউইশেন বুঝেছিল যে, লজ্জায় আমরা চুপ করে আছি, আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে মজা করে চোখ টিপলো:

'আরে, তোমাদের ঝুলি তো দেখছি তোমাদের চেয়ে বড়ো। খুব ভালো কথা, খুকীরা, তোমরা যে এখানে বেড়াতে এসেছ; এখানে তো তোমরাই পড়বে। তোমাদের পাঠশালা — তা, তৈরী হয়ে গেছে বলা যায়। ঘরের কোণে এই মাত্তর আমি একটা চুলো কোনোরকমে তৈরী করে এলাম, তাতে আবার একটা

চিমনীও লাগিয়ে ফেলেছি, দ্যাখো না কেমন দেখাচ্ছে! এখন কেবল বাকি — শীতের জন্যে জ্বালানি জোগাড় করা, নাঃ ঘাবড়াবার কিছু নেই — চারপাশে মেলা শুকনো ঘাস পাওয়া যায়। আমরা বসার জন্যে মেঝেয় খড় বিছিয়ে দেবো, ব্যস, তারপর পড়াশুনো শুরু হয়ে যাবে। কী বলো তোমরা — কি, পড়তে চাও তো, পাঠশালে আসবে তো, না কি?'

আমার বন্ধুদের চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলাম আমি, ফলে আমারই জবাব দেয়া উচিত মনে হলো:

'চাচী আসতে দিলে আসবো,' আমি বললাম।

'আসতে দেবে না কেন, নিশ্চয়ই আসতে দেবে। তা তোমার নাম কি বলো তো?'

'আল্‌তিনাই,' আমি জবাব দিই, চট করে হাতের তালু দিয়ে হাঁটুটা ঢেকে ফেলি আমি, সেখানে কাপড়টায় একটা ফুটো দেখা যাচ্ছিল।

'আল্‌তিনাই — বাঃ, খাশা নাম,' এত সুন্দরভাবে হাসলো সে যে আমি বুকের মধ্যে একধরনের উষ্ণতা অনুভব করলাম। 'তুমি কাদের মেয়ে গো?'

চুপ করে রইলাম আমি। কারুর মনে আমার জন্যে একটা করুণা জেগে উঠলে ভাল লাগতো না।

'কেউ নেই ওর। চাচার কাছে থাকে,' আমার সঙ্গীরা জবাব দেয়।

'আহ্‌-হা, তাই না কি! ঠিক আছে আল্‌তিনাই,' আমার দিকে চেয়ে ফের হাসে দিউইশেন, 'তুমি আর সবাইকে জড়ো করে নিয়ে এসো ইশ্‌কুলে, কেমন? আর, এই যে সব খুকীরা, তোমরাও এসো কিন্তু।'

'ঠিক আছে, চাচাজান।'

'আমাকে মাষ্টার সা'ব বলে ডেকো। ইশ্‌কুল দেখবে না

কি তোমরা? চলে এসো ভেতরে, ভয় পাওয়ার কি আছে!'

'না, না, আমরা এখন চলে যাবো, ঘরে যেতে হবে আমাদের,' লজ্জা পেয়ে সবাই বলে ওঠে।

'ঠিক আছে, জলদি বাড়ি যাও। পরে যখন পড়তে আসবে তখনই দেখো। আমাকে আরেকবার শুকনো ঘাস কাটবার জন্যে যেতে হবে, এক্ষুনি আবার আঁধার হয়ে যাবে।'

দড়ি আর কাস্তে নিয়ে দিউইশেন মাঠের দিকে হাঁটা শুরু করলো। আমরাও উঠে পড়লাম, পিঠে ঝুলি বাঁধা আমাদের, টুক্‌টুক্‌ করে পা বাড়ালাম গাঁয়ের দিকে। হঠাৎ ধাঁ করে মাথায় আমার একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

'এই ভাই, তোরা দাঁড়া!' বন্ধুদের পানে আমি চেঁচিয়ে উঠি। 'চ' ভাই, আমাদের ঘুঁটেগুলো সব পাঠশালে ঢেলে দিয়ে আসি, তাহলে শীতের জন্যে আরো বেশি জ্বালানি হবে।'

'তা, খালি হাতে ঘরে ফিরবো? এঃ, কি বুদ্ধি দ্যাখো!'

'না, তা কেন, আমরা ফিরে গিয়ে আর খানিকটা কুড়িয়ে নেবো।'

'নাঃ, দেরি হয়ে যাবে, বাড়িতে বকবে।'

তারপর আমার জন্যে একটুও না দাঁড়িয়ে মেয়েগুলো সব ঘরের দিকে হনহন করে চলে গেল।

আমি এখন অবধি ঠিক বুঝতে পারি না, সেদিন অমন কাজ আমি করেছিলাম কী জন্যে। হতে পারে, মেয়েগুলো আমার কথায় কান না দেয়ায় খুব অভিমান হয়েছিল, সে জন্যে নিজের খুশিমতো কাজ করতে চেয়েছিলাম। এও হতে পারে যে, ছোটোবেলা থেকে আমার স্বাধীনতা, আমার সব সাধ-আহ্লাদ ধমকানির তলায়, বর্বর কিছু লোকের শাসনের তলায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, ফলে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল এই অচেনা লোকটিকে কোনো-না-কোনো ভাবে একটু কৃতজ্ঞতা

জানাই — সত্যি বলতে কি — ওর ঐ হাসিটুকুর জন্যে, আমার হৃদয়ে উষ্ণতা অনুভব করেছিলাম আমি তার হাসির জন্যে, সে যে আমাকে সামান্য একটুও বিশ্বাস করেছিল, আদর করে একটু কথা বলেছিল, সেজন্যে। এতদিনে আমি নিশ্চিতরূপে বুঝে গেছি, এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে, আমার সুখদুঃখ সবকিছু নিয়ে আমার আসল জীবন শুরু হয়েছিল ঐ দিনটাতেই, ঐ এক ঝুলি ঘুঁটের কাহিনী থেকেই। আমি যে এমন বলছি তার কারণ, ঐ দিনটিতেই আমি সেই সর্বপ্রথম আমার জীবনে কোনো কিছু না ভেবেচিন্তে, কোনো শাস্তির তোয়াক্কা না করে, যা করা সঙ্গত মনে করেছিলাম সে অনুযায়ীই কাজ করেছিলাম। আমার সঙ্গীসাথী বান্ধবীরা যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আমি দিউইশেনের পাঠশালে দৌড়ে ফিরে এসেছিলাম, দরজার পাশে ঝুলি খালি করে দিয়ে ফের ছুটে গিয়েছিলাম উপত্যকার বিস্তীর্ণ মাঠেপ্রান্তরে ঘুঁটে কুড়োবার জন্যে।

কোথা কোন্ দিকে যাচ্ছি সে-সব না ভেবেই দৌড়ুচ্ছিলাম আমি, যেন আলাদা কোনো শক্তির উচ্ছ্বাসে, বুকের মধ্যে তখন আনন্দের বন্যা বইছে আমার, যেন ভয়ানক কোনো বীরত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছি আমি। কোত্থেকে আমার ঐ আনন্দ, সেদিনের সূর্য ঠিকই টের পেয়েছিল যেন। হ্যাঁ, আমার ধারণা, ঠিকই বুঝেছিল সে কেন আমি মুক্ত অবাধ দৌড়েছিলাম সেদিন, যেন পাখায় ভর করে। তার কারণ — খুব ছোট্টো একটি সৎকর্ম আমি সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম সেদিন।

পাহাড়চূড়োয় তখন সূর্য পাটে বসেছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল বিলম্ব করছে সে, আড়ালে যেতে চাইছে না, আমাকে আরো কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে তার। অপূর্ব রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল সে সারাটা পথ: পায়ের তলায় হেমন্তে

হলুদ হয়ে যাওয়া ঘাস গাঢ় লালচে, গোলাপী বেগনি নানান রঙে রঞ্জিত। দুপাশের পাতাঘাস অগ্নিশিখার ন্যায় ঝিকমিক করছে। আমার তালি-দেয়া বেশ্‌মেৎ-এর* রুপোলি চকচকে বোতাম সূর্য তার আগুন-রংয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে। আমি সামনে পানে দৌড়ুচ্ছি তো দৌড়ুচ্ছিই, আকাশ বাতাস মৃত্তিকাকে ডেকে বলে উঠছি মনে মনে, মহাউল্লাসে: "দ্যাখো, তাকিয়ে দ্যাখো আমার পানে! দেখছো, কী গর্ব আমার আজ! আমি পড়াশুনো শিখবো, ইশ্‌কুলে যাবো, আমার সাথে অন্যদেরও ডেকে নিয়ে যাবো!.."

জানি না কতক্ষণ এমন দৌড়েছিলাম আমি, তারপর হঠাৎ একসময় চৈতন্যোদয় হলো: আরে, ঘুঁটে কুড়োতে হবে যে। আর এদিকে কী তাজ্জবের ব্যাপার: সারাটা গরমকাল এখানে গরুভেড়ার পাল সমানে চরে বেড়ায়, এক পা ফেললেই যেখানে চিরটাকাল গোবরের ছড়াছড়ি, আজ সেগুলো সব মাটির তলায় উবে গেল না কি! না কি আমি ভালো করে মোটেই খুঁজি নি? আমি হন্যে হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়ুতে লাগলাম, যত দূরে যেতে লাগলাম ততই কমে আসতে লাগলো ঘুঁটের পরিমাণ। তখন আমার মনে হলো, সন্ধ্যের আগে তো কোনোরকমেই ঝুলি ভর্তি করতে পারবো না দেখছি; ভয় হলো আমার, তাড়াতাড়ি করে এ-ঝোপ ও-ঝোপ সব খুঁজতে লাগলাম। তখন অবধি মাত্র আধ ঝোলার মতো কুড়িয়েছি। ততক্ষণে আলো মরে গেছে, সমস্ত উপত্যকা দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে।

মাঠে একা একা আর কখনো এত দেরী পর্যন্ত থাকি নি কোনো দিন। রাত্রির কালো ডানা ততক্ষণে নির্জন, নিস্তব্ধ

---

* বেশ্‌মেৎ — কোমর পর্যন্ত ঝুল এক ধরনের কোট। — সম্পাঃ

পাহাড় ঢেকে দিয়েছে। ভয়ে আমি তখন হতবুদ্ধি, পিঠে ঝোলাটা তুলে নিয়ে গাঁয়ের পথে ছুটতে লাগলাম। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমি, কে জানে হয়তো চেঁচাতাম, এমন কি কান্নাকাটিও করতাম হয়তো, কিন্তু — কী অদ্ভুত — এক দুর্বোধ্য কারণ সেটা হতে দেয় নি — আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় দেখে ফেললে দিউইশেন মাষ্টার কী ভাববেন। কোনওখান থেকে মাষ্টার সাহেব আমাকে যেন সত্যিই লক্ষ্য করছেন ভেবে পিছন ফিরে একবার অন্তত তাকাবার ইচ্ছা বহু কষ্টে দমন করলাম আমি।

ঘরে ফিরলাম ধুলোয়, ঘামে একেবারে মাখামাখি হয়ে। চৌকাঠ পার হতে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। চাচী আগুনের সামনে বসে ছিল, চোখ পড়া মাত্রই ভয়াবহ মূর্তিতে উঠে দাঁড়ালো আমার মুখোমুখি। অত্যন্ত হীন ও হিংস্র প্রকৃতির নারী ছিল সে।

'বলি, গিয়েছিলি কোন্ চুলোয়?' আমার দিকে এগিয়ে এলো সে, আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবার আগেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল ঝোলাটা, টান মেরে ছুঁড়ে ফেললো একদিকে। 'ব্যস, এই? এই তুই কুড়িয়েছিস দিনভর?'

আমার সঙ্গীসাথীরা, মনে হলো, আগেই এসে তাকে সব লাগিয়েছে।

'হারামজাদী, মুখপুড়ী পেতনী। ইশ্‌কুলে যাওয়া হয়েছিল? বলি, কী জন্যে, হ্যাঁ, কী জন্যে মরতে গিয়েছিলি ওখানে, ইশ্‌কুলে, বল!' চাচী একহাতে আমার কান টেনে ধরে সমানে তখন মাথায় গাঁট্টা-চড়চাপড় মারছে। 'হাড়-হারামজাদী, বদমাইশ! দুধকলা দিয়ে ঘরে সাপ পোষা হয়েছে আমার! লোকজনদের বাড়ি দ্যাখো গে, ছেলেমেয়েরা কত কাজ করছে, আর ইনি — কেবল বাইরে, কেবল বাইরে। ইশ্‌কুল তোমাকে

আমি দেখাচ্ছি দাঁড়াও, — কেবল ঐ পথে একবার পা দিয়ে দেখিস তুই, তোর ঠ্যাং আমি খোঁড়া করে তবে ছাড়বো। ইশ্‌কুল যে কাকে বলে সেটা আমার কাছেই দেখতে পাবি...'

চুপ করে ছিলাম আমি, কেবল চেষ্টা করছিলাম যেন না কে'দে ফেলি। অবশ্য পরে, চুলোর পাশে বসে আগ্‌নের দিকে নজর রাখতে রাখতে নিঃশব্দে কে'দেছিলাম আমি, গোপনে, আমাদের ছেয়ে রঙের বিড়ালটার গায়ে হাত ব্‌লোতে ব্‌লোতে; এই বিড়ালটা সবসময়ে টের পেতো, কখন আমি কাঁদি, লাফিয়ে এসে আমার কোলে উঠে বসে থাকতো। চাচীর মারধোরের ফলে যে কাঁদছিলাম আমি, তা নয় — না, ওতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, — আমি কাঁদছিলাম, কেননা ব্‌ঝতে পেরেছিলাম, কোনোরকমেই চাচী আমাকে পাঠশালে যেতে দেবে না...

দিন দ্‌য়েক পরে একদিন খ্‌ব সকালে আমাদের গাঁয়ের কুকুরগ্‌লো বড়ো বেয়াড়াভাবে তারস্বরে চে'চাতে লাগলো। দেখা গেল, দিউইশেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঠশালার প'ড়ো যোগাড় করছে। তখন তো গাঁয়ে কোনো রাস্তা ছিল না, আমাদের গের্‌য়া রঙের মেটে ঘরগ্‌লো সারা গাঁয়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকতো, বার যেখানে মন চায় সেখানেই বাড়ি তুলতো। দিউইশেন — তার চারপাশে ছেলেপিলের দল হৈচৈ তুলে হে'কে ধরেছে, আর সে এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়িটা ছিল একেবারে গ্রামের এক প্রান্তে। আমি ঠিক তখনই চাচীর সাথে মিলে উদ্‌খলে জোয়ার ভাঙছি, আর চাচা চালাঘরের কাছে মাটির গর্তে রাখা গম বের করায় ব্যস্ত: ওগ্‌লো সে বাজারে নিয়ে যাবে। আমরা, কামারশালে হাপর টানার মতন, পালা করে এ একবার ও

একবার মুশল দিয়ে জোয়ার কুটছি; কিন্তু আমি আবার চোরা চাউনিতে ঠিকই নজর রাখছি মাষ্টার সাহেব চলে গেলেন না তো। আমার ভয় ছিল, আমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত যদি তিনি না আসেন। আমি যদি জানতাম যে চাচী আমাকে ইশ্‌কুলে যেতে দেবে না, তবু আমার মনোগত বাসনা ছিল — দিউইশেন অন্তত এখান পর্যন্ত আসুন, অন্তত একবার দেখে যান কোনখানে আমি থাকি। ভিতরে আমি তখন একটা প্রার্থনাই করছি, আমাদের বাড়ি পর্যন্ত না এসে তিনি যেন ফিরে চলে না যান।

'সালাম, সালাম! আল্লা আপনাদের সহায় থাকুন! আর ধরুন, আল্লা যদি সহায় নাও থাকেন তো আমরা এই যে এক দঙ্গল আছি, সব্বাই — দেখুন না, কত জন আমরা!' পরিহাসের সুরেই চাচীকে সম্ভাষণ করেছিল দিউইশেন তার ভাবী পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে।

চাচী এর উত্তরে মুখের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বললে, আর চাচা — সে ঐ গর্ত থেকে মুখটা তুলে একবার দেখলো না পর্যন্ত।

দিউইশেন অবশ্য এতে হতাশ হন নি। তিনি উঠোনের মাঝখানে রাখা একটা কাঠের গুঁড়ির উপরে কাজের লোকের ভঙ্গিতে বসে পড়ল, একটা কাগজ আর পেন্সিল বের করল:

'আজ আমরা পাঠশালা খুলতে যাচ্ছি। আপনাদের মেয়ের বয়েস কত হলো গো?'

কোনো কথা না বলে চাচী আরো জোরেসোরে উদ্‌খলে মুশল ঠাসতে লাগলো। স্পষ্টতই, সে কোনো কথাবার্তা চালু করতেই রাজী নয়। আমি ততক্ষণে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেছি ভয়ে: এখন কী হবে? দিউইশেন আমার দিকে তাকিয়ে

একটু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যে এক উষ্ণতা অনুভব করলাম আমি।

'আল্‌তিনাই, তোমার বয়েস কতো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

জবাব দেওয়ার ভরসা আমার হল না।

জ্বালাতনভাবে মুখ ঝামটা দিলো চাচী:

'বলি তাতে তোমার দরকারটা কি হে? ভারি আমার বয়েসজানানওয়ালা এসেছেন! পড়াশুনো করবে না ও। ওর মতো বাপ-মা-খাকী তো দূরের কথা, মা-বাপের সঙ্গে যারা থাকে তারাও তো লেখাপড়া শিখতে যায় না। তুমি তো বাপু এক পাল পেয়েছ, ওদেরই পাঠশালে খেদিয়ে নিয়ে যাও, আমাদের এখানে কোনো সুবিধে হবে না বলে দিচ্ছি।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন দিউইশেন।

'ভেবে দেখেছেন, কী বলছেন আপনি! ও অনাথা — সে কি ওর দোষ না কি? না কি এমন আইন আছে কোনো যে বাপ-মা মরা ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে না?'

'তোমার অত আইন জানতে আমার বয়ে গেছে হে ছোকরা! আমার নিজের আইন নিজের কাছে, তোমার আইনের কে ধার ধারে!'

'আইন তো আছে একটাই। এই মেয়েকে যদি আপনাদের দরকার নেই, তো আমাদের দরকার আছে; সোভিয়েত সরকারের দরকার আছে। আর আপনারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যান, তাহলে যা করা দরকার করবো বৈ কি!'

'এঃ, দ্যাখো দ্যাখো, কি আমার অফিসার এসে গেছে রে!' হাঁক ছেড়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল চাচী। 'বলি, ওর জন্যে কার কাছ থেকে অর্ডার নিতে হবে শুনি? আমি

ওকে খাওয়াচ্ছি মাখাচ্ছি পরাচ্ছি না তুই? — ভবঘুরের বেটা, নিজেও নচ্ছার!'

যদি না ঠিক তক্ষুনি কোমর পর্যন্ত নগ্ন চাচা ঐ ফাঁকা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতো সামনে, তো ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো কে জানে। বাড়িতে গৃহস্বামী, মানে তার স্বামী বর্তমান — এ-কথাটা ভুলে গিয়ে তার গিন্নী যখন নিজের কাজের বাইরে এটা-ওটা নিয়ে নাক গলাতো, তখন ভয়ানক রেগে যেত চাচা। এর জন্যে মাঝেমধ্যে মহা মারধোরও করেছে বৌকে। এখন, সব দেখেশুনে, রক্ত গরম হয়ে গেল তার।

'চোপ্‌রাও, বুড়ি মাগী,' গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হুঙ্কার ছাড়লো সে। 'তুই আবার বাড়ির কত্তা হয়ে গেলি কবে থেকে, বলি ন্যায্য-অন্যায্য হুকুম দিতে শিখলি আবার কবে থেকে? বকবকানি থামা, কাজে মন দে। আর, ওহে — তাশ্‌তান্‌বেকের পো, যাও, মেয়েটাকে নিয়ে ভাগো হিঁয়াসে, ইচ্ছে হয় পড়াও, ইচ্ছে হয় ওর মাথা চিবিয়ে খাও — যা ইচ্ছে করো গে! কিন্তু খবরদার, আমাদের দোরগোড়া মাড়াবে না!'

'বা-বা-বা! ইশ্‌কুলে খুব ছিনালী করে বেড়াক এবার, এ্যাঁ, আর ঘরের কাজ? সব আমি, না?' চাচী চেঁচিয়ে উঠলো।

তখনি এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলো তার স্বামী:

'ব্যস, মিটে গেছে! — কথা না! খবরদার!'

সব খারাপেরই ভালো আছে। আমার ভাগ্যে প্রথম পাঠশালে যাওয়া এভাবেই ঘটেছিল।

সে-দিন থেকে রোজ সকালে দিউইশেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের জড়ো করে নিয়ে যেতেন।

আমরা প্রথম যে-দিন পাঠশালায় গেলাম সে-দিন আমাদের শিক্ষক পুরু করে খড় বিছানো মেঝেতে বসতে বললেন প্রথমে,

তারপর প্রত্যেককে খাতা, পেন্সিল আর ছোট্টো একটা বোর্ড দিলেন।

'বোর্ডটা কোলের উপরে রাখো তোমরা, তাহলে ওর উপরে খাতা রেখে লিখতে সুবিধে হবে,' দিউইশেন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের।

তারপর এক রুশী ভদ্রলোকের ছবি দেখালেন আমাদের। দেয়ালে সেটা সাঁটা ছিল।

বললেন: 'ইনি লেনিন!'

সারা জীবন আমি ঐ ছবিটা ভুলি নি। কী কারণে জানি না, কিন্তু আর কখনো কোথাও ঐ ছবিটা আমার চোখে পড়ে নি, আমি তো আজ পর্যন্ত ওটাকে 'দিউইশেনের' ছবিই বলে থাকি। ঐ ছবিতে একটা ঢিলে ফৌজী পোষাক পরে ছিলেন লেনিন, মুখটা কেমন রোগা, দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে। জখমী হাতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, পিছনে সরিয়ে দেয়া টুপীর নীচে থেকে তাঁর চোখ শান্ত গম্ভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। তাঁর নরম হার্দ দৃষ্টি, মনে হলো, বলছে আমাদের: "বাছারা, তোরা যদি জানতিস, কী অপূর্ব ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে তোদের সমুখে!" সেই নিস্তব্ধ মুহূর্তে আমার তো মনে হয়েছিল যে, সত্যি সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ নিয়েই তিনি ভাবছেন।

কোনো প্রচারপত্র থেকে কেটে নেয়া সাধারণ একটা কাগজে মুদ্রিত এই প্রতিকৃতিটি নিশ্চয়ই বহু দিন ধরেই দিউইশেন নিজের কাছে রেখেছিলেন — ভাঁজে ভাঁজে সেটা ছেঁড়াছেঁড়া হয়ে গেছে, ধারগুলো তার ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু, একমাত্র এই ছবিটি ব্যতিরেকে আমাদের ইস্কুলঘরের চার দেয়ালের আর কিচ্ছুটি ছিল না।

'এবার শোনো, আমি তোমাদের পড়তে শেখাবো, আঁক কষতে শেখাবো, কী করে অক্ষর লিখতে হয়, সংখ্যা লিখতে

হয় — সব দেখাবো,' দিউইশেন বললেন, 'যতটুকু আমি জানি তার স-ব শেখাবো তোমাদের...'

আর সত্যিই, যতটুকু তিনি জানতেন তা আমাদের শিখিয়েছিলেন, অসম্ভব ধৈর্য ছিল তাঁর এ ব্যাপারে। তাঁর প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর উপর ঝুঁকে ঝুঁকে কী করে পেন্সিল ধরতে হয় তা শিখিয়েছিলেন, পরম আগ্রহভরে প্রতিটি অজানা শব্দ ব্যাখ্যা করে করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন পর্যন্ত ভাবলে আমি অবাক হয়ে যাই: কী করে এই অর্ধশিক্ষিত ভদ্রলোক — যে নিজে বানান করে করে ছাড়া পড়তে পারে না, একটা বই পর্যন্ত যার হাতে নেই, এমন কি সাধারণ একটা বর্ণপরিচয়ও না, তিনি কি না অমন একটা যথার্থ মহৎ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। যাদের বাপ-দাদা, এমন কি ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষে কেউ কোনদিন শিক্ষিত ছিল না, তাদের ছেলেমেয়েকে পড়ানো কি চাট্টিখানি কথা! আর এতো নিশ্চিত যে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী বা প্রণালী কিছুই জানা ছিল না তাঁর। এমন কি ও-রকম কোনো ব্যাপার-স্যাপার যে আদৌ আছে তা তিনি সন্দেহ পর্যন্ত করেন নি কখনো।

দিউইশেন আমাদের পড়িয়েছিলেন যেমনটি তিনি পেরেছিলেন, যে-রকমটি দরকার বলে তাঁর মনে হয়েছিল, বলা যায়, সম্পূর্ণত নিজের বুদ্ধিআক্কেল অনুযায়ী চলেছিলেন তিনি। অন্তত আমি এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, যে-হেন খাঁটি আগ্রহ নিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন তা বৃথা যায় নি।

নিজে যে কী অসাধ্য সাধন করছেন, তা নিজেও বুঝতেন না। হ্যাঁ, অসাধ্য সাধনই। কেননা, ঐ স্কুলে — অবশ্য হাঁ-করে থাকা ফোঁকরওয়ালা মাটির ঐ চালাঘরটাকে, যার ভিতর থেকে সর্বদা বরফঢাকা পাহাড়ের চূড়োটা দেখা যেত, ওটাকে যদি

আদৌ তা বলা যায় — আমাদের, কিছু কিরগিজ ছেলেমেয়ের সামনে, যারা গাঁর সীমানা ছাড়িয়ে কোনোদিন কোনখানে যায় নি, তাদের সামনে অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব এক নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল।

ওখানেই আমরা প্রথম জেনেছিলাম যে, লেনিন যেখানে থাকতেন সেই মস্কো আউলিয়ে-আতা শহর থেকে অনেক অনেক বেশি বড়ো, এমন কি তাশখন্দ থেকেও; জেনেছিলাম যে, পৃথিবীতে বিরাট বিরাট সাগর আছে, একেবারে আমাদের তালাস্ উপত্যকার মতো বিরাট, আর সেই সব সাগরে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড সব জাহাজ ভেসে বেড়ায়। সেই জেনেছিলাম যে, যে-কেরোসিন বাজার থেকে নিয়ে আসি তা পাওয়া যায় মাটির ভিতর থেকে। আর ততদিনে আমরা তো পাকাপোক্তভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে, লোকজন যখন একটু ধনী হবে তখন আমাদের পাঠশালাটায় সাদা বড়ো দালান তোলা হবে, বড়ো বড়ো জানালা থাকবে তার আর পড়ুয়াদের সামনে রীতিমতো ডেস্ক রাখা থাকবে।

কোনো রকমে অ-আ-ক-খ একটু রপ্ত হয়েছে মাত্র, তখনো আমরা 'বাবা', 'মা' লিখতে পারি না, তখনি কিন্তু কাগজে আঁচড় কেটেছি: 'লেনিন'। রাজনৈতিক শব্দাবলী যা আমরা শিখেছিলাম তা এ-ধরনের: 'বাই', 'বাত্রাক্'*, 'সোভিয়েত'। আর বৎসরখানেক কেটে গেলে দিউইশেন আমাদের 'বিপ্লব' লিখতে শেখাবেন বলে কথা দিলেন।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হতো, তাঁর সাথে আমরাও ফ্রণ্টে শ্বেতরক্ষীদের সাথে যুদ্ধ করছি। আর লেনিন সম্পর্কে যেমন আবেগবিচলিতভাবে তিনি গল্প করে যেতেন যে

---

* বাত্রাক্ — ভূমিহীন কৃষক; দিনমজুর। — সম্পাঃ

স্বচক্ষে কেউ না দেখলে তা সম্ভব নয়। তিনি যা বলতেন তার বেশির ভাগই, এখন বুঝতে পারি, ছিল মহান নেতাকে নিয়ে লোকের মুখে মুখে রচিত কাহিনী; কিন্তু সে-সময়ে আমরা, যারা দিউইশেনের ছাত্রছাত্রী তাদের কাছে মনে হতো— দুধ যেমন সাদা তেমনি ও-কথাগুলোও একেবারে খাঁটি।

একদিন কোনো কিছু না ভেবেচিন্তেই আমরা জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম: 'মাস্টার সা'ব, আপনি লেনিনের সাথে হ্যান্ডশেক করেছেন, তাই না?'

অত্যন্ত মর্মবেদনায় মাথা নাড়িয়েছিলেন আমাদের শিক্ষক: 'না, বাছারা, আমি লেনিনকে কখনো দেখি নি।'

তারপর অপরাধীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন — আমাদের সামনে অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর।

প্রত্যেক মাসের শেষে দিউইশেন নিজের কাজে ভোলস্ত্*-এর কেন্দ্রে যেতেন। পায়ে হেঁটে যেতেন তিনি, ফিরে আসতেন দিন দুই-তিন বাদে।

সে-ক'টা দিন আমাদের মনখারাপের অন্ত থাকতো না। যেভাবে আমি দিউইশেনের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করতাম, আমার কোনো বড়ো ভাই থাকলেও হয়তো আমি অত অধৈর্য হয়ে তার অপেক্ষায় কখনো থাকতাম না। লুকিয়ে, যেন আবার চাচী না দেখে ফেলে, আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গেছি আমাদের বাড়ির পিছন পানে, রাস্তার দিকে, স্তেপের দিকে তাকিয়ে থেকেছি: এই বুঝি পিঠে-ঝুলি-বাঁধা তাঁকে আসতে দেখা যাবে, এই বুঝি দেখতে পাবো তাঁর হৃদয়-উষ্ণ করা হাসি, এই বুঝি শুনতে পাবো তাঁর প্রেরণাদায়ী দু-একটি কথা।

---

* ভোলস্ত্ — বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশে প্রশাসনিক বিভাগগুলোর নাম। — সম্পাঃ

দিউইশেনের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমিই বয়সে সবচেয়ে বড়ো ছিলাম। হতে পারে এটাও একটা কারণ যার জন্যে অন্যদের চেয়ে আমি ভাল লেখাপড়া করছিলাম, তবে — এটাকেই একমাত্র কারণ বলে মনে হয় না আমার। শিক্ষকের প্রতিটি কথা, প্রতিটি অক্ষর যা তিনি লিখতে শিখাতেন — সবই আমার কাছে পবিত্র ছিল। আর দিউইশেন যা শেখাতেন তা আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনো কাজই আমার নিকট বেশি জরুরী মনে হতো না। যে-খাতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন সযত্নে আমি তা রেখে দিয়েছিলাম, আর লেখা অভ্যেস করতাম কাস্তে দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে কেটে, মাটির দেয়ালে কাঠকয়লার আঁচড় কেটে, বরফের উপরে বা বালির উপরে কোনো ডালপালা দিয়ে। পৃথিবীতে দিউইশেনের চেয়ে জ্ঞানী কোনো শিক্ষকের অস্তিত্ব ছিল না আমার কাছে।

এভাবেই চলতে চলতে শীত এসে গেল।

প্রথম তুষারপাতের আগে পর্যন্ত আমরা পাহাড়ের পাদদেশে কলকল করে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্টো নদীটা পায়ে হেঁটে পার হয়ে যেতাম। কিন্তু পরে ওভাবে হেঁটে যাওয়া অসহ্য হয়ে দাঁড়াল — বরফঠাণ্ডা পানি আমাদের পা যেন পুড়িয়ে দিত। বিশেষভাবে কষ্ট পেতো ছোটো ছেলেপুলেরা, এমনকি তাদের দুচোখ জলে ভরে উঠতো। তখন দিউইশেন কোলে নিয়ে তাদের নদী পার করে দিতেন। কাউকে হয়তো পিঠে চড়াতেন, কাউকে বা কোলে নিতেন, এবং এভাবেই একে একে সব ছাত্রই পার হয়ে যেত।

এখন যখন আমি ও-সব নিয়ে ভাবি, আমার বিশ্বাস করতে মন যায় না যে, তখন ওরকমই ছিল সবকিছু। নিজেদের অজ্ঞতার জন্যেই হোক বা মূর্খতার জন্যেই হোক দিউইশেনকে

নিয়ে সেকালে হাসাহাসি করতো লোকেরা। বিশেষত টাকাপয়সাওয়ালা লোকজনেরা, যারা শীত কাটাতো পাহাড়ের ওপরে আর মাঝে-মধ্যে নীচে নেমে আসতো ময়দাকলে। খ্যাঁকশিয়াললোমের লাল টুপী আর ভেড়ার চামড়ার কোট পরে কতবার যে তারা তাদের চকচকে বনো ঘোড়ায় চেপে হাঁটুজল কেটে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অপলক দৃষ্টিতে দিউইশেনকে দেখেছে তার ঠিক নেই। তাদের মধ্যে কে যেন একবার হেসে কুটিকুটি হয়ে পাশের জনকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল:

'আরে দেখ, দেখ, একটাকে নিয়েছে পিঠে, আরেকটা কোলে!'

তখন আরেকজন অবাধ্য ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে টিপ্পনী কেটেছিল:

'আঃ, মাইরি, দেখলাম বটে একটা জিনিস! আগে জানলে ছাই দু'নম্বর বৌয়ের কাজটা এ ব্যাটাকে দিয়েই চালিয়ে নেয়া যেত!'

তারপর আমাদের গায়ে নোংরা জল কাদা ছিটিয়ে হো-হো হাসতে হাসতে ওরা চলে গিয়েছিল।

হাঁদা লোকগুলোর পিছনে তাড়া করে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার, ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁত বের করা লোকগুলোর মুখের উপর ইচ্ছে হয়েছিল বলি: "কী আস্পদ্দা তোমাদের — আমাদের মাস্টার সাহেবকে এমন কথা বলো! তোমরা আহাম্মক, তোমরা ডাহা শয়তান!"

কিন্তু একটা বাচ্ছা মেয়ে কী বললো না-বললো, কী যায় আসে তাতে? কী করবো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুঃখে-অপমানে চোখের জল সংবরণ করলাম। আর দিউইশেন এই সব অপমান

একবার লক্ষ্যটি পর্যন্ত করলেন না, একেবারে কিচ্ছুটি শুনতেই পান নি যেন তিনি। বরং তিনি হাসি-তামাসা করে আমাদের হাসাতে চেষ্টা করলেন, যা ঘটে গিয়েছিল তা ভুলিয়ে দিতে চাইলেন।

অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও নদীটার উপরে একটা পুল তৈরীর মতো কাঠ জোগাড় করে উঠতে পারেন নি তিনি। একদিন পাঠশালা থেকে ফেরার পথে, বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলোকে পার করার পরে আমি আর দিউইশেন নদীর পারে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক করলাম যে, মাঝে মাঝে পাথরের নুড়ি আর ঘাসের চ্যাঙড় ফেলে দিলে অন্তত পা বাঁচিয়ে নদীটা পার হওয়া যাবে।

বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের গাঁয়ের লোকজন জড়ো হয়ে কেবল দু-তিনটে গাছ কেটে ফেলে দিলেই হয়ে যেত — ব্যস্, পাঠশালের প'ড়োদের জন্যে পুল তৈরী। ' কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই — সে-সব দিনে নিজেদের অজ্ঞতার জন্যেই লোকজন পড়াশুনোর ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না, আর দিউইশেনকে তারা ভেবেছিল বড়োজোর একটা পাগলাটে লোক, কাজটাজ না থাকায় ছেলেপিলে নিয়ে একটু মেতে আছে। পড়াতে এত মন যায় তো বাপু — পড়া, আর নইলে — যেখানে যার ঘর, ভাগিয়ে দে। তারা নিজেরা চলাফেরা করতো ঘোড়ায় চড়ে, ফলে নদী পারাপার নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের লোকজনদের নিশ্চয়ই একবার ভাবা দরকার ছিল: এই যে একটা জোয়ান ছেলে — যে তাদের চেয়ে কি বুদ্ধিআক্কেল কি অন্য কোনো কিছুতে মোটেই কমতি যায় না, কী সুখে সে এত দুঃখকষ্ট সহ্য করে, ঠাট্টা অপমান গায়ে না মেখে তাদের ছেলেমেয়েগুলোকে

লেখাপড়া শেখাচ্ছে, আর শেখাচ্ছে অসাধারণ দৃঢ়তা ও অমানুষিক জেদ নিয়ে?

ঐ দিনে, যেদিন আমরা ঝর্ণায় পাথরনুড়ি ফেলছিলাম, সেদিন মাটিতে বরফ জমে ছিল আর জল এত ঠান্ডা ছিল যে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। দিউইশেন যে কী করে সহ্য করছিলেন তা জানি না, কেননা তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন খালি পায়ে এবং বিরতিহীনভাবে। মহা কষ্টে জলের নিচে পা রাখা মাত্রই, মনে হলো, ছড়িয়ে রাখা জ্বলন্ত কয়লার উপর যেন পা দিয়েছি। যখন মাঝ বরাবর গেছি নদীটার, আমার পায়ের ডিম জমে গিয়ে দ্বিগুণ যন্ত্রণা শুরু হলো। তখন আমি না চেঁচাতে পারি, না সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি, জলের মধ্যেই ধীরে ধীরে বসে পড়তে লাগলাম আমি। দিউইশেন পাথরটাথর ছুড়ে ফেলে দৌড়ে এলেন আমার কাছে, দুহাত দিয়ে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পারের দিকে ছুটলেন, তারপর তাঁর নিজের ফৌজী কোটটার উপরে আমাকে বসিয়ে দিলেন। নীল হয়ে যাওয়া অসাড় আমার পাদুটো একবার ঘষেন তো আরেকবার জমে-যাওয়া আমার হাতের তালু আঁকড়ে ধরেন, পরক্ষণেই আবার হয়তো মুখের কাছে নিয়ে এসে ভাপ দিয়ে তা গরম করার চেষ্টা করতে থাকেন।

'দরকার নেই, আল্‌তিনাই, তুমি বরং একটু বসো, চাঙ্গা হও,' দিউইশেন বললেন আমাকে, 'আমি নিজেই ব্যবস্থা করতে পারবো'খন...'

যখন পার হওয়ার রাস্তা তৈরী হয়ে গেল, দিউইশেন বুট জুতো পরতে পরতে তাকালেন আমার দিকে, তখন আমার শীত লাগছে, জড়সড় করে বসে আছি, তারপর একটু হাসলেন:

'হুঃ, তারপর — আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট, বলি একটু গরম

বোধ করছো এখন? কোটটা ভাল করে জড়িয়ে নাও — হ্যাঁ, ঠিক, অমনিভাবে!' তারপর একটু চুপ করে থেকে ফের জিজ্ঞেস করলেন: 'ইশ্‌কুলে গোবরঘুঁটে সেবার তুমিই রেখে গিয়েছিলে, তাই না আল্‌তিনাই?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিই আমি।

পাৎলা হাসি তাঁর ওষ্ঠের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে গেল, নিজেকেই নিজে যেন বলতে চাইলেন তিনি: "আমি তা-ই ভেবেছিলাম।"

মনে আছে, সেই মুহূর্তে আমার গাল টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছিল লজ্জায়: তার মানে, মাষ্টার সা'ব বুঝেছিলেন এবং ব্যাপারটা যত তুচ্ছই হোক না কেন ভুলে যান নি। মন আনন্দে ভরে গেল, মনে হলো যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি আমি — এত আনন্দ, আর দিউইশেনও আমার খুশি বুঝতে পেরেছিলেন।

'কী গো আমার ঝর্ণারানী,' স্নেহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি। 'তুমি তো বেশ কাজের মেয়ে, দেখলাম... আহ্‌, যদি একবার তোমাকে আমি বড়ো শহরে নিয়ে যেতে পারতাম! তাহলে তুমি একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে যেতে!'

দিউইশেন আচমকা পা বাড়ালেন ঝর্ণার দিকে।

এখনো যেন আমি ছবিটা দেখতে পাই আমার সামনে — কলমন্দ্রিত পাহাড়ী ঝর্ণাটার পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, মাথার পিছনে দু-হাত রাখা, উজ্জ্বল চোখে প্রদীপ্ত বাসনা জেবলে তাকিয়ে আছেন পাহাড়ের উপরে বাতাসে ভাসমান শুভ্র মেঘদলের দিকে।

কী ভাবছিলেন তিনি তখন? কে জানে, সত্যিই হয়তো আমাকে শহরের কোনো বড়ো ইশ্‌কুলে পড়তে পাঠাবার স্বপ্ন দেখছিলেন। আর আমি সেই মুহূর্তে, দিউইশেনের কোট

গায়ে জড়িয়ে ভাবছিলাম: "মাষ্টার সা'ব যদি আমার বড়ো ভাই হতেন! তাঁর পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে, চোখ বন্ধ করে তাঁর কানে কানে আদর করে কতো কথা বলতে পারতাম! হে খোদা, আমার বড়ো ভাই করে দাও না তাঁকে!"

কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা সবাই সেকালে আমাদের মাষ্টার সাহেবকে তাঁর দয়ামায়া, সদিচ্ছা ও আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর উচ্চাশার জন্যে বড়ো ভালবাসতাম। যদিও তখন আমাদের বয়েস কম ছিল, তবু, আমার ধারণা, আমরা এসব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। তা নইলে আর কিসের জন্যে আমরা প্রত্যেকটা দিন বাতাসের চোটে হাঁপাতে-হাঁপাতে, তুষারস্তূপ ভেঙ্গে, অত দূর হেঁটে ঐ উঁচু ঢিবিটায় গিয়ে উঠতাম? পাঠশালে আমরা স্বেচ্ছায় যেতাম। কেউ যে আমাদের ওখানে ঠেলে পাঠাতো তা নয়। সেই ঠাণ্ডা চালাঘরে গিয়ে হিমে জমে যেতে বাধ্য করে নি কেউ আমাদের; এত ঠাণ্ডা ছিল সেই ঘর যে আমাদের মুখে, হাতে, কাপড়-চোপড়ে নিশ্বাসের ভাপ সাদা সাদা তুষারকণার মতো জমে যেত যেন। আমরা কেবল একেক জন পালা করে উঠে গিয়ে উনুনে হাত-পা সেঁকে নিতাম, অন্যেরা ততক্ষণ যে যার জায়গায় বসে দিউইশেনের কথা শুনে যেত।

ও-রকমই এক কনকনে ঠাণ্ডা দিনে — সেটা ছিল, যদ্দূর মনে পড়ছে, জানুয়ারির শেষাশেষি — দিউইশেন যথারীতি ঘরে ঘরে গিয়ে আমাদের জড়ো করে পাঠশালায় নিয়ে গেলেন। নীরবে, গম্ভীরভাবে হাঁটছিলেন তিনি, স্বর্ণঈগলের ডানার মতো তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ, আর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেটানো কালো লোহা দিয়ে তৈরী যেন তা। আমাদের মাষ্টার সাহেবের অমন রূপ আমরা আর কখনো দেখি নি। তাঁর দিকে তাকিয়ে

আমরাও ঝিম মেরে গিয়েছিলাম: কিছু যেন একটা বিপদের আভাস টের পাচ্ছিলাম মনে মনে।

যাওয়ার পথে রাস্তায় বড়ো বরফস্তূপ জমে থাকলে দিউইশেন সাধারণত নিজে তার ভিতর দিয়ে পথ বের করে নিতেন, তাঁর পিছনে থাকতাম আমি, আর আমার পিছন পিছন অন্য সবাই। সেদিনও টিলার পাদদেশে রাত্রে অত্যন্ত তুষারপাতের কারণে দিউইশেনই আগে আগে যাচ্ছিলেন। কখনো-কখনো পিছন থেকেও যদি কাউকে দ্যাখো — অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে তার অবস্থা, তার বুকের মধ্যে ঘটছে কী। সেদিন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে, আমাদের শিক্ষক দুঃখশোকে প্রায় মুমূর্ষু। মাথা নিচু করে, অতি কষ্টে পা টেনে টেনে তিনি চলেছিলেন। আমার চোখের সামনে সাদাকালোর জাফরিকাটা সেই ভয়াবহ ছবি এখনো মনে করতে পারি আমি: আমরা এক এক করে টিলায় উঠছি, কালো কোটের তলে দিউইশেনের কুঁজো পিঠ, আর ঊর্ধ্বে তার উপরে খাড়াই বরাবর ঝুঁকে আছে উটের কুঁজের মতো সাদা তুষারস্তূপ, বাতাস তা উড়িয়ে নিচ্ছে, আর আরো উপরে — সাদা ঘোলাটে আকাশে এক খণ্ড ঘন কালো মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে।

আমরা পাঠশালে পৌঁছুবার পর দিউইশেন উনুন ধরাতে গেলেন না।

'উঠে দাঁড়াও সবাই,' হুকুম দিলেন তিনি।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

'টুপী খোলো।'

শোনা মাত্র মাথা খালি করলাম আমরা, তিনিও মাথা থেকে টোপরমার্কা ফৌজী টুপী খুলে ফেললেন। বুঝতে পারি নি কিসের জন্যে। আর তখনই সর্দি লাগা ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি বলে উঠলেন:

'লেনিন মারা গেছেন। এই মুহূর্তে সারা দুনিয়ার মানুষ শোকে মোহ্যমান। তোমরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো চুপটি করে। আর এদিকে দ্যাখো, এই যে ছবিটার দিকে। এই দিনটারে কথা মনে রেখো।'

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের পাঠশালা, যেন বরফচাপা দেয়া হয়েছে তাকে। কেবল ঘরের ফোকরগুলো দিয়ে বাতাসের ঝাপটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর শোনা যাচ্ছিল খড়ের উপরে তুষারপাতের খস্‌খস্‌ শব্দ।

সেই মুহূর্তে, যখন নগরীর কোলাহল হতবাক হয়ে গেছে, মাটি-কাঁপানো কলকারখানা যখন স্তব্ধ, ট্রেনের গুম গুম শব্দ থেমে গেছে রেললাইনে, যখন সারা বিশ্ব ভারাক্রান্ত মনে শোকের শরীক হয়েছে, সেই মর্মান্তিক মুহূর্তে আমরাও — জনগণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ — দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে তাঁকে শেষ বিদায় সম্মান জানাতে সকলের অলক্ষ্যে এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম আমাদের শিক্ষকের সাথে পাঠশালা নামে অভিহিত সেই ঠাণ্ডা চালাঘরটার ভিতরে; এইভাবে লেনিনকে বিদায় জানালাম আমরা, মনে মনে এই ভেবে যে সমস্ত মানুষের মধ্যে আমরাই তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলাম সবচেয়ে, আর তাঁকে হারিয়ে দুঃখও পেয়েছি আমরাই সবচেয়ে বেশি। আর আমাদের লেনিন ঢিলে ফৌজী পোষাক পরে ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাত নিয়ে দেয়াল থেকে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের পানে। স্বচ্ছ, পরিষ্কার দৃষ্টি মেলে আমাদের বলছিলেন যেন তিনি: "বাছারা, তোরা যদি জানতিস, কী অপূর্ব ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে তোদের সমুখে!" সেই নিস্তব্ধ মুহূর্তে কল্পনা করেছিলাম, তিনি আমারই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন তখন।

এরপরে দিউইশেন জামার হাতায় চোখ মুছে বলেছিলেন:

'আমি আজকে ভোলস্ত্-য়ে যাচ্ছি। পার্টিতে নাম লেখাবো আমি। ফিরে আসবো দিন তিনেক পরে...'

জীবনে আমি যত শীতের দিন কাটিয়ে এসেছি, তার মধ্যে ঐ তিনটি দিন সবচেয়ে দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল আমার। আমাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া কোনো মহান পুরুষের শূন্যতা যেন ভরাট করে দিতে প্রকৃতির প্রচণ্ড উন্দামতা শুরু হয়ে গিয়েছিল: অশান্ত বাতাসের প্রচণ্ড গর্জন, তুষারের ঘূর্ণিঝড় লৌহকঠিন শৈত্যের হুঙ্কার... প্রকৃতি শান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় নি: দাপাদাপি করেছে সমানে, মাটিতে লুটিয়ে ভেঙে পড়েছে কান্নায়...

নিচু হয়ে আসা মেঘগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কালো কালো পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশে নিঝুম, শান্ত আমাদের গ্রাম। ঝঞ্ঝাপ্রহত চিমনী দিয়ে পাৎলা ধোঁয়ার রেশ দেখা যায়, লোকজন বাড়ি থেকে বেরোয় নি। এদিকে অবস্থাটা আরো ভয়ঙ্কর করে দিয়েছিল নেকড়েগুলোর অকস্মাৎ আবির্ভাব। দিনেদুপুরে হন্যে হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতো তারা, আর কাছেপিঠের গ্রামগুলোয় হানা দিয়ে বেড়াতো রাত্রে; একেবারে সেই ভোরবেলা পর্যন্ত ক্ষুধার্ত, প্রাণকাঁপানো চিৎকার শোনা যেত তাদের।

কী কারণে জানি না মাষ্টার সাহেবের জন্যে ভয় হচ্ছিল আমার: এ-রকম ঠাণ্ডায়, ভারী ওভারকোট ছাড়া এক কেবল ঐ ফৌজী কোটে কীভাবে যে আছেন সেখানে কে জানে! আর যেদিন দিউইশেনের ফেরার কথা, আমি যেন সেদিন একেবারে পাগল হয়ে গেলাম, স্পষ্টতই ভিতরে ভিতরে কিসের অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নানান কাজের ছুতোয় বাড়ি থেকে কেবল বেরিয়ে যাই, তুষারাচ্ছাদিত নির্জন স্তেপের দিকে তাকিয়ে

থাকি: এই বুঝি রাস্তায় দেখা যাবে তাঁকে! কিন্তু না, জনপ্রাণীও নেই কোথাও।

"কোথায় রয়ে গেলে তুমি, মাষ্টার সা'ব? মিনতি করি, দেরী করো না, ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। শুনতে পাচ্ছ, মাষ্টার সা'ব, আমরা সবাই রাস্তায় অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে!" কিন্তু না, জনপ্রাণী নেই কোথাও।

আমার সে নিঃশব্দ চিৎকারে সাড়া দিলো না স্তেপ। কী কারণে জানি না কাঁদতে লাগলাম।

এরকম ঘর বার করায় বিরক্ত হচ্ছিল চাচী।

'বলি, দরজা ছেড়ে নড়বি না কি? নিজের জায়গায় গিয়ে বস্ গে যা, সুতো কাটায় মন দে। বাচ্ছাগুলোকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে দিলি। আরেকটি বার পা বাড়িয়ে দ্যাখ্ মজা...' আঙুল উঁচিয়ে ধমকাতে লাগলো আমাকে, এরপর বাড়ি থেকে বেরুতেই দিলো না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, অথচ জানতেই পারলাম না মাষ্টার সাহেব ফিরলেন কি না। অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। একবার মনে হয় — দিউইশেন হয়তো ইতিমধ্যেই গ্রামে ফিরেছেন, কেননা যে-দিন বলে গেছেন সে-দিন ফেরেন নি এমন তো আগে কখনো হয় নি; আবার মনে হয় — হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, জোরে হাঁটতে পারছেন না, একবার যদি বরফঝড় শুরু হয় তো স্তেপে রাত্রে পথ হারিয়ে ফেলবেন। সব কাজ বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল, হাত স্ববশে থাকছিল না আমার, সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছিল কেবলি, আর ক্ষেপে যাচ্ছিল চাচী।

'আজকে তোর হয়েছে কী রে? বলি, হাত কি তোর কাঠের না কি?' আড় চোখে আমাকে দেখতে দেখতে ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল সে। তারপর একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল

তার: 'উহ্‌, যমেও দেখে না তোকে! যা, বরং সাইকাল্‌ বুড়িকে এই ঝোলাটা দিয়ে আয়।'

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম আর কি! সাইকাল্‌ বুড়ির ওখানেই যে থাকতেন দিউইশেন। আমার মায়ের দিকে অনেক দূরের আত্মীয় এই বুড়োবুড়ী — সাইকাল্‌ আর কার্তান্‌বাই। আগে আমি প্রায়ই ওদের ওখানে যেতাম, এমন কি কখনো-সখনো রাতও কাটাতাম। চাচীর এসব হঠাৎ মনে পড়ে গেল, না কি বিধাতাই মন্তর দিলেন তার কানে, কে জানে। ঝুলিটা হাতে গছিয়ে দিয়ে চাচী বলে উঠলো:

'আকালের সময়ে যেমন হয়, তুই তেমনি আজ আমাকে নাজেহাল করে দিলি! এখন এবার বেরোও, আর শোন্‌, যদি বুড়োবুড়ি বলে তো রাত্রে ওখানেই থেকে যাস না হয়। যা, দূর হ সামনে থেকে...'

আমি তখন সোজা উঠোন পানে দৌড় দিলাম। বাইরে ওঝার মতো রাগী বাতাসের দাপাদাপি: রাগে যেন এই দম বন্ধ করে থমকে আছে সে, আবার পরক্ষণেই হঠাৎ প্রচণ্ড হামলা চালাবে তোমার উপর, তোমার উত্তেজিত চোখেমুখে ছুঁড়ে দেবে মুঠি মুঠি হুল ফোটানো তুষারকণা। আমি বগলের তলায় ঝোলাটা চেপে ঘোড়ার ক্ষুরের টাটকা দাগ ধরে ধরে গ্রামের অন্য প্রান্তে দৌড়ুতে লাগলাম। মাথায় তখন একটি চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে: মাষ্টার সা'ব কি ফিরেছেন না ফেরেন নি?

দৌড়ুতে দৌড়ুতে সেখানে পেঁছে গেলাম। না, তিনি নেই। চৌকাঠে পা দিয়েই আমি এমন হাঁফাতে লাগলাম যে সাইকাল্‌ ভয় পেয়ে গেল।

'কি রে, কী হলো? এত দৌড়ে কেউ আসে, কী হয়েছে রে?'

'নাঃ, কিচ্ছু না। এই যে এই ঝুলিটা এনেছি। তোমাদের এখানেই আজ রাতটা কাটাই না কি?'

'তা, থাক্ না বাছা; ঈশ্, পাজী মেয়ে, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলি! এবারে সারা হেমন্তটা তুই একবার উঁকি দিস নি। আগুনের কাছে বস্, শরীরটা গরম করে নে।'

'ডেকচিতে মাংস দাও না, বুড়ি, মেয়েকে খাওয়াতে হবে তো। আর দিউইশেনেরও তো আসার সময় হলো,' কার্তান্‌বাই ফোড়ন কাটে; সে জানলার পাশে বসে তার পুরনো ফেল্‌ট বুটের সোল্ ঠিক করছিল। 'অনেক আগেই তো তার এসে পড়ার কথা — তা, ঠিক আছে, এসে পড়বে'খন, আঁধার হবার আগেই এসে পড়বে। আমাদের ঘোড়াটা তো ঘরমুখো হলে একেবারে পক্ষিরাজ।'

জানালার বাইরে নিঃশব্দে রাত নামলো। বুকের মধ্যে ভয় আরো চেপে ধরছে তখন, বিশেষত যখন কুকুরের চিৎকার কি লোকজনের গলা কানে আসছিল, বুক আমার ছ্যাঁৎ করে উঠছিল। কিন্তু, কই, দিউইশেনের আসার কোনো লক্ষণ নেই। ভাগ্য ভালো যে, সাইকালের সাথে কথাবার্তায় সময় উড়ে যাচ্ছিল।

এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাঝরাত বরাবর কার্তান্‌বাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো:

'বুড়ি, বিছানাটা এবার পাত দেখি। আজ আর সে আসছে না। দেরী হয়ে গেছে। অফিসারদের কাজকম্ম কি আর কম, কোথায় আটকে গেছে ঠিক, নইলে কত আগেই তো ফিরে পড়ার কথা।'

বুড়ো শুয়ে পড়ার জন্যে তৈরী।

আমার বিছানা পাতা হলো উনুনের একপাশে। কিন্তু

ঘুমুতে পারলাম না আমি। বুড়ো সমানে কাশছে, নড়ছে উশখুশ ক'রে, ফিশফিশ ক'রে দোয়াদরুদ পড়ছে, তারপর অস্বস্তিভরে একসময় বলে ওঠে বিড়বিড় করে:

'বলি ঘোড়াটা আমাদের কী যে করছে এখন? বিনি পয়সায় এক আঁটি ঘাস পর্যন্ত বললে কেউ দেবে না, আর কড়ি ফেললেও একদানা চানা পাবে না কোথাও।'

কার্তানবাই ঘুমিয়ে পড়লো একটু পরেই, কিন্তু এবার হাওয়া উঠল। সারা ঘরের চাল তোলপাড় করে বেড়ালো হাওয়া, পাঁচ আঙুলে যেন ছানতে লাগলো ঘরের কার্নিস, আঁচড়াতে লাগলো জানলার শার্সি। বাইরের দেয়ালে বরফের ঝাপটা শোনা যাচ্ছিল।

বুড়োর কথায় স্বস্তি পেলাম না। আমার মনে হচ্ছিল মাস্টার সাহেব আসবেন, তাঁর কথাই চিন্তা করছিলাম, তুষারাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তরের মধ্যে ঐ পথে তিনি কি ভাবে হেঁটে আসছেন সেই ছবি মনে ফুটে উঠছিল আমার। জানি না, কতক্ষণের জন্যে ঝিমুনি এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন আমাকে বালিশ থেকে উঠিয়ে দিলো এক ধাক্কায়। মৃত্তিকার জঠর থেকে নাকী সুরে একটা আর্তনাদ উঠে আসছে যেন এবং বাতাসে গেঁথে যাচ্ছে জমাট হয়ে। নেকড়ে! আর, একটা তো নয় — অনেকগুলো। চতুর্দিক থেকে ডাকতে ডাকতে নেকড়েগুলো দ্রুত কাছাকাছি হলো। তাদের চিৎকার একটি সুদীর্ঘ আর্তনাদে মিশে গিয়ে বাতাসের সাথে সাথে স্তোপময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, একবার ভেসে যাচ্ছে দূরে, ফের কাছে আসছে বাতাসের টানে। একবার তো মনে হলো, একেবারে আশেপাশে কোথাও এসে গেছে তারা, আমাদের গাঁয়ের সীমানার মধ্যেই।

'ঝড় ডেকে আনছে, শালারা!' ফিসফিস করে বুড়ী।

বুড়ো কিছু বললো না, কান খাড়া করে শুনলো কী যেন, তারপরেই লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লো:

'নাঃ, কিছু ব্যাপার আছে! কাউকে তাড়া করছে মনে হচ্ছে। কোনো লোক কি ঘোড়াটোড়াকে ছুঁকে ধরেছে। শুনতে পাচ্ছ? দোহাই আল্লার, দিউইশেনের যেন কিছু না হয়। ওর কিছু পরোয়া নেই, এ্যায়সা বুদ্ধু!' কার্তান্‌বাই অন্ধকারে তার ফারকোট খুঁজতে খুঁজতে মহা সোরগোল তুললো। 'আরে, আলো, আলো দেখি না বুড়ি! কী জ্বালা — একটু চটপট করো না ছাই!'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা। সাইকাল্‌ এদিক-ওদিক হাৎড়ে বাতিটা খুঁজে পেল, ধরালো সেটা; তখনি নেকড়ের ক্ষিপ্ত আর্তনাদ হঠাৎ করে থেমে গেল, একেবারে যেন ভেল্কিবাজী।

'আহ্‌, ধরে ফেলেছে হারামজাদারা!' চিৎকার করে উঠলো কার্তান্‌বাই। একটা লাঠি হাতে নিয়ে দরজার দিকে দৌড়ুলো, কিন্তু তখনি এক পাল কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। জানলার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল দৌড়ে, বরফের উপর দৌড়ের মচ্‌মচ্‌ শব্দ উঠলো, তারপর দরজার উপরে সজোরে অসহিষ্ণুভাবে কড়াঘাত করতে লাগলো কেউ।

এক ঝলক কনকনে কুয়াশার মেঘ ঘরে ঢুকলো যেন। সেটা কেটে যেতেই দিউইশেনকে আমরা দেখতে পেলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে, তিনি টলতে টলতে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন।

'রাইফেল!' দম নিয়ে দিউইশেন বলে ওঠেন।

কিন্তু সত্যি বলতে তার কথা মাথায় ঢুকলো না আমাদের। আমার চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে এলো, শুধু কানে ভেসে এলো দু'বুড়োবুড়ি বিড়বিড় করে বলছে:

'মানত রইলো কালো ভেড়া, মানত রইলো সাদা ভেড়া! দোহাই পীর বাউবোদিনের! সত্যিই তুমি নাকি?'

'রাইফেল, রাইফেল দাও জলদি!' দিউইশেন ফের বলেন।

'রাইফেল নেই। বলছো কী তুমি, এখন কোথা যাবে?'

বুড়োবুড়ি দু'জনেই দিউইশেনের কাঁধ আঁকড়ে ধরে রাখলো।

'তা লাঠি দাও একটা!'

তখন মিনতি করে বুড়োবুড়ি:

'কোথাও যাবে না তুমি, কোথাও না, যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি। আমাদের মেরে ফেল না হয়, তারপর যা ইচ্ছে করো গে!'

হঠাৎ সারা দেহে ভীষণ অদ্ভুত রকমের দুর্বলতা অনুভব করলাম আমি, চুপচাপে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

'ধরতে পারে নি, ধরলো কি না একেবারে ঘরে এসে!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললেন দিউইশেন, হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেললেন এক কোণে। 'রাস্তাতেই ঘোড়াটার দম ফুরিয়েছিল, তারপর তো নেকড়ে তাড়া করলো, গাঁ পর্যন্ত এসে আর পারলো না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তখন নেকড়েগুলো লাফিয়ে পড়লো তার ওপর।'

'ঠিক আছে, ঘোড়া গেছে যাক, বড়ো কথা হলো — তুমি যে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছো। ঘোড়া ফেলে না এলে তোমাকে ওগুলো ছাড়তো ভেবেছ! পীর বাউবোদিনের জয় হোক, ভালোয় ভালোয় যে সব চুকেছে — এই ঢের। এখন কাপড়চোপড় খোলে তো দেখি, আগুনের কাছে একটু বসো। দেখি, বুটটা খুলে নি,' কার্তানবাই তাড়া লাগায়, 'আর বুড়ি, তোমার যা আছে একটু গরমটরম করো।'

উনুনের ধারে বসলো দু'জনে, আর এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কার্তান্‌বাই।

'যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। কিন্তু আজ তোমার ফিরতে এত দেরি হলো কেন বলো তো?'

'ভল্‌কোমে* মিটিং শেষ হতে দেরি হলো, কার্তান্‌বাই। পার্টিতে জয়েন করেছি আমি।'

'চমৎকার। তুমি তো কাল সকালে বেরুলেই পারতে; ঠ্যাঙা নিয়ে কেউ তাড়া করেছিল না কি যে আজকেই বেরুতে হলো?'

'আমি বাচ্ছাদের আজকেই ফিরে আসবো বলেছিলাম,' জবাব দেন দিউইশেন, 'কাল সকালে ওরা পড়তে আসবে তো!'

'আচ্ছা, পাগল তো!' কার্তান্‌বাই লাফিয়েই ওঠে প্রায়, ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়াতে থাকে. 'আরে, ও বুড়ি, শোনো, শোনো! আরে কান্ড দেখ, বলি ঐ বাচ্ছাগুলো — নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, ওদের না কি কথা দিয়েছিল! আর যদি মরেই যেত আজ, তাহলে? ভাল, ভাল! বলি, কী আবোল-তাবোল বলছো ভেবে দেখেছ?'

'এটা আমার কর্তব্য, এই তো আমার কাজ, কার্তান্‌বাই। তবে অন্য কথা বলতে পারো বটে: হেঁটেই তো যাই চিরকাল. এবার কি যে ভূতে পেলো আমায়, আপনার কাছে ঘোড়া চেয়ে বসলাম আর তাও দিয়ে এলাম নেকড়ের পেটে...'

'আরে, কী বলছো! ও-কথা নয়। যমের দোরে যাবার ছিল, গেছে। তোমার জানের বদলে সদ্‌কাই** হলো না হয়!'

---

* ভল্‌কোম্ — ভলোস্ত্ কমিটি। — সম্পাঃ

** সদ্‌কা — উৎসর্গ। ধর্মীয় প্রথানুযায়ী প্রাণের বদলে প্রাণ উৎসর্গ। — সম্পাঃ

খেঁকিয়ে ওঠে কার্তানবাই। 'বলে, জীবনই গেল ঘোড়া ছাড়া, তা এখন রইলো না তো কী হয়েছে! সোভিয়েত রাজ থাকলে, পরে আবার হবে...'

'এতক্ষণে, বুড়ো, কাজের কথা বলেছ,' কান্নাভেজা গলায় সায় দিলো সাইকাল্, 'আবার হবে... ঠিক আছে, বাবা এসো, খাবে এসো গরম থাকতে থাকতে...'

সকলে চুপ করে গেল। মিনিটখানেক পরে আগুনটা উশকে দিতে দিতে কার্তানবাই চিন্তিত স্বরে বলতে থাকে:

'আমি তোমাকে দেখি আর অবাক হই, দিউইশেন; তুমি তো মোটেই বোকাসোকা নও, বরং বেশ বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু কোনোরকমেই বুঝতে পারছি না — এই পাঠশালা নিয়ে, আর গুটিকয়েক অপোগণ্ড শিশুকে নিয়ে কী আনন্দে তুমি এত দৌড়োদৌড়ি করছো? না কি, আর কোনো কাজকম্ম খুঁজে পাও নি তাই! কোথাও অন্তত রাখালদের কাজ নিলেও তুমি আরাম আয়েশে ও বড়োলোকী হালে থাকতে পারতে...'

'কার্তানবাই, আমি বুঝি যে আপনি আমার ভালো চান। কিন্তু এই অপোগণ্ডরা যদি পরে আপনার মতোই হয়, বলে যে, পাঠশালে কী হবে, পড়াশোনায় আমাদের দরকারটা কী, তাহলে সোভিয়েত রাজ বেশিদূর এগুতে পারবে না। অথচ আপনারাই তো চাইছেন যে, তা টিকে থাকুক, বেঁচে থাকুক। সেজন্যেই ইস্কুল চালাতে আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কার্তানবাই। কেবল যদি আর একটু ভাল করে ওদের পড়াতে পারতাম, তাহলে আর কিছু চাইতাম না। সেজন্যেই তো লেনিন বলেছিলেন...'

'হুঁ, একটা কথা...' দিউইশেনের কথায় বাধা দিলো কার্তানবাই, চুপ করে থাকলো একটু, তারপর বলতে লাগলো,

'তুমি সব সময় খুব হা-হুতাশ করছো। কিন্তু চোখের পানিতে কি আর লেনিনকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, বলো? ঈশ, পৃথিবীতে এই ক্ষমতাটা যদি কারো থাকতো! না কি তুমি ভাবছো, এ নিয়ে আর কেউ কষ্ট পাচ্ছে না, শোক করছে না?.. বুকের পাঁজর খুলে দেখাতে পারলে বুঝতে: আমারও বুক পুড়ে খাক হয়ে গেছে। সত্যিই জানি না, তোমার মতের সাথে খাপ খাবে কি না, তবে লেনিনের ধর্মবিশ্বাস অন্য রকম হলেও আমি দিনে পাঁচ অক্ত নামাজের সময়ে তাঁর জন্যে মোনাজাত করি। অন্য সময় আবার ভাবি, দিউইশেন, তাঁর জন্যে যতই শোক করি না কেন, লাভ তো কিছু নেই। নিজের মতো ক'রে, সেকেলে বুদ্ধিআক্কেল নিয়ে আমি তো এরকমই ভেবেছি: লেনিন লোকজনের অন্তরে বেঁচেই থাকবেন, বুঝলে দিউইশেন, বাপ-মার কাছ থেকে ছেলেমেয়ের মধ্যে বংশানুক্রমে রক্তের মধ্যেই থেকে যাবেন।'

'শুক্রিয়া, কার্তান্‌বাই, আপনার কথার জন্যে শুক্রিয়া। ঠিকই ভেবেছেন আপনি। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাতে কি, লেনিনের পথেই আমাদের জীবন চলবে...'

তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে হলো, আমি যেন কত দূর থেকে ফের নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। প্রথমে মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি। বহুক্ষণ ধরে কোনো রকমেই নিজেকে বোঝাতে পারছিলাম না যে, দিউইশেন জীবিত অবস্থায়, অক্ষত ফিরে এসেছেন। আর তারপর, বাসন্তী জলপ্রবাহের ন্যায় অদম্য স্বতোচ্ছল কোনো আনন্দধারা আমার নির্ভার হৃদয় প্লাবিত করে দিয়ে গেল যেন; তার উষ্ণ ধারায় আমি অবগাহন করে উঠেছি, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার মতো ও-রকম আনন্দ হয়তো কেউ কখনো কোনোদিন অনুভব করে নি। সেই মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই আর সত্য মনে

হলো না: না ঐ মাটির ঘর, না ঘরের বাইরে ঝড়ো রাত, বা কার্তান্‌বাইয়ের একমাত্র ঘোড়াকে গ্রামের প্রান্তে ছিন্নভিন্ন করেছে যে নেকড়ে পাল তা। কিছুই না! আমার হৃদয়-মন, আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে আমি আলোকের ন্যায় এক অশেষ, অতল, অলৌকিক আনন্দ অনুভব করলাম। আমার ফোঁপানি যাতে কেউ শুনতে না পায় তাই আমি কম্বলে মাথা ঢেকে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে ধরলাম। কিন্তু দিউইশেন শুনতে পেয়েছিলেন:

'উনুনের ওখানে কে ফোঁপাচ্ছে?'

'ও আমাদের আল্‌তিনাই, ভয়টয় পেয়েছে, তাই কাঁদছে,' জবাব দেয় সাইকাল্‌।

'আল্‌তিনাই? সে এখানে কোত্থেকে?' নিজের জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন দিউইশেন। আমার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে আমার মাথার কাছে বসলেন, আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন। 'কী হয়েছে, আল্‌তিনাই? কাঁদছো কেন?'

আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আগের চেয়ে আরো ভয়ানকভাবে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

'দেখ দেখি! ও খুকুমণি, বলি হয়েছে কী, কিসে এত ভয় পেলে? এ-রকম কেউ করে না কি, ছিঃ, তুমি আমাদের কত্তো বড়ো হয়ে গেছ... আচ্ছা, হয়েছে-হয়েছে, আর না, লক্ষ্মীটি, এবার আমার দিকে তাকাও তো একটু...'

আমি সজোরে আঁকড়ে ধরে রইলাম দিউইশেনকে, তাঁর কাঁধে আমার ভেজা উত্তপ্ত মুখ গুঁজে পড়ে থাকলাম, ভীষণ ফোঁপাতে লাগলাম, কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছিলাম না আমি। খুশিতে ভরে উঠেছিলাম আমি, যেন জ্বরের ঘোরে, তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার কোনো শক্তিই ছিল না আমার।

'ওর ওপর ঠিক কারো ভর হয়েছে!' কার্তান্‌বাইও উদ্বিগ্ন হয়ে সুজানি ছেড়ে উঠে পড়লো। 'বুড়ি, আরে বিড়বিড় করো কিছু একটা পড়োটড়ো...'

তারা সবাই হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সাইকাল্‌ বিড়বিড় করে ভূতছাড়ানো মন্ত্র পড়তে লাগলো, একবার ঠাণ্ডা একবার গরম পানিপড়া নিয়ে আমার মুখে ছিটোতে লাগলো, ভাপ দিল আমাকে আর আমার সাথে সাথে নিজেও কাঁদতে শুরু করলো।

ঈশ্‌, কেবল যদি ওরা জানতো যে আমার মধ্যে 'ভর হয়েছে' এক মহা আনন্দের যা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই, প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

যতক্ষণ না আমি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ততক্ষণ আমার পাশে বসে রইলেন দিউইশেন, ধীরে ধীরে আমার উত্তপ্ত কপালে ঠাণ্ডা হাত বুলাতে লাগলেন।

পাহাড়ের অন্য দিকে শীত চলে গেছে। বসন্ত তার সব সুনীলতা নিয়ে হৈ হৈ করে এসে পড়েছে। সিক্ত, স্ফীতকায় প্রান্তর থেকে উষ্ণ মেদুর বাতাসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে। পৃথিবীর বাসন্তী হৃদয়ের সুবাস, টাটকা ঈষদুষ্ণ দুধের গন্ধ তার মধ্যে। বরফের স্তূপ ভেঙে যাচ্ছে, পাহাড়ী তুষারের ঢল গলছে, চিক চিক করছে পাহাড়ী নদী, আর পরে পথিমধ্যে স্ফীতকায় হতে হতে তারা ঝড়ো উদ্দাম বেগে দু-পাশের বাঁধন ভাঙতে ভাঙতে পূর্ণ গর্জনে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

হতে পারে, আমার কৈশোরে সেটাই ছিল প্রথম বসন্ত। যাই হোক, আমার অভিজ্ঞতায় সুন্দরতম বসন্ত ছিল তা।

আমাদের পাঠশালা যেখানে, সেই টিলা থেকে বসন্তে অপূর্ব এক পৃথিবীর উন্মীলন চোখে পড়তো। পৃথিবী যেন দু'হাত ছড়িয়ে পাহাড় থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, আত্মসংবরণে অক্ষম, নিচে — বহুদূরে ঝিকমিক করা রূপোলি, রৌদ্রস্নাত, হালকা, মায়াবী, কুয়াশাচ্ছন্ন স্তেপে। কোনোখানে, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে যেন, টলটল করছে বরফগলা নীল হ্রদ; কোথাও কোনোখানে, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে যেন, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি; কোথাও কোনোখানে, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে যেন, আকাশ বেয়ে উড়ে যাচ্ছে বলাকা, পাখায় তাদের শুভ্র মেঘদল। কোথা থেকে আসছে ঐ বলাকার ঝাঁক? ঐ বেদনাচ্ছন্ন, ঝংকৃত চিৎকারে আমার হৃদয়কে কোথায় তারা ডাক দিয়ে যায়?..

বসন্ত সমাগমে উল্লাসে ভরে উঠেছিল আমাদের জীবন। হাজারটা খেলা তখন মাথা থেকে বেরুচ্ছে আমাদের, অকারণে হাসির বন্যা বইয়ে দিচ্ছি, আর ক্লাসের শেষে পাঠশালা থেকে গ্রামে ফেরার সারাটা পথ মহা সোরগোল তুলে দৌড়েই পার হচ্ছি আমরা। চাচী মোটেই পছন্দ করতো না এসব, ফলে বকুনি দেয়ার কোনো সুযোগ সে ছাড়তো না:

'বলি এত হা-হা-হি-হি কিসের রে হতচ্ছাড়ী? কাজকম্মে তো ঢু-ঢু, ধিঙ্গি মাগী! ভালমানুষে লোকদের মেয়ে দেখ্ গে, কবে বে'-থা হয়ে ঢুকে গেছে, সংসারে নতুন আত্মীয় কুটুম এনেছে, আর ইনি দেখ না... ভারি একটা ফুর্তি পেয়েছে — ইস্কুলে যাওয়া... দাঁড়া একটু, কব্জা করে আনছি...'

সত্যি বলতে, চাচীর গালমন্দ মনে বড়ো একটা পুষে রাখতাম না: সারা জীবনই তো বকুনির উপর — এটা আর নতুন কী! তবে, আমাকে যে 'ধিঙ্গি মাগী' বললো, সেটা তো মোটেই সত্যি না। ওবারের বসন্তে একটু কেবল মাথায় লম্বা হয়েছিলাম আমি — এই যা।

'একটা এলোকেশী পাগলী আমাদের!' দিউইশেন হাসেন, 'আরে, তোমার চুলও যে মনে হচ্ছে বাদামী গো!'

তাঁর কথা একটুও খারাপ লাগে না আমার। মনে মনে ভাবলাম, এলোকেশী তো বটেই, তবে পুরোপুরি বাদামী নই। যখন বড়ো হবো, সত্যিকারের বিয়ের কনে হবো যখন, তখন বুঝি আর এমন থাকবো? তখন চাচী দেখবে'খন — আমি কী রকম সুন্দরী। দিউইশেন বলেন, আমার চোখ না কি ঠিক যেন তারা — ঝিকমিক করে, আর মুখ বড়ো সরল।

একবার, পাঠশালা থেকে ঘরে ফিরেছি আমি, দেখি উঠোনে দুটো অচেনা ঘোড়া বাঁধা। জিন আর সাজ দেখে বুঝলাম, মালিক পাহাড়ের ওদিক থেকে এসেছে। এরকম আগেও ঘটেছে যে, এ-রকম লোকজন বাজার থেকে ফেরার কিংবা ময়দাকলে যাওয়ার পথে একটু এদিক ঘুরে যায়।

চৌকাঠের ওদিক থেকে চাচীর বিগলিত হাসি আমাকে যেন ফালা ফালা করে চিরে ফেললো: 'অ ভাইপো, বলি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, এতে তো আর গরিব হবে না। কিন্তু পরে, হাতের মুঠোয় ময়না একবার এসে গেলে, তখন আমার কতো গুণ গাইবে, দেখো। হিঃ হিঃ হিঃ।' উত্তরে হাস্যবিগলিত কণ্ঠের অনুমোদন কানে এলো, কিন্তু যখন আমি দরজার কাছাকাছি এলাম হঠাৎ সবাই চুপ মেরে গেল। সুজনি উপরে বিছান চাদরের পাশে বসে আছে যেন একটা গাছের গুঁড়ি — লালচে মুখো, বিশাল বপু একটা লোক। সে তার ঘর্মাক্ত কপালের উপর টেনে নামানো খেঁকশিয়ালী টুপীর আড়ালে ত্যারচাভাবে আমাকে দেখলো, তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে চোখ নামিয়ে নিল।

'এই যে মা, এসে গেছিস। আয় তো মা এদিকে!' গলায় মধু ঢেলে কাষ্ঠহাসি হেসে চাচী আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

সুজানির এক পাশে চাচা আরেক অচেনা লোকের সাথে বসে ছিল। তাস পিটছে তারা, কিমা ছড়ানো সেমাইয়ের সাথে ভোদ্‌কা টানছিল। দু'জনেই মদে চুর; আর যখন তারা তাস ফেলছিল, তাদের মাথা বড়ো অদ্ভুতভাবে দুলছিল এদিক-ওদিক।

আমাদের বাদামী বিড়াল চুপিসারে চাদরের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু লালচেমুখো তার মাথায় এমন এক গাঁট্টা বসালো যে বিড়ালটা আর্তনাদ করে এক লাফে সরে গেল, ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। ঈশ্‌, কী ব্যথাটাই না পেয়েছে বেচারী! আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল ওখান থেকে, কিন্তু কীভাবে বুঝতে পারছিলাম না। চাচীই বাঁচিয়ে দিলো আমাকে:

'মা-মণি, ডেকচির মধ্যে খাবার আছে, যাও ঠাণ্ডা হবার আগেই খেয়ে নাও গে।'

বেরিয়ে গেলাম আমি। তবে চাচীর এই ব্যবহার আমার মোটেই ভালো লাগলো না। মন খুব ছটফট করতে লাগলো। আমাকে সাবধান হতেই হলো।

ঘণ্টা দুয়েক পর আগন্তুকেরা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ চাচী তার চিরাচরিত গালিগালাজ করতে শুরু করলো আমাকে আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। "মানে, নেশার ঘোরে তাহলে আদর বেরুচ্ছিল," ভাবলাম আমি।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে বুড়ী সাইকাল্‌ একদিন আমাদের ওখানে এসে হাজির। আমি উঠোনে ছিলাম, কিন্তু শুনতে পেলাম সে বলছে:

'তুমি কী রকম গা? বাদ দাও ও-সব; মেয়েটাকে নষ্ট করবে যে!'

চাচী আর সাইকাল্ কী নিয়ে যেন তুমুল তর্ক করতে লাগলো. দু'জনেই দু'জনের কথায় বাধা দিতে লাগলো. তারপর একসময় অত্যন্ত রেগেমেগে সাইকাল্ বুড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ক্রোধান্বিত অথচ সেই সাথে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ চলে গেল সে। এদিকে আমি আর আমাতে রইলাম না। আমার পানে অমনভাবে তাকাল কেন, কী এমন করলাম, কখন তাকে আঘাত দিলাম?

পরের দিন পাঠশালে গিয়েই আমি দেখলাম, দিউইশেন মুখ কালো করে আছেন, যে-কারণেই হোক খুব উদ্বিগ্ন, যদিও নিজের মনোভাব গোপন রাখতেই চাইছিলেন আমাদের কাছ থেকে। আমি আরো লক্ষ্য করলাম, যে কোনো কারণেই হোক আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না। ক্লাসের পর যখন আমরা সবাই হুটোপুটি করে পাঠশালা থেকে বেরুচ্ছি এমন সময় দিউইশেন ডাকলেন আমাকে:

'দাঁড়াও, আল্তিনাই।' মাস্টার সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এলেন, স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রাখলেন, হাত রাখলেন আমার কাঁধে। 'তুমি বাসায় ফিরে যেও না। কী বললাম, বুঝতে পেরেছ আল্তিনাই?'

ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। কেবল তখনি আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে চাচীর মতলব কী!

'তোমার হয়ে যা বলবার আমি বলবো।' দিউইশেন বললেন, 'তুমি আপাতত আমাদের ওখানেই থাকবে। আর সব সময় আমার কাছাকাছি থেকো।'

সন্দেহ নেই, মুখের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল আমার। দিউইশেন থুতনি ধরে আমার মুখ তুলে ধরলেন একটু, আমার চোখের উপর চোখ রাখলেন, চিরকাল যেমন তিনি হাসেন তেমনিভাবে হাসলেন।

'ভয় পেও না, আল্‌তিনাই!' হাসলেন তিনি। 'আমি যতক্ষণ আছি তোমার পাশে, ভয়ের কিচ্ছুটি নেই। আগে যেমন করছিলে তেমনি পড়াশুনো করো, পাঠশালে এসো, এ ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই... আমি তো জানি, তুমি কী রকম ভীতু... হ্যাঁ, ভালো কথা, অনেক দিন ধরেই কথাটা তোমায় বলতে চাইছিলাম।' কিছু একটা হাসির ব্যাপার মনে পড়ায় ফের তিনি হাসলেন। 'মনে আছে, ওদিন অত ভোরে উঠে কার্তান্‌বাই কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে একজনকে ডেকে আনতে গিয়েছিল — কাকে, আন্দাজ করো তো দেখি! ওঝা আনতে গিয়েছিল, জাইনাকের বুড়িকে। "কেন," যখন জিজ্ঞেস করলাম। বলে: "একটু ঝাড়ফুঁক করুক, দেখছ না ভয় পেয়ে আল্‌তিনাই কী রকম হয়ে গেছে, ভর হয়েছে ওর ওপরে।" তখন বললাম: "ধুঃ, ধুঃ, দোরগোড়া থেকেই ভাগিয়ে দাও, একটা ভেড়া না দিলে তার হাত থেকে রক্ষাই পাব না। আর আমরা কি বড়লোক না কি? ঘোড়াটোড়াও দিতে পারবো না, সেটা তো দিয়ে এসেছি নেকড়ের পেটে...'' এ-সব কথা যখন হচ্ছে তখনো তুমি ঘুমে। এভাবেই শেষপর্যন্ত ওঝা ভাগিয়ে দেয়া হলো। তারপর কার্তান্‌বাই পাক্কা একটা সপ্তাহ আমার সাথে কথা বলে নি, ওর খুব মনে ঘা লেগেছিল। বলে: "তুমি কি না এই বুড়ো মানুষটার মুখ ডোবালে!" তবে সব মিলিয়ে বড়ো ভাল লোক ওরা, ও-রকম ভালোমানুষ আজকাল পাওয়া যায় না বড়ো একটা। যাক্‌গে, আল্‌তিনাই, তা এখন ঘরে যাওয়া যাক না কি...'

মাষ্টার সাহেবকে আমি অনর্থক চিন্তিত করতে চাইলাম না, যদিও নানান শঙ্কা থেকে আমি রেহাই পেলাম না, তবু আমি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এতো

সত্যিই, যে-কোনো মুহূর্তে তো চাচী এখানে চলে আসতে পারে আর জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারে আমাকে। আর তারপর তারা যা-ইচ্ছা করতে পারে আমাকে নিয়ে, সারা গাঁয়ের একটা মানুষও তাতে বাধা দিতে পারবে না। সেই ভয়ানক সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত রাত চোখে ঘুম এলো না।

দিউইশেন, কোনো সন্দেহ নেই, আমার অবস্থা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। আর হয়তো-বা সেজন্যেই, আমার দুর্ভাবনাকে একটু হালকা করার জন্যে তিনি পরের দিন দুটো ছোটো ছোটো চারা গাছ নিয়ে এলেন ইশ্‌কুলে। তারপর ক্লাসের পর আমার হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

'আল্‌তিনাই, এসো, দু'জনে মিলে এবার আমরা একটা কাজ করবো, কেমন?' এ-কথা বলে হেঁয়ালির হাসি হাসলেন তিনি। 'এই যে দেখছ পপলার, আমি তোমার জন্যে এগুলো এনেছি। আমরা এগুলো লাগাবো। তারপর যতদিনে ওরা বেড়ে উঠবে, যতদিনে বেশ তাজা হরহরে হয়ে উঠবে ওরা, ততদিনে তুমিও অনেক বড়ো হয়ে যাবে, চমৎকার মহিলা হয়ে উঠবে ততদিনে। তোমার মন ভালো, তোমার কৌতূহল অনেক। আমার সব সময়েই মনে হয় যে, তুমি বড়ো পণ্ডিত হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমিও দেখো — তোমার কপালে তাই লেখা আছে। এখনো তো তুমি ছোট্টো খুকী, ঠিক যেন চারা গাছ, অবিকল এই পপলার দুটোর মতোই। এসো, নিজের হাতেই আমরা চারা দুটো লাগাই। লেখাপড়াতেই তুমি যেন চিরকাল সুখ পাও, আমার সোনামণি...'

চারা দুটো লম্বায় আমার সমান -- কাঁচ নীলাভ পপলার চারা। পাঠশালের অল্প দূরে গাছ দুটো লাগিয়ে আমরা সবে উঠেছি, এমন সময় পাহাড়ের ওদিক থেকে হাওয়া বইতে

শুরু করলো, তাদের ছোট্টো কচি কচি পাতা প্রথম বারের মতো স্পর্শ পেলো তার, জীবনের আস্বাদে শিউরে উঠলো ওরা। সমস্ত পাতা কাঁপতে লাগলো তাদের, সারা অঙ্গ আন্দোলিত হতে লাগলো, দুলতে লাগলো এদিক-ওদিক...

'দেখ, দেখ, কী চমৎকার!' একটু পিছনে সরে গিয়ে হেসে উঠলেন দিউইশেন। 'এইবার আমরা একটা ছোট্টো নালা কেটে আনবো -- ঐ যে ঝর্ণাটা দেখছো, এখান থেকে। তারপর দেখো, কী রকম সুন্দর গাছ হয়ে উঠবে ওরা! এখানেই ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে, এই টিলার উপর, পাশাপাশি — যেন দুই ভাই। সবাই ওদের দেখতে পাবে দূর থেকে, যারা লোক ভালো তাদের মন ভরে উঠবে এ দেখে। ততদিনে জীবন অনেক পাল্টে যাবে, আল্‌তিনাই। যা-কিছু ভালো তার সবই তো এখনো সামনে পড়ে আছে...'

দিউইশেনের এই অপূর্ব ব্যবহার আমাকে যে কী আলোড়িত করেছিল তার কিছুমাত্র প্রকাশের ভাষাও এখনো আমার জানা নেই। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু তাকিয়ে রইলাম তাঁর পানে। যেন সেই প্রথম দেখছি এভাবে আমি দেখছিলাম তাঁকে, — কী পবিত্র সুষমা তাঁর মুখে, চোখে কী স্নেহ ও সহৃদয়তা; আগে কখনো জানতেও পারি নি কর্মের উদ্যমে তাঁর হাত কী সমর্থ ও নিপুণ হয়ে উঠতে পারে, কী অমলিন তাঁর হাসি — সারা হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়। আমার বুকের মধ্যে কোন্ অলৌকিক জগতের এক নতুন, অচেনা অনুভব গভীর উষ্ণতায় তরঙ্গিত হতে লাগলো। আর ভিতরে ভিতরে আমার সমস্ত সত্তা দিউইশেনের পানে ছুটে গেল, মুখ ফুটে কত বলতে চাইলাম: "মাষ্টার সা'ব, শুক্‌রিয়া, শুক্‌রিয়া আপনাকে, আপনি যে আজ এমন মানুষ হয়েছেন তার জন্যে শুক্‌রিয়া... জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে

আপনাকে, চুমু খেতে ইচ্ছে করছে!" কিন্তু আমি পারলাম না, ও-সব কথা বলতে লজ্জা হলো। কে জানে, হয়তো বলাই ভালো ছিল...

টিলার উপরে, উজ্জ্বল আকাশের নিচে, আমাদের চারদিক ঘিরে বসন্তে সবুজ হয়ে ওঠা পর্বতপাদদেশ, — আমরা তখনও দাঁড়িয়ে আছি, যে যার স্বপ্নে বিভোর। যত বিপদ আমার মাথার উপরে ঝুলছে, স-ব আমি ভুলে গেলাম সে-মুহূর্তে। আগামী কাল আমার কপালে কী আছে, সে-ভাবনাও আমার মনে এলো না; আজ দ্বিতীয় দিন যাচ্ছে তবু চাচী কেন খুঁজছে না আমাকে, সে-ভাবনাও আমার মনে এলো না। কে জানে, হয়তো আমাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না তারা, হয়তো ঠিক করেছে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে? কিন্তু, দিউইশেন মনে হলো, ভাবছিলেন ও-সব নিয়ে।

'খুব বেশি ভেবো না, আল্‌তিনাই, উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই,' গাঁয়ে ফেরার পথে তিনি বলে উঠলেন। 'পরশু আমি ভোলস্তে যাব। তোমার ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো আমি। হয়তো, তোমাকে পড়াশুনোর জন্যে শহরে পাঠাতে রাজী করাতে পারবো। কী, শহরে যেতে মন চায়?'

'মাষ্টার সা'ব, আপনি যা বলবেন তাই হবে,' আমি বলি।

যদিও আমার পক্ষে কল্পনা করাই সম্ভব ছিল না — শহর, সে আবার কেমনতরো, তবু শহরে যাবার স্বপ্ন দেখার জন্যে দিউইশেনের কথাই যথেষ্ট ছিল আমার কাছে। সেই অচেনা, আমার জন্যে কোথাও কোনোখানে অপেক্ষা করে থাকা সেই জায়গার কথা ভেবে একবার যদি-বা ভয় পাচ্ছি, তো আবার ঠিক করছি — চলেই যাবো। সত্যি বলতে, মগজে যে শহরের চিন্তা একবার ঢুকেছিল, তা বেরুবার কোনো লক্ষণ ছিল না।

আর পরের দিন পাঠশালে বসে ভাবতে লাগলাম: শহরে

কী ভাবে, কাদের কাছে আমি থাকবো। কেউ যদি আমাকে একটু থাকবার জায়গা দেয় তো যা হুকুম করবে স-ব করবো — জ্বালানি কাঠ কাটবো, পানি আনবো, কাপড় কাচবো, যা বলবে তা-ই। ক্লাসে বসেই চিন্তার মধ্যে আমি ডুবে গিয়েছিলাম, চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পেলাম যখন আমাদের জীর্ণ পাঠশালার দেয়ালে দেয়ালে অশ্বক্ষুরের আওয়াজ প্রহৃত হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা এত অকস্মাৎ, আর ঘোড়াগুলো এত তীব্রবেগে ছুটে আসছে যে মনে হচ্ছিল আমাদের ইশ্‌কুলটাকে পদভারে দলিত-মথিত করে দিচ্ছে। আমরা কান খাড়া করে রইলাম, ভিতরে ভিতরে জমে গেলাম যেন।

'অন্য দিকে কান দিও না, নিজেদের পড়া করো তোমরা,' দিউইশেন বলে উঠলেন।

কিন্তু তখনই এক ধাক্কায় সশব্দে খুলে গেল দরজা; আমরা দেখতে পেলাম, আমার চাচী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মুখে কুটিল হাসি ছড়িয়ে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করছে। দিউইশেন এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে:

'আপনার এখানে কী প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন যাই হোক, তার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, বাপু। আমার মেয়েকে এখন বিয়ে দিতে হবে। এই ছুঁড়ি, ওঠ্, হাঘরে মাগী কোথাকার!' আমার দিকে ছুটে আসতে গেল চাচী, কিন্তু দিউইশেন পথ আটকে দাঁড়ালেন।

'এখানে তো কেবল পাঠশালার ছেলেমেয়ে, বিয়ে দেবার মতো কেউ নেই তো!' শান্তভাবে অথচ কড়া গলায় দিউইশেন জবাব দিলেন।

'বটে! সেটা আমরা দেখছি আছে কি নেই। এ-ই, তোমরা চলে এসো, ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করো তো কুত্তীটাকে!' হাত নেড়ে ঘোড়সওয়ারদের একজনকে ডাক দিলো চাচী।

খেঁকশেয়ালী টুপী পরা লালচেমুখো সেই লোকটা। তার পিছন পিছন ঝটতি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো আরো দু'জন, হাতে তাদের মোটা ভারি লাঠি।

আমাদের মাষ্টার সাহেব এক পা-ও নড়লেন না তাঁর জায়গা থেকে।

'বলি পেয়েছিস কি রে, রাস্তার কুত্তা? তোর বৌ না কি সবাই যে অন্যের মেয়েদের হুকুম করবি তুই? পথ ছাড়!'

লালচেমুখো লোকটা ভালুকের মতো তেড়ে এলো দিউইশেনের দিকে।

'এখানে আসার কোনো অধিকার নেই তোমাদের, এটা ইশ্‌কুল!' শক্ত করে দরজার বাজু ধরে বলে উঠলেন দিউইশেন।

'বলেছি না আমি!' চাচী চেঁচিয়ে ওঠে, 'অনেক আগে থেকেই ব্যাটাচ্ছেলে ছোঁক ছোঁক করে মেয়েটাকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। নিখরচায় কুত্তীটাকে হাতাচ্ছে খুব!'

'তোর ইশ্‌কুলে পেচ্ছাব করি আমি!' গর্জে ওঠে লালচেমুখো, চাবুক ঝলকে ওঠে তার হাতে।

কিন্তু দিউইশেন তার আগেই সজোরে এক লাথি কষিয়ে দেন তার পেটে, কোঁ-ক করে পড়ে যায় লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে ঐ দু'জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে মাষ্টার সাহেবের উপর। ছেলেমেয়েগুলো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে। টানাহ্যাঁচড়ায় দরজাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমাকে আঁকড়ে-ধরা বাচ্ছাগুলোকে নিয়েই টেনে-হিঁচড়ে গিয়ে আমি ঐ হুটোপুটির মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

'ছেড়ে দাও, মাষ্টার সা'বকে ছেড়ে দাও! মেরো না, খবরদার। এই তো আমি, আমাকে নিয়ে চলো, মাষ্টার সা'বকে মেরো না!'

দিউইশেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। সারা দেহে তাঁর রক্ত, ভয়ঙ্কর এবং নির্মম দেখাচ্ছে তাঁকে। মাটি থেকে একটা কাঠের চ্যালা তুলে নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি:

'বাচ্ছারা, তোমরা গাঁয়ের দিকে সব পালাও। আল্‌তিনাই, পালাও!' হঠাৎ তাঁর চিৎকার আর্তনাদে পরিণত হলো।

ওরা তাঁর হাত ভেঙে দিয়েছে। বুকের উপরে হাতটা সেঁটে ধরে পিছনে হটে যান দিউইশেন; আর ওরা, যেন পাগলা ষাঁড়, গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর, অরক্ষিত তাঁকে সমানে প্রহার করতে থাকে।

'মারো! মারো! মাথায় মারো! এক ঘায়ে সাবাড় করে দাও!'

লালচেমুখোটাকে নিয়ে আমার ক্রোধান্ধ চাচী লাফিয়ে আমার পানে তেড়ে এলো। তারা আমার কণ্ঠে বেণী জড়িয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল বাইরে, উঠোনে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করলাম আমি, আর সেই মুহূর্তেই চোখে পড়লো ছেলেমেয়েরা ভয়ে হৈচৈ কান্না জুড়ে দিয়েছে, আর দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দিউইশেন, দেয়াল জুড়ে রক্তের কালো ছিটলাগা দাগ।

'মাষ্টার সা'ব!'

কিন্তু আমাকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা দিউইশেনের ছিল না। কোনোরকমে পা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন, অত্যাচারের চোটে টলছেন মাতালের মতো, ঝুলে-পড়া মাথাটা কোনোরকমে একেকবার তুলবার চেষ্টা করছিলেন, আর ওরা তাঁকে সমানে মেরে যাচ্ছিল। আমাকে মাটির উপর উপুড় করে ফেলে আমার দুটো হাতে বাঁধলো তারা। আর তখনই মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন দিউইশেন।

'মাষ্টার সা'ব!'

কিন্তু আমার মুখ চেপে ধরলো ওরা, তারপর আড়াআড়িভাবে জিনের উপরে ছুঁড়ে ফেললো আমাকে।

ল্যালচেমুখো ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে; হাত ও বুক দিয়ে সে চেপে ধরল আমাকে। ঐ দু'জনও — যারা দিউইশেনকে মেরেছে, তারাও তড়াক করে জিনে চেপে বসলো, আর আমার চাচী পাশে পাশে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আমার মাথায় কিলচড়-ঘুষি চালাতে লাগলো:

'এই চাইছিলি তুই, এই চাইছিলি! এ্যাদ্দিনে, যাক্, পাপ বিদেয় হলো! আর তোর মাষ্টারেও শেষ...'

না, মাষ্টারের শেষ তখনও হয় নি। পিছন থেকে মরিয়া চিৎকার ভেসে এলো তাঁর:

'আল্তি-না-ই!'

কষ্টেসৃষ্টে ঘোড়ার গায়ে ঝুলন্ত মাথাটা তুলে তাকাবার চেষ্টা করলাম। আমাদের পিছন-পিছন দিউইশেন দৌড়ে আসছেন। মারের চোটে অর্ধমৃত, রক্তাক্ত — তিনি একখন্ড পাথর হাতে দৌড়ে আসছেন। আর তাঁর পিছন-পিছন কাঁদতে কাঁদতে আসছে সারাটা ক্লাস।

'দাঁড়া, তোরা দাঁড়া, শয়তানের দল! ছেড়ে দে, ওকে তোরা ছেড়ে দে! আল্তিনাই!' আমাদের পিছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চেঁচাচ্ছেন তিনি।

ঘোড়সওয়াররা থেমে গেল। ঐ দু'জন ঘোড়া নিয়ে ঘিরে ধরলো দিউইশেনকে। যাতে ভাঙ্গা হাতটা কোনো অসুবিধে না করে, হাতটার জামার আস্তিন দাঁতে চেপে তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছেন তিনি, কিন্তু একটাও লাগছে না। ওরা তখন দুটো লাঠির দু'ঘায়ে তাঁকে মাটিতে জমা পানির মধ্যে আছড়িয়ে ফেলল। চোখের সামনে সব আবছা হয়ে এলো

যেন, জ্ঞান হারাবার আগে কেবল দেখলাম মাস্টার সাহেবের কাছে দৌড়ে গেল ছেলেমেয়েগুলো, তারপর ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

জানি না, কী ভাবে কোথায় আমাকে ওরা নিয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতে দেখি, এক তাঁবুর মধ্যে আছি। তাঁবুর খোলা ছাদ দিয়ে ভোরবেলার শান্ত, অনুদ্বিগ্ন তারারাজি দেখা যাচ্ছে। কোথাও যেন কাছাকাছি নদীর জলচ্ছল এবং ভেড়ার পাল প্রহরায় রত চৌকিদারদের গলা শুনতে পেলাম। নেভানো উনুনের পাশে এক বয়স্কা নারী বসে আছে, বিষণ্ণ, শুষ্ক, অবিকল যেন এক চিলতে শুকনো কাঠ। মুখ তার মাটির মতো কালো। আমি অন্য দিকে ঘাড় ফেরালাম... ঈশ্, চোখের চাউনিতেই যদি মেরে ফেলা যেত ওকে!

'এই কেলো, ওকে তোল্ দেখি,' লালচেমুখোটা হুকুম করে তাকে।

কৃষ্ণকায়া মহিলাটি আমার দিকে এগিয়ে আসে, তারপর রুক্ষ, কুৎসিৎ হাতে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দ্যায়।

'ওকে বোঝাতে প্যারিস কি না দ্যাখ। বোঝে তো ভালো, নইলে — ওর সাথে এত বাক্যব্যয়ের দরকার দেখি না।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় সে। কৃষ্ণকায়া নারীটি তার জায়গা থেকে নড়লো না একটুও, একটিও কথা বললো না। কে জানে, মহিলাটি বোবা না কি? তার নিস্তেজ, ছাইয়ের মতো ঠাণ্ডা চোখ দুটো তাকিয়েছিল শুধু, তাতে কোনো ভাষা ছিল না। একরকম কুকুর দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো বাচ্ছা বয়েস থেকেই পিটুনী খেয়ে খেয়ে বড়ো হয়েছে। তার নিষ্ঠুর মনিব হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই মাথায় মারে তার, ধীরে ধীরে কুকুরটিও তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে বাসা বাঁধে এমন হতাশা ও শূন্যতা

যে দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। আমি কালো মহিলাটির মৃতপ্রায় চোখ দুটোর দিকে তাকাতেই আমার মনে হলো যে, আমি নিজেও আর জীবিত নই, আমি কবরের মধ্যে আছি। হ্যাঁ, হয়তো সেটাই ঠিক বিশ্বাস করে বসতাম, যদি না ঐ জলচ্ছল শুনতে পেতাম আমি। কলকল ছলছল জল বয়ে যাচ্ছে পাথরের উপরে অবাধ, স্বাধীন জলধারা...

চাচী, তোর একেবারে কালো অন্তর, তুই উচ্ছন্নে যা, জাহান্নমে যা তুই! আমার চোখের পানি আর রক্তেই তুই দম বন্ধ হয়ে মর্!.. সেই রাত্রেই, মাত্র পনেরো বছর আমার বয়স, আমাকে ধর্ষণ করা হলো... পশুটার নিজের বাচ্চাদের চেয়েও বয়সে ছোটো ছিলাম আমি...

তৃতীয় রাত্রে আমি ঠিক করলাম, যে-ভাবেই হোক পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে যদি পথে মারা যাই তো যাব, ধরা পড়ে যাই তো পড়বো, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস আছে ততক্ষণ আমার মাষ্টার সাহেব দিউইশেনের মতোই লড়াই করে যেতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম, দরজা হাতড়ে দেখলাম যে ঘোড়াচুলে তৈরী মজবুত ফাঁস-দড়ি দিয়ে তা ভালোমতো বন্ধ করা হয়েছে। আঁধারে ঐ সব জটিল কায়দার গিঁট খোলা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তখন আমি তাঁবুর নিচের একপাশ তুলে কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে চাইলাম। কিন্তু যতো চেষ্টাই করি না কেন, সবই বৃথা — ঐ একই রকম ফাঁস-দড়ি দিয়ে বাইরে থেকেও বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁবুটা।

এখন বাকি রইলো কেবল ধারালো কিছু একটা হাতে পাওয়া, আর দরজার ঐ দড়ি কেটে ফেলা। চারপাশ আমি হাৎড়ে হাৎড়ে ঘুরতে লাগলাম, কিন্তু ছোট্টো একটা কাঠের

খ্‌ঁটি ছাড়া আর কিছ্‌ই পেলাম না। মরিয়া হয়ে আমি তাঁব্‌র নিচে মাটি খ্‌ঁড়তে লাগলাম। তখন আমি যে কোনো কিছ্‌র আশায় এ-কাজ করছিলাম, মোটেই তা নয়; কিন্তু সে-সব ভেবে দেখার অবস্থা আমার ছিল না। মাথার ভিতরে কেবল একটা চিন্তাই কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে: এখান থেকে পলায়ন অথবা মৃত্যু, — শয়তানটার ভোঁসভোঁসানি, বেহ্‌ঁশ নাকডাকানি শ্‌নতে পারি না আর, এখান থেকে ম্‌ক্তি অথবা মৃত্যু — আর মরতে যদি হয়ই তবে ম্‌ক্তির মধ্যে মরবো, লড়তে লড়তে, তব্‌ কখনো পরাধীনতা মেনে নয়।

'তোকোল্‌' — মানে দ্‌'নম্বর বৌ। উহ্‌, কী ঘেন্নাই না করি এই শব্দটাকে! কে, কখন, কোন্‌ জঘন্য সময়ে যে আবিষ্কার করেছিল একে! দ্বিতীয় পত্নী হওয়ার পরাধীনতা, দেহে মনে ক্রীতদাস হওয়া — এর চেয়ে অপমানকর অবস্থা আর কী হতে পারে? হে হতভাগ্য নারীর দল, তোমরা তোমাদের কবর ছেড়ে উঠে এসো! উঠে এসো, অত্যাচারে নিহতা, ধর্ষিতা, মান্‌ষের যাবতীয় অধিকারবঞ্চিতা নারীর হে প্রেতাত্মারা — তোমরা উঠে এসো! হে শহীদের দল, তোমরা উঠে এসো, ঐ অন্ধকার কালো জগৎ একবার কেঁপে উঠুক! আমি — তোমাদের দলের সর্বশেষ জন, ঐ একই ললাটলিপি পার হয়ে এসেছে যে, সেই আমি ডাকছি তোমাদের!

সে-রাত্রে অবশ্য জানতাম না আমি যে, এ-কথা একদিন আমাকে উচ্চারণ করতে হবে। পাগলের মতো আমি তাঁব্‌র নিচে চেঁচে চেঁচে মাটি খ্‌ঁড়তে লাগলাম। পাথ্‌রে মাটি, কোনো রকমেই কিছ্‌ করা যাচ্ছিল না। নখে করে খ্‌ঁড়ছিলাম আমি, আঙ্‌ল কেটে রক্ত বের্‌তে লাগলো। যখন তাঁব্‌র বাইরে গর্তের ভিতর দিয়ে কেবল বড় জোর একটা হাত বের

করা যায়, তখন ফরসা হয়ে গেল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল, চারপাশের লোকজন জেগে উঠেছে। খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে ঘোড়ার একটা পাল নদীতে জল খেতে গেল, ঘুম জড়ানো চোখে আর একদল ভেড়ার পাল ভ্র-র্‌-র্‌ ভ্র-র্‌-র্‌ করতে করতে চলে গেল। এরপর কে যেন তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালো, বাইরে থেকে ফাঁস দড়িগুলো খুলতে লাগলো, তারপর খুলতে লাগলো সুজনিগুলো। এ সেই নির্বাক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা।

তার মানে — ছাউনি উঠিয়ে নিয়ে এরা চলে যাবে। তখনই মনে পড়লো, গতকাল কাদের যেন কথা কানে এসেছিল — বলছিল যে, সকালেই এ জায়গা ছাড়ার বন্দোবস্ত করবে, প্রথমে যাবে গিরিখাতের ওদিকে — নতুন ছাউনি ফেলবে, তারপর সারা গ্রীষ্মকাল ধরে পাহাড়ের ভিতরে, গিরিখাতের পিছন দিকে থাকবে। ফের মন ভেঙে গেল আমার — ওখান থেকে পালানো এক'শ গুণ কঠিন হবে।

সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জায়গায় যে-ভাবে বসেছিলাম, সে-ভাবেই বসে রইলাম, সেখান থেকে সরে যাবার কথা মনেই হলো না। আমার লুকোবার আর কি আছে, আর কেনই বা লুকোবো, লাভে কী?.. কালো মহিলাটি তো পরিষ্কার দেখেইছে যে, তাঁবুর ভিতরে একজায়গায় মাটি খোঁড়া হয়েছে, একটা কথাও বলে নি সে এ নিয়ে, চুপচাপ নিজের কাজ করে গেছে। বরাবর সে এমন ব্যবহার করে গেছে যে মনে হচ্ছিল, সে কোনো কিছুর মধ্যেই নেই, অনুভব করার মতো কিছুই নেই তার জীবনে। সে এমন কি তার স্বামীকে পর্যন্ত জাগালো না, বেরিয়ে পড়ার আয়োজনে একটুও সাহায্য করতে বললো না তাকে। কম্বল আর ফারকোটের গাদার নিচে ভল্লুকের মতো সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

যত সুজনি ছিল সবই গুটিয়ে নিয়ে বাঁধাছাঁদা হয়েছে, তাঁবু খুলে ফেলা হয়েছে, আর আমি বসে আছি তার মধ্যে ঠিক যেন খাঁচায় বাঁধা পাখি, দেখছি — নদীর ওপারে লোকজন তাদের বলদ, ঘোড়া বোঝাই করছে। নজরে পড়ে, কোত্থেকে যেন তিনজন ঘোড়সওয়ার এসে তাদের দিকে এগিয়ে যায়, কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের এদিক পানে আসতে থাকে। প্রথমে ভেবেছিলাম, যাতে সবাইকে জড়ো করে নিয়ে বেরুতে পারে তাই ওরা ডাকতে আসছে, তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এ যে দিউইশেন, সঙ্গে দু'জন অচেনা লোক — মাথায় ফৌজী টুপী, ফৌজী কোর্তার কাঁধে লাল স্ট্র্যাপ।

আমি জীবন্মৃতের মতো বসেছিলাম, এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে মুখ দিয়ে কথা সরলো না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি -- মাষ্টার সাহেব বেঁচে আছেন! কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুকের মধ্যে এক গভীর শূন্যতা অনুভব করলাম: আমি নিঃশেষিত, আমি কলুষিত...

দিউইশেনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তাঁর হাত গলায় বাঁধা একটা ফেটিতে ঝোলানো। লাফিয়ে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। দরজাটায় লাথি মেরে তিনি তাঁবুর ভিতরে দৌড়ে গেলেন, লালচেমুখোটার উপর থেকে একটানে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'ওঠ্!' জলদগম্ভীর স্বরে গর্জে ওঠেন তিনি।

শয়তানটা মাথা তুললো, চোখদুটো রগড়ালো একবার, তারপর দিউইশেনের উপর লাফিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু ফৌজী লোক দুটোর হাত থেকে তার দিকে তাক্ করে থাকা রিভলভার দেখেই একেবারে মিইয়ে গেল সে। দিউইশেন তার জামার কলার চেপে ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর এক

হ্যাঁচকা টানে একেবারে মুখোমুখি এনে দাঁড় করালেন তাকে।

'শুওরের বাচ্ছা!' তাঁর ফ্যাকাসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফিশফিশ করে আওয়াজ বেরুলো, 'এইবার বলি যাবি কোথায়! চ-ল্ দেখি!'

সুবোধ বালকের মতো শয়তানটা সুড়সুড় করে চলে এলো, কিন্তু দিউইশেন তার কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকুনি দেন, তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন:

'তুই ভেবেছিস, পা দিয়ে ওকে খুব ছানবি, ও যেন তোর পায়ের তলার ঘাস, মেরে ফেলবি ওকে, না?.. তোর দিন শেষ হয়েছে, এবার ওর পালা, বুঝলি, এ্যাদ্দিনে তোর দিন খতম হয়েছে!..'

লালচেমুখোটাকে জুতো পরে নিতে দেওয়া হলো, তারপর ওর হাত বাঁধা হলো, তারপর ওকে ঘোড়ার ওপরে তুলে দেয়া হলো। ফৌজী লোক দুটোর একজন ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে যেতে লাগলো, তার পিছন পিছন অন্যজন চলতে লাগলো ঘোড়ায় চেপে। আমি দিউইশেনের ঘোড়ায় চেপে বসলাম, আর তিনি পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন।

আমরা চলা শুরু করেছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে এক অমানুষিক পাশব তীক্ষ্ন চিৎকার ভেসে এলো। আমাদের পিছন পিছন সেই কালো মহিলাটি দৌড়ে আসছে। সে সত্যিই একেবারে পাগলের প্রায় স্বামীর উপরে লাফ দিয়ে পড়তে চাইলো, একটা পাথর ছুঁড়ে তার মাথার খ্যাকশেয়ালী টুপীটা ফেলে দিলো।

'আমার রক্ত চোষার বদলে এই নে তুই, খুনে জল্লাদ!' মর্মভেদী চিৎকার করে সে বলতে থাকে, 'আমার জীবন তুই ছারখার করেছিস, খুনে জল্লাদ, এই নে তার বদলা! জ্যান্ত তোকে যেতে দিচ্ছি না আমি!'

বোধ হয়, সে প্রায় চল্লিশটা বছর মাথা তুলতে পারে নি। আর এখন তার যত কিছু দাহ, প্রাণের যা-কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা স-ব ছিটকে বেরিয়ে এসেছে আজ। তার তীক্ষ্ণ চিৎকার ঐ প্রস্তরময় গিরিসঙ্কটে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সে একবার এদিকে একবার ওদিকে সমানে ছুটোছুটি করতে থাকে, হাতের কাছে যা পায় — গোবর, পাথর, মাটির ঢেলা, স-ব তার ভীত সন্ত্রস্ত স্বামীর দিকে ছুঁড়ে মারতে থাকে, চিৎকার করে অভিশাপ দিতে থাকে:

'তোর পা যেখানে পড়বে সেখানে একটা ঘাসও গজাবে না রে! মরে গেলে তোকে যেন মাঠে ফেলে রেখে দ্যায়, কাক এসে তোর চোখ খুবলে নেবে রে! তোর পোড়া মুখ যেন আর আমাকে কখনো দেখতে না হয়! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ তুই, পিশাচ, দূর হ, দূর হ, দূর হ!' সমানে সে চেঁচিয়ে যায়, তারপর থামে একটু, তারপর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে করতে দূরে সরে গেল। দৌড়ে চলে গেল সে, তার আলুথালু চুল উড়তে লাগলো বাতাসে।

ঘোড়ায় চেপে তার প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে তার নাগাল ধরলো ঠিক সময়ে।

কোনো ভয়ানক দুঃস্বপ্নের পরে যেমন হয়, আমার মাথার মধ্যে তেমনি সব ভোঁ ভোঁ করছিল। ভাগ্যহতা, মন মরা আমি ঘোড়ার উপরে বসে ছিলাম। আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছিলেন দিউইশেন। চুপ করে ছিলেন তিনি, ব্যাণ্ডেজবাঁধা মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটছিলেন।

কিছুক্ষণ পর আমরা এই দুরদৃষ্ট স্বরূপ গিরিখাত পিছু ফেলে এলাম। ফৌজী লোক দু'জন আগে আগে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দিউইশেন ঘোড়া থামালেন। এই প্রথম আমার

পানে তিনি তাঁর ক্লান্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখ তুলে তাকালেন। বললেন:

'আল্তিনাই, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি নি, ক্ষমা করো আমাকে।' তারপর আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়ালেন তিনি, 'কিন্তু তুমি ক্ষমা করলেও আমি নিজেকে তো কখনো ক্ষমা করতে পারবো না...'

আমি ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। দিউইশেন পাশে দাঁড়িয়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, কেঁদে মন হাল্কা করার সময় দিচ্ছিলেন আমাকে।

'কেঁদো না, আল্তিনাই, চলো, যাওয়া যাক এবার।' অবশেষে বলে উঠলেন তিনি, 'যা বলি, এবার শোনো। দু'দিন আগে আমি ভোলস্তে গিয়েছিলাম। তুমি শহরে পড়তে যাবে এবার। শুনতে পাচ্ছ, শহরে?'

আমরা যখন এক স্বচ্ছ উচ্ছল নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম, তখন দিউইশেন বললেন আমাকে:

'এবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো আল্তিনাই। একটু হাতমুখ ধোও।' পকেট থেকে এক টুকরো সাবান বের করলেন তিনি, 'হুঁ, এই যে, ধরো, আল্তিনাই, আফসোস করো না। ভালো কথা, তুমি বরং এক কাজ করো না — আমি একটু ওদিকে গিয়ে ঘাস খাইয়ে আসি ঘোড়াটাকে, তুমি ততক্ষণে জামাকাপড় খুলে নদীতে স্নান করে নাও। যা কিছু ঘটেছে স-ব ভুলে যাও তুমি, ও সবের কথা কক্ষনো মনে এনো না। একটু সাঁতার কেটো, পারলে; — দেখো, বেশ ভাল লাগবে তোমার। তাহলে — ঠিক আছে, কেমন?'

মাথা নাড়লাম আমি। তারপর দিউইশেন দূরে চলে গেলে জামাকাপড় সব খুলে ফেলে সাবধানে ধীরে ধীরে নদীতে

নামলাম। সাদা, নীল, সবুজ, লাল সব নুড়িপাথর নদীতল থেকে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। নীল জলধারা আমার পায়ের গুল্‌ফে তরঙ্গভঙ্গে আছড়ে পড়ছিল। আমি অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিলাম, আমার সারা বুকে জল ছিটোলাম। আমার দেহময় ছুটোছুটি করতে করতে স্রোত নামতে লাগলো, হালকা মনে হেসে উঠলাম আমি — গত তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম আমি হাসলাম। কী আনন্দই না আছে হাসিতে! আমি ফের বারবার জল ছিটোতে লাগলাম সারা দেহে, তারপর জলের গভীর বুকে আছড়ে পড়লাম। তীরবেগে স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চড়ার দিকে নিয়ে গিয়ে ফেললো, আমি জলের নীচে মাটিতে পা রেখে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ফের ছুঁড়ে দিলাম নিজেকে ফেনিল জলরাশির বুকে।

'ধুয়ে নাও, জল, এ ক'দিনে যত নোংরা জমেছে সব ধুয়ে নাও তুমি! তুমি যেমন স্বচ্ছ নিষ্কলঙ্ক, তেমনি পবিত্র করে দাও আমাকে।' ফিসফিস করে বলে উঠে আমি; হাসি ফুটে ওঠে মুখে, নিজেই জানি না কী জন্যে।

যা-কিছু স্মৃতিময় সেখানে মানুষের পদচিহ্ন চিরকাল কেন পড়ে থাকে না? দিউইশেন আর আমি যে-পথে ঐ পাহাড় থেকে হেঁটে ঘরে ফিরেছিলাম আজ যদি আমি তা খুঁজে পেতাম, তো বুক পেতে দিতাম সেই মাটির বুকে, মাষ্টার সাহেবের পদচিহ্ন চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম আমি। আমার জন্যে ঐ পথ — যত পথ আছে পৃথিবীতে তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। হ্যাঁ, তা-ই; ঐ দিনটি, ঐ পথ — আমার পুনর্জন্মলাভের, নিজের মধ্যে নতুন আত্মপ্রত্যয়লাভের, নব আশা-উদ্দীপনার, নব আলোকের, ঐ পথ আমার জন্যে আশীর্বাদ... সে-দিনের সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, কৃতজ্ঞ আমি সে-দিনের পৃথিবীর প্রতি...

দু'দিন পরে দিউইশেন আমাকে নিয়ে স্টেশানে গেলেন।

যা-কিছু ঘটেছে তার পরে গাঁয়ে থাকতে আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। নতুন জায়গায় নতুন জীবন শুরু করতে হবে। অন্যেরাও আমার সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলে মেনে নিল। সাইকাল্ আর কার্তানবাই আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে কত কিছু তোড়জোড় করলো, বাচ্চা ছেলেপিলের মতো কান্নাকাটি করলো, রাস্তার জন্যে হাতে পুঁটলি গুঁজে দিলো খাবারের। আমাকে বিদায় জানাতে প্রতিবেশীদের অনেকেই এসেছিল, এমন কি ঝগড়াটে সাতিমকুল্ পর্যন্ত।

'ঠিক আছে! আল্লাই তোমাকে দেখবে, বাছা,' সাতিমকুল্ বলেছিল, 'রাস্তার বালাই দূর হোক। ভয় পেও না, মাস্টার সা'ব যা বলেছে সেভাবে চলো — তাহলেই সব ঠিক থাকবে। যা-ই বলো বাপু, আমরাও কিন্তু একটু আধটু বুঝতেটুঝতে শিখছি।'

আমাদের পাঠশালার ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ ধরে আমাদের গাড়ির পিছন-পিছন দৌড়ে এলো, আমাদের পশ্চাতে দীর্ঘ সময় ধরে তারা হাত নেড়ে বিদায় জানালো...

আরো কিছু ছেলেমেয়ের সাথে আমিও তাশখন্দের শিশুভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। স্টেশানে চামড়ার জ্যাকেট পরিহিতা এক রুশ মহিলা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে।

এর পর আরো কতোবারই না আমি পাহাড়ের মধ্যে পপলার ঘেরা এই ছোট্টো স্টেশানটা পার হয়ে গেছি। আমার মনে হয়, আমার হৃদয়ের অর্ধেক ওখানে পড়ে ছিল সব সময়।

সেদিনের বাসন্তী সন্ধ্যায় রক্তিম সূর্যালোকে বিষণ্ণ, বুক-ভাঙা কী যেন একটা ছিল, সেই গোধূলিও যেন জেনেছিল যে আমরা বিদায় নেব। দিউইশেন খুব চেষ্টা করছিলেন

যাতে তাঁর হৃদয়ভার, বুকের মধ্যে কষ্ট কিছুই না বোঝা যায়, কিন্তু আমি তো ঠিকই তা বুঝেছিলাম: কেননা সেই একই যন্ত্রণা যেন আমারও গলার কাছে এসে, গরম, আটকে ছিল। আমার চোখে চোখ রেখে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দিউইশেন, আমার চুলে, আমার মুখে, আমার কোটের বোতামেও হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

'যদি পারতাম তাহলে আমার কাছ থেকে এক পা-ও দূরে যেতে দিতাম না তোমাকে, আল্‌তিনাই।' তিনি বলতে লাগলেন, 'কিন্তু তোমাকে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। তোমাকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখতে হবে। আর আমি, দেখছো তো, কিছুই এমন লেখাপড়া জানি না। চলে যাও তুমি, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে... হয়তো সত্যিই একদিন যথার্থ ভালো শিক্ষক হয়ে উঠবে তুমি, তখন আমাদের পাঠশালার কথা হয়তো মনে পড়বে তোমার, হাসি পাবে... হোক না, তা-ই হোক, তবে তা-ই হোক...'

দূরে ট্রেনের হুইসিলের শব্দ সমস্ত গিরিখাতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, একটু পরে গাড়ির আলো দেখা গেল। স্টেশানে লোকজনদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

'ঠিক আছে, যাবার সময় তো এসে গেল।' আমার হাত চেপে ধরে কাঁপাকাঁপা গলায় দিউইশেন বলতে লাগলেন, 'মন খারাপ করো না, আল্‌তিনাই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা— পড়াশুনো করো, কেবল পড়াশুনো...'

আমি কিছুটি বলতে পারলাম না, চোখের জল আমার কণ্ঠ রোধ করে রেখেছিল।

'কাঁদে না, আল্‌তিনাই,' দিউইশেন আমার চোখ মুছিয়ে দেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে তাঁর: 'ঐ যে পপলার দুটো, তুমি-আমি মিলে যে লাগিয়েছি, আমি নিজের হাতে

ওদের দেখাশোনা করবো। আর তারপর যখন তুমি বেশ বড়ো মানীজ্ঞানী লোক হয়ে ফিরবে এখানে, দেখবে কী চমৎকার হয়েছে ওরা।'

এমন সময়ে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ক্যাঁচক্যাঁচ খট্‌খট্‌ করে বগিগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'ঠিক আছে, আর কি? এবার তাহলে এসো!' দিউইশেন জড়িয়ে ধরেন আমাকে, কপালে গাঢ়ভাবে চুমু খান। 'ভালো থেকো। শুভযাত্রা। এসো তবে, আমার লক্ষ্মী সোনা... ভয় পেও না, বুকে সাহস রেখো।'

লাফিয়ে পা-দানিতে উঠে পড়লাম আমি, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন পানে তাকালাম। জীবনে আমি ঐ দৃশ্য কখনো ভুলবো না: গলা থেকে ঝোলানো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত, দিউইশেন ঝাপসা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, একটু এগিয়ে এলেন তিনি, হাত দিয়ে যেন ছুঁতে চাইলেন আমাকে, এমনি সময় ট্রেন ছেড়ে দিলো।

'বিদায়, আল্‌তিনাই! বিদায়, লক্ষ্মী সোনা!' চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি।

'বিদায়, মাষ্টার সা'ব! বিদায়, আমার প্রিয় মাষ্টার সা'ব!'

ট্রেনের কামরার পাশেপাশে তিনি দৌড়ুতে থাকেন, তারপর পিছিয়ে পড়েন একসময়, ফের হঠাৎ দৌড়ে আসেন তিনি, চিৎকার করে ওঠেন:

'আল্‌তি-না-ই!'

তিনি এমনভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন যে মনে হলো, খুব জরুরী কোনো কিছু তাঁর বলবার ছিল আমাকে, পরে এখন হঠাৎ মনে পড়েছে, যদিও বুঝলেন যে বড়ো দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে... অদ্যাবধি আমার কানে সেই চিৎকার লেগে

আছে, তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসা, হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত সেই ডাক...

আমাদের ট্রেন একটা সুড়ঙ্গপথের মধ্যে ঢুকে গেছে ততক্ষণে, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সমতলভূমির উপর গিয়ে পড়লো, তারপর তীব্র গতি সঞ্চার করে কাজাখস্তানের স্তেপের উপর দিয়ে নবজীবনের দিকে নিয়ে চললো আমাকে...

বিদায়, মাষ্টার সাহেব, বিদায়! আমার প্রথম বিদ্যাপাঠ, বিদায়! হে আমার শৈশব, বিদায়! হে আমার প্রথম, অনুচ্চারিত ভালবাসা, তোমাকে বিদায়!..

হ্যাঁ, তারপর দিউইশেন যেমন কল্পনা করতেন সে-রকমই একটা বড়ো শহরে আমি পড়াশুনো করলাম, বড়ো বড়ো স্কুলগুলোর জানলাও ছিল বড়ো বড়ো ঠিক যেমনটি দিউইশেন গল্প করতেন আমাদের কাছে। এক সময়ে আমি রাব্‌ফাক্* শেষ করলাম, তখন আমাকে মস্কোয় পাঠিয়ে দেয়া হলো — একটা ইনস্টিটিউটে।

বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ বৎসরগুলো কী সুকঠোর পরিশ্রমের মধ্যেই না কেটেছিল, কতবারেই না নিরাশায় ডুবে গেছি, মনে হয়েছে — না, বিজ্ঞানের প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন আমার সাধ্যে কুলোবে না; কিন্তু আমার প্রথম শিক্ষকের কাছে যে-প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্তে আমি তা পালন

---

* রাব্‌ফাক্ — সোভিয়েত দেশে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পরে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের তাড়াতাড়িভাবে প্রস্তুত করার বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'রাবোচি ফাকুলতিয়েৎ' (অর্থাৎ Workers' Faculty বা শ্রমিক অনুষদ) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। — সম্পাঃ

করতে চেয়েছি মনে মনে এবং হাল ছেড়ে দিই নি কখনো। অন্যেরা যা অতি সহজেই আয়ত্ত করে নিত, আমাকে তারই জন্যে ভয়ানক পরিশ্রম করতে হতো। কেননা আমাকে যে শুরু করতে হয়েছিল একেবারে অ-আ-ক-খ থেকে।

রাব্‌ফাকে যখন পড়ছি তখনই একবার চিঠি লিখেছিলাম মাষ্টার সাহেবকে, বলেছিলাম — তাঁকে ভালবাসি আমি, অপেক্ষা করে থাকবো তাঁর জন্যে। সে-চিঠির কোনো উত্তর তিনি দেন নি। এর পরে চিঠিপত্রে কোনো যোগাযোগ আর তাঁর সাথে হয় নি। আমার ধারণা, তিনি আমাকে এবং নিজেকেও যে অস্বীকার করে ছিলেন সেদিন তার কারণ — তিনি আমার পড়াশুনোয় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চান নি। কে জানে, হয়তো তিনি ঠিকই করেছিলেন... কে জানে, না কি অন্য কোনো কারণ ছিল তাঁর? কতো যে দুঃখ পেয়েছি, কতো যে ভুগেছি সে সময়ে বলবার নয়।

আমার প্রথম গবেষণালব্ধ ডিগ্রী আমি মস্কোতেই পাই। আমার জন্য তা এক বিরাট, দারুণ সাফল্য। ঐ ক'টা বছর আমি আমাদের গ্রামের দিকে যাবার সময়ই পাই নি। আর তারপরেই তো শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। হেমন্তের শেষাশেষি তখন, মস্কো থেকে আমাদের তখন সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ফ্রুঞ্জে শহরে — যাওয়ার পথে আমাদের সেই স্টেশানে যেখানে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন আমার শিক্ষক, সেখানে নেমে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভালো বলতে হবে: প্রায় তৎক্ষণাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি পেয়ে গেলাম, আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় খামারে যাচ্ছিল সেটা।

হে আমার জন্মভূমি, আমাদের এ দুঃসময়ে যুদ্ধের দিনেই ফের ফিরে আসতে হলো আমাকে তোমার কাছে। পরিবর্তিত চারপাশ দেখে সেদিন কী খুশিই না হয়েছিলাম আমি — নতুন

সব গ্রাম গজিয়ে উঠেছে, চাষবাস করা হচ্ছে কতো জমিতে, নতুন পথঘাট ব্রীজ স-ব তৈরি করা হয়েছে; কিন্তু যুদ্ধের খনঘটায় ঐ সাক্ষাৎও বেদনাঘন হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন।

গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই বুকের মধ্যে অত্যন্ত আলোড়ন অনুভব করেছিলাম। দূর থেকেই নতুন, অপরিচিত রাস্তা, নতুন ঘরবাড়ি, বাগান চোখে পড়ছিল; তারপর উঁচু টিলাটার দিকে তাকালাম একবার — যেখানে আমাদের পাঠশালাটা ছিল সেখানে; নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো আমার — টিলার মাথায় পাশাপাশি দুটি পপলার দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় দুলছে তারা। সেই প্রথম, সেদিন, আমি নাম ধরে তাঁকে ডাকলাম — সারা জীবন যাঁকে 'মাস্টার সা'ব' বলে ডেকে এসেছি, তাঁকে।

'দিউইশেন,' ফিসফিসিয়ে বলে উঠেছিলাম আমি, 'শুক্রিয়া, যা-কিছু তুমি করেছ, আমার জন্যে যা-কিছু করেছ সবের জন্যে তোমাকে শুক্রিয়া, দিউইশেন। আমাকে তাহলে ভোলো নি তুমি, মানে — আমার কথা সব সময়েই ভেবেছ তাহলে... এ যে অবিকল তোমারই মতো!..'

আমার চোখে জল দেখে গাড়োয়ান ছেলেটি অস্থির হয়ে উঠেছিল:

'হলো কী আপনার?'

'নাঃ, কিছু না। ভালো কথা, তুমি এই যৌথখামারের কাউকে চেনো না কি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সব্বাইকে চিনি।'

'তাহলে দিউইশেনকেও নিশ্চয়ই চেনো, ঐ যে মাস্টারি করতো যে এখানে?'

'দিউইশেন? সে তো আর্মিতে গেছে। আমি তো নিজেই

তাকে আমার এই চার চাকার গাড়িতে চাপিয়ে যৌথখামার থেকে পল্টনের দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।'

গ্রামে ঢোকার রাস্তার মুখে আমি ঘোড়া রুখতে বলেছিলাম তাকে, তারপর নেমে গিয়েছিলাম গাড়ি থেকে। নেমে তো পড়লাম, তারপর ভাবতে লাগলাম কী করি। এখন এরকম অশান্তির সময়ে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচিত লোকজন খুঁজে বেড়াবো, জিজ্ঞেস করবো আমায় চিনতে পারছে কি না, আমি যে তোমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে গো — এইসবের কোনো দরকার নেই বলেই ঠিক করলাম। আর দিউইশেন তো এখন ফৌজে। তাছাড়া আরেক কথা: আমি কসম খেয়েছি — যে-বাড়িতে আমার চাচা-চাচী থাকে সেখানে জীবনে আর পা দেবো না। লোকজনের বহু কিছুই ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ওরকম অন্যায় আমার তো মনে হয় কেউই কখনো কারো ক্ষমা করে না। এমন কি আমি চাইছিলাম না পর্যন্ত যে ওরা আমার গ্রামে ফেরার কথা জানুক। আমি রাস্তা থেকে নেমে অন্য দিকে মোড় ফিরলাম, ঐ টিলাটার দিকে, পপলার দুটোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

আহা, মরি মরি, পপলার, আমার পপলার! সেদিন তোমরা দুটি ছোটো ছোটো লিকলিকে চারাগাছ ছিলে মাত্র, তার পর থেকে কতো জলই না গড়িয়ে গেছে! যে তোমাদের পুঁতেছিল, বড়ো করে তুলেছিল, তার সব স্বপ্ন, যা-কিছু সে বলেছিল স-ব আজ সফল হয়েছে। তাহলে কেন তোমাদের হু-হু-হু দীর্ঘশ্বাস, এত কান্না? শীত কাছিয়ে আসছে, হিমেল হাওয়া পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে তোমাদের, তাইতেই কি মন খারাপ? না কি তোমাদের সারা অঙ্গ আজ জনগণের যন্ত্রণা ও শোকে মোহ্যমান?

ঠিকই তো। আরো শীত আসবে, হিম পড়বে কনকনে.

ভয়ঙ্কর তুষারঝটিকাও বইবে — ঠিকই; কিন্তু বসন্ত, বসন্তও তো আসবে ফের...

বহুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে, হৈমন্তী পাতাঝরার হাহাকার শুনতে লাগলাম। গাছের তলায় প্রবাহিত আরিক কারা যেন দিন কয়েক আগেই পরিষ্কার করে গেছে: কেৎমেন্ দিয়ে মাটি কোপানোর প্রায় টাটকা গভীর চিহ্ন পড়ে আছে সেখানে। স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ আরিক বয়ে চলেছে, পপলারের হলুদ-হয়ে-যাওয়া পাতা কাঁপছে তার বুকে।

টিলার উপর থেকে নতুন স্কুলের রং-করা ছাদ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের পাঠশালার কোনো নামগন্ধ দেখতে পেলাম না কোথাও।

পরে ফের রাস্তায় নেমে এসেছিলাম আমি, একটা গাড়ির দেখা পেয়েছিলাম, সেটা ধরে স্টেশনে পেঁছেছিলাম।

এতদিন তো যুদ্ধ চলছিল, পরে বিজয়ও হাতে এলো আমাদের। জনগণের মনে সে যে কী কটুস্বাদ আনন্দ: বাবার ব্যবহৃত ঝোল্যব্যাগ নিয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে ছুটছে, পুরুষ-দের কর্মিষ্ঠ হাতে ফের যথারীতি কাজ শুরু করলো, আর ঘরে না ফেরা ফৌজী মানুষগুলোর জন্যে সব কান্না কেঁদে নির্বাক স্তব্ধ বিধবা নারী নিজেদের পোড়া কপাল মেনে নিল। সময়টা তখন এমন যে সবাই তখনো নিজেদের আপন জনের জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই তো আর যুদ্ধশেষ হওয়া মাত্রই ঘরে ফিরতে পারে না।

দিউইশেনের যে কী হলো, আমি জানতেই পারলাম না। আমার পাড়াপড়শীর সাথে শহরে দেখা হলে তারা বলেছে, তাঁর একেবারেই কোনো খোঁজ নেই, গ্রাম সোভিয়েত ওরকমই নাকি চিঠি পেয়েছে।

'কে জানে, হয়তো বা লড়াইয়ে মারাই গেছে,' বলেছে তারা, 'সময় তো কম কাটলো না, কিন্তু তার তো কোনোই খোঁজখবর নেই।'

"তা-ই হয়তো ঘটেছে, মাস্টার সা'ব আর ফিরে আসবেন না," কখনো-কখনো ভেবেছি আমি, "সেই যে স্টেশানে আমরা বিদায় নিয়েছিলাম, সেই স্মরণীয় দিনটির পরে আর আমাদের পরস্পরের কখনো দেখাসাক্ষাৎ হলো না..."

বিগত দিনগুলোর কথা যখন মনে হয়, আমার বুকে এত দুঃখও জমা ছিল ভেবে অবাক হই।

ছেচল্লিশ সালের হেমন্তের শেষদিকে আমি এক বৈজ্ঞানিক কাজের ভার নিয়ে তম্স্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলাম। সেই প্রথম আমি সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে গিয়েছিলাম। আসন্ন শীতে সাইবেরিয়ার তখন বড়ো অকরুণ ও বিষণ্ণ। ট্রেনের জানলার ওপারেই বনানী যেন এক ছুটন্ত কালো দেয়াল মনে হচ্ছিল। বনানীর ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল চিমনি থেকে সাদা ধোঁয়া বেরুনো গ্রামের ছোটো ছোটো বাড়ির কালো কালো ছাদ। হিমেল প্রান্তরে প্রথম তুষার জমেছে, তার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে দাঁড়কাক। আকাশ সব সময়ে মুখ ভার করে আছে।

কিন্তু ট্রেনে আমি বেশ আনন্দেই ছিলাম। আমাদের কামরায় জনৈক ভদ্রলোক — যুদ্ধফেরতা, ক্রাচে ভর দেয়া এক সহগামী খুব হাসির গল্প আর সৈনিক জীবনের মজার মজার চুটকি বলে ভীষণ হাসাচ্ছিলেন আমাদের। ভদ্রলোকের অফুরন্ত উদ্ভাবনীশক্তি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, কী সাদাসিধে ও নির্দোষ রসিকতা। কিন্তু সর্বদা এও মনে হচ্ছিল যে, ও-সবের অন্তরালে সত্যও নিহিত বৈকি। সারা কামরায় সকলেরই মন কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। এভাবেই চলছিল; তারপর

নভোসিবিস্কর্ ছাড়িয়ে কোন্‌খানে যেন ছোট্টো একটা স্টেশানে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এক মিনিটের জন্যে। আমি বাইরের দিকে চোখ রেখে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর ভদ্রলোকটির একটার পর একটা হাসিতামাশায় সমানে হাসছিলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, গতিবেগ বাড়ছিল তার; স্টেশানের গুমটিঘর জানালার ওপাশে সরে যাচ্ছিল, আমি জানালার পাশে ভয়ানক চমকে উঠে পিছে সরে এলাম, তারপর ফের মুখ চেপে ধরলাম জানালার কাঁচে। এ যে তিনি — দিউইশেন দাঁড়িয়ে আছেন। গুমটিঘরের সামনে হাতে সিগন্যাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তক্ষুনি যে কী ঘটে গেল, জানি না।

'রোক্‌কো!' সারা কামরাকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি, দরজার পানে ছুটে গিয়েছিলাম, কী যে করতে যাচ্ছিলাম নিজেও জানি না; ভাগ্যিস তখনই এমার্জেন্সী চেন চোখে পড়ে গিয়েছিল, এত জোরে টেনে ধরেছিলাম ওটা যে তা ছিঁড়ে পড়ে গেল।

যত বগী ছিল সমস্ত এ ওর গায়ে ধাক্কা খেল, ট্রেন তীক্ষ্ণ-ভাবে ব্রেক কষতে গাড়ি পিছুপানে হটে গেল খানিকটা। জিনিসপত্র রাখার বাঙ্ক থেকে হুড়মুড় করে সব পড়ে গেল নিচেয়, বাসনকোসন কাপটাপ সব গড়াগড়ি খেল মেঝেয়, বাচ্চাকাচ্চা আর মেয়েরা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো কে যেন:

'ঈশ্‌, ট্রেন চাপা পড়েছে কেউ!'

আমি ওরই মধ্যে ততক্ষণে পা-দানিতে। লাফিয়ে যেন কোন্‌ অতলে নিচে নেমে পড়েছি, নিচের দিকে তাকাই নি পর্যন্ত, সামনে কী আছে কিছু না দেখে-শুনে সোজা দৌড়েছি ঐ গুমটিঘরের দিকে সিগন্যাল ম্যানের পানে, দিউইশেনের

কাছে। পিছনে তখন গার্ড হুইসিল দিচ্ছে। আর গাড়ির কামরা থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নেমে আমার পিছন পিছন দৌড়ুচ্ছে।

এক নিঃশ্বাসে আমি সারাটা ট্রেন বরাবর দৌড়ুতে লাগলাম, দিউইশেনও তখন দৌড়ে আসছেন আমায় দেখে।

'দিউইশেন, মাস্টার সা'ব!' চেঁচিয়ে উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছি ততক্ষণে।

বুঝতে না পারার দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সিগন্যাল ম্যান। তিনি দিউইশেনই ছিলেন — সেই একই মুখ, একই চোখ, আগে কেবল শুধু গোঁফ ছিল না, আর একটু বুড়িয়ে গেছেন, এই যা।

'কী হয়েছে দিদি?' কাজাখ ভাষায় প্রসন্নভাবে তিনি শুধালেন। 'আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, আমি সিগন্যাল ম্যান জান্‌গাজিন্‌, আমার নাম বেইনেউ।'

'বেইনেউ?'

জানি না কীভাবে দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বন্ধ করেছিলাম আমি — যাতে দুঃখে, যন্ত্রণায়, লজ্জায় না কেঁদে ফেলি। এ আমি কী করলাম? মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম আমি। আমার পায়ের নিচে মা ধরিত্রী কেন দ্বিধা হলো না? সিগন্যাল ম্যানের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ আমার, গাড়ির সব লোকজনের কাছেও, কিন্তু নিস্পন্দ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম আমি পাথরের মতো। আমার চারপাশে ছুটে আসা প্যাসে-ঞ্জারদের ভিড়ও কী কারণে জানি না নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি তখন অপেক্ষা করছি কখন সবাই আমাকে ধমকাবে, বকাবকি করবে। কিন্তু না, সবাই নিশ্চুপ। সেই ভয়ানক নিঃশব্দে কে যেন, কোনো এক মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন:

'আহা বেচারী, ভুল করে স্বামী কি ভাই ভেবেছিল!'

লোকজন যেন প্রাণ পেয়ে নড়েচড়ে উঠলো এতক্ষণে।

'আহা, কী কান্ড দ্যাখো দেখি!' ভারি গলায় বলে উঠলো একজন।

'যুদ্ধে কী-ই না ঘটলো, কতো কিছুই না কপালে লেখা ছিল আমাদের...' কাঁপাকাঁপা এক নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম।

মুখের উপর থেকে আমার হাতদুটো নামিয়ে দিয়ে সিগন্যাল ম্যান বলে উঠলেন:

'চলুন, ঠান্ডা লাগছে, আপনার কামরায় পেঁৗছে দিয়ে আমি, চলুন।'

আমার এক হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন আমাকে। আমার আরেক হাত ধরলেন অপরিচিত কে এক মিলিটারী অফিসার।

'চলুন, দিদি। সবই বুঝতে পেরেছি।' ভদ্রলোক বলে উঠেছিলেন।

লোকজন পথ ছেড়ে দিয়েছিল আমাকে, যেন কোনো অন্ত্যেষ্ট্যিক্রিয়ায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সবাই। আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম, আর আমাদের পিছনে অন্যেরা। ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও ভিড়ের মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। কে যেন একজন আমার কাঁধে একটা পশমী শাল চড়িয়ে দিলো। কামরার সেই ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা ভদ্রলোক আমার পাশে পাশে যাচ্ছিলেন। চট করে একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন একবার। সর্বদা হাসিখুশি, প্রগল্ভ, অমায়িক ও পৌরুষমন্ডিত লোকটি কেন জানি মাথা হেঁট করে চলেছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি কাঁদছিলেন। কাঁদছিলাম আমিও। আর সেই মন্থরগতি শোকের মিছিলে

যেতে যেতে, টেলিগ্রাফের তারে তারে হাওয়ার গোঙানিতে আমি কেবলই শবযাত্রার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। "না, কখনোই আর তাঁকে আমি দেখতে পাবো না।"

কামরার কাছে ট্রেনের গার্ড এসে থামিয়ে দিলেন আমাদের। চেঁচামেচি করে কী সব বলছিলেন তিনি, আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে, আইনভঙ্গকারীর শাস্তি, জরিমানা — এইসব কী বলে যাচ্ছিলেন। আমি কিছুই উত্তর দিই নি। আমার কাছে তখন কোনো কিছুরই আর অর্থ নেই, সবই সমান। আমার সামনে কী একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে তাতে সই দিতে হুকুম করলেন গার্ড ভদ্রলোক, কিন্তু পেন্সিলটা যে ধরবো সে শক্তিও তখন আমার ছিল না।

আমার সহযাত্রীটি তখন একটানে ছিনিয়ে নিলেন ঐ কাগজ, ক্রাচে ভর দিয়ে সটান গার্ডের সামনে গিয়ে তাঁর মুখের উপর চিৎকার করতে লাগলেন:

'আরে মশাই, ঠাণ্ডা হতে দেন মানুষটাকে। দেন আমাকে, সই করে দিচ্ছি, আমিই চেন টেনেছিলাম, আমিই জবাব দেবো তার, যান!..'

সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে, সুপ্রাচীন রুশ ভূমির উপর দিয়ে আমাদের বিলম্বিত ট্রেন ছুটে চলেছিল। আমাদের কোনো সহযাত্রীর গীটারে করুণ সুর বেজে উঠেছিল রাত্রে। সেই টানা টানা বিষণ্ণ গীত, রুশ বিধবাদের, বুকের মধ্যে পুরে আমি চলেছিলাম — যুদ্ধের ঐ দুঃখজর্জর সর্বশেষ প্রতিধ্বনি।

বছরের পর বছর কেটে গেল। অতীত ঝাপসা হয়ে এলো ধীরে ধীরে, ছোটো বড়ো নানান দাবী নিয়ে ভবিষ্যৎ জায়গা জুড়ে বসলো। বেশ দেরী করেই বিয়ে করেছি আমি, অতি ভালো লোকের সাথেই ঘর বেঁধেছি। ছেলেপুলে হয়েছে, ভরা সংসার এখন, আমরা সুখেই আছি। আমি এখন দর্শনের

একজন ডি. এস-সি। প্রায়ই আমাকে বাইরে যেতে হয়। বহু দেশেই আমি গিয়েছি... কিন্তু আমাদের গাঁয়ে আর কখনো আমি ফিরে যাই নি। অবশ্য তার কারণও আছে, আর তার সংখ্যাও কম নয়; না, আমি কোনো সাফাই গাইছি না। পাড়াপড়শীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, বুঝি — সেটা খারাপ ও ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু আমার ভাগ্যটাই যে এমন, কী করা। কোনো রকমেই অতীত আমি ভুলে যাই নি, না, ভুলতে যে আমি পারি না, আমি যেন তা থেকে একটু দূরে সরে গেছি মাত্র।

পাহাড়পর্বতে এ-রকম ঝর্ণার উৎসধারা দেখা যায়: নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, ঝর্ণার পথ ভুলে গেছে লোকে, জল পানের জন্যে সেখানে পথচল্তি মানুষের যাতায়াত ক্রমশই কমে যেতে থাকে, তারপর লতাগুল্ম ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠে তার চারপাশে। এর পরে লোকে আর তাকে লক্ষ্যই করে না। কদাচিৎ কোনো গরমের দিনে যদি কারো হঠাৎ মনে পড়ে যে একটা ঝর্ণা ওখানে ছিল, তো তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে বড়ো সড়ক ছেড়ে নেমে যাবে ওদিকে। তখন পরিত্যক্ত জায়গাটায় খুঁজেপেতে আসবে সে, ডালপালা সরিয়ে কাছে গিয়েই অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠবে বিস্ময়ে: দীর্ঘকাল নিরুপদ্রুত শীতল জল তরতর করে গভীর, শান্ত বয়ে চলেছে। সেমুহূর্তেই সে ঐ ঝর্ণাধারাতেই দেখতে পাবে নিজেকে, দেখতে পাবে সূর্য, আকাশ ও অরণ্য-পর্বত... মনে হবে তার — এহেন স্থান না জানা পাপ, বন্ধুবান্ধবদের অবশ্যই এর কথা বলা দরকার। সে ভাববে ঠিকই, কিন্তু এমনটি পুনরায় না ঘটা পর্যন্ত ফের তা বিস্মৃতও হয়ে যাবে।

মানুষের জীবনেও ও-রকম ঘটে বৈকি। হ্যাঁ, তা-ই, জীবন যে অমনই...

কিছুদিন আগে এই যে আমি আমাদের গ্রাম থেকে ঘুরে এলাম, তার পর থেকে ঐ রকম ঝর্ণার কথাই বারবার মনে হয়েছে আমার।

কুর্কুরেউ থেকে আমি যে-ভাবে আকস্মিক চলে এলাম তাতে তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানক অবাক হয়েছিলে। তুমি বলবে, এই এখন তোমায় যেভাবে সব বলছি তেমনভাবে কি ওখানে, ঐ জায়গায়, সকলের সামনে এ-সব বলা যেত না কি? না, যেত না। আমি এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম, এত লজ্জা লাগছিল আমার, নিজেকে নিয়েই এত লজ্জিত ছিলাম আমি যে তৎক্ষণাৎ গ্রাম ছেড়ে চলে আসার মনস্থ করি। আমি বুঝেছিলাম যে, দিউইশেনের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না, তাঁর চোখে সোজাসুজি চোখ রেখে তাকাতে পারবো না আমি। আমার একটু আত্মস্থ হবার প্রয়োজন ছিল, সমস্ত ভাবনাচিন্তাগুলো থিতিয়ে দেখা দরকার ছিল, রাস্তায় আসতে আসতে ভাবার দরকার ছিল যে কী আমি বলবো সবাইকে — আমাদের গ্রামবাসীদেরকেই শুধু নয়, আরো অন্যান্য সকলকেও।

নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছিল আরো এজন্যে যে, ঐ সম্মান আমাকে দেখানোর কোনো কারণই ঘটে নি, স্কুল উদ্বোধনীতে ঐ সম্মানীয় আসনে আমাকে বসাবার প্রয়োজন ছিল না কোনো। সর্বাগ্রে যিনি ঐ আসনের অধিকারী তিনি আমাদের প্রথম শিক্ষক, আমাদের গাঁয়ের প্রথম কমিউনিস্ট — তিনি বৃদ্ধ দিউইশেন। আর ঘটলো কি না তার উল্টোটাই। আমরা উৎসবমুখরিত টেবিলের চারদিকে জড়ো হয়ে বসেছিলাম, আর ঐ সোনার টুকরো মানুষটা তখন বাড়ি বাড়ি দৌড়ুচ্ছে চিঠি বিলি করতে, স্কুলের পুরনো ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো টেলিগ্রাম বিলি করার

জন্যে নতুন তৈরি এই স্কুলটার উদ্বোধনীর জন্য ছুটে আসছে।

না, এটা কোনো নতুন একক ঘটনা নয়। এরকম যে আমি এই প্রথম দেখলাম, তাও নয়। আর তাইতেই তো আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি: সাধারণ লোকজনকেও লেনিন যে-সম্মান দেখাতেন আমরা তা দেখাতেও ভুলে গেলাম কবে থেকে? তবু ভাগ্য ভালো যে, অন্তত এখন আমরা কোনো কিছু না রেখে ঢেকে, ভণ্ডামি বাদ দিয়ে সব খোলাখুলিভাবে বলা কওয়া করছি। এও ভালো যে, এদিক দিয়ে অন্তত আমরা এখনো লেনিনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

এখনকার তরুণ ছেলেমেয়েরা জানে না যে, তাঁর নিজের কালে দিউইশেন কী রকম শিক্ষক ছিলেন। বৃদ্ধদের মধ্যে যাঁরা জানতেন তাঁদেরও অনেকে আজ নেই। দিউইশেনের ছাত্রছাত্রী এই যুদ্ধে কম মারা যান নি, তাঁরা যথার্থ সোভিয়েত যোদ্ধা ছিলেন। আমাদের শিক্ষক দিউইশেন সম্পর্কে তরুণদের কিছু জানানো যেন আমারই অবশ্যকর্তব্য। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে তাকেও এ-কাজ করতে হতো। কিন্তু আমি তো দীর্ঘকাল গ্রামে যাই নি, দিউইশেন সম্পর্কেও কিছুই জানতাম না; সময়ের সাথে সাথে তাঁর ছবি আমার মনে যেন কোনো যাদুঘরের নিঃশব্দে সংরক্ষিত সুপ্রাচীন মহার্ঘ কোনো স্মারকে পরিণত হয়েছিল।

আমার শিক্ষকের কাছে আমাকে ফের যেতে হবে, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে তাঁর সামনে। ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে।

মস্কোর কাজ শেষ হলে কুর্কুরেউ গ্রামে যাবার ইচ্ছে আছে আমার, তখন লোকজনকে অনুরোধ করবো — নতুন এই আবাসিক স্কুলের নাম যেন 'দিউইশেন বিদ্যাভবন' রাখে।

হ্যাঁ, দিউইশেনের নামেই — ঐ সরল যৌথখামারী, পিওনের নামেই নাম হোক স্কুলটার। আমার আশা, তুমিও আমার গ্রামবাসী হিসেবে আমার ইচ্ছেকে সমর্থন জানাবে। তোমার কাছে এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

মস্কোর ঘড়িতে এখন রাত একটা বেজে গেছে। হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি, সামনে আলোকিত শহর পড়ে আছে, ভাবছি কবে গাঁয়ে ফিরবো, গুরুর সাথে পুনর্বার দেখা হবে আমার, পেকে যাওয়া সাদা দাড়িতে তাঁর চুমু খাবো পরম শ্রদ্ধাভরে...

জানালাগুলো আমি পুরো খুলে দিলাম। ঘরে এক ঝলক টাটকা হাওয়া এসে ঢুকলো। নীলচে হালকা আঁধারে আমি আমার শুরু করা ছবিটার জন্যে করে রাখা প্রাথমিক স্কেচ ও নক্সাগুলোর উপরে চোখ বুলোতে লাগলাম। সংখ্যায় ওগুলো অনেক, আমি বহুবারই ফের গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করি। এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে নি ছবিটায়। এখনো আমি সেই আসল বস্তু খুঁজে পাই নি... রাত্রিশেষের নিস্তব্ধতায় আমি সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম; মাথায় শুধু চিন্তা, চিন্তা আর চিন্তা। প্রত্যেকবারই ঠিক এরকমটাই হয়। এবং প্রত্যেকবারই আমার নিশ্চিত মনে হয় যে, আমার ছবি এখনও কেবল কল্পনায়ই আছে।

কিন্তু তবু আমি আপনাদের সাথে আমার এই অসমাপ্ত ছবিটা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করতে চাই। উপদেশ চাই আপনাদের। আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আন্দাজ করেছেন যে, এই ছবি আমাদের গাঁয়ের প্রথম শিক্ষক, প্রথম কমিউনিস্ট, বয়োবৃদ্ধ দিউইশেনের উদ্দেশেই উৎসর্গিত হবে।

অথচ আমি কিন্তু এখনো নিশ্চিত নই যে, ঐ যুযুধান

জটিল জীবন, তার বহুধাগামী নিয়তি, মানুষী কামনা — এই সব কিছুকে রং-তুলিতে ধরে রাখতে পারবো কি না। কানায় কানায় ভরা চায়ের পেয়ালা যাতে ছলকে না পড়ে, আপনাদের কাছে — আমার সমকালীনদের কাছে যাতে বয়ে আনতে পারি একে, তার জন্যে এখন করি কী? আপনাদের কাছে শুধু আমার ধারণার ভাবমূর্তিটাই নয়, তাকে আমাদের সম্মিলিত সৃষ্টি হিসেবে যাতে গড়ে তুলতে পারি, তার জন্যে কী করি বলুন তো?

এই ছবি না এঁকে আমার মুক্তি নেই। কিন্তু কত যে চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা পেয়ে বসছে আমাকে! সময়-সময় মনে হয়, কিছুটি করা যাবে না। তখন আবার ভাবি: তাহলে কী কারণে এই তুলি আমার ভাগ্য আমার হাতে তুলে দিয়েছে? এ কী যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন! আবার অন্য সময় কখনো-কখনো নিজেকে এত শক্তিমান মনে হয় যে, পাহাড়ও টলাতে পারি যেন। তখন আবার ভাবি: দ্যাখো, শেখো, ঠিক জিনিসটা বেছে নাও। আঁকো দেখি: দিউইশেন আর আল্‌তিনাইয়ের পপ্‌লারকে — হ্যাঁ, ঐ পপ্‌লার, ছোটোবেলায় যাদের দেখে এত খুশি হয়ে উঠতে তুমি, ওদের কাহিনী না জানা সত্ত্বেও। আঁকো: খালি পা, রোদে পোড়া একটা ছোট্টো ছেলে, — উঁচু, আরো উঁচুতে উঠে পপ্‌লারের একটা ডালে বসে আছে সে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দূরে অজানার দিকে তাকিয়ে আছে।

অথবা, ছবি এঁকে 'প্রথম শিক্ষক'ই না হয় তার নাম দাও। সেই মুহূর্তটাই, ভাবো, ধরে রাখলে: দিউইশেন ছেলেপিলেদের হাত ধরে পাহাড়ী নদীটা পার করে দিচ্ছে, আর তার পাশেই খ্যাঁকশিয়াল-লোমের লাল টুপি পরা ভোঁতা লোকগুলো চক্‌চকে বুনো ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যাচ্ছে...

নয়তো ঐ দৃশ্যটাই আঁকো — আল্‌তিনাইকে মাস্টার সাহেব যখন শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেই দৃশ্য। মনে আছে তো তাঁর সেই শেষ দীর্ণ চিৎকার। ছবিটা এভাবেই তুমি এঁকো যাতে আল্‌তিনাইয়ের আজও কানে লেগে থাকা দিউইশেনের সেই চিৎকার শুনতে পায় সকলেই।

নিজেকে আমি এ-সবই বলি। নিজেকে নিজে কতো কথাই তো বলি, তার সবই তো আর ঘটে ওঠে না। ছবিটা যে ঠিক কীভাবে আঁকবো এখনো আমি তা জানি না। কিন্তু একটা জিনিস তো আমি ভালোভাবেই জানি: চেষ্টা আমি করেই যাবো।

বিদায় গুলসারি

১

এক বুড়ো ঘোড়ায় টানা একটি পুরানো গাড়িতে করে যাচ্ছিল। গাড়ি টানছিল যে সোনালি রঙের ঘোড়াটি, তার নাম গুলসারি। গুলসারিও বুড়ো — খুবই বুড়ো...

মালভূমির দিকে আঁকাবাঁকা পথটি ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ। শীতকালে ছাইরঙা নির্জন টিলাগুলোর মধ্যে অবিরাম বয়ে চলে মেঠো হাওয়ার ঘূর্ণি, গ্রীষ্মে সেখানে নরককুণ্ডের মতো গরম।

এই চড়াইটা ছিল তানাবাইয়ের কাছে সব সময়েই একটা শাস্তি বিশেষ। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে ওঠা তার কাছে বিরক্তিকর ঠেকত। যৌবনে, বেশ ঘন ঘন যখন তাকে সদরে যেতে হত, তখন ফেরার পথে সে সব সময়ই চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়াকে জোর কদমে চালিয়ে নিয়ে আসত এই চড়াইয়ের পথ দিয়ে। সঙ্গীদের সঙ্গে টানা গাড়িতে যেতে হলে, বিশেষ করে সে গাড়ি যদি গোরুর গাড়ি হত তাহলে সে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে চুপচাপ গায়ের পোশাক কাঁধের ওপর ফেলে হেঁটেই

এই চড়াইতে উঠত। হাঁটত এমন রেগেমেগে যেন লড়াইয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে চলেছে; মালভূমিতে পেঁছে তবেই থামত। তার পর বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে অপেক্ষা করত নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িটা ওপরে এসে পেঁছানো পর্যন্ত। অত জোরে হাঁটার ফলে তার হৃৎপিন্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করত, বুকে ব্যথা হত। কিন্তু তা হোক গে, গোরুর গাড়িতে চেপে অত ধীরে ধীরে ওঠার চেয়ে এটাই ভালো।

চোরো যখন বেঁচে ছিল তখন প্রায়ই তার বন্ধুটিকে অদ্ভুত ধরন-ধারণের জন্য পরিহাস করে বলত:

'তানাবাই, জানতে চাস তোর দুর্ভাগ্যের কারণ কী? কারণ হচ্ছে তোর অধৈর্য। সত্যি বলছি। সবটাতেই তোর বড্ড তড়িঘড়ি। দুনিয়া জুড়ে বিপ্লব — এক্ষুনি চাই! বিপ্লব ত দূরের কথা, আলেক্‌সান্দ্রভ্‌কার এই চড়াইয়ের মতো একটা সাধারণ পথ পার হওয়ার মতো ধৈর্যই তোর নেই। সব লোকই লোকে যে রকম করে থাকে — শান্তভাবে গাড়ি চালায় আর তোর হল লাফঝাঁপ, পাহাড়ে উঠিস গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে — যেন তোকে বাঘে তাড়া করছে। এতে তোর লাভটা কী? কিছুই না। ওপরে ওঠার পর অন্যদের জন্য ত অপেক্ষা করতেই হয়। সারা দুনিয়ার বিপ্লবেও একা লাফিয়ে পড়া যায় না, অন্যদের জন্যে তোকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

কিন্তু এসব হচ্ছে অতীতের কথা। অনেককাল আগের কথা।

আলেক্‌সান্দ্রভ্‌কা চড়াই কখন পেরিয়ে গেল আজ তানাবাই সেটা লক্ষ্যও করল না। দেখা যাচ্ছে বার্ধক্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। গাড়ি সে আস্তেও চালাচ্ছে না, জোরেও চালাচ্ছে না। ঘোড়াকে চলতে দিয়েছে ঘোড়ার ইচ্ছেমতো গতিতে। আজকাল সে একাই বের হয় গাড়ি নিয়ে। এক সময়

কোলাহলমুখরিত পথে যে মানুষের দঙ্গল চলত তার সঙ্গে সঙ্গে, এখন আর তাদের দেখা মেলার উপায় নেই। কেউ মারা গেছে যুদ্ধে, কারও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, কেউ বা ঘরে বসে অমনি অমনি কাটিয়ে দিচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো। অল্পবয়সীরা চলাফেরা করছে মোটর গাড়িতে। একটা জিরজিরে ঘোড়ার পেছন পেছন তার সঙ্গে যাওয়ার মতো কেউই নেই।

গাড়ির চাকাগুলো পুরনো রাস্তায় ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ তুলছে; এভাবে আওয়াজ তুলবে আরও বহুদূর পর্যন্ত। তার সামনে রয়েছে স্তেপ, খালের ওপারে আছে পাহাড়ের পাদভূমি বরাবর প্রসারিত একটি পথ।

বেশ কিছুক্ষণ হলই সে লক্ষ্য করে আসছে ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, যেন আর শক্তি পাচ্ছে না। নিজের নিরানন্দ ভাবনায় মগ্ন তানাবাই এতে খুব একটা বিচলিত বোধ করে নি। একটা ঘোড়া পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ত কী হয়েছে? এর চেয়েও খারাপ ঘটনা অনেক ঘটেছে। বাড়ি সে ঠিকই পেঁছে যাবে...

অসাধারণ উজ্জ্বল সোনালী রঙের জন্য যে ঘোড়ার নাম রাখা হয়েছিল 'গুলসারি',* সে যে আজ তার দীর্ঘ জীবনে শেষবারের মত আলেক্‌সান্দ্রভ্‌কা চড়াই বেয়ে উঠেছে এবং জীবনের শেষতম মাইলগুলো পার হয়ে চলেছে এ কথা তানাবাই কেমন করে জানবে? গুলসারির মাথা যে ধুতুরা ফুলে মাতাল কারও মতো ঝিম্‌ঝিম করছে, তার চোখের সামনে মাটি যে রঙীন বৃত্তের মতো ঘুরছে, আকাশের এপাশ-

---

* কিরগিজ ভাষায় 'গুলসারি' বলতে বোঝায় সোনালী রঙের কুমকোফুল। — সম্পাঃ

ওপাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারবার এদিকে-ওদিকে কাত হয়ে পড়ছে, সামনের মাটি যে মাঝে মাঝে অন্ধকারের শূন্যগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে, সামনের পথ আর পাহাড়ের জায়গায় গুলসারি যে মাঝে মাঝে লাল্‌চে কুয়াশার বা ধোঁয়ার ঘূর্ণি দেখছে এসবই বা তানাবাই কেমন করে জানবে?

ক্লিষ্ট হৃৎপিণ্ডে একটা ঢিমে ব্যথা অনুভব করছে গুলসারি, গলবন্ধনীর জন্য শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। পেছনের বেল্‌ট এক পাশে সরে কেটে বসে গিয়েছে, বাঁ দিকে গলবন্ধনীর নীচে সূচিমুখ কি যেন একটা খোঁচা দিচ্ছে বার বার। হয় তো কাঁটা, অথবা গলবন্ধনীর ফেল্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা কোন পেরেক। ঘাড়ের কড়া-পড়া জায়গাটায় দগদগে ঘায়ে জ্বালা ধরেছে, অসহ্য চুলচুল করছে। ভারী পাগুলো হেঁচ্‌ড়ে টেনে হাঁটছে গুলসারি, যেন সে চলেছে কোন ভেজা, চষা জমির ওপর দিয়ে।

কিন্তু, অনেক কষ্টে হলেও বুড়ো ঘোড়াটি এগিয়েই চলেছে, নিজের ভাবনায় মগ্ন বুড়ো তানাবাই দুয়েকটা কথা বলে বা বল্গা ঝাঁকানি দিয়ে মাঝে মাঝে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তানাবাইয়ের ভাবনার অনেক কিছু ছিল।

পুরনো পথে গাড়ির চাকাগুলো টক্কর খেয়ে খেয়ে চলছে। গুলসারি তার স্বাভাবিক গতিভঙ্গি বজায় রেখেছে — যে বিশেষ দুলকি চালটা সে আয়ত্ত করেছিল জন্মের পর প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বিরাট কেশরওয়ালা মায়ের পেছনে ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে হাঁটার সময় থেকেই।

গুলসারি আজন্ম দুলকি চালের ঘোড়া। তার বিখ্যাত চলনভঙ্গির জন্য সুদিন দুর্দিন দুই-ই অনেক এসেছে তার জীবনে। এমন সময় ছিল যখন তাকে গাড়িতে জোতার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না; ভাবলে সেটা হত পবিত্র

বিষয়ের অবমাননার মতো। কিন্তু, কথায় বলে: ঘোড়া অসুবিধায় পড়লে লাগাম-মুখেই জল খায় আর বাহাদুর বিপদে পড়লে জুতো-পায়েই অগভীর জলা পার হয়।

এসব অনেক আগের কথা — এখন স্মৃতিমাত্র। এখন গুলসারি প্রাণপণ শক্তিতে চলেছে জীবনের শেষতম দৌড়ের শেষ রেখাটিতে পৌঁছনোর জন্য। আগে কখনও কোন শেষ রেখার দিকে সে এত ধীর গতিতে এগোয় নি, এত দ্রুত সে দিকে কখনও ধেয়ে আসে নি। শেষ রেখাটিকে সে এখন প্রতি পদক্ষেপেই দেখতে পাচ্ছে যেন মাত্র এক-পা দূরে।

পুরনো পথে গাড়ির চাকাগুলো টক্কর খেয়ে খেয়ে চলেছে।

খুরের নীচে কঠিন মাটি যেন কাঁপছে, এই অনুভূতি গুলসারির ক্ষীয়মাণ চেতনায় জাগিয়ে তুলল দূর অতীতের এক গ্রীষ্মদিনের স্মৃতি — পাহাড়ী এলাকায় একটা ভেজা কোমল তৃণভূমি, একটা বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য জগৎ, সূর্য যেন হ্রেষাধ্বনি করে লাফিয়ে উঠছে পাহাড়ের ওপর আর নির্বোধ শিশু গুলসারি সেই সূর্যের পিছনে ধাওয়া করে চলেছে তৃণভূমি, স্রোতস্বিনী আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে; পরিশেষে পালের মাতব্বর ঘোড়া রাগে কানদুটো খাড়া তার চেয়েও দ্রুত ছুটে এসে তাকে ফিরিয়ে আনছে। দূর অতীতের সেই দিনগুলিতে মনে হত ঘোড়ার পাল যেন চার পা শূন্যে তুলে উল্টো হয়ে চলত, ঝিলের জলে যেমন দেখা যায়, আর তার মা, সেই বিরাট কেশরওয়ালা মাদী ঘোড়া যেন হয়ে যেত একটা উষ্ণ দুধাল মেঘ। মা যখন হঠাৎ এমন স্নেহময়ী, হ্রেষাধ্বনি করা মেঘ হয়ে যেত, সেই মুহূর্তগুলিকে গুলসারির বড় ভালো লাগত। মায়ের বোঁটাগুলো হয়ে যেত টানটান আর মিষ্টি, দুধের ফেনা জমত গুলসারির ঠোঁটে, দুধের প্রাচুর্যে আর মিঠে স্বাদে তার গলা বুজে আসত। বিরাট কেশরওয়ালা

মায়ের পেটের সঙ্গে ঐভাবে লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব ভালো লাগত। আঃ, কী নেশাধরানো ছিল সেই দুধ! মাত্র এক ঢোঁক দুধের মধ্যেই যেন ছিল সারা দুনিয়া — সূর্য, মাটি আর মা। পেট সম্পূর্ণ ভরে গেলেও সে খেতে পারত আরও এক ঢোঁক, তার পর আরও এক ঢোঁক এবং তার পর আরও...

কিন্তু, এসব বেশি দিন চলে নি, খুব অল্প কালই চলে। দেখতে দেখতে সব বদলে গেল। সূর্য হ্রেষাধ্বনি করে পাহাড়ের ওপর দিয়ে লাফানো বন্ধ করে দিল — প্রতিদিন নিয়মিত পূর্বদিকে উঠে অবিচলিতভাবে পশ্চিম দিকে যাত্রা করছিল, ঘোড়ার পালও আর চার পা শূন্যে তুলে উল্টো হয়ে হাঁটে না, দলিত তৃণভূমিকে তারা খুরের চাপে আরও পিষে আর কালো করে দেয়, অগভীর নদীতে খুরের চাপে নুড়ি শব্দ তোলে, ভেঙে যায়। বিরাট কেশরওয়ালা মাদী ঘোড়াটি খুব কড়া মা হয়ে উঠেছিল, গুলসারি বেশি জ্বালাতন করলে সে গুলসারির কাঁধ জোরে কামড়ে দেয়। মায়ের বাঁটে আর তেমন দুধও ছিল না। গুলসারিকে ঘাস খাওয়া ধরতে হল। এমন এক জীবন শুরু হল যা বহু বছর চলল, এবং এখন যা শেষ হতে চলেছে।

চিরকালের জন্যে মুছে যাওয়া সেই গ্রীষ্মটির দেখা গুলসারি তার দীর্ঘ জীবনে আর কখনও পায় নি। গুলসারি পিঠে জিন বয়ে বেড়িয়েছে, নানা সওয়ার নিয়ে নানা পথে পদচারণ করেছে — সে সব পথের যেন আর শেষ ছিল না। কেবল এখনই, যখন সূর্য আবার লাফাচ্ছে আর তার পায়ের তলার মাটি নড়ে উঠছে, যখন তার চোখে ধাঁধা লাগছে, ক্ষীণ দৃষ্টির সামনে সব কিছু ঘোলাটে হয়ে উঠছে, তখন সুদূর শৈশবে হারিয়ে যাওয়া সেই গ্রীষ্মটা যেন আবার ফিরে এলো।

সেই পাহাড়ের সারি, সেই ভেজা ঘেসো মাঠ, ঘোড়ার পাল, সেই বিরাট কেশরওয়ালা ঘোড়া — সবই এখন দেখা যাচ্ছে একটা অদ্ভুত অস্থির দপ্‌দপানির মধ্যে। চোখের সামনে হঠাৎ ফিরে আসা অতীত জগতে আবার নতুন করে প্রবেশ করার জন্য গুলসারি ব্যাকুলভাবে তার গলবন্ধনী আর দু'পাশের জোয়াল দু'টি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় জোর করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রতারক মরীচিকা কেবলই সরে সরে যাচ্ছে — এটা দুঃসহ। মা মৃদু হ্রেষাধ্বনিতে গুলসারিকে নিজের কাছে ডাকছে অনেক কাল আগের মতো করে, ঘোড়ার পাল গুলসারির পাশ দিয়ে ছুটছে অতি দ্রুত বেগে, তাদের পাশ আর লেজ তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁপা কাঁপা অপসৃয়মান অন্ধকারকে জয় করার শক্তি গুলসারির আর নেই। ঘোড়ার পাল আরও বেগে তার চারপাশে পাক খাচ্ছে, রুক্ষ লেজের ঝাপ্‌টা মারছে তার গায়ে, তার চোখে আর নাকের ফুটোয় বরফ ছুঁড়ে দিচ্ছে। গুলসারির ঘাম ঝরছে, অথচ সে ঠাণ্ডায় কাঁপছেও; আর সে জগৎ — যেখানে আর প্রবেশ করা যাবে না কখনও — নিঃশব্দে ডুবে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তুষারের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে। সেই পাহাড়ের সারি, তৃণভূমি, ছোট নদী সব অদৃশ্য হয়েছে, ঘোড়ার পাল দ্রুতগতিতে মিলিয়ে গিয়েছে কোথায়, শুধু তার মায়ের, সেই বিরাট কেশরওয়ালা ঘোড়াটির অস্পষ্ট ছায়া এখনও চলেছে তার সামনে দিয়ে। মা যেন গুলসারিকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। মা গুলসারিকে ডাকছে। গুলসারি প্রাণপণে চিঁহিহি করল, ফুঁপিয়ে উঠল, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই সে শুনতে পেল না। তার পর সব মিলিয়ে গেল, তুষার ঝড়ও মিলিয়ে গেল। গাড়ির চাকার ধক্‌ধক্‌ শব্দ বন্ধ হল। গলবন্ধনীর নীচে ঘাড়ের সেই ঘায়ে আর ব্যথা হচ্ছে না।

গুলসারি থেমে গেছে। সে দুলছে। চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার মধ্যে অনবরত অদ্ভুত একটা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

তানাবাই লাগাম ছেড়ে দিল, তড়বড়িয়ে নীচে নামল, তার পর ঝিঁঝি ধরা পা দু'টিকে টান্ টান্ করে জড়তা ছাড়িয়ে গোমড়ামুখে এগিয়ে গেল ঘোড়াটির দিকে।

'আঃ, জ্বালিয়ে মারলি!' গুলসারির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল তানাবাই।

ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে আছে, গলবন্ধনীর ভেতর থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে আছে তার বিরাট মাথা আর অস্থিসার গলা। মেরুদণ্ডের নীচে অস্থিসার দুটো পাশ ফুলে ফুলে উঠছে, পাঁজরা ভয়ঙ্কর রকম ওঠা পড়া করছে। তার এক কালের সোনালি রঙ আজ ঘামে আর ধুলোয় কালচে হয়ে গেছে। ধূসর ঘামের ধারা সাবানের ফেনার মতো রেখা এঁকে গুলসারির দেহের অস্থিসার পশ্চাদ্ভাগ থেকে পেট, পা আর খুরের দিকে নামছে।

'আমি তো অত জোরে চালাই নি তোকে,' ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোড়াটিকে দেখতে দেখতে বিড় বিড় করে বলল তানাবাই। পেটে বাঁধা জিনের বেল্ট আর গলবন্ধনী ঢিলে করে দিল, মুখ থেকে কড়িয়ালি বের করে দিল। কড়িয়ালির গায়ে লেগে আছে গরম, আঠাল লালা। কোটের হাতা দিয়ে গুলসারির নাক আর গলা মুছে দিল। তার পর, যেটুক খড় বাকি ছিল তা আনার জন্য তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে গেল। এক পাঁজা খড় এনে রাখল গুলসারির পায়ের কাছে। কিন্তু, গুলসারি তা স্পর্শও করল না। গুলসারি তিরতির করে কাঁপছে।

ঘোড়ার মুখের সামনে একমুঠি খড় এগিয়ে দিয়ে তানাবাই বলল: 'নে, খা! হয়েছে কী রে তোর?'

ঘোড়ার ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠল, কিন্তু খড় মুখে নিতে পারল না। তানাবাই তার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল। বয়সের বিবর্ণ রেখার ভাঁজে ভাঁজে আধবোঁজা কোটরে ঢোকা চোখদু'টির মধ্যে সে কিছুই দেখতে পেল না। চোখজোড়া ঘোলাটে; পরিত্যক্ত গৃহের জানলার মতোই সেগুলো শূন্য।

তানাবাই অসহায়ের মতো চারপাশে তাকাল। দূরে পাহাড়, চারদিকে ঊষর স্তেপ, পথে কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না। বছরের এ সময়টাতে এখানে যাত্রীর দেখা পাওয়া যায় কদাচিৎ।

নির্জন পথে বুড়ো তানাবাই দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো ঘোড়ার পাশে।

ফেব্রুয়ারির শেষ। সমভূমিতে এখন আর বরফ নেই, শুধু সঙ্কীর্ণ গিরিখাতে আর নলখাগড়ার ঝোপেঝাড়ে এখনও শিরদাঁড়ার মতো স্তূপাকারে রয়েছে শেষ শীতের কিছু গোপন স্তর। বাতাস বয়ে আনছে পুরানো বরফের ক্ষীণ গন্ধ, মাটি এখনও হিমজমাট, ধূসর, নিষ্প্রাণ। শীতের শেষে পাথুরে স্তেপভূমি বিবর্ণ, বিষণ্ণ। স্তেপের এই দৃশ্য শুধুমাত্র তাকিয়ে দেখতেও তানাবাইয়ের গা শিউরে ওঠে।

ভেড়ার চামড়ার কোটের হাতার নীচ দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখতেই তানাবাইয়ের অবিন্যস্ত সাদা দাড়ি শঙ্কায় নড়ে উঠল। পৃথিবীর প্রান্তভাগের উপরে সূর্য ঝুলছে মেঘের দোলনায়। বিবর্ণ, কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্যাস্তের আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আবহাওয়া খারাপ হবে এমন কোন পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বাতাসে রয়েছে শীতল, ভুতুড়ে অনুভূতি।

তানাবাই বিষণ্ণভাবে ভাবল: "আগে জানলে আমি বেরই হতাম না। এখন সামনে-পেছনে কোন দিকে যাওয়ার উপায় নেই, দাঁড়িয়ে থাক ধুধু মাঠের মাঝখানে। আমার ভুলের জন্য ঘোড়াটা এখন বেঘোরে মারা যেতে বসেছে।"

হ্যাঁ, সম্ভবত তার উচিত ছিল আগামীকাল সকালে বের হওয়া। দিনের বেলায় পথে কিছু ঘটলে লোকজনের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, তানাবাই যাত্রা করেছে দুপুরে। বছরের এ সময়টাতে এটা কি সুবুদ্ধির কাজ হয়েছে?

কোন মোটর গাড়ি কিংবা ট্রাক নজরে পড়ে কি না দেখার জন্য তানাবাই ছোট একটা টিলার উপর উঠল। কিন্তু, পথের না এদিকে, না ওদিকে — কোথাও কোন কিছু চোখে পড়ে না। ক্লান্তভাবে হেঁটে সে ফিরে গেল নিজের গাড়ির কাছে।

"মিছিমিছি বেরোলাম," তানাবাই আবার মনে মনে বলল, চিরকেলে ব্যস্ততার জন্য নিজেকে বারবার দোষ দিতে লাগল। সে এখন নিজের ওপর, আর যেসব কারণে ছেলের বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বাধ্য করেছে সে সবের ওপর বিরক্ত হয়ে রাগে জ্বলতে লাগল। তার অবশ্যই সেখানে রাতটা থেকে যাওয়া এবং ঘোড়াটাকে বিশ্রাম নিতে দেওয়া উচিত ছিল। আর সে কি না...

তানাবাই সক্রোধে হাত নাড়ল। "না, কোন মতেই থাকতাম না। হেঁটে হলেও চলে যেতাম," সে নিজেই যেন নিজেকে কৈফিয়ত দেয়। "শ্বশুরের সঙ্গে কোনও মেয়ে অমনভাবে কথা বলে? ভালো হই মন্দ হই, আমি ওর স্বামীর বাপ বলে কথা। সারা জীবন ঘোড়া আর ভেড়ার রাখাল আমার পার্টিতে যোগ দিয়ে লাভটা হল কী, যদি বুড়ো বয়সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বেরই করে দেওয়া হল... ছেলেটাও বেশ বটে। মুখ খোলে না, চোখ তুলে তাকাতেও ভয় পায়। যদি মেয়েটা ওকে বলে বাপকে অস্বীকার কর, ও তা-ই করবে। ছেলেটা অপদার্থ, ও আবার বড় দরের কেউ-কেটা হতে চায়! ওঃ, কী আর বলব! কালে কালে লোকজন যা হচ্ছে!"

তানাবাইয়ের খুব গরম লাগছিল, সে শার্টের সামনের

বোতাম খুলে গাড়ির চারদিকে পায়চারি করতে লাগল — ঘোড়া, পথ আর আসন্ন রাত্রির কথা ভুলেই গেল। কিন্তু, কিছুতেই শান্ত হতে পারল না। ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করা নিজের সম্মানের পক্ষে হানিকর মনে করে ছেলের বাড়িতে সে নিজেকে সংযত রেখেছিল। এখন সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, এখন হলে, পথে আসতে মনের জ্বালার যা কিছু ভেবেছে তা ছেলের বৌকে বলতে পারত: "আমাকে পার্টিতে যে নিয়েছিল সে তুমি নও, যে আমাকে বার করে দিয়েছিল সে-ও তুমি নও। আরে বেটি, তখনকার ব্যাপার-স্যাপার কী রকম ছিল তুই তার কী জানিস? এখন সবকিছুরই বিচার করা সোজা। এখন তোমরা সবাই শিক্ষিত, সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু, আমাদের দায়ী করা হত আমাদের সব কাজের জন্য, আমাদের বাবা, মা, বন্ধু, শত্রু সকলের কাজের জন্য, এমন কি পড়শীর কুকুরের নষ্টামির জন্যও, আকাশের নীচে যা কিছু আছে সবকিছুর জন্যই আমাদের দায়ী করা হত। আর আমাকে কেন পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে কথা বলার কোন অধিকার তোমার নেই! সে ব্যথা আমার নিজের। ও নিয়ে কথা বলো না!"

'ও নিয়ে কথা বলো না!' তানাবাই চেঁচিয়ে পুনরুক্তি করল সামনে-পেছনে দ্রুত পায়চারি করতে করতে। সে বার বার বলতে লাগল: 'ও নিয়ে কথা বলো না!' সবচেয়ে দুঃখের আর অপমানের ব্যাপার হচ্ছে এই যে "ও নিয়ে কথা বলো না" ছাড়া তানাবাইয়ের যেন আর কিছুই বলার ছিল না।

সে গাড়ির চারদিকে অবিরাম পায়চারি করতে লাগল; হঠাৎ এক সময় মনে পড়ল কিছু একটা করতেই হবে, সে সারা রাত এখানে থাকতে পারে না।

সাজ পরা গুলসারি ঐ রকমই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অবসন্ন,

কুঁজো হয়ে, খুরগুলো পরস্পরের প্রায় গায়ে ঠেকে আছে — সে যেন কাঠ হয়ে গেছে, মরে গেছে।

'তুই কী রে?' তানাবাই এগিয়ে গেল গুলসারির দিকে, মৃদু, নিস্তেজ গোঙানি শুনতে পেল। 'ঝিমুচ্ছিলি? খারাপ লাগছে তোর?' ঘোড়ার ঠান্ডা কানদুটো দ্রুত হাতে ছুঁয়ে দেখল, কেশরের নীচে হাত গলিয়ে দিল। কেশরের লোমও ঠান্ডা আর ভিজে ভিজে। তানাবাইয়ের সবচেয়ে বেশি ভয় হল এই দেখে যে গুলসারির কেশরের সেই ওজন আর অনুভব করা গেল না। বিষণ্ণভাবে ভাবল: "গুলসারি একদম বুড়িয়ে গেছে। কেশরের লোম ঝরে গিয়ে এখন পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে। আমরা সবাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি; আমাদের সকলেরই এক পরিণাম।" তানাবাই দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। ঘোড়া আর গাড়ি এখানে রেখে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলে মাঝরাতে বাড়িতে, খাতের মধ্যে নিজের চৌকিঘরে পেঁছলেও পেঁছানো যেতে পারে। নদীর তীরে সস্ত্রীক যেখানে সে থাকে সেখান থেকে উজানে দেড় কিলোমিটার দূরে জলপরিদর্শকের বাড়ি। গ্রীষ্মে তানাবাই খড় তোলার তদারকি করে, শীতকালে খড়ের গাদার তদারকি করে, লক্ষ্য রাখে রাখালরা যাতে সময়ের আগেই খড় বার করে কাজে লাগাতে শুরু না করে।

গত শরতে একদিন তানাবাই কাজ নিয়ে খামার-দপ্তরে গেলে নতুন দলনেতা, এখানকার আগন্তুক তরুণ কৃষিবিজ্ঞানী, তাকে বললেন:

'আক্সাকাল, আপনার জন্য একটা নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছি। একটু বুড়ো অবশ্য, তবে আপনার কাজ চলে যাবে।'

তানাবাই সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করেছিল: 'কোনটা? আরেকটা ঘাটের মড়া নয় ত?'

'এখ্নই দেখতে পাবেন। একটু তামাটে ধরনের। আপনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন, এরা ত বলছে আপনি না কি একসময়ে এই ঘোড়া ব্যবহার করেছেন।'

আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে দেখে তানাবাইয়ের হৃৎপিন্ড মোচড় দিয়ে উঠেছিল। "আবার আমাদের দেখা হল তাহলে!" কথাটা সে আপন মনে বলল ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে। প্রত্যাখ্যান করতে ভরসা হল না। গ্লসারিকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

বৌ ঘোড়াটাকে প্রায় চিনতেই পারে নি।

সে অবাক হয়ে বলেছিল: 'এটা সেই গ্লসারি হতেই পারে না!'

বৌয়ের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে তানাবাই বিড় বিড় করে বলেছিল: 'এটা সেই গ্লসারিই বটে...'

গ্লসারির সঙ্গে যেসব স্মৃতি জড়িত সেগ্লো আর না ঘাঁটানোই তাদের পক্ষে ভালো ছিল। তানাবাই ত আর যৌবনে ধোয়া তুলসীপাতাটি ছিল না! কথাটা যাতে অবাঞ্ছিত মোড় না নেয় সে জন্য সে বৌকে একটু কড়াভাবেই বলেছিল:

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? খাবার গরম কর। খিদেয় মরে যাচ্ছি!'

'ভাবছিলাম, বয়সে কী না হয়। তুমি যদি আমাকে না বলতে যে এ-ই সেই গ্লসারি, আমি ওকে চিনতেই পারতাম না।'

'এতে অবাক হবার এমন কী আছে? তুমি কি ভাবছ আমরাই আছি আর আগের মতো? সময় কাউকে রেয়াত করে না।'

'আমিও তা-ই বলছিলাম।' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল তানাবাইয়ের স্ত্রী, তার পর ম্চকি হেসে উদার ভঙ্গিতে আবার

বলেছিল: 'তুমি কি আগের মতো আবার রাতের বেলা ঘোড়া নিয়ে বেরুবে নাকি? বেরুতে পার, আমি আপত্তি করব না।'

'তেমন সম্ভাবনা আর নেই।' অপ্রতিভভাবে কথা থামিয়ে দিয়ে বৌয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল তানাবাই। পরিহাসের জবাব পরিহাসেই দিতে পারত, কিন্তু সে এত বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে, কিছু খড় নামানোর জন্য খড়ের গাদার ওপরে উঠে অকারণে সেখানে দেরি করছিল। সে ভেবেছিল বৌ বুঝি আগেকার সেসব কথা ভুলে গিয়েছে; দেখা যাচ্ছে তা নয়।

চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল; তানাবাইয়ের স্ত্রী তখন দুপুরের রান্না খাবারই গরম করছিল রাতের জন্য। তানাবাই তখনও খড় নাড়াচাড়া করছিল অকারণে। শেষে বৌ দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলল:

'নেমে এস, নয়ত খাবার আবার ঠান্ডা হয়ে যাবে!'

তানাবাইয়ের স্ত্রী অতীতের কথা আর তোলে নি। সেসব কথার আর কোন মানেই ছিল না...

সারাটা শরৎ আর শীতকাল তানাবাই ঘোড়াটাকে যত্ন করেছিল, গরম যবের গুঁড়ো আর কুচান বীট খাইয়েছিল। গুলসারির দাঁতগুলো ক্ষয়ে গিয়েছিল গোড়া পর্যন্ত। তানাবাই ভেবেছিল সে গুলসারিকে আবার খাড়া করে তুলেছে, অথচ তার পর আজ এই অবস্থা হল। এখন কী করে?

গুলসারিকে পথে ফেলে যেতে তার মন সরছিল না।

'এখন আমরা করি কী বল্ তো, এখানে এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব?' বলে তানাবাই গুলসারিকে মৃদু ধাক্কা দিল। গুলসারি একটু দুলে পা নেড়ে দাঁড়াল। 'দাঁড়া দেখি। একটু অপেক্ষা কর! আমি এক্ষুনি আসছি।'

চাবুকের হাতল দিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে সে একটা বস্তা টেনে আনল। এই বস্তায় করে ছেলের বৌয়ের জন্য আলু নিয়ে গিয়েছিল। বস্তার ভেতর থেকে সে একটা ছোট পুঁটুলি বের করল। পুঁটুলির মধ্যে আছে কয়েকটি চাপাটি, তানাবাইয়ের বৌ এগুলো তৈরি করে দিয়েছিল পথে খাওয়ার জন্য। তানাবাই এগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিল; খাওয়াদাওয়া তার মাথায় উঠে গিয়েছিল। আধখানা রুটি ভেঙ্গে জামার কোঁচড়ে রেখে ছোট ছোট টুকরো করে খেতে দিল ঘোড়াটাকে। গুলসারি সশব্দে রুটির ঘ্রাণ নিল, কিন্তু খেতে পারল না। তানাবাই নিজেই তাকে খাওয়াতে শুরু করল। কয়েকটা টুকরো ঠেলে ঢুকিয়ে দিল গুলসারির মুখের ভেতরে, গুলসারি চিবোতে শুরু করল।

'এই তো বেশ, খা, হয়ত বা বাড়ি পৌঁছুতে পারব, কী বলিস?' তানাবাইয়ের মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল। 'আস্তে আস্তে, পায়ে পায়ে পৌঁছুতে পারব, কী বলিস? সেখানে বুঝতেই পারছিস আমি আর আমার বৌ যত্ন করে তোকে সারিয়ে তুলব.' তানাবাই গুলসারিকে ভরসা দিয়ে বলল। গুলসারির মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ল তানাবাইয়ের কম্পিত হাতের উপর; লালাটা আগের চেয়ে গরম হয়ে উঠেছে অনুভব করে সে খুশি হয়ে উঠল।

গুলসারিকে খাইয়ে তানাবাই লাগাম ধরল।

'চল, এবার যাওয়া যাক! এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। চল, চল!' বেশ জোর দিয়ে বলল সে।

গুলসারি চলতে শুরু করল, গাড়িটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলল, অসমান পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চাকাগুলো গড়িয়ে চলল। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল — একটা বুড়ো ঘোড়া আর একজন বুড়ো মানুষ।

পথের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তানাবাই ভাবল: "শক্তি বলতে ঘোড়াটার আর কিছু নেই তোর বয়স কত হল রে গুলসারি? কুড়ি, কম পক্ষে। না, তোর বয়স নিশ্চয় আরও বেশি..."

২

ওদের প্রথম পরিচয় — যুদ্ধের পর। কর্পোরাল তানাবাই বাকাসভ পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে। জাপান আত্মসমর্পণ করার পর সে সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পায়। সব মিলিয়ে প্রায় ছ'বছর তার ফৌজী পথ পরিক্রমা। ভগবানের আশীর্বাদে বিশেষ কিছু ঘটে নি: সরবরাহ লাইনে কাজ করার সময় একবার গোলা লেগে আহত হয়েছিল, আরেকবার বুকে আঘাত পেয়েছিল; কিন্তু দু'মাসে হাসপাতালে থেকে আবার ফিরে যায় নিজের ইউনিটে।

সে যখন বাড়ি ফিরছিল, পথে স্টেশানের ফেরিওয়ালীরা তাকে 'বুড়ো মানুষ' বলে। তারা অবশ্য রসিকতা করেই বলেছিল এবং তানাবাইও তাদের ওপর তেমন রাগ করে নি। অবশ্যই তরুণ ছিল না, তবে বুড়োও ছিল না, চেহারাটাই যা একটু বুড়োটে হয়ে গিয়েছিল আর কি। লড়াই করে করে তার চেহারাটা রীতিমতো কাঠখোট্টা ধরনের হয়ে গিয়েছিল, গোঁফেও কিছুটা পাক ধরেছিল, কিন্তু দেহ আর মন ছিল তখনও বেশ মজবুত। এক বছর বাদে বৌ একটি মেয়ে জন্ম দিল, তার পর এলো আরও একটি। এখন দু'মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের ছেলেপুলেও আছে। গরমের দিনে প্রায়ই আসে বেড়াতে। বড় জামাই ট্রাক ড্রাইভার। ট্রাকের পেছনে পরিবারের লোকজনকে বসিয়ে জামাই আসে পাহাড়ী এলাকায় বুড়ো-বুড়িকে দেখতে। না, মেয়েদের আর

জামাইদের বিরুদ্ধে তাদের কোন নালিশ নেই, কিন্তু ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গিয়েছে। তবে, সেটা অন্য কাহিনী...

তখন যুদ্ধ জয়ের পর বাড়ি ফিরে আসার পথে তানাবাইয়ের মনে হয়েছিল জীবন সবে শুরু হতে যাচ্ছে। মনটা কী ভালোই না লাগছিল। বড় বড় স্টেশানে সেনাবাহী ট্রেনকে ব্যান্ড বাজিয়ে অভ্যর্থনা আর বিদায় জানানো হচ্ছিল। বাড়িতে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল তার স্ত্রী, ছেলেটির বয়স তখন সাত, শিগ্গিরই স্কুল শুরু করার কথা। তানাবাই চলছিল এমন অনুভূতি নিয়ে যেন তার নবজন্ম হয়েছে, এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা যেন হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। সে আগের সবকিছু ভুলে যেতে চাইছিল, শুধু ভাবতে চাইছিল ভবিষ্যতের কথা। তার সেই ভবিষ্যৎ খুবই সরল আর পরিষ্কার: বাঁচতে হবে, ছেলেপুলে মানুষ করতে হবে, গৃহস্থালী গোছাতে হবে, একটা বাড়ি তৈরি করতে হবে — এক কথায় বাঁচতে হবে। এখন আর কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, কারণ যা কিছু ঘটেছে তা যেন এরই জামিন হিশেবে দেওয়া হয়েছে যে, এখন, অবশেষে, শুরু হবে সত্যিকারের জীবন, যে জীবনের জন্য, এতকাল তারা সাধনা করেছে, যার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে এবং যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

কিন্তু, দেখা গেল তানাবাই তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল, বেশি রকম তাড়াহুড়ো। জামিন হিশেবে ভবিষ্যৎকে তখনও দেওয়া দরকার ছিল আরও কয়েক বছর, বছরের পর বছর।

প্রথমে সে এক কামারশালায় হাতুড়ি পেটার কাজ নিল। এক সময় এ কাজে তার দক্ষতা ছিল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নেহাইয়ের ওপর সে এমন জোর হাতুড়ি পেটাতে লাগল যে কামার কোনমতে গন্‌গনে লাল লোহার খণ্ড উলটে দেওয়ার সময় পেত। এখনও সে মাঝে মাঝে শুনতে পায়

কামারশালার সেই ঝন্‌ঝন্‌ আর ঠকাঠক শব্দ; সেই শব্দ সব দুর্ভাবনা ও উদ্বেগ ডুবিয়ে দিত। তখন রুটি আর কাপড়ের ঘাটতি পড়েছিল, মেয়েরা খালি পায়ের ওপর রবারের ঢাকনা পরত, শিশুরা চিনির স্বাদ জানত না, যৌথখামারটি আকর্ণ ডুবে ছিল ঋণে, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, সব সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলত হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে। হাতুড়ি পেটাত, নীল ফুলকি ছুটিয়ে নেহাইতে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ হত। হাতুড়ি ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁকপাঁক করে নিশ্বাস ফেলত আর ভাবত: "সব ঠিক হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে আমরা যুদ্ধে জিতেছি! আমরা জিতেছি!'' হাতুড়ি ধুয়া তুলত: ''জিতেছি, জিতেছি-তেছি-তেছি-তেছি!" তানাবাই একাই নয় — তখনকার দিনে সবাই বিজয়ের বাতাসে জীবন ধারণ করত, সে বাতাস ছিল রুটির মতো।

তার পর পশুপালকের কাজ নিয়ে তানাবাই পাহাড়ে চলে যায়। চোরো তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ কাজে লাগায়। চোরো মারা গেছে বেশ কিছুকাল আগে। তানাবাই যখন পশুপালক হল, তখন চোরো ছিল যৌথখামারের সভাপতি; যুদ্ধের গোটা সময়টাতেও সে সভাপতি ছিল। হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভালো না থাকায় তাকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় নি। কিন্তু বাড়িতে থেকেও চোরো বুড়িয়ে গিয়েছিল বেশি। এটা তানাবাইয়ের চোখে পড়েছিল ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই।

অন্য কেউ তাকে পশুপালক হওয়ার জন্য কামারশালার কাজ ছাড়তে রাজি করাতে পারত না। চোরো ছিল তানাবাইয়ের অনেক কালের পুরানো বন্ধু। এক সময় কম্‌সমোল-সদস্য হিশেবে তারাই একসঙ্গে যৌথখামার গড়ার জন্য আন্দোলন চালায়, একসঙ্গে তারা কুলাকদের অধিকারচ্যুত করে। এই

ব্যাপারে সে, তানাবাই তখন বিশেষ উৎসাহ দেখায়। অধিকারচ্যুত হওয়ার তালিকায় যাদের নাম ছিল, তাদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র করুণা ছিল না তানাবাইয়ের মনে...

কামারশালায় এসে চোরো তানাবাইকে রাজি করাল। চোরোকে খুবই খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

হেসে বলল: 'আমার ভয় ছিল তুই হয়ত হাতুড়ির সঙ্গে একেবারে লেপ্‌টে গেছিস, তোকে বুঝি বা ছাড়িয়ে আনা যাবে না।'

চোরো ছিল অসুস্থ, দুর্বল, তার ঘাড় ছিল লিকলিকে, ভাঙ্গা গালে গভীর ভাঁজ। তখনও গরম, কিন্তু গ্রীষ্মেও চোরো তার সেই একই সোয়েটার পরে থাকত।

কামারশালার কাছে একটি সেচখালের ধারে তারা ঝোপঝাড়ে বসে ছিল কথা বলার জন্য। তানাবাইয়ের মনে পড়ল যৌবনে চোরো কেমন ছিল। সে কালে চোরো ছিল সুদর্শন ছোকরা, গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত। শান্ত আর উদার স্বভাবের জন্য লোকে তাকে পছন্দ করত। কিন্তু তানাবাই চোরোর সেই উদারতাকে পছন্দ করত না। প্রায়ই সভার মধ্যে তানাবাই লাফিয়ে উঠত এবং শ্রেণীশত্রুদের প্রতি অসহনীয় ক্ষমা দেখানোর জন্য চোরোকে তীব্র ভর্ৎসনা করত। তানাবাইয়ের কথাগুলো হত একেবারে খবরের কাগজের লেখার মতো জবরদস্ত। সাময়িক বিবরণ পাঠের আসরে যা শুনত সব তানাবাই হুবহু আবৃত্তি করত। মাঝে মাঝে নিজের উচ্চারিত কথা শুনে নিজেই ঘাবড়ে যেত। তবে শুনতে ভালো হত।

চোরো বলল: 'বুঝলি কিনা, তিন দিন আগে আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম। বুড়োরা জানতে চাইল সব সৈন্যই ফিরে এসেছে কি না। বললাম, যারা বেঁচে আছে সবাই

ফিরেছে। "তারা কখন কাজ করতে শ্বরু করবে?" আমি বললাম: সবাই কাজ শ্বরু করে দিয়েছে, কেউ মাঠে, কেউ কলকারখানায়, ঘর-বাড়ি তৈরির জায়গায়, কেউ বা অন্য কোথাও। "সেটা আমরা জানি। কিন্তু এই ঘোড়াগ্বলোর দায়িত্ব কারা নেবে? ওরা কি আমাদের মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? আমাদের ত আর বেশি দিন বাকি নেই।" আমি সত্যি লজ্জা পেলাম। তারা কী বলতে চেয়েছে ব্বঝতে পারছিস ত? য্বদ্ধের সময় এই ব্বড়োদের আমরা পাহাড়ে পাঠিয়েছিলাম ঘোড়ার তদারকি করার জন্য। তারা এখনও সেখানেই রয়েছে। এটা ব্বড়ো মান্বষের কম্ম না। এ কাজে সারা দিনরাত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে হয়, কোন অবসর নেই। আর শীতের রাতে কী অবস্থা! দেরবিশবাইয়ের কথা মনে আছে তোর? ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই শীতে আড়ষ্ট হয়ে মারা গেল। অথচ আর্মির যখন ঘোড়া দরকার হয়েছিল, তখন তারাই না ঘোড়াকে বশ মানিয়েছে! ষাটের ওপর বয়সে ঐ রকম একটা লাফানো-শয়তানের পিঠে চড়ে পাহাড় আর উপত্যকায় ছোটাছ্বটি করে দেখ দেখি। হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। ব্বড়োরা যা করেছে সে জন্য তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এখন য্বদ্ধফেরত সবার খ্বব নাক উঁচু হয়েছে, বিদেশে কালচারের চ্বড়ান্ত দেখেছে, এখন আর পশ্বপালক হতে চায় না। বলে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘ্বরতে যাবে কোন দ্বঃখে? ব্যাপারটা এখন এ-ই দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের সাহায্য কর তানাবাই। তুই গেলে অন্যদেরও জোর করে পাঠানো যাবে।'

তানাবাই উত্তর দিল: 'ঠিক আছে, চোরো। বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে দেখি।' তানাবাই ভাবছিল: "জীবনে কত কিছ্বই না ঘটে গেল, কিন্তু চোরো, তুমি এখনও সেই আগের মতোই আছ। তোমার দয়াই হবে তোমার কাল। যদিও এটা হয়ত

ভালোই। যুদ্ধে যা দেখেছি তাতে আমাদের সবারই আরও দয়ালু হওয়া উচিত। হয়ত জীবনে এটাই সবচেয়ে খাঁটি জিনিস।"

ওরা যে যার পথ ধরল।

তানাবাই কামারশালায় ফিরে যাচ্ছিল, চোরো তাকে ডাকল:

'তানাবাই, একটু দাঁড়া!' চোরো ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছিল, তানাবাইয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকানোর জন্য মাথা নীচু করল। 'তুই আমার ওপর রাগ করিস নি ত?' মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল সে। 'জানিস, নিজের বলতে আমার একটুকু সময়ও নেই। চেয়েছিলাম একটু বসে প্রাণ খুলে আলাপ করব, যেমন আমরা করতাম আগে। কতকাল আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই! ভেবেছিলাম যুদ্ধ শেষ হলেই সবকিছু সহজ হয়ে যাবে, কিন্তু ঝামেলা আর কমে না। মাঝে মাঝে চোখের পাতা ফেলতে পারি না, মাথায় নানা চিন্তা পাক খায়। ভাবি কী করলে খামারটা ভালোমতো চালু থাকে, লোকজন খেতে পায়, আমাদের সব কাজ পূরণ হয়। মানুষ বদলে গেছে, তারা এখন আগের চেয়ে ভালোভাবে থাকতে চায়...'

কিন্তু একান্তে বসে প্রাণ খুলে আলাপ করার সুযোগ আর তাদের হয়ে উঠল না। সময় কেটে গেছে, সেই আলাপের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে...

পশুপালক হয়ে পাহাড়ে যাওয়ার পরই কোন এক সময় তানাবাই প্রথম দেখতে পায় আঠার মাস বয়সী সোনালী বাদামী রঙের ঘোড়ার বাচ্চাটিকে বুড়ো তোরগোইয়ের পালে।

ঘোড়াগুলো গুনে খোঁয়াড় থেকে বের করে দেওয়ার পর তানাবাই খোঁচা দিয়ে বুড়ো মানুষটিকে বলল: 'এ-ই দিয়ে যাচ্ছেন না কি আমাকে, আকসাকাল? পালটা আহা মরি কিছু নয়।'

তোরগোই অস্থিসার বুড়ো মানুষ, কোঁচকানো মুখের ওপর এক গাছি চুলেরও চিহ্ন নেই। দেখতে একটা ছোট ছেলের মতো। ভেড়ার চামড়ার বিরাট লোমশ টুপিটা তার মাথায় দেখাচ্ছিল ব্যাঙের ছাতার মতো। এ ধরনের বুড়োরা সাধারণত খুব শক্ত সমর্থ, গলাবাজ আর কটুভাষী।

কিন্তু তোরগোই কোন কড়া উত্তর দিল না। শান্তভাবে বলল: 'বলতে পার এটা একটা সাধারণ পাল। বড়াই করার কিছু নেই; ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ চালালে নিজেই দেখতে পাবে।'

বুড়োকে খুশি করার জন্য তানাবাই নরম সুরে বলল: 'আমি অমনি কথার কথা বললাম আর কি।'

টুপিটা চোখের কাছ থেকে ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে, রেকাবের উপর ভর দিয়ে চাবুকের হাতল দিয়ে ইঙ্গিত করে তোরগোই বলল: 'অবশ্য একটা বিশেষ ঘোড়াও আছে এর মধ্যে। ওই যে সোনালী বাদামী রঙের বাচ্চাটা, যেটা ঘাস খাচ্ছে ডান দিকে। সময়ে ওটা একটা ঘোড়া হবে বটে!'

'ওই বলের মতো গোলগাল বাচ্চাটার কথা বলছেন কি? ওটা ত দেখতে কেমন ছোটখাটো গোছের, মাজাটাও ছোট।'

'ও হচ্ছে শীতকালের বাচ্চা। ওকে একটু সময় দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওতে আছে কী? ও ভালোটা কিসে?'

'ও হচ্ছে জাতদৌড়বাজ ঘোড়া।'

'তাতে কী?'

'আমি এমন ঘোড়া বেশি দেখি নি। আগেকার দিন হলে ওর দামের কোন ইয়ত্তা থাকত না। দৌড়ের সময় এ ধরনের ঘোড়ার জন্য লোকে শির কুরবানি দিত।'

তানাবাই বলল: 'বটে, তাহলে ত দেখতে হয়!'

তারা নিজেদের ঘোড়া ছ্বটিয়ে পালটার চারদিকে ঘ্বরল, সোনালী বাচ্চাটাকে আলাদা করে আনল এবং নিজেদের সামনে সেটাকে ছ্বটিয়ে দিল। বাচ্চাটা দেখা গেল দৌড়্বতে পেলে আর কিছ্বই চায় না। আনন্দে মাথার ঝ্বটি ঝাঁকিয়ে, চিঁহিহি করে ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত অথচ অতি দ্রুত চালে বিশাল একটা অর্ধবৃত্তের মতো করে পালে ফেরার চেষ্টায় দৌড়্বতে লাগল। তানাবাই ম্বগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওহ্! কী চলন! তাকিয়ে দেখার মতো বটে!'

ব্বড়ো উত্তেজিত হয়ে জবাবে বলল: 'তা তুমি কী ভেবেছিলে হে!'

তারা বাচ্চাটার পেছনে ছ্বটতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল — খেলার সময়ে বাচ্চারা যেমন করে। তাদের চিৎকারে ঘোড়ার বাচ্চাটা আরও উৎসাহ পেল; ক্ষণেকের জন্যও দ্বলকি চালে না ছ্বটে, বরং উড়ে যাওয়ার মতো সহজ ভঙ্গিতে, যেন প্রায় অনায়াসেই, দৌড়ের গতিবেগ ক্রমেই বাড়াতে লাগল।

সোনালী বাচ্চাটা অবিকল এক ভঙ্গিতে ছ্বটেই চলেছে; তাকে ফেরানোর জন্য তাদের ঘোড়া টগবগিয়ে ছোটাতে হল।

'দেখছ ত তানাবাই!' ঘোড়ায় ছ্বটতে ছ্বটতে টুপি নাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল তোরগোই। 'গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই ও হাতের ছ্বরির মতো তুখোর! আওয়াজে কেমন ছোটে দেখ না! হেট্, হেট্! অ্যাই, হেট্, হেট্!'

অবশেষে বাচ্চাটা পালে ফিরে এলো: ওরা সেটাকে আর খাটাল না। কিন্তু নিজেদের উত্তেজিত ঘোড়াগ্বলোকে গলদ্ঘর্ম করিয়ে ছোটানোর পর তাদের স্বস্থির হতে লাগল অনেকক্ষণ।

'ধন্যি বটে, তোরগোই খুড়ো। আচ্ছা একটা ঘোড়া বড় করে তুলেছেন। মনে বেশ আনন্দই হল।'

'হ্যাঁ, ভালো,' তানাবাইয়ের সঙ্গে একমত হল বুড়ো। 'তবে দেখো,' মাথার পেছন দিকটা চুলকে হঠাৎ একটু রুক্ষভাবে সে বলল, 'ওর মাথাটা খেও না। আগে থেকে অত কথা বলে কাজ নেই। ভালো দৌড়ের ঘোড়া হচ্ছে সুন্দরী মেয়ের মতো, তার সন্ধানী অনেক। মেয়ের ভাগ্যি কেমন? না, ভালো লোকের হাতে পড়লে ফুলের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে, তাকে দেখে সবার চোখ জুড়োবে আর মন্দ লোকের হাতে পড়লে সে মেয়ের দিকে তাকাতেও তোমার বুক ভেঙ্গে যাবে, অথচ তুমি তার জন্য কিছুই করতে পারবে না। ভালো ঘোড়ার ব্যাপারেও ঠিক একই রকম। নষ্ট করে দেওয়া খুবই সোজা। দৌড় শুরু করতে না করতেই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনি ভাববেন না, আক্‌সাকাল, এ ব্যাপারে আমিও একটু-আধটু বুঝি, একেবারে কাঁচা ছেলেটি নই।'

'এই ত চাই! হ্যাঁ, ওর নাম হল গুলসারি। মনে রেখো।'

'গুলসারি?'

'হ্যাঁ। গত গরমের সময় আমার নাতনি এসেছিল বেড়াতে। সে-ই নাম রেখেছে। বাচ্চাটা তখনও খুব ছোট, আমার নাতনি ওকে খুব ভালবাসত। নামটা ভুলো না কিন্তু: গুলসারি।'

দেখা গেল তোরগোই কথা বলতে খুব ভালবাসে। সারা রাত বসে বসে তানাবাইকে অনেক উপদেশ দিল। তানাবাই ধৈর্য ধরে শুনে গেল।

তোরগোই আর তার বৌকে ক্যাম্প থেকে তানাবাই ভার্স্ট সাতেক এগিয়ে দিয়ে গেল। তোরগোইদের ছেড়ে যাওয়া তাঁবুতে তানাবাই বাস করবে সপরিবারে। আরেকটি তাঁবুতে

থাকবে তানাবাইয়ের সহকারী। কিন্তু এখনও কোন সহকারী পাওয়া যায় নি। আপাতত সে একা।

বিদায় নেওয়ার আগে তোরগোই তানাবাইকে আবার মনে করিয়ে দিল:

'ওটাকে আপাতত ঘাঁটিও না। ওর দায়িত্ব বিশ্বাস করে অন্য কারও হাতে দিয়ো না। তুমি নিজে ওকে শেখাবে আগামী বসন্তে। দেখো, সাবধান। প্রথম জিন পরিয়েই বেশি জোরে ছুটিয়ো না, তাতে ওর চাল নষ্ট হবে, ওকে বরবাদ করে ফেলবে। প্রথম ক'দিন ও যেন খুব বেশি জল না খায় সেদিকে নজর রেখো। শেখানো হয়ে গেলে আমি যদি মারা না যাই তাহলে আমাকে দেখিয়ে যেও...'

তোরগোই আর তার বৌ ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল উট বোঝাই তাদের মালপত্র, তানাবাইয়ের জন্য রেখে গেল ঘোড়ার পাল, তাঁবু আর পাহাড়...

গুলসারি যদি জানত, তাকে নিয়ে কত কথা হল, আরও কত কথা হবে আর সে সব কোথায় গড়াবে!..

গুলসারি আগের মতোই স্বচ্ছন্দে বেড়াতে লাগল পালের সঙ্গে। পাহাড়, ঘাস, নদী — কিছুই বদলায় নি। শুধু সেই বুড়োর বদলে আরেক জন প্রভু তাদের চরাচ্ছে। এই মানুষটির গায়ে ছাইরঙা গ্রেট কোট, মাথায় সৈনিকদের কানঢাকা টুপি। নতুন মনিবের কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা, কিন্তু বেশ চড়া আর কড়া। ঘোড়ার পালটি অল্প দিনেই নতুন মনিবের সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হলে, নতুন মনিব চারপাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গেলেও তাদের আপত্তি দেখা যায় না।

তার পর শুরু হল তুষারপাত। প্রায়ই তুষার পড়তে লাগল আর তা মাটির উপর জমাট বেঁধে থাকতে লাগল দীর্ঘ কাল। ঘাসের খোঁজে ঘোড়াগুলো খুর দিয়ে জমাট তুষার খুঁড়তে

লাগল। মনিবের মুখের ওপর কালির পোঁচ পড়ল, বাতাসে হাতগুলো হয়ে উঠল কর্কশ। মনিব এখন ফেল্টের বুট আর ফারের কোট পরছে। গুলসারির লম্বা লোম গজাল, কিন্তু তবু তার শীত লাগে, বিশেষ করে রাতের বেলা। হিমের রাতে পালের ঘোড়াগুলো একটা আশ্রয়ের জায়গায় ঘন দঙ্গল বেঁধে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, তুষারে সাদা হয়ে যায় ওরা। তখন মনিব ওদের পাশে থাকে নিজের ঘোড়ায় চড়ে, দস্তানায় ঢাকা দু'হাত চাপড়ায় আর নিজের মুখ ঘষে। মনিব মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। মনিব কাছে থাকলে আরও ভালো। সে মাঝে মাঝে চেঁচায় অথবা ঠান্ডায় গলা খাঁকারি দেয় — ঘোড়াগুলো তখন মাথা উঁচু করে, কান খাড়া করে, কিন্তু মনিব পাশেই আছে দেখতে পেয়ে রাতের বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে আর শিসে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সেই শীতকাল থেকেই তানাবাইয়ের কণ্ঠস্বর গুলসারির মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইল।

একদিন রাতে পাহাড়ে তুষার ঝড় হল। তীক্ষ্ন, হুল ফোটানো তুষার কণা আঠার মতো লেগে গেল ঘোড়াগুলির কেশরের সঙ্গে, লেজ ভারী করে তুলল, চোখ টাটিয়ে দিল। ঘোড়ার পালে চাঞ্চল্য উঠল। ঘোড়াগুলো কাঁপতে কাঁপতে গা ঘেঁষে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রইল। ধাড়ি মাদী ঘোড়াগুলো উদ্বিগ্ন হয়ে নাক ঝাড়তে লাগল, বাচ্চাগুলোকে পালের মাঝখানে ঠেলে দিল। ওরা গুলসারিকে কোনঠাসা করে একবারে ধারে ঠেলে দিল, সে আর কিছুতেই দঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে পারছিল না। গুলসারি লাথি ঝাড়তে লাগল, অন্যদের ঠেলতে লাগল, একেবারেই পালের বাইরে পড়ে গেল — শেষে পালের সর্দার ঘোড়ার কাছ থেকে জোর মার খেল। পালের ঘোড়াগুলোকে দঙ্গল বাঁধার জন্য সর্দার ঘোড়াটি শক্ত খুরের তলায় তুষার

ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে চারধারে চরকির মতো ছুটছিল। কান খাড়া করে, ভয় দেখানোর মতো করে মাথা নুইয়ে সে মাঝে মাঝে কোন এক পাশে লাফিয়ে পড়ছিল, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, অন্ধকারে শোনা যাচ্ছিল কেবল ওর নাকের ঘরঘর আওয়াজ; তার পর আবার ক্ষ্যাপা আর ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে ফিরে আসছিল। গুলসারিকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বুক চিতিয়ে তার দিকে ছুটে এল, তার চারপাশে এক পাক ঘুরল, তার পর প্রচণ্ড শক্তিতে পেছনের দুটি খুর দিয়ে গুলসারির পাঁজরায় লাথি হানল। ব্যথায় গুলসারির দম বন্ধ হয়ে আসার জো। তার শরীরের ভেতরে কী একটা যেন ফুটে গেল, আর্তনাদ করে উঠল গুলসারি; সে কোন রকমে খাড়া হয়ে রইল। সে আর স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করল না, গাদাগাদি করা পালটির এক ধারে গা চেপে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল; পাঁজরার প্রচণ্ড ব্যথায় তখন সে গোঙাচ্ছে, এই নির্মম ব্যবহারে সে খুবই কষ্ট পেল মনে। ঘোড়াগুলো শান্ত হয়ে গেল, এমন সময় গুলসারি ভাসা ভাসা একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পেল। নেকড়ের ডাক সে আগে আর কখনও শোনে নি। মুহূর্তের মধ্যে তার ভেতরের সবকিছু যেন থেমে গেল, বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল। ঘোড়ার পালটি চকিত, উত্তেজিত হয়ে শুনতে লাগল সেই শব্দ। সবকিছুই যেন শান্ত হয়ে এলো। তবে সে নিস্তব্ধতা ছিল ভয়ানক। ঝির ঝির করে তুষার পড়ছে, গুলসারির উঁচু করা মাথার ওপর আঠার মতো লেগে যাচ্ছে। মনিব কোথায়? এই মুহূর্তে তাকে ওদের বড় দরকার; তার গলার আওয়াজ শুনতে পেলে এমনকি তার ফারকোটের ধোঁয়াটে গন্ধটা পেলেও হত! গুলসারি এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাতে লাগল, ভয়ে সে অসাড় হয়ে গেল। অন্ধকারে তুষারের উপর দিয়ে একটা ছায়া যেন লঘু পায়ে

পেছনে চলে গেল। গ্লেসারি পেছন দিকে প্রচণ্ড লাফ দিল, ঘোড়ার পাল তৎক্ষণাৎ দঙ্গল ভেঙ্গে ছুট দিল। বন্য আওয়াজ আর হ্রেষাধ্বনি করতে করতে হতবুদ্ধি ঘোড়ার পাল নিরেট অন্ধকারে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ছুটতে লাগল। তখন আর এমন কোন শক্তি ছিল না যা তাদের থামাতে পারে। ভূমিধসের সময়ে পাহাড়ের গা বেয়ে যেভাবে পাথর গড়িয়ে পড়ে, ঘোড়াগুলো তেমনিভাবে সর্বশক্তিতে পরস্পরের পাশাপাশি ছুটতে লাগল সামনের দিকে। গুলসারি কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু সেও এই উত্তেজিত, উন্মত্ত দৌড়ে যোগ দিল। হঠাৎ একটা গুলীর আওয়াজ হল, তার পর আরেকটা। ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে মনিবের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনতে পেল। চিৎকারটা প্রথমে শোনা গেল এক পাশ থেকে, তার পর একেবারেই না থেমে শোনা গেল তাদের সারির মাঝখানে, এখন শোনা যাচ্ছে সামনে। ওরা এখন ছুটল মনিবের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে, সে ওদের চালিয়ে নিয়ে গেল। মনিব এখন ওদের সঙ্গে। প্রতি পদক্ষেপেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফাটলে বা খাদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও মনিব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে ওদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার গলার আওয়াজ ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে, পরে তা ভেঙে গেল, কিন্তু তবু সে অবিরাম চিৎকার করছে: 'হট্, হট্, অ্যাই-হট্!' ঘোড়াগুলো মনিবকে অনুসরণ করছে, পেছনে ধাওয়া করছিল যে ভয়টা সেটার কাছ থেকে পালাচ্ছে তারা।

ভোরের দিকে তানাবাই ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনল পুরনো জায়গাটায়। ঘোড়াগুলো সেখানে থামল। ঘন মেঘের মতো বাষ্প উঠছে তাদের গা থেকে, তাদের দু'পাশ দারুণভাবে ফুলে ফুলে উঠছে, তারা তখনও ভয়ে কাঁপছে। ঘোড়াগুলো উষ্ণ ঠোঁটে দলা দলা তুষার তুলে নিল। তানাবাইও তুষার

খেল। তানাবাই উবু হয়ে বসে ঠাণ্ডা সাদা ডেলা মুঠো করে মুখে পুরল। তার পর হঠাৎ যেন জমে গেছে এমন ভাবে করতলে মুখ ডুবিয়ে বসে রইল। ওপর থেকে তুষার তখনও ঝরে ঝরে পড়ছে, ঘোড়াদের গরম পিঠের উপর গলে গিয়ে ঘোলাটে হলদে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে তাদের গা বেয়ে...

তুষারের পুরু আস্তরণ গলে গেছে; মাটি দেখা দিয়েছে, সবুজ হয়েছে, গুলসারিও দেখতে দেখতে গায়ে-গতরে বাড়তে থাকে। ঘোড়াগুলোর গা থেকে শীতের বাড়তি লোম ঝরে গেছে, তাদের নতুন লোম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শীত আর অনাহারের সেই দিনগুলোর নামগন্ধ পর্যন্ত আর নেই। ঘোড়াগুলো ভুলে গেছে সেসব দিনের কথা, কিন্তু মানুষটি ভোলে নি। তার মনে আছে সেই হিমের কথা, নেকড়ের চিৎকারে আতঙ্কিত সেই রাতগুলোর কথা, মনে আছে ঘোড়ার জিনের উপর বসে কেমন অসাড় হয়ে যেত, কান্না রোধ করার জন্য ঠোঁট কেমন কামড়াত, শীতে জমে যাওয়া হাত-পা গরম করত ক্যাম্পফায়ারে, তার মনে আছে ভারী স্তরের নীচে মাটি গোপন করে রাখা বসন্তকালের সেই বরফের কথা, সে ভোলে নি কীভাবে পালের দুর্বল ঘোড়াগুলো মরে গেল আর কীভাবে পাহাড় থেকে নেমে খামারের দপ্তরে গিয়ে কেমন চোখ নত করে সে সই দিয়েছিল ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্টে, হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ে সভাপতির টেবিলে কিল মেরে কেমন চিৎকার করে বলেছিল:

'আমার দিকে অমন করে তাকাস না! আমি নাৎসী নই! ঘোড়ার পালের জন্য গোলাবাড়ি কোথায়, ঘোড়ার খাবার কোথায়, যই কোথায়, নুন কোথায়? কেবল হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকব

না কি! এভাবেই কি আমাদের খামার দেখাশোনার কথা? আমাদের গায়ের জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ! আমাদের তাঁবুগুলোর দিকে চেয়ে দ্যাখ, এসে দ্যাখ আমি কীভাবে আছি! পেট ভরে রুটিও খেতে পাই না। লড়াইয়েও ত এর চেয়ে শতগুণ ভালো ছিলাম। আর তুই কিনা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছিস যেন আমি নিজেই ওই ঘোড়াগুলোকে খুন করেছি!'

সভাপতির সেই ভয়ংকর নিঃশব্দতার কথা আর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যাওয়ার কথা তার মনে আছে। মনে আছে নিজের ক্রোধের জন্য সে কেমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল আর কেমন বিব্রতভাবে ক্ষমা চাইতে লাগল।

ও ঢোক গিলে ঠেকে ঠেকে বলল: 'যেতে দে, মাফ কর। মেজাজটা গরম হয়ে গিয়েছিল।'

চোরো বলল: 'আমারই উচিত তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

তানাবাই আরও বেশি বিব্রত হয়ে পড়ল যখন সভাপতি ভাঁড়ারের কর্তাকে ডেকে বলল:

'একে পাঁচ কিলো আটা দাও।'

'তা হলে নার্সারি স্কুলের কী হবে?'

'কোন্ নার্সারি স্কুল? তুমি কি কোন কথাই সোজাভাবে বুঝতে পার না! বলছি একে পাঁচ কিলো আটা দাও।' চোরো চড়াগলায় হুকুম দিল।

তানাবাই এই আটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল শিগ্‌গিরই মাদী ঘোড়াগুলোকে দোয়ানো হবে, তারা ঘোড়ার দুধ পাবে, কিন্তু সভাপতির দিকে তাকিয়ে এত বড় মিথ্যা কথাটা বলতে পারল না। তার পর যতবার সে ওই আটায় তৈরী সেমাই খেয়েছে, ততবারই মুখ পুড়িয়েছে। চামচ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে:

'কী ব্যাপার, আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাও না কি?'

বৌ শান্তভাবে উত্তর দিয়েছে: 'ফুঁ দিয়ে একটু ঠান্ডা করে খাও না, তুমি তো আর খোকাটি নও।'

হ্যাঁ, এ সবই তার মনে আছে...

এখন মে মাস। তরুণ মর্দা ঘোড়াগুলো গলা ছেড়েছে, একে অন্যের গায়ে পড়ে ঠেলাঠেলি করছে, অন্য পাল থেকে অল্পবয়সী মাদী ঘোড়াগুলোকে ভাগিয়ে নিয়ে আসছে। পশুপালকেরা মরিয়া হয়ে ছোটাছুটি করছে, সঙ্ঘর্ষরত ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে, পরস্পরকে গালি দিচ্ছে, মাঝে মাঝে হাতাহাতি করছে, চাবুক হাঁকছে। এসব ব্যাপারে গুলসারির কোন মনোযোগ ছিল না। বর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে, খুরের নীচে মাটি ভেদ করে উঠে আসছে সবুজ ঘাস। তৃণভূমিগুলো সবুজ আর সবুজ, তাদের মাথার ওপর, পাহাড়ের চুড়োয় ঠিকরে পড়ছে সাদা ধবধবে তুষার। সেই বসন্তে সোনালী বাদামী দৌড়বাজ গুলসারি পদার্পণ করল তার যৌবনের বিস্ময়কর পর্বটিতে। লোমশ, খাটো লেজওয়ালা দেড়বছুরে গুলসারি সুঠাম শক্তসমর্থ অশ্বশাবকে পরিণত হল। সে আরও লম্বা হল, তার অবয়বের নরম-নরম ভাবটা চলে গিয়ে বুক চওড়া ও পাছা সঙ্কীর্ণ হয়ে দেহটা তেকোনা হয়ে উঠতে লাগল। তার মাথাটিও হয়ে উঠেছে খাঁটি দৌড়বাজ ঘোড়ার মত: শীর্ণ, হাড্ডিসার মাথা, ধনুকের মতো বাঁকা নাক, বেশ দূরে দূরে দুটি চোখ আর নিখুঁত, টানটান ঠোঁট। তবে এ ব্যাপারেও গুলসারির কোন মনোযোগ ছিল না। আপাতত একটিমাত্র আবেগে সে মাতোয়ারা হয়ে ছিল: দৌড়ের আবেগ। তাতে তার মনিবের উদ্বেগের কিছু কমতি হয় নি। সমবয়সীদের বাচ্চাগুলোকেও গুলসারি লোভ দেখাত তাকে অনুসরণ করতে আর তার সঙ্গে

বিদ্যুৎগতিতে হল্‌দে ধূমকেতুর মতো ছুটতে। এক অফুরান শক্তি তাকে দৌড়িয়ে নিয়ে বেড়াত ওপরের পাহাড়ে আর নীচের উপত্যকায়, পাথুরে নদীতীরে, খাড়া পথে আর গিরিসংকটের মধ্যে। এমন কি মাঝরাতে, তারাভরা আকাশের নীচে গুলসারি যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখনও স্বপ্নে দেখতে পেত তার খুরের নীচে মাটি ছুটে চলেছে, বাতাস তার কেশরের ভেতরে আর কানে শিস্‌ দিচ্ছে, খুরে যেন বিচিত্র বাদ্য বেজে চলেছে।

যেসব ব্যাপারে সরাসরি মাথা ঘামানোর কিছু নেই, সেগুলোর প্রতি, যেমন মনিবের প্রতি গুলসারির মনোভাবও তেমনি। মনিবকে যে সে ঠিক ভালবাসত তা নয়, আবার তার প্রতি কোনরকম বিরুদ্ধভাবও পোষণ করত না। কারণ, মনিব কোন ভাবেই কখনও তার উপর জুলুম করত না। শুধু ঘোড়ার বাচ্চাগুলো দৌড়ে বহু দূর চলে গেলে তানাবাই গালি দিত; তখন তাকে ছুটতে হত বাচ্চাগুলোকে ফেরানোর জন্য। মাঝে মাঝে সে সোনালী দৌড়বাজ গুলসারির রাঙে আঘাত করত তার ফাঁস লাগানো লাঠি দিয়ে। এতে গুলসারির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠত, কিন্তু ব্যথায় ততটা নয় যতটা বিস্ময়ে। সে আঘাতের ফলে গুলসারির পায়ের গতি আরও বেড়ে যেত। পালের দিকে ফিরে আসার সময়ে সে যত জোরে দৌড়ুত মনিব ততই খুশি হত। ফাঁস লাগানো লাঠিটা হাতে ঝুলিয়ে মনিবও জোরে ঘোড়া ছোটাত ওর সঙ্গে সঙ্গে। গুলসারি তখন তার পেছনে মনিবের উৎসাহদায়ক চিৎকার শুনতে পেত, শুনতে পেত মনিব গান গাইতে শুরু করেছে; তখন মনিবকে তার ভালো লাগত, ভালো লাগত গানের তালে তালে দৌড়তে। পরে গুলসারি সেসব গান ভালোভাবে চিনতে পেরেছিল। নানা ধরনের গান: শোকের, বিষাদের, বড়, ছোট, কোন গানে

কথা থাকত কোন গানে থাকত না। মনিব যখন ঘোড়ার পালকে নুন খাওয়াত, তখনও গুলসারির ভালো লাগত। মনিব নুনের বড় বড় পিন্ড ছুঁড়ে দিত লম্বা কাঠের পাত্রটার মধ্যে। ঘোড়ার পাল তখন সেই কাঠের পাত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কারণ নুন তাদের খুবই প্রিয়। ঐ নুনই হল তার পাল।

একদিন মনিব একটি শূন্য বালতি বাজিয়ে ঘোড়াগুলোকে ডাকল: 'হো, হো, হো!' ঘোড়াগুলো ছুটে এল কাঠের পাত্রটার দিকে। অন্যান্য ঘোড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে গুলসারি নুন চাটছিল। ফাঁস লাগানো লাঠি হাতে নিয়ে মনিব আর তার সঙ্গী যখন তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন গুলসারির মনে বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনাও উঁকি দেয় নি। এটা তার ব্যাপার নয়। মনিব আর তার সঙ্গী ফাঁস লাগানো লাঠিগুলো ব্যবহার করত জিন পরানোর ঘোড়া আর দুধালো মাদী ঘোড়া বা অন্যদের ধরার জন্য, গুলসারিকে ধরার জন্য মোটেই নয়। সে ছিল স্বাধীন। হঠাৎ ঘোড়ার লোমে প্যাকানো একটা ফাঁস গুলসারির মাথা দিয়ে গলিয়ে তার গলায় এসে ঝুলে পড়ল। সে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী, ফাঁসটা তখনও তাকে ভড়কে দেয় নি, সে আপন মনে নুন চাটতে লাগল। গলায় ফাঁস আটকানোর সময় অন্যান্য ঘোড়া টানাটানি করে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু গুলসারি একটুও নড়ল না। শেষে জলতেষ্টা পেতে তার ইচ্ছে হল নদীর দিকে যায়। সে ঘোড়ার পাল ভেদ করে বাইরে আসার চেষ্টা করল। ফাঁসটা গলায় শক্ত হয়ে এঁটে তার গতি রোধ করল। তার জীবনে এ ধরনের কোন কিছু কখনও ঘটে নি। গুলসারি লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল, চিঁহিহি করল, চোখ পাকালো, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক ছুটে

গেল। যারা তাকে ফাঁসে আটক করেছে গুলসারি এবার একা তাদের মুখোমুখি হল। সামনে মনিব আর তার পেছনে আর এক সহীস দাঁড়িয়ে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পশুপালকদের ছোট ছোট ছেলেরা। ছেলেগুলো অল্প দিন হল এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে দারুণ উপদ্রব শুরু করেছে, অনবরত পালের চারে দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়।

গুলসারি ভয় পেয়ে গেল। সে আরও একবার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেল; তার সামনে সূর্য ঘুরছে প্রবল বেগে, জ্বলন্ত চাকার মত টুক্রো টুক্রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, পাহাড় মাটি মানুষ সব পড়ে যাচ্ছে, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ছে; ভয়ঙ্কর একটা কালো ছায়া যেন গুলসারিকে ঢেকে ফেলছে; সামনের দু'পা দিয়ে সেই ছায়াটাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সে।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য গুলসারি যতই চেষ্টা করতে লাগল, ফাঁসটাও তার গলায় ততই শক্ত হয়ে এ'টে বসতে লাগল; হাঁসফাঁস করতে করতে মানুষগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বদলে সে তাদের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকজন ছড়িয়ে পড়ল, মুহূর্তেকের জন্য ফাঁসটা একটু ঢিলে হল, গুলসারি তাদের হি'চড়ে নিয়ে চলল মাটির উপর দিয়ে। মেয়েরা চিৎকার করে ছোট ছেলেদের তাড়িয়ে তাঁবুর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সহীসরা কোন রকমে আবার উঠে দাঁড়াল, ফাঁসটা গুলসারির গলায় আবার শক্ত হয়ে এ'টে বসল। এবার এত শক্ত হয়ে এ'টে গেল যে গুলসারি শ্বাস নিতে পারছিল না। মাথা ঘুরিয়ে দম আটকে প্রায় অচেতন অবস্থায় সে থামতে বাধ্য হল।

এক পাশ থেকে গুলসারির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মনিব ফাঁসটা তুলে নিল। গুলসারি এক চোখে তাকে দেখল।

মনিবের কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, মুখে কালশিরা পড়েছে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ নেই। মনিব হাঁপাচ্ছে; ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটে চুকচুক শব্দ করতে করতে সান্ত্বনা দিয়ে কোমল স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে বলল:

'শান্ত হ গুলসারি। ভয় পাস নে।'

ফাঁসটা আলগা না করে পেছন পেছন তার সঙ্গীটি সাবধানে এগিয়ে এলো। অবশেষে, মনিব হাত বাড়িয়ে মৃদুভাবে গুলসারির মাথা চাপড়ে আদর করল, মাথা না ঘুরিয়ে সংক্ষেপে বলল:

'লাগাম।'

সঙ্গী লাগাম বাড়িয়ে দিল।

মনিব বলল: 'নড়িস নে, গুলসারি, নড়িস নে।' এক হাতে গুলসারির চোখ আড়াল করে মনিব আরেক হাতে লাগাম পরিয়ে দিল গুলসারির মাথার উপর দিয়ে।

এখন বাকি রইল গুলসারির মুখে কড়িয়াল পরানো আর তার পিঠে জিন বাঁধা। মাথার ওপর লাগামের স্পর্শ অনুভব করেই গুলসারি চিঁহিহি করে উঠল, সেটাকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু মনিব ততক্ষণে গুলসারির ওপরের ঠোঁট শক্ত করে ধরে ফেলেছে।

মনিব সঙ্গী উদ্দেশে চিৎকার করে বলল: 'মুখের বাঁধন!' সঙ্গী ছুটে এসে চামড়ার বেল্‌ট লাগিয়ে দিল গুলসারির মুখের ওপর, তার পর একটা কাঠি দিয়ে সেটাকে পাকাতে লাগল নলকলের চরকির মত।

ব্যথায় কাতর হয়ে গুলসারি দেহের পেছন দিকে ভর দিয়ে বসে পড়ল এবং আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। ঠাণ্ডা লোহার কড়িয়াল তার দাঁতে ঠন্ ঠন্ করে বাজতে লাগল এবং তার মুখের দুই কোণে শক্ত হয়ে চেপে বসে গেল।

কী একটা যেন তার পিঠের ওপর রেখে শক্ত করে টেনে বাঁধা হল। বেল্‌ট টেনে বুক এমন চেপে বাঁধা হতে লাগল যে তাকে এপাশ ওপাশ টলতে শুরু করল। কিন্তু সেটা তখন আর তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না। মুখের সর্বগ্রাসী অসহ্য ব্যথা অন্য সব কিছুকেই তুচ্ছ করে দিয়েছে। তার চোখ দুটি কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে নড়তেও পারছে না, শ্বাসও নিতে পারছে না। মনিব যে কখন কীভাবে তার পিঠে চড়ে বসেছে সে টেরও পায় নি; মুখ থেকে বাঁধন সরিয়ে নেওয়ার পরেই শুধু সে চেতনা ফিরে পেল।

গুলসারি হতবুদ্ধি হয়ে মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে রইল, গোটা শরীর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, পিঠে ভার, পেছন দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল একজন মানুষ বসে আছে তার পিঠের উপর। ভয়ে সে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কড়িয়ালের টানে তার মুখ যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল, পিঠে বসা লোকটার পা দুটো তার দেহের দু'পাশে শক্ত হয়ে এঁটে আছে। গুলসারি প্রচণ্ড রেগে উঠে চিঁহিহি করে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করল, চারদিকে পা ছুঁড়ল, পেছনের পা দিয়ে লাথি ঝাড়ল, পিঠে যে বোঝা তাকে চাপ দিচ্ছিল তা ফেলে দেওয়ার জন্য গোটা শরীর টান টান করল, কাত হয়ে লাফাল — কিন্তু অন্য যে লোকটা আরেকটি ঘোড়ায় চড়ে ফাঁসের এক প্রান্ত ধরে রেখেছিল সে কিছুতেই গুলসারিকে মুক্ত হতে দিচ্ছিল না। এর পর গুলসারি গোল হয়ে দৌড়ুল, ভাবল, বৃত্তটা এক সময়ে ভাঙবে আর সে এখান থেকে ছুটে পালাতে পারবে যে দিকে দু'চোখ যায়। বৃত্তটা কিন্তু কিছুতেই ভাঙল না, সে অবিরামভাবে ঘুরেই চলল। মনিব আর তার সঙ্গী ঠিক এটাই চাইছিল। মনিব তাকে চাবুকের ঘা মেরে চলল। গুলসারি চেষ্টা করে দুবার তাকে পিঠের ওপর থেকে

ফেলে দিল, কিন্তু প্রতি বারেই সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার জিনে চড়ে বসে।

এ রকম চলতে লাগল অনেকক্ষণ, বহুক্ষণ। গুলসারির মাথা ঘুরতে লাগল, চার পাশের মাটি ঘুরতে লাগল, তাঁবুগুলো ঘুরতে লাগল, দূরে যে ঘোড়ার দল ইতস্তত বিচরণ করছিল, সেগুলো ঘুরতে লাগল, পাহাড়গুলো ঘুরতে লাগল, আকাশের মেঘও ঘুরতে লাগল। তারপর গুলসারি ক্লান্ত হয়ে পড়ে পায়ে পায়ে চলল। ওর দারুণ তেষ্টা পেল।

কিন্তু ওকে জল খেতে দেওয়া হল না। সন্ধ্যায় ওর পিঠের ওপর থেকে জিন খোলা হল না, শুধু জিনের বেল্ট ঢিলে করা হল আর খুঁটির সঙ্গে আটকান ছোট একটা দড়িতে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল গা ঠাণ্ডা করার জন্য। শক্ত করে বল্গা জড়িয়ে রাখা হল জিনের মাথার সঙ্গে, ফলে গুলসারি এক ঠায়ে টানটান হয়ে থাকতে বাধ্য হল, শুয়ে পড়াও সম্ভব হল না; রেকাবগুলো গুটিয়ে রেখে দেওয়া হল জিনের মাথার সঙ্গে। এভাবে গুলসারি দাঁড়িয়ে রইল সারা রাত। যেসব অবিশ্বাস্য ব্যাপারের অভিজ্ঞতা সে লাভ করল তাতে হতভম্ব হয়ে শান্তভাবেই সে দাঁড়িয়ে থাকল। কড়িয়ালটা মুখে তখনও অস্বস্তিকর ঠেকছে, এদিক-ওদিক একটু নড়তে গেলেই ব্যথায় জ্বালা ধরে যাচ্ছে, মুখের মধ্যে লোহার স্বাদটা কেমন যেন লাগছে। মুখের ফুলে ওঠা কশগুলোতে কালশিরা পড়েছে। বেল্টের ঘষায় পাঁজরের যেসব জায়গায় কালশিরা পড়েছে সেগুলো জ্বলছে। গদীর নীচে আহত পিঠ ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। নদীর কলকলানি শুনে ওর তেষ্টা আরও অসহ্য হয়ে উঠল। বরাবরের মতোই. ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে নদীর ওপারে। বহু খুর দাবড়ানির শব্দ, ঘোড়ার চিঁহিহি আর রাতের রাখালের চিৎকার ভেসে

আসছে। লোকজন তাঁবুর বাইরে, আগুনের চার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ছেলেরা কুকুরগুলোকে উত্যক্ত করছে, কুকুরের ডাক ডাকছে। আর গুলসারি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর কারোই ছিল না।

তারপর চাঁদ উঠল। অন্ধকার ফুঁড়ে নিঃশব্দে ভেসে উঠে পাহাড়গুলো হলুদ চাঁদের আলো পেয়ে মৃদু মৃদু দুলতে শুরু করল। তারারা নীচে মাটির আরও কাছাকাছি নেমে আসতে লাগল, তাদের উজ্জ্বলতাও যেন ততই বাড়তে লাগল। গুলসারি এক জায়গায় বাঁধা অবস্থায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, কে যেন ওকে খুঁজে বেড়ায়। বাদামী রঙের বাচ্চা মাদী ঘোড়াটার চিঁহিহি শুনতে পাচ্ছে গুলসারি। ওরা দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, এর আগে কখনও ওরা আলাদা থাকে নি। মাদী বাচ্চাটার কপালের উপর আছে তারার মতো সাদা একটা দাগ। সে গুলসারির সঙ্গে দৌড়ুতে ভালবাসে। মদ্দা ঘোড়াগুলো আজকাল ওর পেছনে ধাওয়া করতে শুরু করেছে; কিন্তু ও সব সময়েই গুলসারির সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে যায় নিরাপদ দূরত্বে। ও এখনও পূর্ণ যুবতী হয় নি, এদিকে বড় মদ্দা ঘোড়াগুলো যা করতে চায় তা করার মতো বয়স গুলসারিরও হয় নি।

কাছে-পিঠেই কোথায় যেন গুলসারি মাদী বাচ্চাটার চিঁহিহি শুনতে পেল। হ্যাঁ, সে-ই বটে। গুলসারি ওর কণ্ঠস্বর ঠিকই চিনতে পেরেছে। সে উত্তর দিতে চাইল, কিন্তু ব্যথায় ফোলা মুখ খুলতে সাহস করল না। ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে। অবশেষে মাদী বাচ্চাটা গুলসারিকে খুঁজে পেল। হালকাভাবে দৌড়ে সে এলো গুলসারির কাছে, ওর কপালের সাদা তারাটা চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছিল। ওর লেজ আর পা ভেজা। নদী পার হয়ে এসেছে, গায়ে জলের ঠাণ্ডা

গন্ধ। গুলসারির নাকে নাক ঘষতে লাগল, ওর দৃঢ়, উষ্ণ ঠোঁটদুটি গুলসারির মুখের ঝিল্লি স্পর্শ করল। গুলসারিকে সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ও মৃদু চিঁহিঁহি করল। কিন্তু গুলসারি নড়তে পারল না। মাদী বাচ্চাটা গুলসারির ঘাড়ে মাথা রাখল, দাঁত দিয়ে গুলসারির কেশর আঁচড়াতে শুরু করল। অন্য সময়ে গুলসারিও মাথা রাখত ওর ঘাড়ের উপর, ওর কেশর আঁচড়ে দিত। কিন্তু এখন গুলসারি ওর আদরের প্রতিদান দিতে পারল না। নড়াচড়ার ক্ষমতাই তার ছিল না। ভীষণ জল পিপাসা পেয়েছে তার। হায় রে, যদি মাদী বাচ্চাটা ওকে একটু জল এনে দিতে পারত! মাদী বাচ্চাটা যখন দৌড়ে চলে গেল, গুলসারি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ ওর ছায়াটা নদীর ওপারে আঁধারে মিলিয়ে না গেল। এলো আর চলে গেল। গুলসারির চোখে জল এলো। সেই জল গাল বেয়ে গড়িয়ে বড় বড় ফোঁটায় নিঃশব্দে পড়তে লাগল গুলসারির পায়ের কাছে। জীবনে এই প্রথম কাঁদল গুলসারি।

পর দিন খুব সকালে মনিব এলো গুলসারির কাছে। তানাবাই বসন্তসজীব পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল, আড়মোড়া ভাঙল, মৃদু হাসল, হাড়ের টাটানিতে ককিয়ে উঠল।

'ওঃ গুলসারি, কাল তুই আমাকে একটা দৌড় করিয়েছিস বটে! কি রে, ঠান্ডা লেগেছে না কি? হ্যাঁ, তাই তো, দেখে মনে হচ্ছে ঠান্ডায় জমে গেছিস।'

গুলসারির ঘাড় চাপড়ে আদর করল; ভালো ভালো আর মজার মজার কী সব কথা তাকে বলতে ল্যগল। সে যে ঠিক কী বলছে গুলসারি তা কেমন করে বুঝবে? তানাবাই বলছিল:

'আমার ওপর রাগ করিস না, বন্ধু। সারা জীবন তো তুই

নিষ্কর্মার মতো দৌড়ে বেড়াতে পারবি না। অভ্যেস হয়ে গেলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আর এত কষ্ট যে পেলি তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। জীবনটা ভাই এমনই জিনিস, তোর চার পায়েই নাল পড়বে। তবে তখন পথের কোন পাথরই আর তোর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। খিদেয় মরে যাচ্ছিস, তাই না? পিপাসা পেয়েছে? জানি...'

সে গুলসারিকে নদীর তীরে নিয়ে গেল। বল্গা খুলে নিল, সতর্কভাবে কড়িয়াল বের করে আনল গুলসারির আহত মুখ থেকে। লোভীর মত দ্রুত জলে মুখ দিয়ে গুলসারির সারা দেহ শিহরিত হল, জলের শীতলতায় মাথা ঝিম ঝিমিয়ে উঠল। আহ, জলের কী স্বাদ; কী কৃতজ্ঞতা এখন সে অনুভব করছে মনিবের প্রতি!

এভাবে চলল কিছুদিন। অল্পকালের মধ্যেই গুলসারি জিনে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ল যে, এটা নিয়ে সে বিশেষ কোন সঙ্কোচই বোধ করত না। পিঠে সওয়ার নিয়ে নানা জায়গায় যেতে তার সহজ আর আনন্দের লাগত। যদিও খাঁটি দৌড়বাজ ঘোড়ার মতো এলোমেলো ছাঁদে খুরের আওয়াজ তুলে উঁচু নীচু পথ দিয়ে সোজা দৌড়ুতে তার ভালো লাগত তবু মনিব সব সময়েই তাকে সংযত করে রাখত। গুলসারি সওয়ার নিয়ে এত দ্রুত আর সমান তালে চলতে শিখল যে লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত তার দিকে।

'যদি ভরা এক বালতি জল রাখা হয় গুলসারির পিঠে, ও দৌড়ুনোর সময়ে তার ফোঁটাও ছল্‌কে পড়বে না!'

তানাবাইয়ের আগে যে এখানে পশুপালক ছিল সেই বুড়ো তোরগোই গুলসারিকে দেখে বলল: 'গুলসারিকে এমন চমৎকার শিক্ষা দিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন দেখবে তোমার এই দৌড়বাজ ঘোড়াটির কপাল কেমন খুলে যায়।'

৩

পুরানো গাড়িটার চাকাগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলতে লাগল নির্জন পথে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ তুলে। মাঝে মাঝে শব্দটা থেমে যাচ্ছিল। যারপরনাই ক্লান্তির ফলে গুলসারি থেমে যাচ্ছিল। তখন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দতার মধ্যে গুলসারি শুনতে পাচ্ছিল নিজের হৃৎপিণ্ডের ফাঁপা ফাঁপা স্পন্দনের প্রতিধ্বনি: থপ্-থপ্, থপ্-থপ্, থপ্-থপ্।

বুড়ো তানাবাই গুলসারিকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিল, তার পর আবার লাগাম তুলে নিল।

'চল্ গুলসারি। চল্, বেলা পড়ে এলো।'

এভাবে থেমে থেমে ওরা চলল প্রায় দেড় ঘণ্টা, তার পর গুলসারি একেবারেই থেমে গেল। গাড়িটাকে টেনে নেওয়ার মতো শক্তি আর তার একেবারেই ছিল না। তানাবাই আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোড়ার চার পাশে ছোটাছুটি করতে লাগল।

'কী হল গুলসারি? দেখতে পাচ্ছিস না, রাত হয়ে গেল যে!'

কিন্তু ঘোড়া তার কথা বুঝল না। সাজ পরা গুলসারি দাঁড়িয়ে আছে, মাথা কাঁপছে, মাথাটা এত ভারী লাগছে যে সেটা যেন আর ঘাড়ের ওপর রাখা যাচ্ছে না, সে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক টলছে; কানে বেজে চলেছে হৃৎস্পন্দনের প্রবল শব্দ: থপ্-থপ্, থপ্-থপ্, থপ্-থপ্।

তানাবাই বলল: 'আমাকে মাপ কর্। এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। গাড়ি আর তোর এই সাজের জন্য আমি একটুও ভাবি না, এখন কোন রকমে তোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারলেই হয়।'

ওভারকোটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তানাবাই চট্‌পট গুলসারির সাজ খুলতে লাগল। গুলসারিকে গাড়ি থেকে খুলে নিয়ে তার যোয়াল বার করে নিল; সাজগুলোকে ছুঁড়ে ফেলল গাড়ির মধ্যে।

ওভারকোটটা আবার পরে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার দিকে চেয়ে সে বলল: 'যাক।' সন্ধ্যার শীতল স্তেপের মধ্যে প্রেতের ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, যোয়াল নেই, সাজ নেই, মাথাটা দেখাচ্ছে দেহের অনুপাতে অনেক বড়। তানাবাই ফিস ফিস করে বলল: 'হায় খোদা, কী হাল তোর হয়েছে গুলসারি! তোকে দেখলে তোরগোই তার কবরের মধ্যেই হয়ত নড়ে উঠত...'

তানাবাই লাগামে টান দিল, অতি কষ্টে দু'জনে হেঁটে চলল পথের ওপর দিয়ে। এক বুড়ো ঘোড়া আর একজন বুড়ো মানুষ। পেছনে পড়ে রইল পরিত্যক্ত গাড়িটা, সামনে পশ্চিমে পথের উপর নেমে আসছে গভীর নীল-বেগনি অন্ধকার। স্তেপের উপর নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রি, কালো বোরখায় ঢেকে দিচ্ছে পাহাড়গুলোকে, মুছে দিচ্ছে দিগন্তরেখা।

বিগত বছরগুলিতে গুলসারির জীবনে যা কিছু ঘটেছে, হাঁটিতে হাঁটিতে তানাবাইয়ের মনে পড়তে লাগল সেসব কথা, সে বাঁকা হাসি হেসে ভাবতে লাগল পরিচিত লোকজনের কথা: "আমরা সবাই ওই রকম। পরস্পরের কথা ভাবি জীবনের একেবারে শেষ দিকে, যখন কেউ গুরুতর রোগশয্যায় পড়ে অথবা মারা যায়। তখনই আমাদের কাছে হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে ওঠে কাকে আমরা হারালাম, কেমন সে ছিল, কত ভাল ছিল, কী কী কাজ সে করেছে। কিন্তু একটা অবোলা জীবের কথা কী বলার আছে? কাকেই না গুলসারি বহন করেছে নিজের পিঠে! কে-ই বা তার পিঠে চড়ে যায় নি! আর বুড়ো

হতেই সবাই ভুলে গেল তাকে। এখন চলছে কোন ক্রমে পা টেনে টেনে। অথচ কী ঘোড়াই না ও ছিল!..”

স্মৃতি আবার তাকে নিয়ে গেল অতীতে, আবার সে বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করল কত কাল ভাবে নি অতীতের কথা। যা কিছু ঘটেছিল সব আবার তার মনে পড়তে লাগল। দেখা যাচ্ছে কোন কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় না। আগে সে অতীতের কথা ভেবেছে খুবই কম, অথবা বলা যায় নিজেকে অতীতের কথা ভাবতেই দেয় নি। কিন্তু এখন, ছেলে আর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর অন্ধকার পথে একটা মরণমুখী ঘোড়াকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলতে চলতে, বেদনা আর বিষণ্ণতা নিয়ে সে তাকাল বিগত বছরগুলোর দিকে, বিগত কাল সজীব হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। তানাবাই হেঁটে চলেছে, গভীর ভাবনায় মগ্ন, ক্রমেই বেশি করে টান পড়ছে লাগামে — কারণ গুলসারির চলার কষ্ট ক্রমেই বাড়ছে। যখনই তানাবাইয়ের হাত অসাড় হয়ে আসছে, এখন সে লাগামটাকে এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে ফেলছে, তার পর আবার টেনে নিয়ে চলছে ঘোড়াটাকে। তানাবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, ঘোড়াটাকে বিশ্রাম নিতে দিল। একটু ভেবে ঘোড়ার মুখ থেকে লাগাম খুলে নিল।

বলল: ‘তুই আগে আগে যা, নিজের মতো হেঁটে চল্, আমি তোর পেছনে পেছনে হাঁটব। আমি থাকব তোর ঠিক পেছনেই, তোকে ফেলে যাচ্ছি না। চল্, ধীরে ধীরে হেঁটে চল্।’

গুলসারি চলছে আগে আগে, তানাবাই পেছনে, লাগামটা তার কাঁধে। লাগামটা সে মুহূর্তের জন্যও ফেলছে না। গুলসারি যখন থামছে, তাকে দম নিতে দেওয়ার জন্য তানাবাই অপেক্ষা করছে, তার পর আবার চলছে দু'জনের টেনে টেনে

চলা। চলছে এক বুড়ো ঘোড়া আর একজন বুড়ো মানুষ।

এক সময়ে যখন পেছনে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে গুলসারি এই পথেই বহুবার চলাচল করেছে সেই তখনকার কথা মনে করে তানাবাই বিষণ্ণভাবে হাসল। রাখালরা বলত যে ধুলো ওড়ানোর বিশেষ ভঙ্গী দেখে বহু দূর থেকেও তারা গুলসারিকে চিনতে পারত। স্তেপের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা ডোরায় ধুলো উঠত গুলসারির খুরের তলা থেকে সাদা রেখার মতো, নিবাত দিনে সেই ধুলো বহুক্ষণ ভেসে থাকত পথের ওপর — যেমন থাকে জেট-বিমানের গতিপথের ধোঁয়া। সে সময় রাখাল হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে নিজের মনে বলত: "গুলসারি যাচ্ছে!" আর ঈর্ষার সঙ্গে ভাবত গরম বাতাসের হলকায় মুখ তাতিয়ে পুড়িয়ে কোন্ ভাগ্যবান উড়ে চলেছে এই ঘোড়ায় চড়ে। এ ধরনের বিখ্যাত দৌড়বাজ ঘোড়ায় চড়া কিরগিজদের কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার।

বহু যৌথখামার-সভাপতি গুলসারির পিঠে চড়েছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান, নির্বোধ, সৎ, অসৎ সব ধরনের লোকই ছিল; তারা প্রত্যেকেই সভাপতিগিরির প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত গুলসারির পিঠে চড়েছে। তানাবাই মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল: "তারা এখন কোথায়? তারা কি কখনও গুলসারির কথা মনে করে — যে গুলসারি তাদের বয়ে বেড়াত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত?"

অবশেষে তারা পৌঁছুল গিরিখাতের ওপরকার পুলটার কাছে। এখানে তারা আবার থামল। গুলসারি মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্য হাঁটু বাঁকাতে শুরু করল; কিন্তু তানাবাই কিছুতেই তা হতে দিতে পারে না: কারণ এর পর আর কোন কিছুতেই গুলসারিকে খাড়া করে তোলা যাবে না।

'দাঁড়া, সোজা হয়ে দাঁড়া!' চেঁচিয়ে উঠল তানাবাই, লাগাম দিয়ে আঘাত করল গ্লসারির মাথায়। গ্লসারিকে আঘাত করার জন্য নিজের উপর বিরক্ত হয়ে গ্লসারির উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগল: 'তুই কি ব্ঝতে পারছিস না? মরতে চাস তুই? আমি তোকে মরতে দেব না! আমি তোকে শ্রয়ে পড়তে দেব না! দাঁড়া, দাঁড়া! সোজা হয়ে দাঁড়া!' তানাবাই গ্লসারির কেশর ধরে টানতে লাগল।

অতি কষ্টে নিজের পা সোজা করল গ্লস্যারি, তার গলা দিয়ে তীব্র কাতরানির শব্দ বের হল। অন্ধকারের মধ্যেও গ্লসারির চোখের দিকে তাকাতে সাহস করল না তানাবাই। ম্দ্ভাবে হাত চাপ্ড়ে আদর করল গ্লসারিকে, ওর বাঁ দিকটায় হাত ব্লিয়ে সেখানে নিজের কান চেপে রাখল। জলের শেওলায় মিলের চাকা আট্কে গেলে যেমন হয় তেমনি জল ছল্কে ছিটিয়ে পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে গ্লসারির ব্কের মধ্যে, ওর হৃৎপিন্ডে। অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়ার ব্কে কান চেপে উপ্ড় হয়ে থাকায় তানাবাইয়ের কোমর ব্যথা করতে লাগল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, মাথা নাড়ল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং স্থির করল ঝ্ঁকি তাকে নিতেই হবে — প্লের ওপারে বড় সড়ক থেকে মোড় নিয়ে তাদের ধরতে হবে ওই পথটা যেটা গেছে গিরিখাতের পাশে বরাবর। পথটা গেছে পর্বতমালার মধ্য দিয়ে; এ পথে তানাবাইয়ের বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছ্নো যায়। এটা ঠিক যে, রাতের বেলা পথ হারানোর সম্ভাবনা খ্ব বেশি, কিন্তু তানাবাই ভরসা রাখল নিজের স্মৃতির ওপর, এই এলাকাটা তার বহ্ কালের জানা। এখন ঘোড়াটা পারলেই হয়।

তানাবাই যখন এসব কথা ভাবছিল, এমন সময়ে একটা ট্রাকের দ্টি হেড্লাইট দেখা দিল তাদের পেছন থেকে।

হেড্‌লাইট দুটি হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে উঠে এলো একজোড়া উজ্জ্বল চাকার মতো, তারা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। দীর্ঘ, অস্থির আলোকচ্ছটায় তারা সামনের পথ হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তানাবাই আর গুলসারি পুলের পাশে দাঁড়িয়ে। ট্রাক দিয়ে তাদের কোন উপকার হবে না, তবু তানাবাই অপেক্ষা করল ট্রাকটা এগিয়ে আসা পর্যন্ত। কেন যে ট্রাকটার জন্য অপেক্ষা করল তা সে নিজেই জানে না। "যাক্‌, অন্তত আরেকজনের দেখা ত পাওয়া গেল" — পথে আরও মানুষ আছে অনুভব করে তানাবাই স্বস্তি পেল। হেড্‌লাইট দুটো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে তানাবাইয়ের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, সে হাত তুলে চোখ আড়াল করল।

ট্রাকে বসা দু'জন মানুষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল পুলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো মানুষটির দিকে আর তার পাশের হাড় জিরজিরে মরকুট ঘোড়াটার দিকে। ঘোড়াটার পিঠে জিন নেই, মুখে লাগাম নেই, যেন সেটা আদৌ ঘোড়াই নয়, যেন একটা কুকুর — নাছোড়বান্দার মতো দাঁড়িয়ে আছে মনিবের পেছনে। ট্রাকের আলোটা সরাসরি ওদের ওপর পড়ায় বুড়ো মানুষটা আর ঘোড়াটাকে মুহূর্তেকের জন্য দেখাল ভুতুড়ে সাদা আকৃতির মতো।

ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল কানঢাকা টুপি পরা এক ঢ্যাঙা ছোকরা; সে ড্রাইভারকে বলল: 'আশ্চর্য এই মাঝরাতে লোকটা এখানে কী করছে?'

গাড়ির যন্ত্র বন্ধ করে ড্রাইভার বলল: 'আমরা যে গাড়িটা দেখেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই এই লোকটার।' জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে সে চিৎকার করে বলল: 'কী ব্যাপার, বুড়ো? তুমিই বুঝি পথে গাড়ি ফেলে এসেছ?'

তানাবাই উত্তর দিল: 'হ্যাঁ, আমিই।'

'ঠিকই ধরেছি। দেখি লক্কড়মার্কা একটা গাড়ি পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ কাছে-পিঠে কেউ নেই। ভাবলাম হয়ত একটা ঘোড়ার সাজ তুলে নেওয়া যাবে, কিন্তু যেটা পেলাম সেটা এক পয়সার মালও নয়।'

তানাবাই কিছুই বলল না।

ড্রাইভার ট্রাক থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে পথের ওপর পেচ্ছাপ করতে লাগল। ভোদ্‌কার দুর্গন্ধ তানাবাইয়ের নাকে এলো।

ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল: 'ব্যাপারটা কী?'

'ঘোড়াটা আর পারছিল না। অসুস্থ হয়ে পড়ল; বুড়োও হয়েছে বটে।'

'হুম্। তা এখন চললে কোথায়?'

'বাড়িতে... সারিগোউ গিরিখাতের দিকে।'

ড্রাইভার শিস্ দিল। বলল: 'ওরে ব্‌বাপ্‌স, পাহাড়ে? পথে পড়ছে না। যদি চাও তো ট্রাকের পেছনে উঠে বসতে পার, তোমাকে রাষ্ট্রীয় খামারে নামিয়ে দিয়ে যাব। সেখান থেকে আগামী কাল বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

'ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে ঘোড়া আছে।'

'এই হাড্ডিসারটা? জাহান্নামে যাক এটা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও খাতের মধ্যে, ঝামেলা চুকে যাবে, কাকেরা ছিঁড়েছুঁড়ে খাক। বল, হাত লাগাব?'

তানাবাই রেগে বলল: 'চলে যাও এখান থেকে।'

'তা যা ভালো মনে কর,' চাপা হাসির সঙ্গে কথাটা বলে ড্রাইভার দড়াম করে ট্রাকের দরজা বন্ধ করে দিল। বলল: 'বুড়োটার মাথা খারাপ হয়েছে।'

ঘোলাটে আলোর বন্যা সঙ্গে নিয়ে ট্রাকটা চলে গেল। গিরিখাতের ওপরের পুলটায় দারুণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠল,

ট্রাকের পেছনের স্টপ্ সিগন্যালের লাল আলোয় গিরিখাতটা আলোকিত হয়ে উঠল।

পুল পার হওয়ার পর ড্রাইভারের পাশে কান-ঢাকা টুপি পরা যুবকটি বলল: 'লোকটার সঙ্গে তামাশা করলে কেন? যদি তুমি নিজে ওরকম বিপদে পড়তে?'

পথের বাঁকে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হাই তুলে ড্রাইভার উত্তর দিল: 'আরে, এটা তো কিছুই না। আমি নিজে সব রকম বিপদেই পড়েছি নানা সময়ে। লোকটাকে আমি ভালো পরামর্শই দিয়েছি। যে না একটা মরকুটে! এখন যন্ত্রপাতিই হচ্ছে আসল ব্যাপার। সর্বত্রই যন্ত্রপাতি, বুঝলে হে ছোকরা, যুদ্ধেও। ওসব বুড়ো আর ও রকম ঘোড়ার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি বড় নিষ্ঠুর!' ছোকরা বলল।

'আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর রাত যখন আবার চারদিক ঘিরে ধরল, তার চোখ যখন আবার অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এলো তখন তানাবাই বলল:

'চল্, চল্, হেট্ হেট্, চল্ দেখি!'

পুল পার হওয়ার পর সে গুলসারিকে নিয়ে চলল বড় রাস্তা ছাড়িয়ে। গিরিখাতের ওপরে অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য পথ ধরে তারা চলল ধীরে ধীরে। চাঁদ সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। ঠান্ডা আকাশে নিস্তেজভাবে ঝিক্‌মিক্ করতে করতে তারাগুলো চাঁদেরই অপেক্ষা করছিল।

৪

যে বছর গুলসারিকে বশ মানানো ও তালিম দেওয়া হয়, ঘোড়ার পালগুলো সে বছর শরৎকালের চারণভূমিতে অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি দিন কাটায়। শরৎকালটা ছিল অসাধারণ

…মের দীর্ঘ, মৃদু শীত পড়ছিল, প্রায়ই তুষারপাত হচ্ছিল — কিন্তু তুষার জমছিল না, খাওয়ার মতো ঘাস ছিল যথেষ্ট। বসন্তকালে ঘোড়ার পালগুলো নেমে আসে পাহাড়ের পাদদেশে, স্তেপে ফুল ফোটা শুরু হতেই তারা নীচের দিকে নেমে আসে।

যুদ্ধের পর তানাবাইয়ের জীবনে সম্ভবত এটাই ছিল সবচেয়ে ভালো সময়। ধূসর অশ্বের মতো বার্ধক্য তখনও দূরে অপেক্ষা করছে গিরিপথের ওপারে, যদিও খুব দূরে নয়, তানাবাই তখনও তরুণ সোনালী দৌড়বাজ ঘোড়ায় চড়ত। গুলসারি যদি তার জীবনে আসত কয়েক বছর পরে, তবে সে খুব সম্ভবত এরকম সুখানুভূতি এবং এমন পুরুষোচিত উল্লাস পেত না, যা পাচ্ছিল দৌড়বাজ গুলসারির পিঠে চড়ে। তানাবাইও অবশ্য মাঝে মাঝে বাহাদুরি দেখানোর লোভ সামলাতে পারত না। এমন দৌড়বাজ ঘোড়ায় চড়ে সেই লোভ সামলানো কঠিনও ছিল বটে। গুলসারি এটা ভালো করেই জানত। এটা বিশেষ করে ঘটত যখন তানাবাই গুলসারির পিঠে চড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে গাঁয়ের দিকে যেতে যেতে মেয়েদের কাজে যেতে দেখতে পেত। মেয়েদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই তানাবাই জিনের উপর সোজা হয়ে বসত, তার শরীরের প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে উঠত, তার উত্তেজনা সঞ্চারিত হত গুলসারির দেহেও। গুলসারি তার লেজ উপরে তুলতে থাকত পিঠের প্রায় সমান্তরালে, তার কেশর শন্‌শন্‌ করে উড়তে থাকত বাতাসে। সে চিঁহিহি করত, সওয়ারকে হালকাভাবে বহন করে আঁকাবাঁকা গতিতে চলত। সাদা ও লাল রুমাল মাথায় মেয়েরা পথের পাশে সরে গিয়ে হাঁটু-সমান উঁচু সবুজ গমের মধ্যে দাঁড়াত। তারা গমের খেতে দাঁড়িয়ে থাকত, মাটিতে পা-গাঁথা হয়ে, একসঙ্গে ঘুরে

দাঁড়াত তাদের মুখ, উজ্জ্বল চোখ, হাসি আর সাদা দাঁত চক্‌চক করত।

'হেই, রাখাল! থা-মো-ও!' পেছন পেছন শোনা যেত হাসি আর এই শেষ কথাগুলো: 'একবার বাগে পাই না, মজা টের পাবে'খন!'

হাত ধরাধরি করে পথ আগলে মেয়েরা মাঝে মাঝে তানাবাইকে ধরেও ফেলত। তখন যা হত! মেয়েরা ঠাট্টা তামাশা করতে ভালবাসে। তারা তানাবাইকে টেনে ঘোড়া থেকে নামাত, তার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

'কবে আমাদের জন্য ঘোড়ার দুধ আনবে বল?'

'তুমি তো কেবল ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াও, আর এদিকে আমরা সকাল-সন্ধে মাঠে কাজ করে করে মরছি!'

'কে তোমাদের ধরে রেখেছে? যাও না, ঘোড়ার পাল আগলানোর কাজ নাও না কেবল সোয়ামীদের বলে রেখ তারা যেন অন্য মেয়ে খুঁজে নেয়। পাহাড়ের হিমে বরফের দাড়ির মতো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কি না!'

'বটে, বটে!' মেয়েরা আবার ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু করত তাকে।

কিন্তু তানাবাই ওদের কাউকে তার ঘোড়ায় চড়তে দিয়েছে, এমন ঘটনা ঘটে নি। যে মেয়েটির সঙ্গে পথে দেখা হলে তার মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌টে যেত এবং সে তার দৌড়বাজ ঘোড়াকে রাশ ধরে পায়ে পায়ে হাঁটাত সেই মেয়েটি পর্যন্ত একবারও তানাবাইয়ের ঘোড়ায় ওঠে নি। হয়তো মেয়েটি নিজেও চায় নি।

তানাবাই সে বছর পরিদর্শক কমিশনে নির্বাচিত হয়। নানা কাজে প্রায়ই তাকে গ্রামে যেতে হত। প্রায় প্রতিবারই

তার দেখা হত সেই মেয়েটির সঙ্গে। অনেক সময় দপ্তর থেকে সে বেরুত তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে। তার চোখ দেখে, কণ্ঠস্বর শুনে আর হাতের সঞ্চালন দেখে গুলসারি সেটা টের পেত। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলেই তানাবাইয়ের মেজাজ ভালো হয়ে যেত।

কড়া মেজাজী ঘোড়াটাকে শান্ত করতে করতে তানাবাই ফিস্ ফিস্ করে বলত: 'আস্তে! আস্তে এত তাড়াহুড়োর কী আছে?' মেয়েটির পাশাপাশি এসে সে ঘোড়া চালাত হাঁটার গতিতে।

তারা নীচু গলায় কী সব কথা বলত; কখনও বা নিঃশব্দেই চলত পাশাপাশি। মনিবের মন হালকা হয়ে যাচ্ছে, স্বরে আবেগ আসছে আর হাত নরম হয়ে এসেছে এসব গুলসারি টের পেত। এ কারণেই, পথে মেয়েটির নাগাল পেলে গুলসারি খুশি হত।

যৌথখামারের অবস্থা যে খুব খারাপ যাচ্ছে, চাষীদের যে প্রায় কিছুই উপার্জন হচ্ছে না, পরিদর্শক কমিশনের সদস্য তানাবাই বাকাসভ যে সভাপতির কাছে জানতে চাইছে কেন এমন অবস্থা হল, অবশেষে সুখের দিন কবে আসবে, কবে রাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুত পরিমাণ সামগ্রী দেওয়ার পরও তাদের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকবে এবং লোকেদের মনে হবে না যে তারা বৃথা খেটে মরছে — গুলসারি এসব কেমন করে জানবে!

গত বছর অজন্মা হয়েছিল, পশু খাদ্যের ফলনও খারাপ হয়েছে; অন্যদের হয়ে এবং মুখে চুনকালি পড়ার হাত থেকে এলাকাটিকে বাঁচানোর জন্য এ বছর রাষ্ট্রের কাছে শস্য আর গবাদি পশু বেচতে হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি। সামনে যে কী হবে আর চাষীরা যে কী আশা করতে পারে — কেউ জানত না। সময় বয়ে চলেছে, যুদ্ধ স্মৃতিতে পরিণত হচ্ছে,

কিন্তু তবু লোকে এখনও জীবন যাপন করছে আগের মতোই নিজেদের ছোট ছোট সবজিবাগানে ফলানো সামান্য সামগ্রীর উপর নির্ভর করে আর খামারের মাঠ থেকে চুরি-করা এটা-সেটার উপর নির্ভর করে। খামারের তহবিলে টাকা নেই; রাষ্ট্রের কাছে শস্য, দুধ, মাংস যা-ই বিক্রি করছে সব কিছুতেই লোকসান হচ্ছে। গ্রীষ্মে পশুপাল বেশ বেড়ে ওঠে, কিন্তু শীতে সবই প্রায় শূন্যে গিয়ে দাঁড়ায় — পশুগুলো তখন মরে শীতে আর খিদেয়। গোয়াল, গোলাবাড়ি আর পশুখাদ্যের কেন্দ্র গড়ে তোলা একান্তে দরকার — কিন্তু সে সব তৈরীর উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ দেবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে না। আর যুদ্ধের ফলে চাষীদের ঘরবাড়ির অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? যারা খোলা বাজারে আলু আর ভেড়া বিক্রি করে দু' পয়সা রোজগার করেছে, শুধু তারাই নতুন বাড়ি তুলেছে। তৈরি করার দরকারী মাল-মশলাও অবৈধভাবে তারা পেয়েছে।

একদিন তানাবাই বলল: 'কমরেডরা, কোন একটা কিছুতে নিশ্চয় খুবই ভুল হচ্ছে, এভাবে কাজ চলবার কথা নয় কোনক্রমেই। বড় রকমের কিছু একটা গলদ হচ্ছে। এমন হওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। হয় আমরা ভুলে গেছি কাজ করতে অথবা আপনারা আমাদের ঠিকমতো চালাচ্ছেন না।'

তানাবাইয়ের দিকে এক তাড়া কাগজ ঠেলে দিয়ে হিসাবরক্ষক বলল: 'কোন্‌টা ভুল? কোন্‌টা বেঠিক? এই যে, পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে দেখ, এই আমরা পেয়েছি, এই আমরা দিয়েছি, এই হচ্ছে জমা, এই খরচ আর এই হচ্ছে ব্যালেন্স। লাভের ঘরে শূন্য, সবই লোকসান। আর কী চাও? আগে বোঝার চেষ্টা কর। তুমি একাই এখানে কমিউনিস্ট, আর আমরা বুঝি জনগণের শত্রু?'

অন্যেরাও আলোচনায় যোগ দিল, তর্কাতর্কি, হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। কী হচ্ছে বোঝার আশা ছেড়ে দিয়ে তানাবাই বসে রইল দুহাতে মাথা চেপে। যৌথখামারটির জন্য তার দুর্ভাবনার কারণ শুধু এই নয় যে সে এতে কাজ করে, এ ছাড়াও বিশেষ কিছু কারণ আছে। এখানে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে তানাবাইয়ের পুরানো ঝগড়া আছে। সে জানে তারা এখন তাকে নিয়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করে; দেখা হলে তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যেন ভাবটা এই: "এখন কেমন? আবার কুলাক উচ্ছেদের কাজে নামতে চাস নাকি? এবার আর তেমন সুবিধা হচ্ছে না। এক পাও এগোতে হবে না। ওঃ, লড়াইয়ে যে কেন ফৌত হলি না!"

তানাবাইয়ের চোখই উত্তর দিত: "দাঁড়া, হারামজাদারা, আমরা যা চাই তা হবেই হবে!" অথচ এরা অন্য কেউ নয়, তানাবাইয়েরই আত্মীয়স্বজন। এদের মধ্যে একজন তানাবাইয়ের সৎ ভাই কুলুবাই। সে এখন বুড়ো, যুদ্ধের আগে সাত বছর কাটিয়েছে সাইবেরিয়ার কারাগারে। ছেলেরাও বাপেরই মতো, তানাবাই তাদের দুচক্ষের বিষ। তারা তানাবাইকে পছন্দ করবেই বা কেন? সম্ভবত তাদের সন্তানেরাও তানাবাইয়ের বংশধরদের ঘৃণা করবে। এর কারণও আছে। এ সবই অতীতের কথা, কিন্তু মনের দাগ্য লোকের মনে থাকে দীর্ঘকাল। কুলুবাইয়ের সঙ্গে এই রকম আচরণ করা ঠিক হয়েছিল কি? কুলুবাই ছিল একজন ভালো কৃষক মাত্র, যাদের এখন বলা হত মাঝারি কৃষক। জ্ঞাতিসম্পর্ক অস্বীকার করবে কী করে? একই বাপের প্রথম স্ত্রীর সন্তান কুলুবাই আর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান তানাবাই। কিরগিজদের মধ্যে এ রকম ভাইদের সহোদর বলেই গণ্য করা হয়। তাই কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তানাবাই হাত তুলেছিল নিজেরই বংশের বিরুদ্ধে।

তখন এ নিয়ে কত কথাই না হয়েছে! এখন হয়ত সে ঘটনা নানা রকমভাবে বিচার করা চলে, কিন্তু তখন? তানাবাই যা করেছিল তা কি এই যৌথখামারের স্বার্থেই নয়? কিন্তু তার কি দরকার ছিল? আগে তার মনে এ ব্যাপারে কোন সংশয় ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের পর এ নিয়ে মাঝে মাঝে অন্য রকম ভেবেছে। সে কি শুধু শুধু তার এবং যৌথখামারের অকারণ শত্রুই সৃষ্টি করে নি?

'অমন ধন্দ মেরে বসে রইলে কেন হে, তানাবাই! হল কী তোমার?' লোকেরা আবার আলোচনায় জড়াল তাকে। আবার কথা শুরু হল শুরু থেকে: শীতকালের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে গোবর এনে মাঠে ফেলা দরকার। গাড়ি নেই, তার মানে কাঠ আর লোহা কিনতে হবে। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে, ঋণ পাওয়া যাবে কি, সিকিউরিটিই বা কী দেখানো হবে? শুধু মুখের কথায় ত আর ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না। সেচের পুরানো নালাগুলো মেরামত করতে হবে, নতুন নালা খুঁড়তে হবে — বিরাট কাজ, শ্রমসাধ্য কাজ এটা, শীতকালে করা যাবে না, মাটি জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যায়, তখন কোপানো সম্ভব নয়। এদিকে, বসন্তকালেও সময় থাকে না, তখন বীজ বোনা, ভেড়াদের প্রসব করানো, আগাছা উপড়ানো, তার পরই ফসল তোলা... ভেড়া পালনেরই বা কী অবস্থা? ভেড়ার বাচ্চা রাখার ঘর কোথায়? দুধের ফার্মের অবস্থাও উন্নত কিছু নয়। ছাদ পচে গেছে, পশুখাদ্য যথেষ্ট নেই, দুধ দোয়ার কাজ কেউ করতে চায় না। উদয়াস্ত খেটে পায়টাই বা কী? আরও কত যে ঝঞ্ঝাট আর ঘাটতি ছিল সেগুলোর কথা ভাবতে গেলেও আঁতকে উঠতে হয়।

তবু তারা মনোবল নিয়ে জমায়েত হয়, এসব প্রশ্ন আবার আলোচনা করে পার্টি-সভায় এবং খামার-বোর্ডের সভায়।

সভাপতি ছিল চোরো। তানাবাই চোরোর কদর দিতে পেরেছিল আরও অনেক পরে। সমালোচনা করা খুবই সহজ কাজ। তানাবাই শুধু একটি ঘোড়ার পালের জন্য দায়ী, কিন্তু চোরো দায়ী যৌথখামারের সব কিছুর জন্য, খামারের প্রতিটি মানুষের জন্য। হ্যাঁ, চোরো খুবই শক্ত মানুষ ছিল। যখন মনে হত সবই গোল্লায় যাচ্ছে, যখন সদরে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে তার বিরুদ্ধে চিৎকার চেঁচামেচি হত আর খামারের কর্মীরা তার ওপর মারমুখো হয়ে উঠত তখনও সে হতোদ্যম হত না। তানাবাই হলে হয় পাগল হয়ে যেত নয় ত আত্মহত্যা করত। কিন্তু চোরো খামারটিকে চালু রেখেছিল শেষ পর্যন্ত, তার নিজের হৃৎপিণ্ডে গোলযোগ দেখা দেওয়ার আগে পর্যন্ত। তার পরও দু'বছর কাজ করেছে পার্টি-সংগঠক রূপে। লোকের সঙ্গে কথা বলার, লোককে যুক্তি দর্শানোর ক্ষমতা ছিল তার। এ কারণেই, তার সঙ্গে আলাপ করার পর প্রতিবারই তানাবাই ফিরেছে এই নতুন বিশ্বাস নিয়ে যে, সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে এবং ক্রমে ক্রমে ঠিক সেই রকমটিই হবে যেমন হবে বলে তারা স্বপ্ন দেখেছিল একেবারে শুরুতে। শুধু একবার চোরোর উপর বিশ্বাসটা তানাবাইয়ের টলে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটায় দোষ ছিল তার নিজেরই...

খামার-দপ্তর থেকে চোখ পাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে তানাবাই যখন বেরিয়ে এলো, যখন সে হঠাৎ লাফ দিয়ে জিনে চড়ল, লাগামে ঝাঁকানি দিল সক্রোধে তখন যে কী ভাবনা তানাবাইকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল গুলসারি তা জানত না। গুলসারি বুঝতে পারল যে মনিবের মেজাজ বেজায় খারাপ। যদিও তানাবাই কখনও গুলসারিকে প্রহার করে নি, তবুও এ রকম অবস্থায় গুলসারি তাকে ভয় করত। গুলসারি জানত, যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পথে, মনিবের মেজাজ হালকা হয়ে যাবে,

মনিব সদয় হয়ে উঠবে, বলগা টেনে গুলসারিকে থামাবে, কোমল স্বরে কথা বলবে মেয়েটির সঙ্গে আর মেয়েটি তার হাত দিয়ে গুলসারিকে আদর করবে, সে তার কেশরে আর গলায় হাত বুলাবে। সেই মেয়েটির মতো কোমল হাত আর কারও ছিল না। তার হাতদুটো ছিল সেই কপালে সাদা তারাওয়ালা তরুণী ঘোড়াটির ঠোঁটজোড়ার মতোই দৃঢ় অথচ কোমল। সেই মেয়েটির মতো চোখও দুনিয়ায় আর কারও ছিল না। জিনের একপাশে কাত হয়ে তানাবাই যখন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলত, মেয়েটি কখনও হাসত কখনও বা ভ্রূ কোঁচকাত কিংবা অসম্মতিতে মাথা নাড়ত, তার চোখ কালো থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠত আবার উজ্জ্বল থেকে কালো হয়ে উঠত — চাঁদের আলোয় খরস্রোতা ছোট নদীর তলায় পাথরের নুড়ি গড়িয়ে যাওয়ার সময় যেমন দেখায়। চলে যেতে যেতে মেয়েটি ফিরে তাকাত, আবার মাথা নাড়ত।

এর পর তানাবাই নিজের পথ চলতে থাকত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে। লাগাম ছেড়ে দিত, ঘোড়াকে চলতে দিত নিজের ইচ্ছেমতো গতিতে; সাধারণত সেটা হত সহজ দুলকি চালের গতি। মনিব যেন জিনের ওপর নেই, মনে হত সে আর গুলসারি দু'জনেই চলেছে যে যার মতো। তার পর আপনা থেকেই শুরু হত গান। অস্পষ্ট উচ্চারণে তানাবাই গাইত অনুচ্চ স্বরে, গুলসারির মাপা পদক্ষেপের তালে তালে সে গাইত অনেক দিন আগে ভুলে যাওয়া লোকজনের দুঃখ-কষ্টের গান। তাকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া চলত পরিচিত পথে, নদী পার হয়ে স্তেপে, নিজের পালের দিকে...

মনিবের এ ধরনের মেজাজের সময়ে গুলসারি খুশি হত। তার নিজের ধরনে গুলসারিও পছন্দ করত সেই মেয়েটিকে। মেয়েটির দেহ আর চলার ভঙ্গি গুলসারি চিনতে পারত,

মেয়েটির কাছে গেলেই গুলসারির আগ্রহী নাসারন্ধ্র কেমন একটা অচেনা ঘাসের অদ্ভুত আর বিস্ময়কর ঘ্রাণ পেত। সেটা ছিল লবঙ্গের ঘ্রাণ; মেয়েটি লবঙ্গদানার মালা পরত।

তানাবাই মেয়েটিকে বলত: 'দেখ বিউবিউজান, ও তোমাকে কেমন ভালবাসে। ওকে আবার একটু আদর কর। উঃ দেখ, কান দুটো কেমন ঝুলে পড়েছে, ঠিক বাছুরের মতো। কিন্তু পালে ফিরে গেলেই এখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। একবারে ছেড়ে দিলেই হল। সর্দার ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কামড়াকামড়ি করবে কুকুরের মতো। তাই ওর পিঠে জিন বেঁধে রাখি। আশঙ্কা হয় সর্দার ঘোড়াগুলো ওকে খোঁড়া-টোড়া না করে দেয়। ও তো এখনও কচি।'

মেয়েটি অন্য কী একটা ভাবতে ভাবতে উত্তর দিল: 'ও তো ভালবাসেই।'

'তার মানে, বলতে চাও অন্য কেউ ভালবাসে না।'

'তা বলছি না। আমাদের ভালবাসাবাসি খেলার সময় চলে গিয়েছে। তোমার জন্য দুঃখ করতে হোক সেটা আমি চাই না।'

'কিন্তু, কেন?'

'কারণ তুমি অন্য রকম। তুমি পরে কষ্ট পাবে।'

'আর তুমি?'

'আমার কী? আমি সৈনিকের বিধবা। কিন্তু, তুমি...'

পরিস্থিতিটাকে হালকা করার উদ্দেশ্যে তানাবাই বলল:

'আর আমি হচ্ছি পরিদর্শন কমিশনের সদস্য। তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে পথে, কিছু তথ্য জেনে নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে।'

'তথ্য জানার জন্য তুমি খুব ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছ, তাই না? একটু সাবধান হও।'

'আমার এখানে কী করার আছে? আমি যাচ্ছি, তুমিও যাচ্ছ।'

'আমি নিজের পথে যাচ্ছি। আমাদের পথ আলাদা। এখানেই বিদায় নিলাম। আমার হাতে সময় নেই।'

'শোন, বিউবিউজান!'

'আবার কী হল? দরকার নেই তানাবাই। কী লাভ? তুমি ত বুদ্ধিমান মানুষ। তোমাকে ছাড়া আমার বড় খারাপ লাগে।'

'কী হল, আমি কি তোমার শত্রু নাকি?'

'তুমি নিজেই তোমার শত্রু।'

'তার মানে?'

'যেমন বোঝ।'

সে চলে গেল। তানাবাই গ্রামের পথ ধরে এমনভাবে চলতে লাগল যেন কাজে যাচ্ছে, মিলের দিকে কিংবা স্কুলের দিকে ঘোরে, এক পাক ঘুরে আবার ফিরে আসে অন্তত দূর থেকে হলেও দেখার জন্য কী ভাবে সে বের হয় তার শ্বাশুড়ীর বাড়ি থেকে। কাজের সময় সে বাচ্চা মেয়েটাকে রাখত সেখানে, তার পর মেয়ের হাত ধরে চলত গ্রামের প্রান্তে নিজের বাড়ির দিকে। ওর সব কিছুই তানাবাইয়ের বড় আপন বলে মনে হত: তার হাঁটার ভঙ্গি, তানাবাইয়ের দিকে না তাকানোর চেষ্টা, বাদামী শালের আড়ালে ওর বিবর্ণ মুখ, ওর মেয়েটি আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছে যে বাচ্চা কুকুরটি — সব কিছুই।

অবশেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেল নিজের বাড়ির দরজার আড়ালে। তানাবাই এগিয়ে চলল, মনে মনে কল্পনা করতে লাগল: মেয়েটি শূন্য ঘরের দরজা খুলছে, লেপের মতো সেলাই করা পুরানো জ্যাকেটটা খুলছে, সুতী কাপড় গায়ে কুয়োর দিকে যাচ্ছে, আগুন জ্বালছে, হাত-মুখ ধুইয়ে বাচ্চা

মেয়েটাকে খাওয়াচ্ছে, গোরুর পাল ফিরে আসার পর নিজের গোরুটিকে দেখতে যাচ্ছে; গভীর রাতে নিঃশব্দ অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে আছে, মনে মনে নিজেকে আর তানাবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, তারা পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, তানাবাই সংসারী মানুষ, এই বয়সে প্রেমে পড়া হাস্যকর, জীবনে সব কিছুরই একটা সময় আছে, তানাবাইয়ের বৌ ভালো মেয়ে, তার স্বামীর প্রাণ অন্য কোন মেয়ের জন্য আকুলিবিকুলি করুক এটা হতে দেওয়া উচিত নয়।

এসব ভাবনা তানাবাইকে উদাস করে দিল। নদীর ওপারের কুয়াশার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে বলল: "নিয়তিই আমাদের বিরুদ্ধে।" ধীরে ধীরে গাইতে শুরু করল পুরানো একটা গান, ভুলে গেল দুনিয়ার অন্য সব কিছু: কাজকর্ম, যৌথখামার, বাচ্চাদের জামা-জুতো, শত্রু-মিত্র, সৎ ভাই কুলুবাই — যে বহু বছর ধরে কথা বলে না তার সঙ্গে, যুদ্ধ — যা সে প্রায়ই স্বপ্নে দেখে, যে স্বপ্ন তার ঘুম ভাঙ্গায় ঠাণ্ডা ঘামে — সব কিছুই। সে টের পেল না যে, ঘোড়াটি তাকে নিয়ে নদীর হাঁটুজল পার হয়ে আবার পথ ধরেছে। তার ভাবনার আবেশ কাটল যখন গুলসারি নিজের পালের ঘ্রাণ পেয়ে হঠাৎ দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল।

চমকে উঠে লাগাম টেনে তানাবাই বলল: 'এই, এই গুলসারি! ছুটে চলেছিস কোথায়!'

৫

তবুও, তখনকার সময়টা ছিল খুবই চমৎকার — তার আর গুলসারির দুজনের পক্ষেই। দৌড়বাজ ঘোড়ার খ্যাতি ফুটবল খেলোয়াড়ের খ্যাতির মতো। মাত্র গতকালও যে ছেলে

এলোপাতাড়ি লাথি মারেত বলে, সে-ই হয়তো আজ হয়ে উঠল দর্শকদের প্রিয় খেলোয়াড়, বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয়, জনতার প্রশংসার পাত্র। যতদিন সে গোল দিতে পারে ততদিনই তার খ্যাতি বাড়তে থাকে। তার পর সে ধীরে ধীরে মাঠ থেকে বিদায় নেয়, এক সময়ে সবাই তার কথা একেবারেই ভুলে যায়। যারা সবচেয়ে বেশি তারিফ করেছিল তারাই ভোলে সবার আগে। এককালের বিখ্যাত সেই খেলোয়াড়ের জায়গা দখল করে নেয় নতুন কোন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। দৌড়বাজ ঘোড়ার গৌরবের পথ তেমনই। যতদিন দৌড়ে জিততে পারে ততদিনই তার খ্যাতি। সম্ভবত একমাত্র পার্থক্য এই যে, ঘোড়াকে কেউ ঈর্ষা করে না। ঘোড়ারা ঈর্ষা করতে জানে না, মানুষও সৌভাগ্যবশত এখনও ঘোড়াকে ঈর্ষা করা শিখতে পারে নি। যদিও বলতে গেলে ঈর্ষার গতিবিধি দুর্বোধ্য, তবু এমন ঘটনাও অজানা নেই যখন মানুষের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়েই ঈর্ষাপরায়ণ লোকজন ঘোড়ার খুরে পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওঃ কী ভয়ঙ্কর এই ঈর্ষা! কিন্তু সে যাক গে...

বুড়ো তোরগোইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল। সেবার বসন্তকালে গুলসারির ভাগ্যতারা অনেক ওপরে উঠল। ছেলে-বুড়ো সবাই জেনে গেছে গুলসারিকে। "গুলসারি!", "তানাবাইয়ের ঘোড়া", "আমাদের গাঁয়ের গৌরব" — এইভাবে লোকেরা বলত ওর কথা।

তিন-চার বছর বয়সী খালি-পা ছেলেরা, যারা এখনও 'র' উচ্চারণ করতে শেখে নি, তারা গুলসারির গতিভঙ্গির অনুকরণ করে ধুলোবালিমাখা রাস্তায় ছোটাছুটি করত, চিৎকার করত: "আমি গুলসালি!.." "না, আমি গুলসালি!", "মা ওকে বল না আমি গুলসালি! অ্যা-ই, হট্ হট্, আগে চল্, আমি গুলসালি!"

জীবনের প্রথম দৌড়-প্রতিযোগিতায়ই গ্ল্সারি জেনে ফেলেছিল গৌরবের মানে কী আর শক্তি কত। ঘটনাটা মে দিবসের।

নদীর ধারের বিশাল ঘেসো মাঠটায় খেলাধ্লো শ্র্ হয়েছিল জনসভা শেষ হওয়ার পর। লোক এসেছিল নানা জায়গা থেকে — পাশের রাষ্ট্রীয় খামার থেকে, পাহাড় থেকে, এমন কি কাজাখস্তান থেকেও। কাজাখরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল নিজেদের ঘোড়া নিয়ে।

সবাই বলেছিল যে য্দ্ধের পর অত বড় উৎসব আর হয় নি।

আগের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন নিয়ে জিন আর রেকাব ঠিকঠাক করে সেদিন ভোরে তানাবাই যখন গ্ল্সারির পিঠে উঠেছিল, তখন তার চোখের উত্তেজিত উজ্জ্বলতা আর তার হাতের ম্দ্ কম্পন লক্ষ্য করেই গ্ল্সারি অন্মান করেছিল যে অসাধারণ কিছ্ একটা ঘটতে যাচ্ছে। মনিব খ্ব উত্তেজিত।

গ্ল্সারির কেশর আর ঝ্ঁটির ভেতরে আঙ্ল চালিয়ে আদর করে তানাবাই ফিসফিসিয়ে বলেছিল: 'আমাকে ডোবাস নে গ্ল্সারি। তোরও যেন লজ্জা পেতে না হয়। ব্ঝতে পারছিস? সেটা আমরা হতে দিতে পারি না!'

অসাধারণ কিছ্ একটার প্রত্যাশা যেন ছড়িয়ে ছিল বাতাসে, মান্ষের উত্তেজনাপ্র্ণ কণ্ঠস্বরে, ঠেলাঠেলি ভিড়ে আর কোলাহলে। আশেপাশে চারণভূমিতে পশ্পালকেরা ঘোড়ার পিঠে জিন পরাচ্ছে, বাচ্চা ছেলেরা ইতিমধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ওপরে-নীচে ছোটাছ্টি করছে। তার পর পশ্পালকেরা জমায়েত হল, সকলে মিলে নদীর দিকে যাত্রা করল।

তৃণভূমিতে এত মান্ষ আর ঘোড়ার ভিড় দেখে গ্ল্সারি হতব্দ্ধি হয়ে পড়েছিল। কোলাহলে ম্খরিত হয়ে উঠেছিল নদী, চারণভূমি আর পাহাড়ের পাশের বন্যাধৌত ভূমির বাতাস।

উজ্জ্বল শাল, পোশাক, লাল পতাকা আর মেয়েদের সাদা পাগড়িতে গুলসারির চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। ঘোড়াগুলোও সেজেছিল মনোহর সাজে। রেকাব, কড়িয়ালে আর রুপোর বর্মের ঝালরের ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল চারদিক থেকে।

ঘন সারিবদ্ধ ঘোড়াগুলো সওয়ার পিঠে নিয়ে অধীরভাবে পা ঠুকছিল, দৌড়ানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার তদারককারী বুড়োরা নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে মাঠের মাঝখানে ছোটাছুটি করছিল।

গুলসারি অনুভব করছিল তার পেশীগুলো টান টান হয়ে উঠছে, অনুভব করছিল শক্তি জেগে উঠছে তার দেহের মধ্যে। একটা দুর্দান্ত দানব যেন প্রবল বেগে ছোটাছুটি করছিল তার দেহের শিরায় শিরায়, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠের মধ্যে ছুটে গিয়ে প্রাণপণে দৌড়ানো।

তদারককারীরা ঘোড়সওয়ারদের মাঠের মধ্যে ঢোকার সংকেত জানাতে তানাবাই বলগায় ঢিল দিল, গুলসারি তাকে বয়ে নিয়ে গেল মাঠের মাঝখানে, কোন্ দিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। জনতার মধ্য থেকে গুঞ্জন শোনা গেল: "গুলসারি! ওই যে গুলসারি!.."

বড় দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগদানে আগ্রহী সকলেই এগিয়ে এলো। পঞ্চাশেক ঘোড়সওয়ার এসে জুটল।

প্রতিযোগিতার প্রধান ব্যবস্থাপক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল: 'জনতার আশীর্বাদ নাও!'

মুণ্ডিত মস্তকের চারপাশে শক্ত ফেটি বাঁধা ঘোড়সওয়ারেরা সারি ধরে এগিয়ে গেল, তাদের হাত ওপরে তোলা, আঙ্গুল ফাঁক করা। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে সমস্বরে উচ্চারিত হল:

আমিন" — কপাল ছুঁয়ে মুখমণ্ডল বেয়ে শত শত হাত নীচের দিকে নেমে এলো জলধারার মতো।

তার পর ঘোড়সওয়ারেরা ছুটে চলে গেল দৌড় শুরু করার জায়গাটার দিকে। জায়গাটা এখান থেকে নয় কিলোমিটার দূরের একটা মাঠ।

ইতিমধ্যে মাঠের মাঝখানে অন্যান্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল: মাটির ওপর ও ঘোড়ার পিঠে চেপে মল্লযুদ্ধ, জিন থেকে টেনে নামানো, ছুটন্ত অবস্থায় মাটি থেকে পয়সা তোলা এবং আরও অনেক রকম। এসবই হচ্ছে ভূমিকা, আসল প্রতিযোগিতা শুরু হবে যেখানে ঘোড়সওয়ারেরা গেছে সেখান থেকে।

গুলসারি পথে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারছিল না মনিব কেন তাকে সংযত করে রেখেছে। তার চারপাশে ঘোড়াগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। তার চারপাশে যে এতগুলো ঘোড়া আর সবগুলোই যে ছোটার জন্য ব্যগ্র এতে গুলসারির রাগ হল, অধীরতায় কাঁপন ধরল তার দেহে।

অবশেষে সব ক'টি ঘোড়া যাত্রা শুরুর রেখা বরাবর মাথায় মাথায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। স্টার্টার সারির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘোড়া চালিয়ে গেল। তার পর থেমে একটা সাদা রুমাল তুলল। উত্তেজিত, উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই তুষারে জমাট বাঁধার মতো স্থির হল। হাতের রুমাল নড়ে উঠল। ঘোড়াগুলো সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল; একসঙ্গে সব ক'টি ঘোড়া দৌড় শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গুলসারিও সামনের দিকে ছুট দিল। ঘোড়াগুলোর খুরের দাপটে মাটি কাঁপছিল, ধুলোর মেঘ উঠল ওদের পেছনে। সওয়ারদের হাঁকডাক ও চিৎকারে উৎসাহিত হয়ে ঘোড়াগুলো ছুটতে লাগল পাগলের মতো। কীভাবে চার পা এক সঙ্গে তুলে দ্রুত দৌড়ুতে হয় একমাত্র গুলসারিরই তা জানা ছিল না, তাই সে দৌড়ুতে

লাগল নিজের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। এখানেই ছিল ওর দুর্বলতা আবার শক্তিও বটে।

শুরুতে সব ক'টি ঘোড়াই চলছিল দঙ্গল বেঁধে, কয়েক মিনিট বাদেই কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল। গুলসারি এটা লক্ষ্য করে নি। ও শুধু দেখেছিল দ্রুত ধাবমান ঘোড়াগুলো ওকে ছাড়িয়ে সড়ক ধরে এগোচ্ছে। তাদের খুরের আঘাতে গরম খোয়া-পাথর আর তাল তাল শুকনো কাদা উড়ছে, তার নাকে-মুখে লাগছে। গুলসারির আশেপাশে ঘোড়ারা ছুটে চলেছে, সওয়ারেরা চিৎকার করছে, চাবুক শিস্ মারছে, ধুলো উড়ছে। ধুলোর মেঘ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। নাকে আসছে ঘাম, পাথরকুচি আর সদ্য পদদলিত লতাগুল্মের কটু গন্ধ।

এ রকম চলল দৌড়ের প্রায় আধা পথ পর্যন্ত। দশটি ঘোড়া এগিয়ে গিয়ে গুলসারির নাগালের বাইরে চলে গেছে। দু পাশের কোলাহল কমতে শুরু করেছে, পেছনে যারা আসছিল তাদের গোলমালও অনেক পিছিয়ে পড়েছে; কিন্তু এখনও যে কয়েকটি ঘোড়া সামনে রয়েছে আর মনিব যে এখনও ওর বলগা ঢিল দিচ্ছে না এতে গুলসারির খুব রাগ হল। ক্রোধে আর বাতাসে ওর চোখ কালো হয়ে এল, খুরের নীচে পথ চলে যাচ্ছে বিজলির বেগে, অগ্নিগোলকের মতো আকাশ থেকে পড়তে পড়তে সূর্য যেন গড়িয়ে আসছে ওর দিকে। সর্বাঙ্গে গরম ঘাম ঝরতে লাগল, আর যতই সে ঘামতে লাগল তার দেহও যেন ততই হালকা হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে, এমন এক সময় এলো যখন দ্রুত ধাবমান ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়তে শুরু করল, ক্রমে ক্রমে তাদের গতিবেগ কমতে লাগল; কিন্তু গুলসারির সঞ্চিত শক্তি তখনও অটুট। "জোরসে, গুলসারি, জোরসে!" মনিবের কণ্ঠস্বর শুনতে

পেল গুলসারি, সূর্য যেন আরেও দ্রুত গড়িয়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে। অন্য ঘোড়াদের ছাড়িয়ে যেতে শুরু করল গুলসারি — সওয়ারদের ক্রুদ্ধ মুখ, বাতাসে চাবুক আছড়ানোর শব্দ, অন্য ঘোড়াদের হাঁ-করা মুখ আর দাঁত সব একে একে পিছিয়ে যেতে লাগল বিজলির বেগে। সহসা বলগায় ঢিল পড়ল; গুলসারি এখন আর জিন অথবা সওয়ারের ভার অনুভব করছে না — দৌড়ের দুরন্ত আবেগ গর্জে উঠল ওর শিরায় শিরায়।

এখনও দুটি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটে চলেছে গুলসারির সামনে, একটি ঘোর ছাইরঙা, আরেকটি বাদামী। সওয়ারদের চিৎকারে আর চাবুকে দ্রুত ধাবমান ঘোড়াদুটি কেউ কারও কাছে হার মানছে না। দুটিই শক্তিশালী দৌড়বাজ। ওদের ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বহুক্ষণ চেষ্টা করতে হল বটে কিন্তু অবশেষে পথের একটা উঁচু জায়গায় গুলসারি ওদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে সক্ষম হল। উঁচু জায়গাটার উপর দিয়ে গুলসারি যেন উড়ে চলে গেল, জায়গাটাকে মনে হল যেন একটা বিশাল তরঙ্গের চুড়ো, মুহূর্তেকের জন্য গুলসারি ভেসে রইল বাতাসে, নিজের দেহকে তার মনে হল নির্ভার। সেই মুহূর্তে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল। দৌড়ুনোর সময়ে চোখের উপর রোদের বর্ষণকে মনে হচ্ছিল আগের চেয়েও বেশি ধাঁধানো রকমের। সে ছুটে চলল রাস্তার ঢল ধরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গুলসারি পেছনে খুরের দাপট শুনতে পেল। ঘোর ছাইরঙা আর বাদামী ঘোড়াদুটি ওকে প্রায় ধরে ফেলছিল। দু'পাশ থেকে ঘোড়্যদুটি দৌড়ুতে লাগল ওর সঙ্গে সঙ্গেই — এখন আর এক পাও হটছে না।

এভাবে ঘোড়া তিনটি মাথায় মাথায় ছুটে চলল এমন ভঙ্গিতে যেন ওদের দেহ অভিন্ন। গুলসারি কল্পনা করল ওরা

যেন এখন আর দৌড়্বচ্ছে না, ওরা তিনজনেই যেন জমাট বেঁধে আছে অদ্ভুত আর নিঃশব্দ একটা অসাড়তায়। পাশের ঘোড়াদ্বটির চোখের ভাব, ক্লিষ্ট মাথা, কড়িয়াল চেপে রাখা দাঁত আর লাগামও দেখতে পাচ্ছিল গ্বলসারি। গাঢ় ছাইরঙা ঘোড়াটি হিংস্র আর একগ্বঁয়ে, বাদামী ঘোড়াটিকে মনে হল বিব্রত — অনিশ্চিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাদামী ঘোড়াটিই প্রথম পিছিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে তার অপরাধী, বিহ্বল দ্বষ্টি, পরে তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র গ্বলসারির চোখের আড়াল হল, তার পরে তাকে আর দেখা গেল না। গাঢ় ছাইরঙা ঘোড়াটি পেছনে পড়ল অনেক কষ্টে, অনেক পরে। দৌড়্বতে দৌড়্বতে ওর যেন ধীরে ধীরে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, অসহায় ক্রোধে চোখ হয়ে উঠেছিল কাচের মতো। কিন্তু পরাজয় স্বীকারে অনিচ্ছ্বক হওয়া সত্ত্বেও অবশেষে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হল।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলার পর গ্বলসারির নিঃশ্বাসে সহজতর হল। ও এখন নদীর র্বপোলী বাঁক আর সব্বজ তৃণভূমি দেখতে পাচ্ছে সামনে, শ্বনতে পাচ্ছে জনতার দ্বরাগত গর্জন। দেখা গেল সবচেয়ে উৎসাহী দর্শকেরা পথেই অপেক্ষা করছে। ঘোড়ায় চড়ে ছ্বটে চলেছে তারা গ্বলসারির দ্ব'পাশ দিয়ে, বিজয়োল্লাসে চিৎকার করছে। এখানে গ্বলসারি হঠাৎ দ্বর্বলতা বোধ করতে শ্বর্ব করল। দৌড়ের দ্বরত্বটা তার জন্য খ্বব বেশিই হয়েছে বটে। গ্বলসারি জানতে পারে নি পেছনে কী হচ্ছে, অন্যরা তাকে ধরে ফেলছে কিনা। তার শক্তি দ্রত শেষ হয়ে আসছিল, সে অন্বভব করছিল সে আর চলতে পারছে না।

কিন্তু গ্বলসারির সামনে বিরাট জনতা মহা উল্লাসে আনন্দধ্বনি করছে, ঘোড়সওয়ার আর পদচারী মান্বষেরা তার

দিকে এগিয়ে আসছে দুটি বাহুর মতো, চিৎকার ক্রমেই বেড়ে গেছে। হঠাৎ সে স্পষ্ট শুনতে পেল জনতার অভিনন্দন: "গুলসারি! গুলসারি! গুলসারি!" চিৎকার আর আনন্দধ্বনি তার ফুসফুস ভরিয়ে তুলল বাতাসের মতো, সে এগিয়ে চলল নতুন শক্তিতে। উঃ, জনতা, জনতা! জনতা কীই না করতে পারে!..

উল্লাসের অবিরাম চিৎকার চেঁচামেচিতে উৎসাহিত হয়ে গুলসারি তীরবেগে ছুটে গেল জনতার ভিড়ের ফাঁক দিয়ে। তার পর দৌড়ের গতি কমিয়ে তৃণভূমিতে একটা চক্কর দিল।

কিন্তু, এ-ই সব নয়। গুলসারি বা তানাবাই কেউই এখন আর নিজের নয়। গুলসারি যখন দাঁড়িয়ে পড়ে খানিকটা দম নিল এবং শান্ত হল তখন জনতা বিজয়ীর সম্মানে কিছুটা সরে গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল বৃত্তাকারে আবার ফেটে পড়ল চিৎকার: "গুলসারি! গুলসারি! গুলসারি!" সঙ্গে সঙ্গে তার মনিবের নামও উচ্চারিত হল: "তানাবাই! তানাবাই! তানাবাই!"

জনতা আবার অলৌকিক প্রভাব ফেলল গুলসারির ওপর। ক্রীড়াক্ষেত্রে সে প্রবেশ করল গর্বিত বিজয়ীর মতো, মাথা উঁচু, চোখ জ্বলছে। যশের হাওয়ায় নেশাগ্রস্ত গুলসারি নাচতে লাগল, হেলে দুলে পা ফেলতে লাগল — যেন এখনই নতুন করে দৌড়ুতে সে প্রস্তুত। গুলসারি বুঝতে পেরেছিল সে সুন্দর, শক্তিমান এবং বিখ্যাত।

তানাবাই জনতার সামনে দিয়ে ঘোড়া চালাতে লাগল, তার দু'হাত দরাজভাবে দু'দিকে প্রসারিত — সেটা বিজয়ের সংকেত। আবার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে সমস্বরে ছড়িয়ে পড়ল আশীর্বাদের ধ্বনি: "আমিন"। আবার শত শত হাত ললাট ছুঁয়ে মুখমন্ডল বেয়ে নীচের দিকে নেমে এলো জলধারার মতো।

জনতার মধ্যে গুলসারি সহসা একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেল। সেই মেয়েটি। কালো শালের বদলে পরনে এবার সাদা পোশাক থাকা সত্ত্বেও মুখের ওপর থেকে হাত সরে যেতেই মেয়েটিকে চিনতে পারল সে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সামনের সারিতে, আনন্দে উজ্জ্বল মুখ, অগভীর জলধারায় রোদ পড়ে নীচের নুড়ি যেমন চিক্ চিক্ করে মেয়েটির চোখদুটি তেমনই ঝিলিক দিচ্ছে, চোখদুটি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়ে আছে গুলসারি আর তানাবাইয়ের উপর। গুলসারির মন স্বভাবতই টানছিল মেয়েটির দিকে, যাতে তার মনিব মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারে আর মেয়েটি তার আশ্চর্য হাত বুলিয়ে গুলসারির কেশর আর গলায় আদর করতে পারে — যে হাত ললাটে সাদা তারাওয়ালা বাদামী মাদী ঘোড়ার বাচ্চাটার ঠোঁটের মতো কোমল আর দৃঢ়। কিন্তু তানাবাই কেন যেন বলগা টানছিল অন্য দিকে আর মনিবের আচরণে বিস্মিত হয়ে গুলসারি পেছনের পা তুলে লাফাচ্ছিল মেয়েটির দিকে যাওয়ার জন্য। যে মেয়েটির সঙ্গে তার মনিবের অবশ্যই কথা বলা উচিত সে যে কাছেই রয়েছে মনিব কি সেটা দেখতে পাচ্ছে না?..

পরের দিনটি, ২রা মে তারিখটিও ছিল গুলসারির দিন। ছাগল-কাড়া বা ছাগল ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা — অনেকটা পোলোর মতো একটা খেলা, বলের বদলে এতে ব্যবহার করা হয় একটা ছাগলের ধড়। ছাগলের লোম দীর্ঘ আর কর্কশ বলে প্রতিযোগীদের পক্ষে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ছাগলের দেহটা ঠ্যাং ধরে কিংবা ছাল ধরে ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হয়। সেদিন দুপুর বেলার অনুষ্ঠান এই প্রতিযোগিতা।

আবার সেই প্রথাগত জয়ধ্বনি উঠল স্তেপের প্রান্তরে, আবার কেঁপে উঠল মাটি। প্রতিযোগীদের চারদিক দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে ক্রীড়ামোদীরা চিৎকার আর উল্লাসধ্বনি করতে লাগল। এ দিনও গুলসারির ওপরই সবার নজর। অর্জিত খ্যাতির জন্য সবাই তাকেই সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়া বলে ভাবতে লাগল। কিন্তু আলামান-বাইগার, অর্থাৎ সমাপ্তির দিকে যাওয়ার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত তানাবাই গুলসারিকে সংযত করে রাখল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন ইচ্ছেমতো সংঘর্ষে নামার অনুমতি দেওয়া হবে। যে সওয়ার দক্ষ ও চটপটে সে-ই ছাগলটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে নিজের গাঁয়ে। এই প্রতিযোগিতা সবার জন্যই উন্মুক্ত। সবাই সংকেতের অপেক্ষা করছে, সবাই নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইছে।

মে মাসের সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছে দূরে কাজাখস্তানের দিকে। সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় হলুদ। চোখ না কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে দেখা যায়।

জিনের ওপর থেকে ঝুলে পড়ে ছাগলের দেহটাকে খামচি দিয়ে ধরে পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে উল্লাসধ্বনি করে কিরগিজ আর কাজাখ সওয়ারেরা মাঠের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।

যখন দীর্ঘ, বহুবর্ণ ছায়া ছড়িয়ে পড়ল স্তেপের ওপর, অবশেষে তখনই মোড়লরা আলামান বাইগার নির্দেশ দিল। সচিৎকারে "আলামান" শব্দ উচ্চারণ করে ছাগলের দেহটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল মাঠের মাঝখানে।

সঙ্গে সঙ্গেই সওয়ারেরা ধড়টাকে ঘিরে ফেলল, সেটাকে মাটি থেকে তোলার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল। ভিড়ের চাপে ব্যাপারটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দাঁত বের করে ঘোড়াগুলো পাগলের মতো ঘুরতে লাগল, কামড়াকামড়ি করতে

লাগল। এই চাপাচাপিতে গ্লসারির প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হল, তার দরকার একটু খোলা জায়গা, কিন্তু তানাবাই ছাগলটাকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। এমন সময় তীব্র চিৎকার উঠল: "ধর, ধর! কাজাখরা নিয়ে নিয়েছে!" ঘোড়ারা যেখানে চরকির মতো প্যাক খাচ্ছিল সেখান থেকে ভয়ংকর ক্ষ্যাপা মর্দা ঘোড়ায় চড়ে ছেঁড়া ফৌজী শার্ট পরা এক তরুণ কাজাখ বেরিয়ে গেল। ছাগলের ধড়টাকে তুলে নিজের পায়ের নীচে চেপে সে তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল।

জনতা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: 'ধর, ধর! ওই যে কটা ঘোড়াটা! শিগগির তানাবাই, তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে ধরতে পারবে না!'

কাজাখ তরুণ সোজা ছুটে চলল সে দিকে, যেখানে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে, ছাগলের দেহটা ঝাঁকানি খাচ্ছে তার পায়ের নীচে। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে সে উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে এই বহ্নিমান সূর্যের মধ্যে, মিলিয়ে যাবে খানিকটা লাল ধোঁয়া ছেড়ে।

গুলসারি বুঝতে পারছিল না কেন তানাবাই ওকে পেছনে টেনে রাখছে। কিন্তু ওর মনিব জানত যে, যারা ওর পিছু নিয়েছে আর যে কাজাখরা ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটছে, তাদের সবাইকে যাতে এই তরুণটি ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই জন্য তাকে একটু সময় দেওয়া দরকার। যদি কাজাখরা কটা ঘোড়াটিকে একবার ঘিরে ফেলতে পারে তবে শিকার ছিনিয়ে আনার কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না। একমাত্র আশা রয়েছে যদি প্রতিযোগিতাটা হয় শুধু দু'জনের মধ্যে।

সুযোগের অপেক্ষা করে অবশেষে তানাবাই পুরোবেগে ঘোড়া ছোটাল। গুলসারি তীরবেগে ধেয়ে চলল সূর্যের দিকে, খুরের শব্দ আর মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমে পিছনে পড়তে

এগোল, ক্ষীণতর হতে লাগল, কটা ঘোড়াটার সঙ্গে ওর দূরত্ব ক্রমে কমতে লাগল। কটা ঘোড়াটা ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, ওটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয়। তানাবাই এগিয়ে যাচ্ছিল কাজাখ ঘোড়াটার ডান দিক লক্ষ্য করে। কাজাখ তরুণের পায়ের নীচে শক্তভাবে চেপে রাখা ছাগলটা ছিল ওই দিকেই। এবার গুলসারি কাজাখ ঘোড়াটার পাল্লা ধরে ফেলেছে। ছাগলের একটা পা ধরে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য তানাবাই জিনের ডান দিকে ঝুঁকল, কিন্তু কাজাখ কায়দা করে শিকারটাকে সরিয়ে ফেলল নিজের বাঁ দিকে। ঘোড়াগুলো তখনও ছুটে চলেছে সোজা সূর্যের দিকে। কাজাখ ঘোড়াটার বাঁ দিকে গিয়ে আবার এগিয়ে যাওয়ার জন্য তানাবাইকে একটু পিছিয়ে পড়তে হল। গুলসারিকে সরিয়ে নিয়ে আনতে অবশ্য বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল তবে এ কৌশলটাও সফল হল। ছেঁড়া ফৌজী শার্ট পরা কাজাখ তরুণটি এবারেও ছাগলটাকে সরিয়ে ফেলল অন্য দিকে।

'সাবাস!' তানাবাই উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বলল।

ঘোড়াগুলো তীরবেগে ছুটে চলেছে সোজা সূর্যের দিকে।

আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। গুলসারিকে কাজাখ ঘোড়াটির গায়ে ঘেঁষিয়ে তানাবাই কাত হয়ে শুয়ে পড়ল কাজাখ ঘোড়াটির জিনের উপর। কাজাখ তানাবাইকে সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তানাবাই তাকে ছাড়ল না। গুলসারির গতি আর নমনীয়তার ফলে তানাবাইয়ের পক্ষে কটা ঘোড়াটির কাঁধের উপর প্রায় শুয়ে পড়া সম্ভব হল। অবশেষে, তানাবাই ছাগলটার নাগাল ধরল এবং সেটাকে নিজের দিকে টানতে শুরু করল। ডান দিক থেকে ছাগলটাকে ধরা আরও সহজ হল, তাছাড়া, তার দুটি হাতই মুক্ত ছিল। সে ছাগলটার প্রায় অর্ধেক নিয়ে এল নিজের দিকে।

তানাবাই চেঁচিয়ে বলল: 'ভাই কাজাখ, সাবধান!'

জবাবে তরুণটিও চেঁচিয়ে বলল: 'না হে পড়শি, পেতে হচ্ছে না!'

ভয়ঙ্কর গতিতে চলতে চলতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। শিকার নিয়ে যুধ্যমান ঈগলের মতো তারা লড়ছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, পশুর মতো দাঁত খিঁচিয়ে ঘোৎ ঘোৎ করছে, পরস্পরকে শাসাচ্ছে, তাদের হাতগুলো হয়ে উঠেছে ইস্পাতের বেড়ির মতো, নখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। লড়াইয়ে যোগ দিয়ে ঘোড়াদু'টিও উন্মত্ত হয়ে সওয়ারদের নিয়ে চলেছে সামনের দিকে, তীরবেগে ছুটছে রক্তিম সূর্যটাকে ধরে ফেলার জন্য।

ধন্য আমাদের সেই পূর্বপুরুষরা যাঁরা আমাদের দিয়ে গেছেন এমন প্রচণ্ড সাহসিকতার খেলা!

ছাগলের ধড়টা এখন ঝুলছে দু'জনের মাঝখানে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ পর্ব। নিঃশব্দে, দাঁত চেপে, দেহের প্রতিটি পেশীকে টান টান করে দু'জনেই ধরে আছে ছাগলটাকে; যাতে করে হঠাৎ টান দিয়ে ছাড়িয়ে আনা যায় তার জন্য দু'জনেই চেষ্টা করছে ছাগলটার ওপর পা তুলে দিতে। কাজাখ বেশ শক্তিমান। তার বাহু দীর্ঘ, পেশল, বয়সও তানাবাইয়ের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু অভিজ্ঞতা বড় কথা। তানাবাই হঠাৎ ডান দিকের রেকাব ছেড়ে কটা ঘোড়াটার পাঁজরায় পা দিয়ে চাপ দিল। ছাগলটাকে নিজের দিকে টানতে লাগল আর পা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘোড়াটাকে দূরে ঠেলতে লাগল। কাজাখ তরুণের মুঠি ধীরে ধীরে আলগা হয়ে এলো।

পরাজিত কাজাখ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠল: 'সামাল!'

আকস্মিক ঝাঁকুনিতে তানাবাই প্রায় পড়ে যাচ্ছিল জিন

থেকে। শেষ পর্যন্ত সে সামলে নিল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বিজয়ের বন্য চিৎকার। ন্যায্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নেওয়া শিকারটিকে পায়ের নীচে চেপে ধরে ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে তানাবাই পালাতে লাগল। একদল ঘোড়সওয়ার জয়ধ্বনি করতে করতে ছুটল তানাবাইয়ের দিকে।

'গুলসারি! গুলসারি ছিনিয়ে নিয়েছে!'

'ওকে ধর! তানাবাইকে ধর!' একদল কাজাখ ছুটল তানাবাইকে বাধা দেওয়ার জন্য।

এখন আসল কাজ হল বাধা এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া যাতে তার গ্রামের লোকেরা তাকে গোল হয়ে ঘিরে ব্যূহ তৈরি করে ফেলতে পারে।

যারা পিছু ধাওয়া করছিল তাদের এড়িয়ে তানাবাই আবার ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। মনিবের দেহের দোলার সামান্যতম সংকেতমাত্র গুলসারি ঘুরে, এদিক-ওদিক মোড় নিয়ে কাজাখদের এড়িয়ে যেতে লাগল। তানাবাই কৃতজ্ঞ স্বরে মনে মনে বলল: "সাবাস! সাবাস গুলসারি!"

কাত হয়ে ঘোরার সময়ে গুলসারির অবস্থা প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ার মতো হয়েছিল। তার পর সে সোজা পথে ছুটল। সেই মুহূর্তেই তানাবাইয়ের গ্রামবাসীরা এসে গুলসারির দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার পেছন দিকও আটকে দেয় এবং একসঙ্গে ঘন দঙ্গল বেঁধে ছুটতে শুরু করে নিজেদের গ্রামের দিকে। কাজাখরা আবার ওদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। তানাবাইয়ের দলকে ছুটন্ত অবস্থায় আবার মোড় নিতে হল। ঘোড়সওয়ারেরা দ্রুতগামী উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের মতো ছুটছিল বিশাল স্তেপের ওপর দিয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে, কেউ পালাচ্ছে, কেউ পিছু ধাওয়া করছে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ধুলোয়, প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে উচ্চকণ্ঠের

চিৎকারে, কোন ঘোড়া আর সওয়ার হয়তো পড়ে যাচ্ছে, কেউ উল্টে পড়ছে ঘোড়ার ওপর থেকে, কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ুচ্ছে নিজের ঘোড়ার পিছনে, কিন্তু সবাই যেন মাতাল হয়ে আছে প্রতিযোগিতার আবেগে। প্রতিযোগিতার সময়ে যা ঘটবে তাতে কেউ কাউকে দোষ দিতে পারবে না। সাহস আর বিপদের ঝুঁকি আসলে একই মায়ের সন্তান...

সূর্যের ক্ষীণ প্রান্তভাগ তখনও দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু সন্ধের নীল শীতলতার মধ্যে তখনও চলছে আলামান-বাইগা, ঘোড়ার খুরের দাপটে মাটি কাঁপছে। এখন আর কেউ চিৎকার করছে না, কেউ কারও পিছু ধাওয়া করছে না, তবু গতির আবেগে মুগ্ধ হয়ে সবাই তখনও ঘোড়া নিয়ে দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ের ছন্দ আর সঙ্গীতের প্রভাবে ঘোড়সওয়ারেরা হিমানী-সম্প্রপাতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে স্তেপের ওপর, পাহাড়ে উঠছে নামছে আঁধারের তরঙ্গের মতো। এরই জন্য কি ঘোড়সওয়ারদের মুখগুলো নিঃশব্দ আর দৃঢ়সংকল্পিত হয় নি, এই ছন্দই কি কাজাখ 'দোমব্রা' আর কিরগিজ 'কোমুজ'-এর বিশেষ ধরনের সঙ্গীতের জন্ম দেয় নি!..

তানাবাইয়ের দল নদীর কাছে এসে পড়েছে। সামনের অন্ধকার ঘন ঝোপের ওধারে সব কিছু নিষ্প্রভ। পথ বাকি আছে আর সামান্যই। খেলা শেষ হবে নদীর ওপারে, গ্রামে। তানাবাই আর তার বন্ধুরা তখনও চলেছে ঘন দঙ্গল বেঁধে। বহরের প্রধান জাহাজের মতো গুলসারিকে তারা নিয়ে চলেছে চারদিক থেকে ঘিরে।

গুলসারি ক্লান্ত, চরমভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেইদিনে সাধ্যাতীত শ্রম হয়েছে তার। তার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। ডাইনে

পাঁয়ে দুই ঘোড়সওয়ার হাত রেখেছে গুলসারির বলগায়, তারা গুলসারিকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিছুতেই ওকে পিছিয়ে পড়তে দেবে না। অন্য সঙ্গীরা তানাবাইকে রক্ষা করছে পাশ থেকে আর পেছন থেকে। জিনের সামনে ফেলে রাখা ছাগলের ধড়টার ওপর তানাবাই পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার মাথা ঝুলছে ওপরে নীচে, অতি কষ্টে আসনের ওপর রয়েছে সে। সঙ্গীরা না থাকলে সে বা গুলসারি কেউই সম্ভবত আর চলতে পারত না। সেকালে ঘোড়সওয়ারেরা সম্ভবত এভাবেই তাদের শিকার নিয়ে যেত, সম্ভবত এভাবেই আহত যোদ্ধাদের উদ্ধার করত শত্রুর হাত থেকে...

সামনে নুড়ি ছড়ানো অগভীর নদী আর তৃণভূমি। এখনও অন্ধকারে চোখে দেখা যাচ্ছে।

ঘোড়সওয়ারেরা চলতে চলতে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঘোড়ার খুরের দাপটে জলে কানে তালা ধরানোর মতো শব্দ তুলে তারা গুলসারিকে নিয়ে গেল অপর তীরে। এবার তারা নিজেদের এলাকায় চলে এসেছে! তারা জিতেছে!

কেউ একজন তানাবাইয়ের জিনের ওপর থেকে ছাগলটাকে নিয়ে ছুটে গেল গ্রামের দিকে।

কাজাখরা দাঁড়িয়ে রইল অন্য তীরে।

'খেলার জন্য ধন্যবাদ!' কিরগিজ সওয়ারেরা চেঁচিয়ে বলল।

'বিদায়! আবার আমাদের দেখা হবে শরৎকালে!' জবাবে বলল কাজাখরা। তার পর ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তানাবাই আতিথ্য নিয়েছে একজনের বাড়িতে, গুলসারি বাঁধা রয়েছে অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে বাইরে। সম্ভবত, যেদিন তাকে প্রথম তালিম দেওয়া হয় সেদিন

ছাড়া গুলসারি আর কখনও এমন ক্লান্ত হয় নি। কিন্তু তখন সে এখনকার তুলনায় ছিল পাতলা। বাড়ির ভেতরে সবাই গুলসারির সম্পর্কে কথা বলছিল।

'এসো তানাবাই, আমরা গুলসারির স্বাস্থ্য কামনায় পান করি। গুলসারি না থাকলে আমরা কিছুতেই জিততে পারতাম না।'

'খাঁটি কথা। ওই কটা মর্দা ঘোড়াটা সিংহের মতো শক্তি ধরে। আর ওই ছোকরাটাও জওয়ান আছে। কালে কেউকেটা হবে।'

'ঠিক কথা। তবে গুলসারি যেভাবে কাজাখদের এড়িয়ে দৌড়ুচ্ছিল সেটা এখনও আমার চোখে ভাসছে। মাঝেমাঝে গুলসারি এত বেশি কাত হয়ে দৌড়ুচ্ছিল যে দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।'

'সে আর বলতে! আগেকার দিনে হলে লড়ুয়েরা ওকে নিয়ে যেত যুদ্ধে। ঘোড়া ত নয়, দুলদুল!'

'তানাবাই, গুলসারিকে মাদী ঘোড়ার কাছে ছাড়বে কবে?'

'ও তো এর মধ্যেই মাদী ঘোড়াদের তাড়া করতে শুরু করেছে। কিন্তু ও এখনও খুব ছোট। আগামী বসন্তেই উপযুক্ত সময় হবে। যাতে ওর একটু ওজন বাড়ে সেজন্য এবার শরৎকালে ওকে স্বাধীনভাবে খেতে দেব...'

পানীয়ের আমেজে বিভোর লোকজন আরও অনেকক্ষণ বসে বসে আলামান-বাইগার খুঁটিনাটি ব্যাপার আর দৌড়বাজ ঘোড়ার গুণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল, এদিকে ঘোড়াটা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম শুকোয়, মুখের লাগাম চিবোয়। তাকে ভোর অবধি পেটে খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার কষ্ট যা হচ্ছিল তা কিন্তু খিদের জন্য নয়। কাঁধ

টনটন করছে, পাগ্‌লো যেন তার নিজের নয়, গরমে খ্‌র জ্বলে যাচ্ছে, মাথার ভেতর তখনও চলছে আলামান-বাইগার গমগমে আওয়াজ। তখনও যেন সে শ্‌নতে পাচ্ছে চিৎকার-চেঁচামেচি আর পিছ্‌ ধাওয়ার কোলাহল। থেকে থেকে সে কেঁপে কেঁপে ওঠে. নাকে ঘড়ঘড় আওয়াজ তোলে, কান খাড়া করে। তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিতে, গা ঝাড়া দিতে, ঘোড়াদের মাঝখানে চারণভূমিতে চরে বেড়াতে। অথচ মনিব গাঁড়মসি করছিল।

যাই হোক, শিগ্‌গিরই সে সামান্য টলমল করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে এলো। তার গা থেকে ভেসে আসতে লাগল কেমন যেন একটা তীব্র, কটু গন্ধ। এমনটা তার কখন-সখন হত। আর এক বছর বাদেই এই দৌড়বাজ ঘোড়াটি এমন একজন লোকের হাতে পড়বে যার গা থেকে অনবরত এরকম বোঁটকা গন্ধ ছাড়তে থাকবে। ঐ লোকটা আর এই বিচ্ছিরি গন্ধ তার ঘ্‌ণা উদ্রেক করবে।

তানাবাই গ্‌লসারির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলের গোছায় বিলি কাটল, জিনের গদির নীচে হাত চালিয়ে দিয়ে বলল:

'খানিকটা জ্‌ড়িয়েছিস? কাহিল হয়ে পড়েছিস? আমিও বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছি। অমন আড়চোখে আর তাকাস নে, মদ না হয় খেয়েইছি, সে ত তোরই সম্মানে। উৎসব। তা-ও সামান্যই। ভুলে যাস না, আমার মাত্রাজ্ঞান আছে। যুদ্ধেও ছিল। হয়েছে, গ্‌লসারি, আড়চোখে তাকাস নে। এখন খালের ভেতর যাব, জিরোব...'

মালিক কোমরের বাঁধনগ্‌লো টেনে লাগাল, বাড়ি থেকে অন্যান্য যে সব লোক বেরিয়ে এলো তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল, সবাই যার যার ঘোড়ায় চেপে এদিক-ওদিক চলে গেল।

তানাবাই গাঁয়ের ঘুমন্ত পথের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলছিল। চারদিক নিঝুম। জানলাগুলো অন্ধকার। মাঠে শোনা যাচ্ছে ট্র্যাক্টরের মৃদু ঘর্ঘর। চাঁদ ইতিমধ্যে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে, বাগিচায় সাদা ঝলমল করছে ফুটন্ত আপেলগাছের সারি, কোথায় যেন একটা দোয়েল ডেকে চলেছে। কেন যেন গোটা গাঁয়ে সে একা। পাখিটা গাইতে গাইতে নিজেই নিজের গান কান পেতে শুনছে, থেমে যাচ্ছে, তারপর আবার রিনরিনে সুর ধরছে, শিস দিচ্ছে।

তানাবাই ঘোড়ার লাগাম একটু টেনে ধরল।

'সুন্দর আর কাকে বলে!' সে গলা চড়িয়ে বলল। 'আর কী শান্ত! কেবল দোয়েল ডেকে চলেছে। তুই বুঝতে পারছিস গুলসারি, অ্যাঁ? তোর দরকার... তোর দরকার পালে, আর আমি...'

ওরা কামারশালা পার হয়ে গেল, এখান থেকে প্রান্তের রাস্তাটি ধরে বেরোতে হবে নদীর দিকে, আর সেখানে গিয়েই — ঘোড়ার পালের মধ্যে। অথচ মালিক কেন যেন টেনে নিয়ে চলল অন্য দিকে। সে চলল মাঝের পথ বরাবর, ঐ পথের শেষে একটা আঙ্গিনার সামনে এসে থামল — এখানে থাকত সেই রমণী। যে কুকুরটা ছোট মেয়েটির সঙ্গে প্রায়ই দৌড়াদৌড়ি করত সে ছুটে বেরিয়ে এলো, সে ঘেউ ঘেউ করল, শেষে থেমে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। মালিক চুপচাপ জিনের ওপর বসে কী যেন ভাবতে লাগল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইতস্তত করে লাগামে হাত দিল।

দৌড়বাজ ঘোড়াটি এগিয়ে চলল। তানাবাই নদীর নীচের দিকে বাঁক নিল, রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘোড়াকে তাড়া লাগাল। গুলসারি নিজেও চাইছিল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মাঠে পৌঁছুতে। ওরা ঘেসো জমির ওপর দিয়ে চলল। এই ত নদী,

পায়ের নাল তীরের ওপর প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করছে। কলকল করে ছুটে চলেছে কনকনে জল। এমন সময় অল্প জলের মাঝামাঝি জায়গায় এসে মনিব আচম্‌কা লাগাম টেনে ধরে খট্‌ করে পেছন দিকে টান মারল। মনিব ভুল করেছে ভেবে গুলসারি মাথা নাড়ল। পিছু ফেরার কথা তাদের নয়। কত বেলা যেতে পারে? কিন্তু উত্তরে মনিব তার পেটের পাশে চাবুক মারল। গুলসারি মার খাওয়া পছন্দ করত না। বিরক্ত হয়ে মুখের লাগাম চিবোতে চিবোতে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বশ মানল, পিছু ঘুরল। আবার ঘেসো জমির মধ্য দিয়ে, আবার রাস্তার ওপর দিয়ে, আবার সেই আঙিনার দিকে।

বাড়ির সামনে মনিব আবার জিনের ওপর ছটফট করতে লাগল, এদিক-ওদিক লাগাম টানতে লাগল, বোঝার উপায় নেই কী চায়। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। অবশ্য ফটক বলতে কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল কেবল দুটো হেলে পড়া খুঁটি। এবারেও কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে এলো, ঘেউ ঘেউ করল, থেমে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ঘর নিস্তব্ধ, অন্ধকার।

তানাবাই জিন থেকে নেমে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে নিয়ে আঙিনা ধরে চলল, জানলার কাছাকাছি এসে আঙুল দিয়ে কাচের ওপর টোকা মারল।

'কে?' ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি, বিউবিউজান, খোল। শুনছ, আমি!'

ঘরের ভেতর আগুনের শিখা জ্বলে উঠল, জানলায় পাল্লাটে আলোর আভা দেখা দিল।

'ব্যাপার কী? এত দেরি করে কোত্থেকে?' দোরগোড়ায় বিউবিউজানের আবির্ভাব ঘটল। তার পরনে সাদা পোশাক, গলার বোতাম খোলা, পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে গাঢ়

রঙের চুলের রাশ। তার দেহ থেকে ভেসে আসছিল উষ্ণ ঘ্রাণ আর অজানা ঘাসের সেই অপূর্ব গন্ধ।

'মাফ কর,' অনুচ্চ স্বরে তানাবাই বলল, 'আলামান-বাইগা দেরিতে শেষ হল। কাহিল হয়ে পড়েছি। ঘোড়াটারও একেবারে মর-মর দশা। ওকে একটু জিরোতে দিতে হবে, কিন্তু জানই ত ঘোড়ার পাল বেশ খানিকটা দূরে।'

বিউবিউজান চুপ করে রইল।

চাঁদের আলোয় আলোকিত জলাশয়ের গর্ভে পড়ে থাকা পাথরের মতো তার চোখজোড়া চকচক করে উঠে নিভে গেল। দৌড়বাজ ঘোড়াটার আশা ছিল মেয়েটি এগিয়ে এসে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেবে, কিন্তু সে তা করল না।

'ঠান্ডা,' বিউবিউজানের কাঁধ দুটো ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। 'তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তা-ই যদি হয় ত ভেতরে এস না। ওঃ, তোমার মাথায় খেলেও,' বলে সে নিঃশব্দে হেসে উঠল। 'তুমি যখন এখানে ঘোড়ায় চড়ে মাটিতে ঠকঠক আওয়াজ করছিলে তখন আমার নিজেরই যা অবস্থা। তুমি কচি খোকার মতো।'

'এক্ষুনি। ঘোড়াটা বেঁধে রাখি।'

'ওখানে কোনায় উনুনটার কাছে বেঁধে রাখ।'

মনিবের হাত এমন আর কখনও কাঁপে নি। সে তাড়াহুড়ো করে কড়িয়াল খুলতে লাগল, বাঁধনগুলো আলগা করতে গিয়ে অনেক সময় লাগিয়ে ফেলল — একটা আলগা করল, অন্যটার কথা বেমালুম ভুলেই গেল।

তানাবাই মেয়েটির সঙ্গে চলে গেল, জানলার আলোও দেখতে দেখতে নিভে গেল।

অজানা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থাকাটা দৌড়বাজ ঘোড়াটির পক্ষে ছিল অনভ্যস্ত ব্যাপার।

চাঁদ পূর্ণোদ্যমে আলো দিচ্ছিল। চোখ তুলে গুলসারি দেখতে পায় দুধাল-নীল আভায় জড়ান রাতে-ঢাকা পাহাড়ের ঘুমোয়মান মাথা। সজাগ হয়ে দু'কান নেড়েচেড়ে সে কান পাতল। খালে জল কলকল করছে। দূরে মাঠের মধ্যে সেই একই ট্র্যাক্টর ঘর্ঘর আওয়াজ করছে, বাগিচায় গান গেয়ে চলেছে সেই একই নিঃসঙ্গ দোয়েল পাখিটা।

পাশের আপেল গাছের ডাল থেকে ঘোড়ার মাথায় ও কেশরের ওপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা পাঁপড়ি।

রাত পুইয়ে ফর্সা হয়ে আসছিল। দৌড়বাজ ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর রেখে পা বদলাবদলি করছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে মনিবের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার জানা ছিল না যে আরও একাধিকবার তাকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকাল অবধি রাত কাটিয়ে দিতে হবে।

তানাবাই ভোরবেলা বেরিয়ে এসে উষ্ণ হাতে গুলসারিকে সাজ পরাতে লাগল। এখন তার হাতেও অজানা ঘাসের সেই অপূর্ব ঘ্রাণ।

তানাবাইকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য বিউবিউজান বেরিয়ে এলো। সে তানাবাইয়ের সঙ্গে নিবিড় হয়ে এলো, তানাবাই তাকে অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল।

'গোঁফ দিয়ে হুল ফুটিয়ে দিয়েছ,' সে ফিসফিস করে বলল। 'জলদি কর, দেখ কেমন ফর্সা হয়ে গেছে।' সে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'বিউবিউ, এদিকে এসো,' তানাবাই ওকে ডাকল। 'শুনছ, ওর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও, আদর করে দাও ওকে,' ঘোড়াটার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলল। 'আমাদের মনে দুঃখ দিও না!'

'ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম,' সে হেসে উঠল। 'দেখ, ওর সারা গায়ে আপেল ফুল।' সোহাগভরা কথা উচ্চারণ করতে করতে সে কপালে তারাচিহ্ন আঁকা বাদামী রঙের সেই বাচ্চা মাদী ঘোড়ার ঠোঁটের মতো নমনীয় ও অনুভূতিশীল নিজের আশ্চর্য হাত ঘোড়াটার গায়ে বুলাতে লাগল।

নদীর ওপারে গিয়ে তানাবাই গান শুরু করে দিল। তার গানের তালে তালে চলতে ভালো লাগছিল, তার খুব ইচ্ছে করছিল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চরার জন্য ঘোড়ার পালের মধ্যে যেতে।

মে মাসের এই রাতগুলোতে তানাবাইয়ের সৌভাগ্যের উদয় হল। ঠিক এই সময়ই তার রাতে ঘোড়া চরানোর পালা এলো। দৌড়বাজ ঘোড়াটিরও শুরু হল রাতের জীবনের এক রূপ। দিনের বেলায় সে অমনি চরে বেড়াত, বিশ্রাম করত, রাতে ঘোড়ার পালকে উপত্যকার ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর মনিব তার পিঠে চেপে আবার সেই আঙ্গিনার উদ্দেশেই ছুটে চলত। ভোরবেলায় ফর্সা হতে না হতে তারা ঘোড়াচোরের মতো স্তেপের পায়ে-চলা আবছা পথের ওপর দিয়ে আবার ছুটে চলত উপত্যকায় রেখে আসা ঘোড়ার পালের কাছে। ওখানে মনিব ঘোড়ার পালকে খেদিয়ে জড় করত, ঘোড়াগুলোকে গুনে দেখত, শেষকালে আশ্বস্ত হত। দৌড়বাজ ঘোড়াটির কষ্ট হত। যাওয়া এবং আসার সময় — দু'পথেই মনিবের তাড়া, আর রাতের বেলায় পথে-বিপথে দৌড়ঝাঁপ করাও তেমন সহজ নয়। কিন্তু মনিবের মর্জি।

গুলসারির ইচ্ছেটা অন্য রকম। তার হাতে ছেড়ে দিলে সে পাল থেকে একেবারেই আলাদা হত না। তার ভেতরে পুরুষটি প্রকট হয়ে উঠছিল। আপাতত পালের মর্দা ঘোড়াটার সঙ্গে গুলসারি সদ্ভাব বজায় রাখছিল, কিন্তু দিনের পর দিন

একই মাদী ঘোড়াকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঘনঘন সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগল। আরও ঘনঘন ঘাড় বাঁকিয়ে, নলের মতো লেজ উঁচিয়ে সে পালের পুরোভাগে শোভাবর্ধন করতে লাগল। সে তারস্বরে হ্রেষাধ্বনি করত, উত্তেজিত হয়ে মাদী ঘোড়াদের ঊরু কামড়ে ধরত। আর দেখেশুনে মনে হত তাদেরও এটা ভালোই লাগছে, তারা ওর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকত এবং এইভাবে পালের মর্দা ঘোড়াটির ঈর্ষা জাগিয়ে তুলত। দৌড়বাজ ঘোড়াটিকে জোর ঠ্যালা সামলাতে হত — মর্দা ঘোড়াটা ছিল পুরনো ও দুর্দান্ত লড়িয়ে। যাই হোক না কেন উঠোনে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকা এবং পালের মর্দার ঘোড়ার হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান বরং ভালো। এখানে মাদী ঘোড়াদের জন্য তার মন খারাপ লাগত। অনেকক্ষণ পা ঠুকত, খুর দিয়ে মাটিতে আঘাত করত — কেবল তাতেই শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে আসত। এই নৈশ অভিযান কতদিন চলত কে জানে, যদি না সেই ঘটনাটি ঘটত...

সেই রাতে দৌড়বাজ ঘোড়া অভ্যাসমতো মনিবের প্রতীক্ষায় উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল, পালের জন্য তার মন খারাপ লাগছিল, ইতিমধ্যে সে ঝিমোতে শুরু করে দিয়েছে। লাগামের আগাটি ছাদের ছাঁচের নীচে কড়িকাঠের সঙ্গে উঁচু করে বাঁধা ছিল। ফলে শোয়া যাচ্ছিল না — যতবারই তার মাথা ঝুঁকে পড়ছিল ততবারই কড়িয়াল তার মুখের নরম অংশে কেটে বসছিল। তবু ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। বাতাস কেমন যেন ভারী ভারী, মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।

তন্দ্রা আর আধা ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যেই গুলসারি হঠাৎ শুনতে পেল গাছপালা হেলেদুলে উঠছে, আওয়াজ তুলছে, ঠিক যেন কেউ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের ঝাঁকুনি দিতে এবং উপড়ে ফেলে দিতে শুরু করেছে। বাতাস উঠোন

জুড়ে চাবুক মেরে চলল, ঠনঠন আওয়াজ তুলে দুধের খালি কেঁড়েটা গড়িয়ে দিল, দড়ি থেকে জামাকাপড় খুলে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কুকুরটা কোথায় গিয়ে লুকোবে দিশে করতে না পেরে কিঁউ কিঁউ করে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। গুলসারি রাগতভাবে নাকে ঝাড়া দিল, কান খাড়া করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উনুন ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সন্দেহজনকভাবে ফুঁসে ওঠা আবছা ছায়াটার দিকে — সেই স্তেপের দিকে, যেখান থেকে অস্পষ্ট কোলাহলের মতো ভয়ঙ্কর কী একটা এগিয়ে আসছে। আর পর মুহূর্তেই রাত খানখান হয়ে গেল ভেঙ্গে পড়া বনজঙ্গলের মতো, বাজ কড়কড় করে উঠল, মেঘের গায়ে বিদ্যুতের ডোরা খেলে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে পড়ল। দৌড়বাজ গুলসারি যেন কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে বাঁধন খুলে ছুটে চলল, নিজের পালের কথা ভেবে আতঙ্কে বেপরোয়া হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। তার মধ্যে জেগে উঠল নিজের জাতকে বিপদ থেকে রক্ষা করার চিরন্তন সহজাত প্রবণতা। সহজাত প্রবণতা তাকে ডাকছিল সেই দিকে, সাহায্যের জন্য। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিদ্রোহ প্রকাশ করল লাগামের বিরুদ্ধে, কাঁড়িয়ালের বিরুদ্ধে, চুলে পাকানো রশির বিরুদ্ধে — যা কিছু তাকে এখানে এমন শক্ত করে ধরে রেখেছে সে সবের বিরুদ্ধে। সে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল, খুর দিয়ে জমি খুঁড়তে লাগল এবং পালের কাছ থেকে জবাবে চিৎকার শোনার আশায় অবিরাম হ্রেষাধ্বনি করল। কেবল ঝড় শিস দিল, গর্জন করল। ওঃ, তখন যদি বাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত!..

মনিব সাদা অন্তর্বাস গায়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তার পেছন পেছন — স্ত্রীলোকটি, তারও গায়ে সাদা অন্তর্বাস।

চোখের পলকে তারা বৃষ্টির ধারায় কালচে হয়ে গেল। তাদের ভিজে মুখ ও ভয়ার্ত চোখের ওপর স্পর্শ বুলিয়ে গেল নীল আলোর ঝলক আর তাতে কালিমার মাঝখান থেকে ফুটে উঠল বাতাসে দোদুল্যমান দরজা সমেত বাড়ির একটি অংশ।

'দাঁড়া! দাঁড়া!' ঘোড়াটাকে খুলতে গিয়ে তানাবাই তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু গুলসারি তাকে আর চিনতেই পারে না। দৌড়বাজ গুলসারি হিংস্রভাবে মনিবের দিকে ধেয়ে গেল, খুরের আঘাতে উনুন ভেঙ্গে ফেলে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে লাগল। তানাবাই দেয়াল ঘেঁসে গুড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে গেল, দু'হাতে মাথা ঢেকে সামনে ছুটে গিয়ে লাগাম ধরে ঝুলে পড়ল।

'চটপট বাঁধন খোল!' স্ত্রীলোকটির উদ্দেশে সে চিৎকার করল।

বাঁধন খুলতে না খুলতে দৌড়বাজ ঘোড়াটি দু'পায়ে ভর দিয়ে তানাবাইকে উঠোন বরাবর টেনে নিয়ে গেল।

'জলদি চাবুকটা দেখি!'

বিউবিউজান চাবুকের জন্য ধেয়ে গেল।

'দাঁড়া, দাঁড়া বলছি, খুন করব!' তানাবাই ক্ষ্যাপার মতো ঘোড়ার মুখের ওপর চাবুক মারতে মারতে চেঁচাল। তাকে জিনের ওপর চেপে বসতে হবে, তাকে এক্ষুনি পালে হাজির হতে হবে। সেখানে কী হচ্ছে? ঝড়ে ঘোড়ার দল কোথায় ছিটকে পড়েছে?

গুলসারিরও কিন্তু দরকার ঘোড়ার পালে যাওয়া। অবিলম্বে, এই মুহূর্তে — সেখানে, যেখানে প্রবৃত্তির প্রবল শাসন তাকে বিপদের সময় আহ্বান জানাচ্ছে। এই কারণেই সে হ্রেষাধ্বনি করছে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই

কারণেই সে এখান থেকে ছুটছে। এদিকে বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়, ঘনঘন গর্জনে আর চমকে রাতের আকাশ কাঁপিয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে বজ্রবিদ্যুৎ।

'ধর!' তানাবাই বিউবিউজানকে হুকুম দিল। বিউবিউজান লাগাম আঁকড়ে ধরতে সে লাফিয়ে জিনের ওপর উঠল। তখনও সে বসার অবকাশ পায় নি, ঘোড়ার কেশর ধরে ঝুলছে মাত্র, গুলসারি কিন্তু ইতিমধ্যেই স্ত্রীলোকটিকে ধাক্কা মেরে, জলকাদার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে উঠোন থেকে ছুট দিল।

না মুখের লাগাম, না চাবুক, না কণ্ঠস্বর — কোনটাকেই সমীহ না করে একমাত্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে পথ আন্দাজ করে নিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের মধ্য দিয়ে, প্রবল বর্ষণের মধ্যে গুলসারি ছুটল। যে মনিবের এখন আর কোন শাসনক্ষমতা নেই তাকে বহন করে নিয়ে সে চলল আবর্তসঙ্কুল নদীর ওপর দিয়ে, জল আর বজ্রের গর্জনের মধ্য দিয়ে, ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে, খানা পেরিয়ে, কন্দর পেরিয়ে; সে অপ্রতিহত বেগে সামনের দিকে ছুটছে ত ছুটছেই। এর আগে আর কখনও, না কোন বড় দৌড়ে, না কোন আলামান-বাইগা উপলক্ষে গুলসারি এমন দৌড়ায় নি যেমন সে দৌড়াল ঐ ঝড়ের রাতে।

ভুতে পাওয়া দৌড়বাজ ঘোড়াটি কীভাবে এবং কোথায় তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তানাবাই তা মনে করতে পারল না। মুখে ও গায়ে বৃষ্টির ছাঁটগুলো এসে লাগছিল জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো। মাথার মধ্যে একমাত্র একটি চিন্তাই ঘুরছিল — ঘোড়ার পালটার কী দশা হল? ঘোড়াগুলো এখন কোথায়? খোদা না করুন তারা যেন নীচের উপত্যকায় রেল লাইনের দিকে ছুটে না যায়। সর্বনাশ! আল্লাহ, আমার সহায় হও, আমার

সহায় হও! আর্বাকরা* আমার সহায় হও, তোমরা কোথায়? পড়িস না গুলসারি, পড়িস না! আমাকে স্তেপে নিয়ে চল, নিয়ে চল সেখানে, ঘোড়ার পালের কাছে!

এদিকে স্তেপে বয়ে চলেছে গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুতের শুভ্র ছটা — শুভ্র বহ্নিশিখায় রাত ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আবার নেমে আসছে তমসা, গর্জে উঠছে বজ্র, বাতাসের ওপর আঘাত করছে বর্ষণের ধারা।

এই আলো এই আঁধার, ফের আলো ফের আঁধার...

দৌড়বাজ ঘোড়াটি পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছিল, মুখবিবর ব্যাদান করে হ্রেষাধ্বনি তুলছিল। সে ডাকছিল, সে অনুনয়-বিনয় করছিল, সে খুঁজছিল, সে প্রতীক্ষা করছিল। কোথায় তোমরা? তোমরা কোথায়? সাড়া দাও! — উত্তরে আকাশ কড়কড় করে উঠল, তারপর আবার দৌড়, আবার খোঁজ, আবার ঝড়ের মধ্যে...

এই আলো এই আঁধার, ফের আলো ফের আঁধার...

কেবল ভোরের দিকে ঝড় শান্ত হয়ে এলো। মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু পুবের আকাশে বজ্রধ্বনি তখনও শান্ত হয় নি — ঘর্ঘর আওয়াজ তুলছে, গর্জন করছে, এধার থেকে ওধারে ছুটে চলছে। নিপীড়িত ধরণীর বুক থেকে ধোঁয়া উঠছে।

কিছু কিছু সইস আশপাশের অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দলছুট ঘোড়াগুলোকে জড় করতে লাগল।

এদিকে বৌ তানাবাইকে খুঁজছে। খুঁজছে বলা ঠিক নয়, তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাতেই সে পড়শীদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে স্বামীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। পালটাকে

---

* পূর্বপুরুষদের আত্মা। — সম্পাঃ

খ‌ুঁজে পাওয়া গেল, তারা তাকে খাতের মধ্যে ধরেও রাখল। অথচ তানাবাইয়ের পাত্তা নেই। লোকে ভাবল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তানাবাইয়ের বৌ জানত যে সে পথ হারায় নি। পড়শীদের ছেলেটা যখন সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল "ঐ ত সে, জায়দার আপা, ঐ যে আসছে!" এবং এই বলে তার দিকে ঘোড়া ছ‌ুটিয়ে গেল, জায়দার কিন্তু তখন জায়গা থেকে নড়ল না। সে চুপচাপ ঘোড়ার ওপর বসে বসে দেখছিল তার বিপথগামী স্বামী কীভাবে ফিরে আসছে।

তানাবাই নীরব, তার ম‌ূর্তি ভয়ঙ্কর। তার গায়ে ভিজে অন্তর্বাস, মাথায় টুপি নেই, তার বাহন দৌড়বাজ ঘোড়াটির ওপরও রাতে বেশ ধকল গেছে। গ‌ুলসার‌ি ডান পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছিল।

'আমরা কিন্তু আপনাকে খ‌ুঁজছিলাম!' ছেলেটি ছ‌ুটে এসে সোৎসাহে তাকে সংবাদ দিল। 'জায়দার আপা ত উতলা হয়ে পড়েছে।'

ওঃ, অবোধ বালক আর কাকে বলে...

'পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম,' তানাবাই বিড়বিড় করে বলল।

এই ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। কেউ কাউকে কিছ‌ু বলল না। ছেলেটি সান‌ুদেশের তলভাগ থেকে ঘোড়ার পালকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে আড়াল হয়ে যেতে তানাবাইয়ের স্ত্রী ম‌ৃদ‌ুস্বরে বলল:

'জামাকাপড় পরারও সময় পেলে না? তাও ভালো যে পাতল‌ুন আর ব‌ুটজোড়া পরনে আছে। লজ্জাও করে না? বয়স ত আর কম হল না! ছেলেমেয়েরাও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে, আর তুমি কিনা...'

তানাবাই চুপ করে রইল। তার আর কী বলার আছে?

ইতিমধ্যে ছোঁড়াটা ঘোড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে এলো। ঘোড়া ও ঘোড়ার বাচ্চাগুলো সকলেই আস্ত ছিল।

'বাড়ি যাওয়া যাক, আলতিকে,' জায়দার ছোঁড়াটাকে ডাকল। কি তোদের, কি আমাদের — আজ আর কাজের অন্ত নেই। তাঁবুগুলো বাতাসে উল্টে পড়েছে। চল, ঠিকঠাক করা যাক।'

আর তানাবাইকে সে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল:

'তুমি এখানে থাক। তোমাকে খাবার এনে দেব, আর পরনের জন্যও কিছু এনে দেব। লোকের চোখের সামনে দেখা দেবে কী করে?'

'আমি ওখানে, নীচে থাকব,' তানাবাই মাথা নাড়ল।

ওরা চলে গেল। তানাবাই ঘোড়ার পালকে চারণভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ঘোড়াগুলোকে দাবড়াল। ইতিমধ্যে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে, গরম পড়ছে। স্তেপ বাষ্পাচ্ছন্ন, জীবনচঞ্চল। বৃষ্টি আর কাঁচা ঘাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘোড়াগুলো অগভীর জলার ওপর দিয়ে, গভীর গিরিখাত বেয়ে ধীরেসুস্থে দুলকি চালে চলল, বেরিয়ে এলো একটা টিলার ওপর। এখানেই যেন অন্য এক জগৎ খুলে গেল তানাবাইয়ের সামনে। দূরে, অনেক দূরে দিকচক্রবাল সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা। আকাশ বিশাল, উন্নত, নির্মল। আর এখান থেকে অনেক দূরে স্তেপে ধোঁয়া তুলছে রেলগাড়ি।

তানাবাই ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। পাশেই একটা চাতক পাখি ডানা ঝটপটিয়ে আকাশে উঠে কিচিরমিচির করতে লাগল। তানাবাই মাথা নীচু করে চলতে লাগল। হঠাৎ সে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।

গুলসারি তার মনিবকে কখনও এমন অবস্থায় দেখে নি। সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, ফোঁপানির দমকে তার কাঁধদুটো কাঁপতে লাগল। সে কাঁদছিল লজ্জায় ও দুঃখে, সে বুঝতে পারল জীবনে শেষবারের মতো যে সুখ তার এসেছিল তা সে হারাল। এদিকে পাখিটা ডাকছে ত ডাকছেই...

পরদিন ঘোড়ার পালগুলো পাহাড়ের দিকে সরে গেল — এখন তাদের এখানে ফেরার কথা কেবল আগামী বছর, বসন্তের গোড়ায়। আস্তানা পড়ল নদীর ধারে ধারে, জলাভূমির ওপরে, গাঁয়ের পাশ দিয়ে। চলল গোরু, ভেড়া ও ঘোড়ার পাল। চলেছে বোঝাই উট ও ঘোড়া, চলেছে জিনে চেপে শিশু ও নারীর দল। ছুটছে ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুর। বাতাসে বিচিত্র ধ্বনি — হৈ হট্টগোল, হ্রেষাধ্বনি, ভেড়ার ডাক...

তানাবাই বড় চারণভূমির ভেতর দিয়ে নিজের ঘোড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলল, তারপর নিয়ে গেল ছোট টিলার ওপর দিয়ে, যেখানে এই কিছু দিন আগে উৎসব উপলক্ষে লোকজনের জমায়েত হয়েছিল, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল গাঁয়ের দিকে না তাকাতে। গুলসারি হঠাৎ গ্রামের প্রান্তের উঠোনটার দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করলে চাবুকের ঘা খেল। তাদের আর যাওয়া হল না সে রমণীর কাছে যার হাতদুটো কপালে তারাচিহ্ন আঁকা বাদামী রঙের সেই বাচ্চা মাদী ঘোড়ার ঠোঁটের মতো নমনীয় ও অনুভূতিশীল আর আশ্চর্য...

পালের ঘোড়াগুলো দলবদ্ধ হয়ে ছুটছিল।

গুলসারির ইচ্ছে ছিল তার মনিব গান গায়, কিন্তু সে গাইল না। গ্রাম পড়ে রইল পিছে। বিদায় গ্রাম। সামনে পাহাড়। বিদায় স্তেপ, আসছে বসন্তে আবার দেখা হবে। সামনে পাহাড়।

মাঝরাত এগিয়ে এলো। গুলসারি আর যেতে পারছিল না। বারবার থেমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে কোনক্রমে এখানে, এই গিরিখাত অবধি পেঁছেছে, কিন্তু গিরিখাত পার হওয়ার ক্ষমতা আর তার ছিল না। বুড়ো তানাবাই বুঝতে পারল যে ঘোড়াটার কাছ থেকে আর বেশি কিছু দাবি করা অন্যায়। গুলসারি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল, গোঙাচ্ছিল মানুষের মতো। যখন সে শুয়ে পড়তে গেল তখন তানাবাই তাকে ঘাঁটাল না।

ঠান্ডা মাটিতে শুয়ে দৌড়বাজ ঘোড়াটা কাতরে চলল, মাথা এপাশ-ওপাশে নাড়াতে লাগল। ওর ঠান্ডা লাগছিল, ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। তানাবাই নিজের গা থেকে পশুলোমের কোটটা খুলে ফেলে তা দিয়ে ঘোড়ার পিঠ ঢেকে দিল।

'কী রে, খারাপ লাগছে না কি তোর? বড্ড খারাপ লাগছে? তুই ঠান্ডায় জমে গেছিস, গুলসারি। তুই ত কখনও জমে যেতিস না।'

তানাবাই আরও কী বকবক করে গেল, কিন্তু গুলসারির আর কিছুই কানে যাচ্ছিল না। হৃৎপিন্ডটা আর একেবারে মাথার ভেতরে ঘা মারছে, তালা ধরিয়ে দিচ্ছে, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, দম আটকে আসছে, আওয়াজ উঠছে থপ্, থপ্, থপ্, থপ্... যেন পেছন থেকে তাড়া খেয়ে ঘোড়ার পাল আতঙ্কে ছুটে চলেছে।

পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে কুয়াসার মাঝখানে ধরণীর ওপর ঝুলে রইল। একটি তারা নিঃশব্দে খসে পড়ে নিভে গেল...

'তুই এখানে শুয়ে থাক, আমি গিয়ে কুটোকাটা ভেঙ্গে নিয়ে আসি,' বুড়ো বলল।

সে অনেকক্ষণ চারধারে ঘুরে ঘুরে গত বছরের আগাছার শুকনো ডালপালা জড় করতে লাগল। এক আঁটি জড় করতে করতে কাঁটায় তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আরও এগিয়ে সে খাদে নেমে গেল, ছুরির দরকার হতে পারে ভেবে সেটা হাতে নিল; এখানে সে ঝাউঝোপে হোঁচট খেল। খুশী হল — সত্যিকারের জ্বালানি হবে।

কাছে পিঠে আগুন জ্বলতে দেখলে গুলসারি সর্বদাই ভয় পেত। এখন ভয় পেল না, উষ্ণতা ও ধোঁয়ার স্রোত তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তানাবাই চুপচাপ বস্তার ওপর বসে ছিল, আগাছার সঙ্গে সঙ্গে ঝাউগাছের ডালপালা তালগোল পাকিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল, দু'হাত তাতাতে তাতাতে আগুনের দিকে চেয়ে ছিল। ঘোড়ার গায়ের ওপর পশুলোমের যে কোটটি বিছিয়ে দিয়েছিল মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে তা ঠিক করে দিচ্ছিল, আবার আগুনের পাশে বসে পড়ছিল।

গুলসারির দেহ কিছুটা গরম হল, কাঁপুনি থামল, কিন্তু চোখে তার হলুদ ঘোলাটে ভাব, বুকের ভেতরটা কেমন ভার ভার, চাপা চাপা, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আগুনের শিখা এই পড়ে ত আবার বাতাসে দপ করে জ্বলে ওঠে। তার সামনে এই যে বুড়োটি বসে আছে, যে তার বহুকালের মনিব, সে এই অদৃশ্য হচ্ছে, ওই দেখা দিচ্ছে। ঘোরের মধ্যে দৌড়বাজ ঘোড়াটির মনে হচ্ছিল যেন তারা ঝড় বাদলের রাতে স্তেপের ওপর দিয়ে ছুটে চলছে, সে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে চিঁহিহি আওয়াজ তুলছে, তাদের পালটাকে খুঁজছে, অথচ তার পাত্তা নেই। শ্বেত বিজলীর ঝলক জ্বলে উঠে নিভে যায়।

এই আলো এই আঁধার, ফের আলো ফের আঁধার...

শীত বিদেয় হল, বিদেয় হল ক্ষণকালের জন্য, পশুচারণকারীদের কাছে এটাই প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে পৃথিবীতে জীবনযাপন তেমন কষ্টসাধ্য মোটেই নয়। গরমকাল আসবে, পশুগুলোর গায়ে মেদ জমবে, প্রচুর দুধ আর মাংস হবে, উৎসবের দিনে ঘোড়দৌড় হবে, নিত্যকার কাজ থাকবে — ভেড়াগুলোর প্রসব, পশম ছাঁটা, ভেড়ার বাচ্চাগুলোর আদর-যত্ন, নতুন নতুন চারণভূমির সন্ধান আর এসবেরই মধ্যে প্রত্যেকের যার যার জীবন — প্রেম ও বিচ্ছেদ, জন্ম ও মৃত্যু, সন্তানদের সাফল্যে আনন্দ আর বোর্ডিং স্কুল থেকে তাদের সম্পর্কে শোচনীয় সংবাদ পেয়ে দুঃখ: বাপ-মা কাছে থাকলে হয়ত বা তাদের পড়াশুনাটা ভালো হত... কত কিছুই না ঘটতে পারে! ঝক্কি সব সময়ই অনেক, তবে লোকে কিছু দিনের জন্য শীতের কঠোরতা ভুলে থাকবে। খাদ্যাভাব, পশুসংখ্যার হ্রাস, জমির ওপর বরফের কঠিন আবরণ, টুটা-ফাটা তাঁবু আর ভাঙা ছাউনি আগামী বছর পর্যন্ত থেকে যাবে হিসাবের খাতায় ও বিবরণীর মধ্যে। তার পর আবার আছড়ে পড়বে শীত — ছুটে আসবে সাদা মাদী উটের পিঠে চেপে, খুঁজে বার করবে পশুপালককে — তা সে পাহাড়ে কিংবা স্তেপে যেখানেই থাকুক না কেন এবং তার কাছে পরিচয় দেবে নিজের ভয়াল চেহারার। অল্প কালের জন্য যা যা বিস্মৃত হয়েছিল সে সবই স্মরণে এনে সে প্রতিশোধ নেবে। এই বিশ শতকেও শীত আগের মতোই আচরণ করে চলছে...

তখনও এই রকমই ছিল। শুকিয়ে যাওয়া ভেড়া ও ঘোড়ার পাল পাহাড় থেকে নেমে এসে স্তেপের বুকে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল। বসন্তকাল। এরা শীত পার করে দিয়েছে।

সেই বসন্তে গুলসারি প্রজননের ঘোড়া হয়ে পালে ঘুরে বেড়াল। তানাবাই এখন কদাচিৎ তার পিঠে জিন চাপায়, ওর প্রতি তার করুণা হল, তা ছাড়া সেটা করাও উচিত হত না — জোড়া বাঁধার মরসুম এগিয়ে আসছে।

গুলসারির মধ্যে ভালো মর্দা ঘোড়া হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। সরাসরি পিতার মতো সে ছোট বাচ্চাগুলোর দিকে নজর রাখত। কোন মা-ঘোড়া একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি সে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে, বাচ্চাটাকে কোথাও পড়ে যেতে দেবে না কিংবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না। গুলসারির আরও একটি গুণ ছিল: অনর্থক ঘোড়াদের শান্তিভঙ্গ সে পছন্দ করত না — সে রকম ঘটলে সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পালকে কিছু দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

সে বছরের শীতকালে যৌথখামারে অদল-বদল ঘটল। নতুন সভাপতিকে পাঠান হল, চোরো কাজের ভার অন্যের হাতে দিয়েছে, এখন সে অঞ্চল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। তার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা একেবারেই খারাপ। তানাবাই বন্ধুকে দেখতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এখান থেকে বের হওয়া কি সহজ ব্যাপার? পশুচারণকারী হল বহু সন্তানের জননীর মতো, চিরকাল তার ওপর সেবা-যত্নের ভার, বিশেষত শীতকালে, এমনকি বসন্তকালেও। প্রাণী ত আর যন্ত্র নয়: সুইচ বন্ধ করে রেখে ছেড়ে যাওয়া যায় না। তানাবাইয়েরও তাই তখন আর অঞ্চল হাসপাতালে যাওয়া হয়ে উঠল না। তখন পালা-বদলি তার কেউ ছিল না। বদলি পশুচারণকারী বলতে ছিল তার স্ত্রী — জীবনধারণের জন্য কোনক্রমে উপার্জন ত করা চাই: দিন-মজুরী যদিও সামান্যই ছিল তবু দুটো দিন-মজুরীতে একটার চেয়ে বেশি পাওয়া যেত বটে।

কিন্তু জায়দারের কোলে শিশু। সে আবার পালাবদলি

। দিন-রাত নিজেকেই চালাতে হত। তানাবাই যখন বদলির ব্যাপারে পড়শীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক তৎক্ষণে খবর এলো যে চোরো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। তখন সে আর তার স্ত্রী ঠিক করল যে পরে পাহাড় থেকে নেমে আসার পর তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। উপত্যকায় সবে নেমেছে, নতুন জায়গায় বসত সবে পেতেছে এমন সময় ঘটল সেই ঘটনাটি যার কথা তানাবাই আজও স্থির হয়ে ভাবতে পারে না...

দৌড়বাজ ঘোড়ার খ্যাতি দু'মুখো অস্ত্রের মতো। সারাটা খেলা যে যত বেশি সরগরম করে তোলে কর্তৃপক্ষের নজর তার ওপর ততই বেশি পড়ে।

সে দিন তানাবাই ভোরবেলা থেকে ঘোড়াগুলোকে চারণভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, তারপর নিজে বাড়ি ফিরে এসেছে নাশ্‌তা খেতে। ছোট মেয়েটাকে কোলের ওপর বসিয়ে সে চা খাচ্ছে আর পারিবারিক নানা ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

বোর্ডিং স্কুলে ছেলেকে দেখতে যেতে হবে, সেই সঙ্গে স্টেশনের দিকে বাজারেও যাওয়া দরকার, সেখানে টুকিটাকির দোকানে বৌ আর ছেলেমেয়েদের জন্য কিনতে হবে কিছু জামাকাপড়।

'তাই যদি হয় জায়দার তা হলে দৌড়বাজ ঘোড়াটিকেই আমি জিন লাগাব,' পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তানাবাই বলল। 'নইলে পেরে উঠব না। শেষবারের মতো ওকে নিয়ে যাব, আর ওকে ছোঁব না।'

'সে তুমিই ভালো বোঝ,' জায়দার রাজী হয়ে বলল।

বাইরে থেকে ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল, কারা যেন তাদের কাছে আসছিল।

'দেখ দেখি কে এলো?' সে বৌকে বলল।

সে বেরিয়ে গেল, তারপর ফিরে এসে বলল, 'ফার্মের কর্তা ইব্রাহিম, তার সঙ্গে আরও যেন কে।'

তানাবাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল, মেয়েকে কোলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। যদিও অশ্ব প্রজনন ফার্মের কর্তা ইব্রাহিমকে সে বিশেষ পছন্দ করত না তবু মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানোই রীতি। তবে ইব্রাহিমকে সে যে কেন পছন্দ করত না তা তানাবাই নিজেও জানত না। এমনিতে ত নরম স্বভাবেরই মনে হয়, আর দশজনের মতো নয়, তবু তার ভেতরে কেমন একটা পিছলে পিছলে ভাব আছে। সবচেয়ে বড় কথা — করার মতো কিছুই সে করত না — আঁকজোক, হিসাব-নিকাশ। ফার্মে সত্যিকারের অশ্ব প্রজননের কাজ মোটেই হত না, প্রত্যেক পশুপালক চলত যার যার মতো। পার্টি মিটিংগুলোতে তানাবাই একাধিকবার এই নিয়ে কথা বলেছে, সকলেই তার সঙ্গে একমত হয়েছে, ইব্রাহিমও, সে সমালোচনার জন্য তানাবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কিন্তু সবই আগের মতো রয়ে গেছে। তবু ভালো যে বেছে বেছে সৎ পশুপালকদের নেওয়া হয়েছে, চোরো নিজে তাদের বাছাই করেছে।

জিন থেকে নেমে ইব্রাহিম অভিবাদনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়াল।

'সালাম আলেকুম, বাই!' সব পশুপালককেই সে বাই বলত।

'আলেকুম সালাম!' সংযতকণ্ঠে উত্তর দিয়ে তানাবাই আগন্তুকের করমর্দন করল।

'হালচাল কেমন? ঘোড়াগুলো কেমন আছে? আপনার নিজেরই বা শরীর কেমন?' ইব্রাহিম তার অভ্যস্ত প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিল, তার মাংসল গালদুটিও ঐরকমই অভ্যস্ত হাসিতে থলথল করে উঠল।

'ভালো।'

'খোদার রহমৎ। আপনার জন্য আমার চিন্তা নেই।'

'তাঁবুর ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক।'

জায়দার অতিথিদের জন্য নতুন কম্বল বিছাচ্ছিল আর কম্বলের ওপর ছাগলের চামড়ার আসন।

ইব্রাহিম তার প্রতিও মনোযোগ দিল।

'এই যে জায়দার, ভাবী, কী খবর? কেমন আছেন? স্বামীর পরিচর্যা ভালো চলছে ত?'

'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন, এখানে বসুন।'

সকলে আসন নিল।

'আমাদের কিছু ঘোড়ার দুধ দাও,' তানাবাই স্ত্রীকে অনুরোধ করল।

পান করতে করতে সকলে এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল।

'এখন যে কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখা যায় তা হল পশুপালন। এখানে গরমকালে অন্তত মাংস, দুধ আছে,' ইব্রাহিম বলল, 'অথচ চাষের কাজে কিংবা অন্যান্য কাজের জায়গায় একেবারে কিছুই নেই। তাই এখন ঘোড়া আর ভেড়ার পালগুলো নিয়ে লেগে থাকা ভালো। ঠিক কি না জায়দার ভাবী?'

জায়দার মাথা নাড়ল, তানাবাই কিন্তু চুপ করে রইল। সে নিজেই এটা জানত, আর ইব্রাহিমের কাছ থেকেও একথা প্রথম শুনছে না — ইব্রাহিম ত সুযোগ পেলেই বলতে ছাড়ে না যে পশুপালনের ব্যাপারটিকে মূল্য দেওয়া উচিত। তানাবাই বলতে যাচ্ছিল যে এখানে ভালো কিছুই হতে পারে না যদি লোকে দুধ ও মাংস যেখান থেকে আসে সেই আরামের জায়গাগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকে। অন্যদের অবস্থাটা একবার

চিন্তা করে দেখা দরকার। লোকে কতদূর পর্যন্ত বেগার খাটবে? যুদ্ধের আগে কী এমন অবস্থা ছিল? শরৎকালে প্রত্যেক বাড়িতে দুই তিন গাড়ি ফসল আসত। আর এখন? লোকে এখান-ওখান থেকে কিছু পাওয়ার আশায় খালি বস্তা নিয়ে ছুটোছুটি করে। নিজেরা ফসল ফলায় অথচ নিজেরাই নিরন্ন। এটা কীরকম? কেবল সভা-সমিতি আর আলোচনা করে বেশি দূর টানা যাবে না। চোরোরও এই ভেবে মন খারাপ হয়ে গেছে যে লোককে কাজের জন্য ভালো ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই সে দিতে পারে নি। কিন্তু এই সব বিষয়, যা তানাবাইয়ের মন মুষড়ে দিয়েছিল তা নিয়ে ইব্রাহিমকে কিছু বলা নিরর্থক। তা ছাড়া কথা বাড়ানোর ইচ্ছেও তানাবাইয়ের এখন ছিল না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এদের বিদেয় করে দিয়ে দৌড়বাজ ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়, যাতে আগে আগে ফিরে আসা যায়। এদের আগমনের হেতুটা কী? জিজ্ঞেস করতেও বাধ-বাধ ঠেকে।

'তোমাকে ত ঠিক চিনতে পারছি না, ভাই,' ইব্রাহিমের সঙ্গী সংযতবাক যুবকটির দিকে চেয়ে তানাবাই বলল। 'তুমি কি মরহুম আবালাকের ছেলে?'

'হ্যাঁ, আমি তার ছেলে।'

'ওঃ, সময় কেমন চলে যায়! ঘোড়ার পাল দেখতে এসেছ? এ ব্যাপারে কৌতূহল আছে বুঝি?'

'না মানে, আমরা...'

'ও আমার সঙ্গে এসেছে,' ইব্রাহিম ওকে বাধা দিয়ে বলল। 'আমরা এখানে কাজে এসেছি, সে কথা পরে হবে। জায়দার ভাবী, আপনার এই দুধ কিন্তু অতি খাসা। গন্ধই বা কী কড়া! আরও এক পেয়ালা ঢালুন দেখি।'

আবার এটা-সেটা নিয়ে কথা চলল। তানাবাইয়ের খটকা

লাগল, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না ইব্রাহিম তার কাছে কেন এলো। শেষকালে ইব্রাহিম পকেট থেকে কী একটা কাগজ বার করল।

'আমরা আপনার কাছে এসেছি এই কাজে, এই যে এ কাগজটা নিয়ে। পড়ে দেখুন।'

তানাবাই মনে মনে পড়ল, টেনে টেনে উচ্চারণ করে পড়ল, পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। গোটা গোটা হরফে কাগজের ওপর লেখা ছিল:

'নির্দেশ।

পশুপালক বাকাসভের প্রতি।

দৌড়বাজ ঘোড়া গুলসারিকে আরোহী বহন করিবার জন্য অশ্বশালায় পাঠানো হউক।

যৌথখামারের সভাপতি (স্বাক্ষর অস্পষ্ট)। ৫ই মার্চ, ১৯৫০।'

ঘটনার এমন অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনে হতচকিত তানাবাই চুপচাপ কাগজটিকে চার ভাঁজ করে তার ফৌজী উর্দির বুক পকেটে রাখল, চোখ না তুলে অনেকক্ষণ বসে রইল। পাকস্থলীর নীচে অস্বস্তিকর রকম শিরশির করে উঠল। সত্যি বলতে গেলে কি এতে অপ্রত্যাশিত কিছুই ছিল না। সে যে ঘোড়া বড় করে তুলছে তার উদ্দেশ্যই এই যে যাতে পরে সেগুলোকে কাজের জন্য, চড়ার জন্য অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ক'বছরের মধ্যে সে কতই না অমন পাঠিয়েছে! কিন্তু গুলসারিকে দিয়ে দেওয়া! এটা তার সহ্যের অতীত। সে ব্যাকুলভাবে গুলসারিকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার উপায় ভাবতে লাগল। সব দিকে ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। নিজেকে সংযত রাখতে হবে। ইব্রাহিম ইতিমধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

'এই রকম একটা ছোট আর্জি নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি, তানাবাই,' সে সতর্কভাবে বিশদ করে বলল।

'ভালো কথা, ইব্রাহিম,' তানাবাই শান্তভাবে তার দিকে তাকাল। 'কাজটা ত আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। আর একটু ঘোড়ার দুধ খাওয়া যাক, কথাবার্তা বলা যাক।'

'তা ত বটেই, আপনি বুদ্ধিমান লোক।'

"বুদ্ধিমান! তোমার ঐ শেয়ালের মতো ধূর্ত কথায় ভুলছি আর কি!" তানাবাই মনে মনে বিরক্ত হল।

আবার তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা চলল। এখন আর তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

এইভাবে তানাবাইয়ের সংঘর্ষ বাধল যৌথখামারের নতুন সভাপতির সঙ্গে। সঠিক বলতে গেলে ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে নয়, তার অস্পষ্ট স্বাক্ষরের সঙ্গে। তাকে তানাবাই এখনও চোখে দেখে নি। সে যখন চোরোর বদলে এলো তখন তানাবাই পাহাড়ে শীত কাটাচ্ছিল। সকলে বলাবলি করছিল যে লোকটা কড়া, বড় বড় কর্তার পদে ছিল। প্রথম মিটিংয়েই এই বলে সতর্ক করে দিল যে কাজে অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, কাজের ন্যূনতম সময় পালিত না হলে আদালতে বিচারের ভয় দেখাল, বলল যে যৌথখামারগুলোর সমস্ত দুর্দশা এই কারণে যে সেগুলো ছোট ছোট, এখন সেগুলোকে বড় করা হবে, শিগ্‌গিরই পরিস্থিতির উন্নতি হবে — এই জন্যই তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং উন্নত কৃষিপ্রকৌশল ও প্রাণিবিদ্যার সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী খামারব্যবস্থা পরিচালনা করা তার মূল উদ্দেশ্য। আর তার জন্য সকলকে কৃষিপ্রকৌশল ও প্রাণিবিদ্যার চক্রগুলোতে অবশ্যই পাঠ নিতে হবে।

সত্যি সত্যিই পড়াশুনা চালু হয়ে গেল — সর্বত্র পোস্টার

দাঁড়ানো হল, বক্তৃতা চলল। আর বক্তৃতার সময় পশুপালকরা যদি ঘুমিয়ে পড়ত, সেটা তাদের ব্যাপার...

'এবার আমাদের যেতে হয়,' ইব্রাহিম উৎসুক দৃষ্টিতে তানাবাইয়ের দিকে তাকাল, সে তার বুট টেনে বাঁধতে লাগল, শেয়ালের চামড়ার টুপিটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করতে লাগল।

'ওহে ফার্মের কর্তা, সভাপতিকে গিয়ে বলো গুলসারিকে আমি দেব না। ও হল আমার পালের মর্দা ঘোড়া। মাদী ঘোড়াগুলোকে পাল দেয়।'

'আরে কী বলেন! আমরা ওর বদলে আপনাকে পাঁচটা মর্দা ঘোড়া দেব, একটা মাদী ঘোড়াও বাদ যাবে না। এটা কী একটা কথা হল?' ইব্রাহিম অবাক হয়ে গেল। সে খুশিতে ছিল, সবই ভালো ভাবে চলছিল, এমন সময় কি না... এঃ, যদি তানাবাই না হয়ে অন্য কেউ হত তা হলে কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হত। কিন্তু তানাবাই তানাবাই-ই, নিজের ভাইকেও সে ছেড়ে কথা বলে নি, সেটা দেখতে হবে ত। এখানে একটু নম্র হতে হয় বৈকি।

'তোমাদের পাঁচটা মর্দা ঘোড়ায় আমার কাজ নেই!' তানাবাই তার ঘর্মাক্ত কপাল মুছে ফেলল এবং একটু চুপ করে থেকে সরাসরি পথ ধরবে বলে ঠিক করল। 'তোমাদের সভাপতির চড়ার মতো আর কিছু নেই নাকি? আস্তাবলের ঘোড়াগুলো কি অন্য কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে? গুলসারিকেই কেন চাই?'

'তা কী করা যাবে? সভাপতি হলেন আমাদের ওপরওয়ালা, তাঁর একটা মান-সম্মান আছে ত! তিনি সদরে যান, তাঁর কাছে লোকজনও যাতায়াত করে। সভাপতি মশাই লোকের চোখের সামনে, জনসাধারণের সামনে, বলতে গেলে কি না...'

'বলতে গেলে কী? অন্য ঘোড়ায় চড়লে তাকে কি লোকে পাত্তা দেবে না? না কি সকলের চোখের সামনে থাকতে গেলে তাকে দৌড়বাজ ঘোড়ার চাপতেই হবে?'

'চাপতেই হোক আর না-ই হোক, কতকটা তেমনই হওয়া উচিত। আপনি ত যুদ্ধে সৈন্য ছিলেন। এমন কি হয়েছে যে আপনি মোটরকারে গেছেন আর আপনার জেনারেল গেছেন জীপে? নিশ্চয়ই নয়। জেনারেলকে জেনারেলের উপযুক্ত আর সৈন্যকে সৈন্যের উপযুক্ত সম্মান। ঠিক কি না?'

'এখানে ব্যাপারটা অন্য রকম,' তানাবাই থতমত খেয়ে আপত্তি তুলল। ঠিক কেন যে অন্য রকম তা সে বুঝিয়ে বলল না, বোঝাতে পারতও না। ঘোড়াটার চার দিকে ব্যূহ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে এটা অনুভব করে সে রেগে গিয়ে বলল: 'দেব না। যদি অনুপযুক্ত মনে কর তাহলে ঘোড়া চরানোর কাজ থেকে সরিয়ে দাও। কামারের কাজ করতে যাব। সেখানে আমার হাত থেকে তোমরা হাতুড়ি কেড়ে নিতে পারবে না।'

'এমন কথা কেন বলছেন? আমরা আপনাকে সম্মান করি, আপনার দাম দিই। আর আপনি কি না ছোটদের মতো করছেন! এটা কি আপনার মুখে শোভা পায়?' ইব্রাহিম জায়গায় বসে উসখুস করতে লাগল। সে যেন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। নিজে বড় মুখ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, নিজে পরামর্শ দিয়েছে, নিজেই দায়িত্বটা নিয়েছে, আর এই গোঁয়ার-গোবিন্দটা কি না সব মাটি করে দিচ্ছে!

ইব্রাহিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জায়দারের দিকে ফিরে বলল:

'আপনিই বিচার করে বলুন না জায়দার ভাবী, একটা ঘোড়াতে কী আসে যায়? হলই বা দৌড়বাজ ঘোড়া! পালে ঘোড়ার কি অভাব আছে? — যে কোন ঘোড়া বেছে নাও না। একটা লোক এসেছে, তাকে পাঠানো হয়েছে...'

'...। তুমি অমন উঠে-পড়ে লেগেছ কেন?' জায়দার জিজ্ঞেস ...ল।

ইব্রাহিম থতমত খেয়ে অসহায়ে ভঙ্গিতে দ্‌হাত ছড়াল। '...না লেগে উপায় কী? ডিসিপ্লিন বলে কথা। আমার ...পর ভার দেওয়া হয়েছে আর আমি হলাম একজন নগণ্য ...লোক। আমি ত আর নিজের জন্য করছি না। গাধার পিঠেও ...পতে আমার আপত্তি নেই। এই ত জিজ্ঞেস করে দেখ্‌ন না, ...লোকের ছেলেকে পাঠানো হয়েছে ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে ...য়ে যাওয়ার জন্য।'

ছেলেটা নীরবে মাথা নাড়ল।

'ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না,' ইব্রাহিম বলে চলল। সভাপতি মশাইকে আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে, উনি আমাদের ...তিথি, আর আমরা কিনা সমস্ত গাঁ মিলে তাঁকে একটা ভালো ...তের ঘোড়া দিতে পারি না? লোকে জানলে বলবে কী? ...রগিজদের মধ্যে এমন ব্যবহার কোথায় দেখা গেছে?'

'বেশ, ভালো কথা,' তানাবাই জবাবে বলল, 'গাঁয়ের লোকে ...পারটা জান্‌ক। আমি চোরোর কাছে যাব। সে-ই বিচার ...ক।'

'আপনি কি ভাবছেন চোরো না দিতে বলবেন? তাঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এতে কেবল তাঁকেই বেকায়দায় ...লবেন। স্যাবোটেজ গোছের। নতুন সভাপতিকে মান্য না ...রে প্‌রনো জনের কাছে নালিশ। তা ছাড়া চোরো অস্‌স্থ ...ষ। সভাপতি মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা খারাপ করে ...ওয়া কেন? চোরো হলেন পার্টি সংগঠক, তাঁকে সভাপতি মশাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে। কেন ঘাঁটানো?..'

চোরোকে নিয়ে কথা উঠতে তানাবাই চুপ করে গেল। ...লেই চুপ করে গেল।

জায়দার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'দিয়ে দাও,' সে স্বামীকে বলল, 'এদের ধরে রেখ না।'

'এই ত বুদ্ধিমানের মতো কথা! অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। ধন্যবাদ, জায়দার ভাবী।'

ইব্রাহিম অমনি-অমনি ধন্যবাদ বর্ষণ করে নি। এ ঘটনার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই সে ফার্মের প্রধান থেকে পশু প্রজনন সংক্রান্ত সহসভাপতি হয়ে দাঁড়াল।

তানাবাই উদাস দৃষ্টি মেলে জিনের ওপর বসে ছিল, সে চোখ না মেলেই সমস্ত কিছু দেখছিল। দেখল কী করে গুলসারিকে ধরা হল এবং কীভাবে তার গলায় নতুন ফাঁস পরানো হল — তানাবাই নিজেরটা কিছুতেই দেবে না। সে দেখল গুলসারি কিছুতেই পাল ছেড়ে যেতে চাইছে না, আবালাকের ছেলের হাতে ধরা লাগামে টান দিচ্ছে, দেখল কেমন করে ঘোড়ায় চেপে একবার এদিক থেকে অন্য বারে ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে ইব্রাহিম কাঁধ সমান উঁচু চাবুক তুলে তাকে সপাং সপাং মেরে চলেছে। দেখতে পেল তার সাধের দৌড়বাজ ঘোড়াটির চোখজোড়া — সে চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, কেননা সে বুঝতে পারছে না কোথায় এবং কেন এই অচেনা লোকগুলো তাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাদী ঘোড়া ও বাচ্চা ঘোড়াদের কাছ থেকে, তার মনিবের কাছ থেকে। তানাবাই দেখতে পেল ঘোড়াটা যখন চিঁহি হি করছে তখন তার হা করা মুখ থেকে কী করে ফেনা বেরিয়ে আসছে, দেখতে পেল তার কেশর, ঘাড়, জিনের পেছনে তার শরীরের অংশ, ঘাড়ে ও দেহের দু'পাশে কশাঘাতের চিহ্ন, দেখতে পেল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি সামনের ডান পায়ে কব্জির কিছুটা ওপরে

বাদামী রঙের ছোট্ট টিবি, দেখতে পেল তার চলন, খুরের ঢঙ, তার হালকা সোনালি পশমের শেষ কেশাগ্র পর্যন্ত সব কিছুই দেখতে পেল — দেখতে পেল সবই এবং ঠোঁট কামড়ে নীরবে কষ্ট সহ্য করল। যখন সে মাথা তুলল ততক্ষণে যারা গুলসারিকে নিতে এসেছিল তারা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তানাবাই চিৎকার করে উঠে তাদের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

'দাঁড়াও, এমন কাজ করো না!' জায়দার তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।

ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল — ঐ রাতগুলোর জন্য তার বৌ দৌড়বাজ ঘোড়াটার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। সে চাবুক হাঁকিয়ে ঝটিতি ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল, পিছু হটল। তাঁবুর কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টানল, লাফিয়ে নামল এবং বিকৃত ও ফ্যাকাসে মুখে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে স্ত্রীর দিকে ছুটে গেল।

'কেন? কেন তুই বললি দিয়ে দাও?' তীব্র দৃষ্টি হেনে সে ফিসফিস করে বলল।

'গোলমাল করো না। হাত নামাও,' সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে শান্তভাবে তানাবাইকে থামিয়ে দিল। 'আমি যা বলি, শোন। গুলসারি কি তোমার নিজের ঘোড়া? তোমার নিজস্ব? তোমার নিজের কী আছে? আমাদের যা কিছু আছে সবই যৌথখামারের। এই নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। গুলসারিও যৌথখামারের। সভাপতি মশাই হলেন যৌথখামারের কর্তা — তিনি যা বলবেন তা-ই হবে। আর ঐ ব্যাপারে খামোকাই ভাবছ। চাইলে এক্ষুনি চলে যেতে পার। চলে যাও। ও আমার চেয়ে ভালো, আমার চেয়ে সুন্দরী, বয়সে কম। ভালো মেয়ে। আমি বিধবাই হয়ে পড়তাম, কিন্তু তুমি ফিরে এলে। তোমার জন্য

কতই না অপেক্ষা করেছি! তা সেটা না হয় ধর্তব্যের মধ্যে না-ই হল। তোমার তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় যাবে? পরে তাদের কী বলবে? তারা কী বলবে? আমিই বা তাদের কী বলব? নিজেই ঠিক কর...'

তানাবাই ক্ষেপে চলে গেল। সে একেবারে সন্ধে অবধি ঘোড়ার পালের সঙ্গে কাটাল, কিছুতেই সুস্থির হতে পারল না। ঘোড়ার পাল অসহায় হয়ে পড়ল। তার মনটাও কেমন অসহায়-অসহায় ঠেকল। গুলসারি নিজের সঙ্গে তানাবাইয়ের মনটিকেও নিয়ে চলে গেছে। সব কিছুই নিয়ে চলে গেছে। কিছুই তেমনটি নেই। সূর্য তেমন নেই, আকাশও তেমন নেই, সে নিজেও আর তেমন নেই।

যখন ফিরে এলো তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মুখ কালো করে চুপচাপ তাঁবুতে ঢুকল। মেয়েরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। বৌ তার হাতে জল ঢেলে দিল। খাবার দিল।

'খেতে ইচ্ছে করছে না,' তানাবাই বলল। তারপর বলল, 'তেমির-কোমুজ* নিয়ে বাজাও "কাঁদ মা-উট, কাঁদ"।'

জায়দার যন্ত্রটা নিয়ে ঠোঁটের কাছে ধরল, সূক্ষ্ম ইস্পাতের তার আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল, তাকে ফুঁ দিল, তার পর নিশ্বাস টেনে নিল, প্রাচীন যাযাবর সঙ্গীতে চারদিক পরিপূর্ণ হল। গানটি ছিল এক মা-উটকে নিয়ে — যে তার সাদা ছানাটিকে হারিয়ে ফেলেছে। দিনের পর দিন মা মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়ায়। সে খোঁজে, ডাকে তার সন্তানকে। বিলাপ করে এই ভেবে যে বাছাকে আর সন্ধে বেলা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না গিরিখাতের ওপর দিয়ে, সকাল বেলা নিয়ে যাবে না

---

* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। — সম্পাঃ

পাথরের ওপর দিয়ে, আর কখনও তারা একসঙ্গে ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে না, সঞ্চরমান বালুকারাশির ওপর দিয়ে হাঁটবে না, বসন্তকালে প্রান্তরে ইতস্তত বিচরণ করবে না, কাকে সে আর সাদা দুধ খাওয়াবে না। কাজলকালো চোখ, আমার বাছা তুই কোথায়? সাড়া দে! আমার বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে দুধ উপছে পড়ছে, পা বয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় তুই? সাড়া দে! দুধ উপছে পড়ছে বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে। উপছে পড়ছে সাদা দুধ...

জায়দার চমৎকার বাজাল। এক কালে ওই বাজনার জন্যই তানাবাই জায়দার নামে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল।

তানাবাই মাথা নীচু করে শুনছিল এবং এবারেও না তাকিয়েই সমস্ত দেখছিল। আজ শীতে ও গ্রীষ্মে এতকাল পার করে জায়দারের হাতদুটো রুক্ষ হয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে, ঘাড়ে, মুখের কাছে, দু'চোখের ধারে পড়েছে কুঞ্চনরেখা। ঐ রেখাগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বিগত যৌবন — একটি শ্যামলা মেয়ে, তার দু'কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে বেণী এবং সে নিজে — তখন তরতাজা তরুণ, আর তাদের অতীত ঘনিষ্ঠতা। তানাবাই বুঝতে পারল যে জায়দার এখন তাকে লক্ষ্য করছে না। সে নিজের সঙ্গীতে, নিজের ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন। সেই মুহূর্তেই তানাবাই দেখতে পেল জায়দারের ভেতরে তার দুঃখ-দুর্দশার অর্ধাংশ। জায়দার সব সময় তা নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াত।

...দিনের পর দিন মা-উট ছুটে বেড়ায়, খোঁজে, ডাকে তার সন্তানকে। কাজলকালো চোখ, আমার বাছা তুই কোথায়? বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে উপছে পড়ছে দুধ, ভেসে যাচ্ছে পা বয়ে। কোথায় তুই? সাড়া দে! দুধ উপছে পড়ছে বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে। উপছে পড়ছে সাদা দুধ...

মেয়েরা জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে ছিল। তাঁবুর বাইরে পড়ে আছে স্তেপভূমি — বিশাল, রাতের অন্ধকারে দৃষ্টির অগোচর।

সেই মুহূর্তে আস্তাবলে গুলসারি বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সহীসদের ঘুমোতে দিল না। এই প্রথম সে বাঁধা পড়েছে আস্তাবলে — ঘোড়াদের বন্দীশালায়।

৮

একদিন সকালে তানাবাই যখন ঘোড়ার পালে নিজের দৌড়বাজ ঘোড়াটিকে দেখতে পেল তখন আর তার আনন্দের সীমা রইল না। তার পিঠে জিন বাঁধা, একপাশে ঝুলছে লাগামের ছেঁড়া দড়ি।

'গুলসারি, গুলসারি, কেমন আছিস?' তানাবাই চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো এবং সামনে থেকে দেখতে পেল তার পিঠে কোথাকার এক বিশাল জিন আর সেখান থেকে ঝুলছে ভারী রেকাব। যেটা তার বিশেষ করে খারাপ লাগল তা হল জিনের ওপরকার ফুলোফুলো মখমলে গদিটা — দেখে যেন মনে হয় তাতে পুরুষ মানুষ চাপে নি, বুঝি চেপেছিল ভারী পাছাওয়ালা কোন মাগী।

'থু!' তানাবাই বিরক্তিভরে থুতু ফেলল। তার ইচ্ছে করছিল ঘোড়াটাকে ধরে তার গা থেকে এই বিদঘুটে সাজ খুলে ফেলে, কিন্তু গুলসারি ধরা দিল না। এখন তানাবাইয়ের দিকে মন দেওয়ার অবসর তার নেই। সে মাদী ঘোড়াগুলোকে সোহাগ জানাচ্ছে। তাদের জন্য ওর মন এমনই বিগড়ে ছিল যে নিজের প্রাক্তন মনিবকে সে লক্ষ্য করল না।

''তার মানে, পালিয়ে এসেছিস আর কি, লাগাম ছিঁড়েছিস।

শাবাস! তা একটু চরে বেড়া, চরে বেড়া, আমি বরং চুপ করেই থাকব." তানাবাই ভাবল এবং ঠিক করল ঘোড়ার পালকে খানিক ছুটোছুটি করতে দেওয়া উচিত। গুলসারির পিছু পাকড়াও করার জন্য লোকজন যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণে গুলসারি নিজেকে ভালো করে উপভোগ করুক।

'হেট্-হেট্-হেট্!' তানাবাই হাঁক দিল, সে জিনের ওপর আলগোছে উঠে দাঁড়াল এবং চাবুক আন্দোলন করে ঘোড়ার পালকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।

মা-ঘোড়ার দল বাচ্চাদের ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলল, সমবয়সী মাদী ঘোড়াগুলো লাফাতে লাফাতে ছুটে গেল। বাতাসে তাদের কেশর দুলে উঠল। সূর্যের আলোয় শ্যামল ধরণী হাসতে লাগল। গুলসারি কেঁপে উঠল, নিজেকে টান টান করে নিল, গটমট করে এগিয়ে চলল। সে হুড়মুড় করে ঘোড়ার পালের প্রথম সারিতে ঢুকে পড়ল, পালের নতুন মর্দা ঘোড়াটিকে ছাড়িয়ে গেল, তাকে পিছে হটিয়ে দিল, আর নিজে পালের আগে আগে শোভাবর্ধন করতে করতে নাক দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলল, নাচতে লাগল এবং কখনও এদিক থেকে কখনও বা ওদিক থেকে ছুট দিতে গেল। ঘোড়ার পালের গন্ধ মা-ঘোড়ার দুধের গন্ধ, বাচ্চা ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, সকাল হাওয়ার ঘ্রাণ তার মাথা ঘুরিয়ে দিল। তার পিঠের ওপর যে একটা বিদঘুটে মখমলী গদি আঁটা জিন চাপানো আছে, ভারী রেকাবদুটো যে দু'পাশে খোঁচা মারছে তাতে তার ভ্রূক্ষেপই নেই। সে ভুলে গেল কীভাবে গতকাল সে শহরে ঘোড়ার একটা বড় দলের পাশে খুঁটি বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের লাগাম চিবুচ্ছিল আর ট্রাকের ঘর্ঘর শব্দে থেকে চমকে উঠছিল। ভুলে গেল পরে কীভাবে একটা পূতিগন্ধময় সরাইয়ের ধারে ডোবার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, কী

ভাবে নতুন মনিব তার সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো আর তাদের সকলের গা থেকেই ভেসে আসছিল দুর্গন্ধ। নতুন মনিবটা তার পিঠে চেপে বসতে বসতে কী রকমই না ঢেকুর তুলছিল আর ফোঁস ফোঁস করছিল। গুলসারি ভুলে গেল কীভাবে রাস্তায় ওরা নোংরার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেতাই রকম ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল, কীভাবে ও নতুন মনিবকে নিয়ে প্রাণপণে ছুট দিয়েছিল, কেমন করে সেই লোকটা বস্তার মতো ধুপ্‌ধাপ জিনের ওপর আছাড় খাচ্ছিল, আর তারপরই গুলসারির মুখের লাগাম টানতে টানতে তার মাথায় চাবুকের সপাং সপাং ঘা মারতে লাগল।

গুলসারি সব ভুলে গেল, সব। ঘোড়ার পালের গন্ধ — মা-ঘোড়ার দুধের গন্ধ, বাচ্চা ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, মাতাল হাওয়ার ঘ্রাণ তার মাথা ঘুরিয়ে দিল... গুলসারি ছুটছিল ত ছুটছিলই, সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নি যে লোকজন ইতিমধ্যে তার পিছু ধাওয়া করেছে।

তানাবাই ঘোড়ার পালকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছে, এমন সময় গাঁ থেকে দু'জন সহিস এসে হাজির। আবার গুলসারিকে ঘোড়ার পাল থেকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হল।

দেখতে দেখতে আবারও গুলসারির আবির্ভাব হল। এবারে না আছে জিন, না আছে লাগাম। কী ভাবে যেন সে তার গলা থেকে লাগামের ফাঁসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাতের বেলা আস্তাবল থেকে পালিয়েছে। গোড়ায় তানাবাইয়ের হাসি পেল, তারপর চুপ করে গিয়ে কী ভেবে ঘোড়ার ঘাড়ে ফাঁস ছুঁড়ে দিল। সে নিজে তাকে ধরল, নিজে তার মুখে লাগাম পরাল এবং নিজেই তাকে গাঁয়ে নিয়ে চলল, পাশের চারণভূমির এক অল্পবয়সী পশুপালককে অনুরোধ

দেল গুলসারিকে পেছন থেকে তাড়া দিতে। মাঝপথে দেখা হয়ে গেল সহিসদের সঙ্গে — তারা পলাতক ঘোড়াটির খোঁজেই যাচ্ছিল। গুলসারিকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তানাবাই অনুযোগ করে একথাও বলল:

'তোমরা কি সব ঠুঁটো এসে জুটেছ নাকি? সভাপতি চোরাইয়ের ঘোড়ার দিকে নজর রাখতে পার না? ওকে আরও শক্ত করে বাঁধ।'

আর গুলসারি যখন তৃতীয়বার ছুটে এলো তখন তানাবাই তো একেবারে ক্ষেপে গেল:

'তুই কী রে, বুদ্ধু! এখানে আসিস কী করতে? বোকা আর কাকে বলে!' গালাগাল দিতে দিতে সে ফাঁস হাতে গুলসারির পিছু ধাওয়া করল। আবার তাকে আস্তাবলে টেনে নিয়ে গেল এবং এবারেও সহিসদের গালাগাল দিল।

গুলসারি কিন্তু চালাক হওয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না — সুযোগ পেলেই সে পালিয়ে আসত। সহিসরা বিরক্ত, তানাবাইও বিরক্ত।

...সে দিন তানাবাই দেরিতে ঘুমিয়েছে -- চারণভূমি থেকে ফিরেছে দেরিতে। কী জানি কী হয় এই ভেবে ঘোড়ার পালকে তাড়িয়ে তাঁবুর কাছাকাছি জড় করে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল — তবে অস্থিরতা ও অস্বস্তি তার মধ্যে ছিল। সারা দিনে যন্ত্রণার অবশেষ হয়েছে। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল — বুঝি সে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে, কিংবা কোন এক কসাইখানায়। চার দিকে শুধু আর রক্ত, দু'হাতও রক্তে চটচট করছে। স্বপ্নের মধ্যে তার নিজেরই মনে হচ্ছে স্বপ্নে রক্ত দেখাটা ভালো লক্ষণ নয়। ইচ্ছে হয় কোথাও হাত ধুয়ে ফেলে। অথচ কারা যেন তাকে ধাক্কা মারছে, তার দিকে তাকিয়ে হো-হো হাসছে, হাসতে ফেটে পড়ছে: "তানাবাই রক্তে হাত ধুচ্ছে, রক্তে। এখানে জল

নেই, তানাবাই, এখানে সর্বত্র রক্ত! হা-হা, হো-হো, হি-হি!..''

'তানাবাই, তানাবাই!' কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল তার বৌ, 'ওঠ।'

'কী হয়েছে?'

'শুনেছ, পালে কী যেন হচ্ছে। অল্পবয়সী মর্দা ঘোড়াগুলো মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে। গুলসারি বোধহয় আবার পালিয়ে এসেছে।'

'জাহান্নামে যাক! একটুও সোয়াস্তি নেই!' তানাবাই চট্‌পট জামাকাপড় পরে নিয়ে ফাঁস জড়ানো কাঠিটা তুলে নিল এবং ছুটে গেল কোটরের দিকে, যেখান থেকে আসছিল কেমন একটা দুড়দাড় আওয়াজ। ততক্ষণে ফর্সা হয়ে এসেছে।

ছুটে এসে দেখতে পেল গুলসারিকে। কিন্তু এ কী? গুলসারির দুটো পা লোহার শেকল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা — তাই নিয়ে সে লাফাচ্ছে। তার পায়ের বেড়ি ঝন ঝন করে বাজছে, সে পাক খাচ্ছে, পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, গোঙাচ্ছে, চিৎকার করছে। আর হতচ্ছাড়াটা — পালের গোদা নতুন মর্দা ঘোড়াটা তাকে শুধু শুধু লাথি মারছে, কামড়াচ্ছে।

'নচ্ছার কোথাকার!' তানাবাই ঘূর্ণির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, হতচ্ছাড়াটাকে এমন মার মারল যে বেতের লাঠিটাই ভেঙ্গে গেল। তাকে তাড়িয়ে দিল। তানাবাইয়ের নিজের চোখদুটো সজল হয়ে উঠল। 'তোর এ কী হাল করে দিয়েছে, অ্যাঁ? তোকে বেড়ি দেওয়ার দুর্বুদ্ধি কার মাথায় এসেছে! এখানে এসেছিস কী করতে, বোকা?..'

দেখ দেখি, এতখানি পথ, নদী, খানা আর টিলা পার হয়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কিনা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এসেছে এখানে, শেষ পর্যন্ত পালের নাগাল ধরেছে! খুব সম্ভব সারা

রাত লাফিয়েছে, সারা রাত পথ চলেছে। একা শেকল বাজাতে বাজাতে চলেছে পলাতক আসামীর মতো।

'কী কান্ড, কী কান্ড!' তানাবাই মাথা নাড়ল। সে গুলসারির গায়ে হাত বুলাতে লাগল, মুখটা তার ঠোঁটজোড়ার কাছে এগিয়ে দিল! গুলসারিও ঠোঁট বাড়িয়ে তার মুখে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, আরামে চোখ বুজল।

'এখন আমাদের কী হবে অ্যাঁ? এটা তুই না করলেই পারিস, গুলসারি। এতে তোর ভালো হবে না। তুই বোকা, বোকা। কিছুই জানিস না...'

তানাবাই গুলসারিকে পরীক্ষা করে দেখল। মারামারিতে যে সব আঁচড় গায়ে লেগেছে সেগুলো সেরে যাবে। কিন্তু পাদুটো বেড়িতে গভীরভাবে ছড়ে গেছে। খুরের চারধার রক্তাক্ত। বেড়ির নীচের জড়ানো কম্বলটা পচা, পোকায় খেয়ে ফেলেছে। ঘোড়াটা যখন জলের ওপর দিয়ে দৌড়ঝাঁপ মারে তখন কম্বলের প্যাডটা আলগা হয়ে গিয়ে লোহা বেরিয়ে আসে। তাতেই তার পায়ে রক্ত ঝরছে। "ইব্রাহিম নিশ্চয়ই বুড়োদের কারও কাছ থেকে বেড়িটা জোগাড় করেছে। এটা তারই কাজ," তানাবাই রেগে গিয়ে ভাবল। এ ছাড়া আর কার কাজ? এরকম শেকল বাঁধা বেড়ি — সেকেলে জিনিস। প্রতিটি বেড়ির আছে বিশেষ ধরনের তালা, চাবি ছাড়া খোলা যায় না। আগেকার দিনে ভালো ভালো ঘোড়ার পায়ে বেড়ি লাগান হত যাতে ঘোড়া-চোরেরা চারণভূমি থেকে তাদের চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। সাধারণ দড়ির বাঁধন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা যেত — কোন ঝামেলা নেই, কিন্তু বেড়ি দেওয়া থাকলে ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার আর উপায় নেই। তবে সেটা ছিল অনেককাল আগের ব্যাপার, এখন বেড়ি বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন বুড়োর কাছে হয়ত বা অতীতের স্মৃতি

হিশেবে তার একটা রয়ে গেছে। বোঝা ব্যাপার, সম্ভবত কেউ বলে দিয়েছে। ঘোড়াটাকে বেড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে যাতে সে গাঁয়ের চারণভূমি থেকে দূরে চলে যেতে না পারে। ও কিন্তু তা সত্ত্বেও পালিয়ে গেছে...

পরিবারের সকলে মিলে গুলসারির পা থেকে বেড়ি খুলল। জায়দার মুখের লাগাম ধরে ঘোড়াটার চোখ আড়াল করল, মেয়েরা ধারে কাছে খেলতে লাগল, আর তানাবাই তার যন্ত্রপাতির গোটা বাক্স বার করে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তালার উপযুক্ত চাবি খুঁজতে লাগল। কামার হিশেবে তার যে দক্ষতা ছিল তা কাজে লেগে গেল, অনেকক্ষণ পরিশ্রম করল, কাজে মেতে রইল, তার হাত ক্ষতবিক্ষত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোলার উপায় বার করল।

বেড়িটাকে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল, চোখের সামনে থেকে আপদটা বিদেয় হল। গুলসারির পায়ের রক্তাক্ত জায়গায় মালিশ লাগাল, জায়দার তাকে ঘোড়া বাঁধার খুঁটির কাছে নিয়ে গেল। বড় মেয়েটা তার ছোট বোনটিকে পিঠের ওপর চড়াল, তারাও বাড়ির দিকে রওনা দিল।

তানাবাই তখনও বসে বসে হাঁপাচ্ছিল — সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর যন্ত্রপাতি গোছগাছ করে নিয়ে চলল, মাটি থেকে বেড়িটাকে তুলে নিল। ফিরতে হয়, তা না হলে আবার জবাবদিহি করতে হবে। মরচে ধরা বেড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কারিগরের নৈপুণ্যে সে অবাক হয়ে গেল। অপূর্ব সৃষ্টি, বড় রকমের কল্পনার পরিচয় এতে আছে। এ হল সাবেকী কিরগিজ কামারদের কাজ। হ্যাঁ, এই শিল্পটা এখন লোপ পেয়েছে, চিরকালের জন্য বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছে। এখন বেড়ির দরকার নেই। তবে আক্ষেপের বিষয়

এই যে অন্য আরও জিনিস লোপ পেয়েছে। রুপো, তামা, কাঠ আর চামড়ার কী সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ও তৈজসপত্রই না তারা তৈরী করতে জানত। জিনিসগুলোও তেমন একটা দামী ছিল না, অথচ কী সুন্দরই না ছিল! প্রত্যেকটি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এখন সে রকম নেই। আজকালকার দিনে মগ, কাপ, চামচ, দুল এবং গামলা — সব কিছুই গড়া হয় অ্যালুমিনিয়াম থেকে — যেখানেই যাও না কেন সবই এক। এমন কি একঘেয়ে। জিন তৈরীর কারিগররাও তাদের দিন গুনছে। কী রকম সব জিনই না তারা তৈরী করতে জানত! প্রতিটি জিনের ছিল নিজস্ব ইতিহাস: কে, কবে, কার জন্য করেছে এবং নিজের শ্রমের জন্য কী পুরস্কার পেয়েছে। শিগ্গিরই বোধহয় সকলে হাওয়াগাড়িতে যাতায়াত করবে, যেমন হচ্ছে ও দেশে, ইউরোপে। সকলে একই রকম গাড়িতে, তফাৎ কেবল নম্বরের। এদিকে বাপ-ঠাকুর্দার বৃত্তি ভুলে যাচ্ছি। সাবেকী হস্তশিল্প পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিয়েছি, অথচ হাতেই ত মানুষের মন আর চোখ...

একেক সময় তানাবাইয়ের হঠাৎ যেন কেমন মনে হত। লোকশিল্প নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে নেমে তার রাগ হত কিন্তু ওটা যে লোপ পেতে বসেছে তার জন্য কাকে দোষ দিতে হয় বুঝতে পারত না। কম বয়সে সে নিজেও ছিল সেকেলে জিনিসের কবর খুঁড়িয়েদের একজন। একবার যাযাবরদের তাঁবু উচ্ছেদের ব্যাপারে কম্সমোলের সভায় বক্তৃতাও দেয়। কোথা থেকে যেন শুনে আসে তাঁবু উঠিয়ে দেওয়া উচিত, তাঁবু হল প্রাকবিপ্লবী আমলের বাসগৃহ। 'তাঁবু নিপাত যাক! সেকেলে ধরনে বাস করা আর চলবে না!'

তাঁবুর আধিপত্য গেল। লোকে ঘরবাড়ি বানাতে লাগল আর তাঁবু ভেঙ্গেচুরে ফেলা হল। তাঁবুর ঢাকনাগুলো কেটে

নানা কাজে লাগান হল, কাঠামোর কাঠ বাড়ির চারধারের বেড়া ও পশুদের চরার মাঠের বেড়া এমন কি জ্বালানির কাজে গেল...

তারপর দেখা গেল যে সব পশুকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় সেগুলোকে পালন করতে গেলে অস্থায়ী তাঁবু ছাড়া অসম্ভব। এখন তানাবাই নিজেই বারবার অবাক হয়ে যায় এই ভেবে, কেমন করে সে ওরকম কথা বলতে পারল, নিন্দা করতে পারল তাঁবুর, যার চেয়ে ভালো আর কিছু যাযাবরদের জন্য আজও ভেবে বার করা যায় নি। কী করে তার নজর এড়িয়ে গেল যে তাঁবু হল তার জাতির এমন এক অপূর্ব উদ্ভাবনা যেখানে প্রতিটি খুঁটিনাটি বহু যুগের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত?

এখন সে বাস করে ঝুলকালিমাখা ফুটো তাঁবুতে, এই তাঁবু সে পেয়েছে বুড়ো তোরগোইয়ের কাছ থেকে। তাঁবুটার বয়স অনেক আর সেটা যে এখনও খাড়া আছে তা একমাত্র জায়দারের অসীম ধৈর্যের দরুন। সারা দিন ধরে সে তাঁবু মেরামত করে, তালি লাগায়, তাকে বাসযোগ্য করে তোলে, কিন্তু দু'-এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাউনির শতচ্ছিন্ন কম্বলের টুকরো আবার খসে পড়ে, আবার নতুন করে ফুটো দেখা যায়, বাতাস ঢুকতে থাকে, তুষার ঝরে পড়ে, বৃষ্টির ধারা চোঁয়ায়। আবার জায়দার মেরামতের কাজে হাত দেয়, এর আর শেষ নেই।

'আর কত দিন এই যন্ত্রণা ভোগ করব?' স্ত্রী অভিযোগ করে বলত। 'দেখ, এতে কি আর কম্বলের কিছু আছে? এ যে ধুলো! বালির মতো ঝুরঝুর করছে। কাঠামোটার দশাই বা কী হয়েছে! কী আর বলব! তুমি বরং চেষ্টা কর না গো যাতে ওরা অন্তত ছাউনির জন্য আমাদের নতুন কম্বল দেয়।

তুমি কি বাড়ির কর্তা নও? আমাদের ত মানুষের মতো করে বাঁচতে হবে...'

তানাবাই প্রথম প্রথম সান্ত্বনা দিত, প্রতিশ্রুতি দিত। যা হোক, সে যখন গাঁয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল যে তার নতুন তাঁবু গড়া দরকার তখন দেখা গেল পুরনো কারিগররা অনেক আগেই লোপ পেয়ে গেছে আর ছেলে-ছোকরারা বুঝেই উঠতে পারে না কী করে তা বানাতে হয়। তাঁবুর ছাউনির জন্য কম্বলও যৌথখামারে ছিল না।

'ঠিক আছে, আমাদের পশম দাও, আমরা নিজেরাই কম্বল বানিয়ে নেব,' তানাবাই বলল।

'পশম কোত্থেকে আসবে!' তাকে বলা হল। 'তুমি কি চাঁদ থেকে এলে না কি? সব পশম পরিকল্পনামতো বিক্রির জন্য চলে যায়, আমাদের এখানে এক গ্রাম পশমও ফেলে রাখার নিয়ম নেই...' সকলে বলল ও যেন তার বদলে ক্যানভাসের ছাউনি নেয়।

জায়দার সে প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিল। সে বলল:

'ছেঁড়া তাঁবুতে থাকব তাও ভালো, কিন্তু ছাউনিতে নয়।'

পশুপালকদের অনেকে ইতিমধ্যে বাধ্য হয়ে ছাউনিতে উঠে এসেছে। কিন্তু সেটা কি একটা বাসের জায়গা হল? দাঁড়ান যায় না, বসা যায় না, আগুন জ্বালান যায় না। গরমকালে অসহ্য গরম, শীতকালে কুকুরও ঠাণ্ডায় জমে যায়। জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রাখার, রান্নাঘরের জায়গা করার, একটু ভালো মতো গোছগাছ করার কোন উপায় নেই। আর অতিথি এলে কোথায় যে ঠাঁই দেব তা বুঝে ওঠা ভার।

'না না!' জায়দার রাজী হল না। 'যা-ই বল না কেন ছাউনিতে বাস করতে আমি যাচ্ছি না। ক্যানভাসের ছাউনি হল

সেই সব মানুষের জন্য যাদের পরিবার নেই, তাও আবার সাময়িক, কিন্তু আমাদের পরিবার আছে, বাচ্চা-কাচ্চা আছে। ওদের স্নান করাতে হয়, শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হয়, না যাব না।'

ঐ সময় একবার চোরোর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তানাবাই তাকে সব কথা বলল।

'এরকম হচ্ছে কেন সভাপতি মশাই?'

চোরো বিষণ্ণ হয়ে মাথা ঝাঁকাল:

'সময়মতো আমাদের এই নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। আমাদের ওপরওয়ালাদেরও বটে। এখন আর কী করা? — চিঠিপত্র লিখছি, জানি না কী জবাব আসবে। শুনছি, পশম হল দামী কাঁচামাল। পশমের ঘাটতি চলছে। পশম রপ্তানি হয়। নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করাটা নাকি ঠিক নয়।'

এরপর তানাবাই চুপ করে গেল। দেখা যাচ্ছে সে নিজেই অংশত দোষী। নিজের মূর্খতায় সে মনে মনে হাসল: "ঠিক নয়! হা-হা-হা! ঠিক নয়।"

"ঠিক নয়" — এই রূঢ় শব্দটি বহুকাল তার মাথা থেকে দূর হল না।

সুতরাং তারা থেকে গেল পুরনো, ফাটা, তালিমারা তাঁবুতে, যা সারাতে গেলে দরকার হত সাধারণ পশম। আর পশম ত বলতে গেলে টনে টনে ছাঁটা হয় যৌথখামারের ভেড়ার পাল থেকে...

তানাবাই বেড়িটা হাতে করে নিজের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁবুটাকে তার এত দুর্দশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল, সব কিছুর প্রতি — নিজের প্রতি এবং এই যে বেড়িটি গুলসারির পা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে তার প্রতি এমন রাগ ধরল যে দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল। হাত যখন তার নিশপিশ করছে

ঠিক এই সময় গ্নলসারির খোঁজে সহিসদের আবির্ভাব।

'ওটাকে নিয়ে যাও!' তানাবাই তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল। রাগে তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'আর এই বেড়িটা সভাপতি মশাইয়ের হাতে দিয়ে বলো ফের যদি দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে বেড়ি দিয়ে বাঁধার স্পর্ধা করে তা হলে আমি তাকে এই বেড়ি দিয়েই খ্নলি উড়িয়ে দেব। যা বললাম, বলো!..'

বলাটা তার ঠিক হয় নি। ওঃ, মোটেই ঠিক হয় নি! তার এই গরম মেজাজ ও সরল স্বভাবের দাম তাকে সব সময়ই দিতে হয়েছে...

৯

দিনটা ছিল উজ্জ্বল, রোদে ঝলমলে। রোদে বসন্তের চোখেম্নখে কুঞ্চনরেখা পড়েছে। নব পল্লব কুঁকড়ে আছে, মাঠ থেকে ভাপ উঠছে, পায়ে চলা পথে, একেবারে পায়ের নীচে ঘাস গজিয়ে উঠছে।

আস্তাবলের কাছে কতকগ্নলো ছেলে ডাংগ্নলি খেলছিল। একটা চটপটে ছেলে গ্নলিটাকে শ্নন্যে ছ্নঁড়ে দেয়, ডাণ্ডা দিয়ে তাকে সাপটে পথ বরাবর মারে। ডাণ্ডা দিয়ে মাটির ওপর মাপতে থাকে দ্নরত্ব — এক, দ্নই, তিন... সাত... দশ... পনেরো... ছিদ্রান্বেষী বিচারকেরা দল বেঁধে তার পাশে পাশে চলতে থাকে, লক্ষ্য করে ছেলেটা যেন কারচুপি না করে। বাইশ।

'আটাত্তর ছিল, এখন হল বাইশ,' ছেলেটা গ্ননল, যোগ দিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে বলল: 'একশ! একশ হয়েছে!'

'হ্নর-রে, একশ!' অন্যেরা ধ্নয়া তুলল।

তার মানে সে তার লক্ষ্য পেঁাছেছে। কমও নয়, বেশিও নয়। এখন যে হেরে গেছে তাকে দম বন্ধ করে 'চু-উ-উ' করতে হয়। বিজয়ী দাগের কাছে চলে যায়, সেখান থেকে আবার গুলি ছোঁড়ে, এমনভাবে ছোঁড়ে যাতে তা দূরে গিয়ে পড়ে ওটা যেখানে পড়ে সকলে সেখানে ছুটে যায়, সেখান থেকে আরও এক ঘা, তিনবার এই রকম চলে। যার হার হয়েছে তার তখন কাঁদ কাঁদ অবস্থা — এত দূরে পর্যন্ত তাকে 'চু-উ-উ' করে যেতে হবে! কিন্তু খেলার আইনে কোন দয়া-মায়া নেই। 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চু-উ-উ করে যা!' পরাজিত ছেলেটা ফুসফুসে বাতাস ভরে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ছড়া কাটতে থাকে:

আক্‌বাই, কোক্‌বাই,
মাঠে গিয়ে কাজ নেই।
বাছুর খেদাবি না,
খোঁজ তবে পাবি না।
ভেবে হবি দেওয়ানা — চু-উ-উ...

মাথা বনবন করছে, কিন্তু চু-উ-উ করে যেতে হয়। দাগ পর্যন্ত দম রাখতে পারল না। তখন ফিরে গিয়ে ফের শুরু কর। এবারেও পারে না। বিজয়ীর মহা ফুর্তি। দম যখন রাখতে পারলি না তখন আমাকে বয়ে নিয়ে চল! বিজয়ী পরাজিত ছেলেটার পিঠে চেপে বসে আর ছেলেটা গাধার মতো তাকে বয়ে নিয়ে যায়।

'হট্‌ হট্‌, জলদি চল!' সওয়ার পা দিয়ে দু'পাশে লাথি মারতে থাকে। 'দ্যাখ্‌ ভাই, এটা আমার গুলসারি। দ্যাখ, এটা কেমন টগবগিয়ে চলছে...'

গুলসারি তখন দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালের ওপারে, আস্তাবলের মধ্যে। সে অবসন্ন। তার পিঠে আজ জিনও চাপান হয় নি।

সকাল থেকে তার পেটে দানাপানি পড়ে নি। ওর কথা সকলে ভুলে গেছে। আস্তাবল অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে, গাড়ির ঘোড়া, সওয়ারের ঘোড়া — সব বাইরে, সে একা কেবল আস্তাবলে পড়ে আছে...

সহিসরা ঘোড়ার নাদ পরিষ্কার করছে। বাইরে ছেলেরা হৈচৈ করছে। এখন যদি যাওয়া যেত ঘোড়ার পালের মধ্যে, স্তেপে! সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে উন্মুক্ত প্রান্তর, ঘোড়ার পাল খোলা মাঠে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাইরঙা হাঁসের ঝাঁক তাদের মাথার ওপর উড়ছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, তাদের ডাকছে...

গুলসারি নড়ে উঠল, খুঁটির বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল। না, তাকে দুটো শেকলের টানা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। হয়ত তার দলের ওরা শুনতে পাবে? গুলসারি ছাদের নীচের ঘুলঘুলির দিকে মাথা উঁচু করল, মেঝের তক্তায় পা ঠুকে সে তারস্বরে টেনে টেনে চিঁহিহি করে উঠল: 'তোমরা কো-থা-য়-য়?..'

'থাম, শয়তান!' তার দিকে কোদাল নিয়ে তেড়ে এলো এক সহিস। দোরের ওধারে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল: 'বার করে আনব না কি?'

'বার করে আন!' উঠোন থেকে উত্তর এলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সহিস গুলসারিকে উঠোনে বার করে আনল। উঃ কী আলো! কী বাতাস! গুলসারির অনুভূতিপ্রবণ নাসারন্ধ্রগুলো বসন্তের মাতাল হাওয়া স্পর্শ করে, তাতে নিশ্বাস নিয়ে কাঁপতে লাগল। বাতাসে পাতার কটু ঘ্রাণ, মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। শিরায় শিরায় রক্ত খেলে যায়। এখন দৌড়ুলে হত। গুলসারি আলগোছে একটু লাফ দিল।

'থাম! থাম!' কয়েকটি কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ তাকে দাবিয়ে দিল।

আজ তার চারদিকে এত লোক ভিড় করে আছে কেন? তাদের আস্তিন গোটানো হাতগুলো পেশল, লোমশ। একজনের গায়ে ছাইরঙা জোব্বা, সে একটা সাদা কাপড়ের টুকরোর ওপর ধাতুর তৈরী চকচকে কী সব যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখছে। সূর্যের আলোয় সেগুলো ঝকঝক করছে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অন্যদের হাতে দড়িদড়া। আরে, নতুন মনিবও দেখছি এখানে! তার পরনে ঘোড়সওয়ারের আঁটো প্যাণ্ট, সে মোটা মোটা খাটো পা জোড়া ফাঁক করে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর সকলের মতো তারও ভুরু কুঁচকে আছে। কেবল আস্তিন গোটানো নেই। তার এক হাত কোমরে, অন্য হাতে সে জামার বোতাম খুঁটছে। গতকাল তার গা থেকে আবার ভেসে আসছিল সেই দুর্গন্ধ।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? আরম্ভ কর! আরম্ভ করা যাক, জোরোকুল আলদানোভিচ্, কী বলেন?' ইব্রাহিম সভাপতি মশাইয়ের উদ্দেশে বলল। সভাপতি নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আসুন তাহলে!' ইব্রাহিম ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সে তাড়াতাড়ি আস্তাবলের গেটের ওপর এক পেরেকে তার শেয়ালের চামড়ার টুপিটা টাঙাল। টুপি সেখান থেকে খসে ঘোড়ার নাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ইব্রাহিম ঘেন্নায় সেটা ঝেড়ে নিয়ে আবার টাঙাল। 'আপনি একটু সরে দাঁড়ালে পারতেন, জোরোকুল আলদানোভিচ্,' সে এই ফাঁকে বলল, 'কী হয় বলা যায় না, খুর দিয়ে চাঁট মারতে পারে। ঘোড়া ত আর যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না! তার কাছ থেকে সব সময়ই খারাপ কিছু আশঙ্কা করতে পারেন।'

ঘাড়ে চুলের দড়ি বাঁধা ফাঁস অনুভব করে গুলসারির চামড়া তির তির করে উঠল। দড়িটা খোঁচা খোঁচা। সরসরে ফাঁসটা দিয়ে তার বুক বাঁধা হল, ফাঁসের প্রান্তটা ওরা বাইরে, এক পাশে ঝুলিয়ে দিল। ওরা কী চায়? ফাঁসের প্রান্তটাই বা কেন পেছনের পায়ের গাঁটের দিকে টানছে, কেনই বা পাগুলো জড়িয়ে বাঁধছে? গুলসারি ঘাবড়ে যায়, নাক দিয়ে আওয়াজ করে, চোখ ঘোরাতে থাকে। এসবের অর্থ কী?

'জলদি!' ইব্রাহিম তাড়া দেয়, হঠাৎ বিকট স্বরে হাঁক দেয়: 'মাটিতে শুইয়ে দে!'

দু'জোড়া বলিষ্ঠ লোমশ হাত ফাঁসে ঝট করে টান মারল। গুলসারি কাটা গাছের মতো ধপ্ করে মাটিতে পড়ল। সূর্য ডিগবাজি খেয়ে পড়ল, আঘাতে মাটি কেঁপে উঠল। কী হল? কেন সে কাত হয়ে শুয়ে আছে? কেন লোকজনের মুখগুলো এমন অদ্ভুত লম্বাটে হয়ে গেল? কেন গাছগুলো আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে? মাটিতে এমন অস্বস্তিজনক ভাবে কেন সে পড়ে রয়েছে? না এটা চলতে পারে না।

গুলসারি মাথা নাড়ল, গোটা শরীর টান করল। ফাঁসের দড়ি জ্বলন্ত লোহার মতো কেটে বসে তার পাগুলোকে টেনে ধরল পেটের নীচে। গুলসারি ঝট্‌কা মারল, টান দিল, তার পেছনের একটা পা তখনও মুক্ত ছিল — মরিয়া হয়ে সে ঐ পায়ে লাথি ছুঁড়ল। দড়ি টান টান হয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম।

'ফেলে দে, চেপে ধর, ধরে রাখ!' ইব্রাহিম ছটফট করতে লাগল।

সকলে ঘোড়ার দিকে ছুটে গিয়ে হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধরল।

'মাথা, মাথাটাকে মাটিতে চেপে রাখ! বাঁধ! টান মার! ঠিক আছে। জলদি। আরও এক পাক দে। টান, আরও, আরও

একবার। এই ত ঠিক আছে। এখন এখানে বাঁধন লাগা, গিঁট দে!' ইব্রাহিম অনর্গল হাঁক ডাক করে চলল।

যতক্ষণ পর্যন্ত গুলসারির সবগুলো পা একটা শক্ত গিঁটে গুছিয়ে বাঁধা না হল ততক্ষণ পাগুলো ক্রমেই কঠিন ফাঁসে জড়িয়ে পড়তে লাগল। এই মরণ ফাঁসের আলিঙ্গন থেকে এখনও মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় গুলসারি কাতরে উঠল, ডাক দিল, যারা তার ঘাড়ে ও মাথার ওপর চেপে বসেছিল তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু তারা আবার তাকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল। গুলসারির ঘর্মাক্ত শরীরে খিঁচ ধরে গেল, পাগুলো নিথর হয়ে গেল। সে আত্মসমর্পণ করল।

'উঃ শেষকালে বাগে এলো! '

'পালোয়ান বটে!'

'এখন আর নড়াচড়া করার উপায় নেই, ট্র্যাক্টর হলেও নয়!'

এই সময় পড়ে থাকা গুলসারির দিকে ছুটে গেল নতুন মনিব নিজে, সে উটকো হয়ে তার শিয়রে বসল, লোকটার মুখ থেকে ভেসে আসছিল গতকালের পচাইয়ের গন্ধ, আন্তরিক ঘৃণায় আর বিজয়ের আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল — যেন তার সামনে পড়ে আছে ঘোড়া নয়, একটা মানুষ — তার মারাত্মক দুশমন।

রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে ঘর্মাক্ত কলেবরে তার কাছে এসে বসল ইব্রাহিম। এত পাশাপাশি বসে এর পর আরও যা কিছু ঘটতে চলেছে তার প্রতীক্ষায় তারা ধূমপান করতে লাগল।

এদিকে উঠোনের বাইরে ছেলের দল ডাংগুলি খেলছে:

আক্‌বাই, কোক্‌বাই,
মাঠে গিয়ে কাজ নেই।

বাছুর খেদাবি না,
খোঁজ তবে পাবি না।
ভেবে হবি দেওয়ানা — চু-উ-উ।

সূর্য আগের মতোই কিরণ দিচ্ছিল। গুলসারি শেষবারের মতো দেখতে পাচ্ছিল বিস্তৃত স্তেপভূমি, দেখতে পাচ্ছিল কীভাবে প্রান্তরের ওপর ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। তাদের মাথার ওপর উড়ছে ছাইরঙা হাঁসের দল, তারা পাখা ঝাপটাচ্ছে, কলরব করছে... গুলসারির মুখ মাছিতে ছেয়ে গেছে। তাড়ানোর উপায় নেই।

'শুরু করা যাক, জোরোকুল আলদানোভিচ্?' ইব্রাহিম ফের জিজ্ঞেস করল।

সভাপতি নীরবে মাথা নাড়ল। ইব্রাহিম উঠে দাঁড়াল।

সকলে আবার নড়েচড়ে উঠল, হাঁটু আর বুক দিয়ে বাঁধা ঘোড়াটাকে চেপে ধরল। তার মাথা আরও শক্ত করে মাটির সঙ্গে চেপে ধরল। সে তার দুই উরুর মাঝখানে কার যেন হাতের স্পর্শ অনুভব করল।

ছেলেরা চড়াইয়ের মতো বেড়ার ওপর উঠে বসে ছিল।

'দ্যাখ ভাই, দ্যাখ, কী হচ্ছে।'

'ঘোড়াটার পায়ের খুর সাফ করছে।'

'খুব জানিস! খুর না আরও কিছু! খুর মোটেই না।'

'অ্যাই, তোমাদের এখানে কী চাই? ভাগ এখান থেকে!' ইব্রাহিম তাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। 'যাও, খেল গে। এখানে হাঁ করে দেখার কিছু নেই।'

ছেলেরা বেড়া থেকে নেমে সরে পড়ল।

জায়গাটা শান্ত হয়ে গেল।

একটা ধাক্কায় এবং কী একটা ঠাণ্ডা জিনিসের স্পর্শে

গুলসারি একেবারে কুঁকড়ে গেল। এদিকে নতুন মনিব আলগোছে তার সামনে বসে বসে দেখছিল, কিসের যেন প্রতীক্ষা করছিল। হঠাৎ তীব্র একটা যন্ত্রণা চোখ ধাঁধিয়ে দিল। উঃ! উজ্জ্বল লাল অগ্নিশিখা দপ্ করে জ্বলে উঠল, তারপরই হঠাৎ হয়ে এলো অন্ধকার, কালো আর কালো...

যখন সব শেষ হল তখনও গুলসারি বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল। রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'ব্যস্, জোরোকুল আলদানোভিচ্, সব ঠিক আছে,' ইব্রাহিম হাতে হাত ঘষে বলল। 'এখন আর ও কোথাও ছুটে যাবে না। ওর দৌড়ঝাঁপ শেষ হয়েছে। আর তানাবাইয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। জাহান্নামে যাক। লোকটা বরাবরই ওরকম। নিজের ভাইয়ের দিকে পর্যন্ত ফিরে তাকায় নি — জোতদারী ঘুচিয়ে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছে। ও কারও মঙ্গল চিন্তা করে বলে আপনার মনে হয়?..'

পরিতৃপ্ত ইব্রাহিম পেরেক থেকে শেয়ালের চামড়ার টুপি তুলে ঝেড়ে পাট করে নিল এবং ঘর্মাক্ত মাথার ওপর আঁটল।

ছেলেরা তখনও ডাংগুলি খেলে চলছে:

আক্‌বাই, কোক্‌বাই,
মাঠে গিয়ে কাজ নেই।
বাছুর খেদাবি না,
খোঁজ তবে পাবি না।
ভেবে হবি দেওয়ানা — চু-উ-উ!

'উঁহু, দৌড়ুতে পারিস নি, পিঠ পেতে দে। হট্, হট্ গুলসারি, আগে বাড়! হুর্-রে, এটা আমার গুলসারি!'

দিনটা ছিল উজ্জ্বল, রোদে ঝলমলে...

রাত। গভীর রাত। বুড়ো মানুষ আর বুড়ো ঘোড়া। গিরিখাতের কিনারায় অগ্নিকুন্ড জ্বলছে। বাতাসে আগুনের শিখা পড়ছে আর উঠছে...

কঠিন ঠান্ডা মাটি গুলসারির পাঁজর জমাট করে দিচ্ছে। মাথার পেছন দিকটা লোহার মতো ভারী হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে, দু'পা বাঁধা বেড়ি নিয়ে যখন সে লাফালাফি করে তখনকার মতোই এখনও ওপরে নীচে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথাটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখনকার মতোই গুলস্যারি আর ছুটোছুটি করতে পারে না, বেড়ির শেকল ছিঁড়তে পারে না। তার ইচ্ছে করছে স্বচ্ছন্দে পাগুলো নাড়ায় যাতে দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খুর জ্বলতে থাকে, ইচ্ছে করছে বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য মাটির ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে যেতে, ইচ্ছে করছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চারণভূমিতে ছুটে গিয়ে গলা ছেড়ে হ্রেষাধ্বনি করে, ঘোড়ার পালকে ডাকে যেন মাদী ঘোড়া ও বাচ্চা ঘোড়ার দল তার সঙ্গে সঙ্গে লতাগুল্মে ঢাকা বিশাল স্তেপের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে, কিন্তু শেকল বাধ সাধে। সে একা একা শেকল ঝনঝন করতে করতে পলাতক কয়েদীর মতো চলে, এক পা-দু'পা করে লাফায়। ফাঁকা, অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা। ওপরে, বাতাসের দমকে চাঁদ কাঁপছে। গুলসারি যখন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঝটকা মেরে মাথা তোলে তখন চাঁদটা তার সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন মাথায় ঠোকর খায়ে তখন ঢেলার মতো চাঁদটা পড়ে যায়।

এই আলো এই আঁধার, এই আলো এই আঁধার... দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে।

শেকল ঝনঝন করে, ঘসা লেগে লেগে পা রক্তাক্ত হয়ে যায়।

লাফ, আরও লাফ, আরও। অন্ধকার, ফাঁকা। বেড়ি বাঁধা অবস্থায় পথ চলতে কত না সময় লাগে, চলতে কী কষ্ট যে লাগে!

গিরিখাতের কিনারায় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। কঠিন ঠাণ্ডা মাটি গ্রুলসারির পাঁজর জমাট করে দিচ্ছে...

১১

দু'সপ্তাহ বাদে নতুন জায়গায়, আবার পাহাড়ে চলে যাওয়ার কথা। সেখানে তারা থাকবে পুরো গরমকাল, পুরো শরৎকাল এবং পুরো শীতকাল, আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত। বাসাবদল কি কম ঝামেলার! কোথা থেকে এত টুকিটাকি এসে জমে? এই কারণে কিরগিজদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটা কথা চলে আসছে: গরীব বলে ভাবছ যখন বদলে দেখ বাসস্থান।

রাতের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়, এটা-ওটা নানা কাজ বাকি আছে, যাঁতাকলে যেতে হবে, যেতে হবে বাজারে, মুচির কাছে, ছেলের বোর্ডিং স্কুলে... তানাবাই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঐ সময় তাকে অদ্ভুত বলে স্ত্রীর মনে হত। ভোর হতে না হতে তাড়াহুড়ো লেগে যায় — কথা বলার ফুরসৎ পাওয়া যায় না, ঘোড়ার পালের কাছে ছোটে। দুপুরের খাওয়ার সময় ফিরে আসে, মুখে বিষাদ আর বিরক্তি। সে যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে, সব সময়ই সতর্ক ভাব।

'কী ব্যাপার তোমার বলত?' জায়দার জিজ্ঞেস করে।

সে চুপ করে থেকে থেকে একদিন বলল:

'কিছু দিন আগে আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'আমাকে এড়ানোর জন্য বলছ বুঝি?'

'না, সত্যি সত্যিই। মাথা থেকে যাচ্ছে না।'

'কালে কালে কতই দেখব! তুমি না গাঁয়ে প্রথম নাস্তিক ছিলে? বুড়িরা না তোমাকেই শাপ-শাপান্ত করত? বুড়ো হয়ে যাচ্ছ তানাবাই, ঘোড়ার পালের আশেপাশে ঘুরে বেড়াও, এদিকে বাসবদলের সময় যে হয়ে এলো তাতে যেন তোমার কিছুই আসে-যায় না। আমি একা বাচ্চাকাচ্চা সুদ্ধ সামলাব কী করে? একবার অন্তত গিয়ে চোরোর সঙ্গে দেখা করে এসো না। কান্ডজ্ঞান যাদের আছে তারা বাসবদলের আগে অসুস্থ লোককে একবার দেখতে যায়।'

'পরে দেখা যাবে'খন,' তানাবাই গ্রাহ্য করল না।

'পরে কখন? গাঁয়ে যেতে ভয় পাও না কি? চল, কাল একসঙ্গে যাওয়া যাক। বাচ্চাদের নিয়ে যাব। আমারও সেখানে যাওয়া দরকার।'

পরের দিন অল্পবয়সী পড়শীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঘোড়ার পাল দেখাশোনা করার ভার তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে ওরা সপরিবারে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করল। জায়দারের সঙ্গে ছোট মেয়ে, বড়টি — তানাবাইয়ের সঙ্গে। বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হল জিনের সামনে বসিয়ে।

তারা চলল গাঁয়ের পথ ধরে, পথে পরিচিত যার যার সঙ্গে দেখা হল তাদের সকলের সঙ্গে কুশল আদান-প্রদান করল। কামারশালার সামনে তানাবাই হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে দিল।

'দাঁড়াও,' সে বৌকে বলল। জিন থেকে নেমে বড় মেয়েটিকে বৌয়ের কাছে জিনের পেছনে বসিয়ে দিল।

'কী ব্যাপার? তুমি আবার কোথায় চললে?'

'এক্ষুনি আসছি, জায়দার। তুমি এগিয়ে যাও। চোরোকে বলবে আমি এক লহমার মধ্যে আসছি। অফিসে জরুরী কাজ

আছে, দুপুরের পরে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। তা ছাড়া কামারশালায়ও যেতে হবে। বাড়তি নাল সঙ্গে নিতে হবে।'

'এরকম আলাদা আলাদা যেতে কেমন যেন লাগছে।'

'কিছু না, কিছু না। তুমি চলে যাও। আমি এক্ষুনি আসছি।'

তানাবাই কিন্তু অফিসেও উঁকি মারল না, কামারশালায়ও না। সে সোজা ঘোড়ার চত্বরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘোড়া থেকে নেমে কাউকে ডাকাডাকি না করে সে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল। আধা অন্ধকারে চোখ জোড়া অভ্যস্ত হয়ে আসতে আসতে তার গলা শুকিয়ে গেল। আস্তাবল ফাঁকা, সেখানে কোন সাড়াশব্দ নেই, সব ঘোড়া বাইরে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তানাবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সহিসদের কারও পাত্তা পাওয়া যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে পাশের দোর দিয়ে আস্তাবলের উঠোনে বেরিয়ে এলো। সেখানেই চোখে পড়ল সেই ব্যাপারটি যা এত দিন সে আশঙ্কা করছিল।

'যা ভেবেছিলাম, ইতর কোথাকার!' হাত মুঠো করে নীচু গলায় সে বলল।

গুলসারি চালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে, তার ব্যান্ডেজ করা লেজটা, ঘাড় থেকে ঝোলান দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার পেছনের ফাঁক করা দু'পায়ের মাঝখানে কলসীর আকারের শক্ত ফোলা ফোলা বিরাট কী একটা উঁকি মারছে। ঘোড়াটা গামলার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তানাবাই ঠোঁট কামড়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, তার ইচ্ছে হল কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু সাহস করল না। তার অস্বস্তি লাগছিল। অস্বস্তি লাগছিল এই ফাঁকা আস্তাবলের জন্য, ফাঁকা উঠোন আর ছিন্নমুষ্ক নিঃসঙ্গ ঘোড়াটার জন্য। সে উলটো দিকে ফিরে

চুপচাপ সেখান থেকে সরে পড়ল। যা হয়ে গেছে তা সংশোধনের আর উপায় নেই।

সন্ধেবেলা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসার পর তানাবাই বিমর্ষ হয়ে বৌকে বলল:

'আমার স্বপ্নই সত্যি হল।'

'কী হয়েছে?'

'অন্যের সামনে আর এই নিয়ে বললাম না। গুলসারি আর পালিয়ে আসবে না। ওর অবস্থা কী করেছে জান? ইতরগুলো ওকে খাসী করে দিয়েছে!'

'জানি। সেই জন্যই ত তোমাকে গাঁয়ে টেনে নিয়ে গেলাম। এটা জানতে কি তুমি ভয় পাচ্ছিলে? ভয় পাওয়ার কী আছে? তুমি ত আর ছোট বাচ্চা নও! এই কি প্রথম ঘোড়াকে খাসী করা হল? তাছাড়া এটা শেষও নয়। আদ্যিকাল থেকে এটা চলে আসছে, চলবেও। এ ত সকলেরই জানা!'

তানাবাই একথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলল:

'তা হোক, তবু আমার মন বলছে, আমাদের নতুন সভাপতি — লোক ভালো নয়। এটা আমি মনে মনে টের পাচ্ছি।'

'যা তা বলো না তানাবাই,' জায়দার বলল। 'তোমার ঘোড়াটাকে খাসী করল বলে সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি খারাপ হয়ে গেল? এমন কথা বলছ কেন? লোকটা নতুন। খামারটা বড়, কাজ কঠিন। চোরো বলছে ওরা যৌথখামার নিয়ে উঠে-পড়ে লাগবে, সাহায্য করবে। কী সব প্ল্যান নাকি করছে। তুমি কি না আগে ভাগেই সব কিছুর ওপর রায় দিয়ে বসে থাকলে। এ ব্যাপারের অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই...'

সন্ধেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তানাবাই ঘোড়ার পাল দেখাশোনা করার জন্য চলে গেল, গভীর রাত অবধি সেখানে কাটাল। মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিল, সব কথা ভুলে

যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দিনের বেলায় আস্তাবেলে যা দেখেছিল তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। স্তেপে ঘোড়ার পালের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবল: "হয়ত সত্যিই লোককে এইভাবে বিচার করাটা ঠিক নয়। বোকার মতো বটে! কারণ হয়ত এই যে বুড়ো হচ্ছি, সারা বছর ঘোড়ার পাল চরাচ্ছি, কিছুই দেখি না, জানিও না। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত এরকম কষ্ট করে বাঁচতে হবে?.. অথচ বক্তৃতা শুনলে মনে হয় যেন সবই ভালো চলছে। ঠিক আছে — ধরলাম আমিই ভুল করছি। আল্লাহ্ করুন, যেন আমারই ভুল হয়। কিন্তু অন্যেরাও ত বোধহয় এরকমই ভাবে..."

তানাবাই স্তেপের চারধারে চক্কর খেল, ভাবল, কিন্তু তার সন্দেহের কোন মীমাংসা খুঁজে পেল না। তার মনে পড়ল কী ভাবে কোন এক সময় তারা যৌথখামার শুরু করে, কীভাবে লোকজনকে সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সকলের কী স্বপ্ন ছিল এবং সে স্বপ্ন সফল করে তোলার জন্য তারা কী চেষ্টাই না করে! সব কিছু ওলট-পালট করে ফেলা হয়, প্রাচীনকে ভেঙ্গে চুরে ফেলা হয়। তা গোড়ার দিকে জীবনযাত্রা মন্দ চলে না। আরও ভালোভাবে চলত যদি অভিশপ্ত যুদ্ধটা না আসত। আর এখন? যুদ্ধের পর কত বছর কেটে গেল, অথচ আমরা পুরনো তাঁবুর মতো খামার জোড়া তালি মেরেই চলছি। একটা জায়গা ঢাকা হয় ত অন্য জায়গায় ফুটো দেখা দেয়। কেন? কেন যৌথখামারকে সেদিনের মতো আর নিজের বলে ভাবা যায় না, মনে হয় পর পর? তখন মিটিংয়ে যা ঠিক করা হত সেটাই হত আইন। লোকে জানত নিজেরা আইন তৈরী করেছে অতএব তাকে মেনে চলতে হবে। আর এখন মিটিং মানে ফাঁকা বুলি মাত্র। তোমার তোয়াক্কা কে করে? যৌথখামার যেন যৌথখামারীরা নিজেরা চালায় না, চালায়

বাইরের কেউ। ভাবটা এই যে কী করা উচিত, কী ভাবে আরও ভালো কাজ করা যায়, খামার কী ভাবে চালাতে হয় — এসব ব্যাপার বাইরে থেকে আরও ভালো করে বোঝা যায়। কাজকর্ম কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে পাক দিচ্ছে, মোচড় দিচ্ছে, কিন্তু কোনরকম ফায়দা নেই। লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেই ভয় হয় — হয়ত বা প্রশ্ন করে বসবে: তুমি ত ভায়া পার্টির লোক, যৌথখামার আরম্ভ করেছিলে — সকলের চেয়ে বেশি গলা ফুলিয়েছিলে, তুমিই আমাদের বুঝিয়ে বল না এসব কী হচ্ছে? তাদের কী বলবে? ওরা যদি অন্তত সকলকে জড় করে ব্যাপারস্যাপার বুঝিয়ে দিত! যদি জিজ্ঞেসও করত কার মনে কী আছে, কী ধরনের ভাবনা-চিন্তা আছে! কিন্তু তা ত হচ্ছে না, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সদর থেকে আসছেন, তাঁরাও আবার আগেকার আমলের মতো নন। আগে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, সকলেই তাঁদের কাছে যেতে পারত। আর এখন এসে অফিসে সভাপতির সঙ্গে চেঁচামেচি করতে হয়, গ্রাম-সোভিয়েতের সঙ্গে ত কিছু বলারই জো নেই। পার্টি মিটিংয়ে বেশির ভাগ বক্তৃতা হয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর, যেন যৌথখামারের পরিস্থিতিটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কাজ কর, প্ল্যান পূরণ কর — ব্যাস্...

তানাবাইয়ের মনে পড়ল কিছু দিন আগে কে একজন এসেছিলেন, তিনি ভাষা সম্পর্কে কী একটা নতুন তত্ত্ব নিয়ে অনেক কথা বলে গেলেন। তানাবাই যখন যৌথখামারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল তখন তিনি তার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন আপনার ভাবনা-চিন্তাগুলো সন্দেহের অবকাশ রাখে। অনুমোদন করলেন না। এসব হচ্ছে কী?

তানাবাই ঠিক করল, "চোরো সুস্থ হয়ে উঠবে, তখন তার কাছ থেকে মনের কথা বার করে নেব। নিজেও মনের কথা বলব। আমার যদি বোঝার কোন গন্ডগোল থাকে ত বলুক, আর যদি না থাকে?.. তা হলে কী হবে? না না তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই আমি গুলিয়ে ফেলছি। আমি কে? ঘোড়ার পাল চরাই, সামান্য একজন পশুপালক। আর ওখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা সব জ্ঞানীগুণী..."

তাঁবুতে ফিরে এসে তানাবাই অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারল না। মাথা ঘামাতে লাগল: গোলমালটা কোথায়? এবারেও উত্তর খুঁজে পেল না।

চোরোর সঙ্গে তার আর কথা বলার অবকাশ হল না। বাসবদলের আগে কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ল।

আবার যাযাবর ছাউনি এগিয়ে চলল পাহাড়ের ভেতরে সারাটা গরমকালের জন্য, গোটা শরৎকাল ও শীতকালের জন্য, আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত। আবার ভেড়া, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর পাল চলল নদীর কিনারা ধরে, জলাভূমির ওপর দিয়ে। চলল বোঝাই কারাভান। বাতাসে ভেসে চলল নানা কণ্ঠের ধ্বনি, মেয়েদের ওড়না আর ঘাগরা রং ধরিয়ে দিল, তরুণীরা বিচ্ছেদের গান ধরল।

বিশাল তৃণভূমির ভেতর দিয়ে, গ্রাম পাশে রেখে টিলার ওপর দিয়ে তানাবাই তার ঘোড়ার পাল খেদিয়ে নিয়ে চলল। সেই বাড়িটা, সেই অ্যাঙ্গিনা যেখানে গুলসারির পিঠে চেপে তানাবাই আসত তা এখনও গাঁয়ের প্রান্তে তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এখন তার না আছে সেই নারী, না দৌড়বাজ গুলসারি। সবই আজ অতীত, বসন্তের ধূসর এক ঝাঁক হাঁসের মতো সে দিন কলরব করে বিদায় নিয়েছে...

...মা-উট দিনের পর দিন ছুটে বেড়ায়, খোঁজে, ডাকে তার সন্তানকে। কাজলকালো চোখ, আমার বাছা তুই কোথায়? সাড়া দে! আমার বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে দুধ উপছে পড়ছে পা বয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় তুই? সাড়া দে! দুধ উপছে পড়ছে বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে। উপছে পড়ছে সাদা দুধ...

১২

সে বছর শরৎকালে তানাবাই বাকোসভের ভাগ্য হঠাৎ মোড় নিল।

গিরিখাত থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি করে যাতে পাহাড়ের ওপরে শীত কাটাতে যাওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সে পাহাড়ের পাদদেশে শরৎকালীন চারণভূমিতে এসে থামল।

এমন সময় যৌথখামার থেকে এক দূত এসে হাজির।

'চোরো আমাকে পাঠিয়েছেন,' সে তানাবাইকে বলল। 'বলেছেন কাল যেন গাঁয়ে আসেন, সেখান থেকে সদরে মিটিংয়ে যাবেন।'

পর দিন তানাবাই যৌথখামারের অফিসে এলো। চোরো সেখানে পার্টি সংগঠনের ঘরে ছিল। বসন্তকালের তুলনায় তাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছিল, যদিও নীলচে ঠোঁট আর রুগ্ণ চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল রোগ এখনও তার সারে নি। তাকে খোসখুশি দেখাচ্ছিল, সে খুবই ব্যস্ত ছিল, লোকজন তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। বন্ধুকে এই ভাবে দেখতে পেয়ে তানাবাইয়ের আনন্দ হল। তার মানে জীবন ফিরে পেয়েছে, আবার কাজে নেমেছে।

দুজনে নিভৃতে দেখা হতে চোরো তানাবাইয়ের দিকে

তাকাল, নিজের ঝুলে পড়া, রুক্ষ গালে আঙুল বুলিয়ে হাসল:

'তুই কিন্তু বুড়ো হচ্ছিস না তানাবাই, একই রকম আছিস। কতকাল আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই — সেই বসন্তকাল থেকে, তাই না? ঘোড়ার দুধ আর পাহাড়ী জলবায়ু —বড় ব্যাপার। আমি কিন্তু একটু একটু করে যেতে বসেছি। বোধহয় সময় ঘনিয়ে এলো...' একটু চুপ করে থেকে চোরো কাজের কথা পাড়ল: 'শোন তাহলে তানাবাই। জানি, বলবি বেহায়ার হাতে চামচ ধরিয়ে দিলে সে এক গ্রাসের জায়গায় পাঁচ গ্রাস ওঠাবে। আবার তোরই শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কাল পশুপালনের এক সভায় যাচ্ছি। পশুপালনের কাজ, বিশেষ করে ভেড়া পালন, বিশেষত আমাদের এই যৌথখামারে খুবই খারাপ চলছে। একেবারে শোচনীয় অবস্থা। অঞ্চল কমিটি কমিউনিস্ট ও কম্‌সমোল সদস্যদের ডাক দিয়েছে: পিছিয়ে পড়া মেষপালন খামারগুলোকে সাহায্য করার জন্য। উদ্ধার কর! তখন ঘোড়ার পালের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলি, তার জন্য ধন্যবাদ। এবারেও সাহায্য কর: ভেড়ার পালের ভার নে, রাখালি কর।'

'তুই বড্ড তাড়াহুড়ো করছিস, চোরো,' তানাবাই চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল: "আমি ঘোড়ায় অভ্যস্ত, ভেড়া একঘেয়ে লাগবে! তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাই বা কেমন দাঁড়াবে?"

'তোকে এটা করতেই হবে তানাবাই,' চোরো আবার বলল। 'আর কিছু করার নেই — পার্টির নির্দেশ। রাগ করিস না। তেমন হলে বন্ধু ভাবে আমার ওপর ঝাল ঝাড়িস, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর দায়-দায়িত্ব নিজের নিজের কাঁধে নেব!'

'তা এমন ঝাল ঝাড়ব, টের পাবি'খন!' তানাবাই হো হো করে হাসতে লাগল, তার মনে এ সন্দেহ তখন উ'কি মারে নি যে শিগ্গিরই এমন সময় আসবে যখন সব কিছুর জন্য সে চোরোকেই দায়ী করবে... 'আর ভেড়ার পালের ব্যাপারে ভাবতে হবে, বৌয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার...'

'তাতে কী আছে, ভাব না। তবে সকালের মধ্যে ঠিক করে ফেল, কালই মিটিংয়ের আগে জানাতে হবে। জায়দারের সঙ্গে পরে পরামর্শ করিস, ওকে সব কিছু বুঝিয়ে বলিস। তেমন দরকার হলে আমি নিজে গিয়েই বলতে পারি। ও বুদ্ধিমতী— বুঝতে পারবে। ও না থাকলে কোনকালে কোথায় ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে থাকতিস!' চোরো ঠাট্টা করে বলল। 'জায়দার কেমন আছে? বাচ্চারা?'

তারপর তাদের কথাবার্তা চলল পরিবার নিয়ে, অসুখ-বিসুখ আর এটা-সেটা নিয়ে। তানাবাইয়ের তখনও ইচ্ছে ছিল চোরোর সঙ্গে বড় রকমের কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে, কিন্তু পাহাড় থেকে যে সব পশুপালককে ডাকা হয়েছে তারা এসে পৌঁছুতে লাগল, আর চোরোর নিজেরও তাড়া ছিল, সে ঘড়ির দিকে তাকাল।

'তা হলে তোর ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখ। ঠিক করেছি আমরা সকলে একসঙ্গে সকালবেলা গাড়ি চড়ে যাব। আমরা একটা গাড়ি পেয়েছি। শিগ্গিরই আরও একটা পাব। ভালো সময় আসছে। আমি এখন রওনা হব, সাতটার মধ্যে অঞ্চল কমিটিতে হাজির হওয়ার কথা। সভাপতি মশাই ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। মনে হয় দৌড়বাজ ঘোড়াটার পিঠে চেপে সন্ধে নাগাদ পৌঁছুতে পারব, ওটা গাড়ির চেয়ে খারাপ যায় না।'

'তার মানে, গুলসারির পিঠে তুই চাপিস নাকি?' তানাবাই

অবাক হল। 'সভাপতি মশাই তোর ওপর সদয় হয়েছেন দেখছি...'

'কী বলা যায়? সদয় হওয়া না হওয়ার কথা নয়, আমাকে ঘোড়াটা দিয়েছেন আর কি। কী দুর্ভোগে জানিস,' হাসতে হাসতে চোরো দু'হাত ছড়াল। 'গুলসারি সভাপতি মশাইকে কেন যেন দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কেন, তা বুঝে ওঠা রীতিমতো ভার। হিংস্র হয়ে ওঠে, ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। নানাভাবে চেষ্টা করা হল। কিছুতেই কিছু হল না, তা সে কেটে মেরে ফেললেও না। অথচ আমি ওর পিঠে চেপে যাই — দিব্যি চলে, তুই ওকে জব্বর তালিম দিয়েছিস। জানিস, মাঝে মাঝে বুক ব্যথা করে, কিন্তু গুলসারির পিঠে চেপে বসি, ও চলতে শুরু করে আর ব্যথাটাও সেরে যায়। একমাত্র এই কারণেই আমি সারা জীবন পার্টি সংগঠকের কাজ করতে রাজী, ও আমাকে সারিয়ে তোলে!' চোরো হাসল।

তানাবাই হাসল না।

'আমিও ওকে পছন্দ করি না,' ও বলল।

'কাকে?' হাসতে হাসতে চোরোর চোখ থেকে যে জল গড়াচ্ছিল তা মুছতে মুছতে সে জিজ্ঞেস করল।

'সভাপতিকে।'

চোরো গম্ভীর হয়ে গেল।

'ওকে পছন্দ না করার কারণ কী?'

'জানি না। আমার মনে হয় লোকটার মাথায় কিছু নেই, মাথায় কিছু নেই, আর বদ।'

'সত্যি বলতে গেলে কি তোকে সন্তুষ্ট করা মুশকিল। আমাকে তুই সারা জীবন গালাগাল করে এসেছিস মেরুদণ্ডহীন বলে, দেখা যাচ্ছে একেও পছন্দ করিস না... জানি না। আমি সবে কাজে ফিরে এসেছি। এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারি নি।'

ওরা চুপ করে গেল। তানাবাই চোরোকে যে সব কথা বলতে চেয়েছিল — গ্লসারিকে যে বেড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল সে কথা, মর্দা ঘোড়াটাকে কী ভাবে ওরা খাসী করে দিল সে কথা — এখন তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, বিশ্বাস উৎপাদনের অন্পেযোগী বলে মনে হল। অস্বস্তিকর ভাবটাকে কাটানোর উদ্দেশ্যে, কথাবার্তার সময় যে স্খবরটা আনন্দ দিয়েছিল তানাবাই তাই নিয়ে কথা পাড়ল:

'খ্ব ভালো কথা যে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। তার মানে এখন যৌথখামারেগ্লোও গাড়ি পাবে। দরকার, দরকার। আর কত দিন? মনে আছে, য্দ্ধের আগে আগে আমরা প্রথম দেড়টনী ট্রাক পেয়েছিলাম? সেই নিয়ে গোটা মিটিং হয়ে গেল। না হয়ে উপায় আছে? — যৌথখামারের নিজের গাড়ি! তুইও গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলি: "কমরেডরা, এ হল সমাজতন্ত্রের ফল!" পরে সেটাকেও য্দ্ধের কাজে নিয়ে নেওয়া হল...'

হ্যাঁ, সে এক সময় ছিল বটে!.. স্র্যোদয়ের মতো আশ্চর্য সময়। গাড়ির কথাই বা কেন! লোকে যখন চুইয়া খাল তৈরীর কাজ শেষ করে ঘরে ফিরল, সঙ্গে নিয়ে এলো প্রথম কলের গান তখন নতুন গানে সারা গাঁ একেবারে মাতোয়ারা হয়ে গেল। সময়টা ছিল গরমকালের শেষ। যার যার বাড়িতে কলের গান আছে সন্ধে বেলায় সকলে তাদের কাছে এসে ভিড় করত, কলের গান রাস্তায় বার করে এনে বারবারে শ্নত লাল র্মাল মাথায় সেরা কাজের মেয়েকে নিয়ে তৈরী একটি গানের রেকর্ড। তাদের কাছে এটাও ছিল সমাজতন্ত্রের ফল...

'মনে আছে চোরো, আমরা নিজেরাই ত মিটিংয়ের পর গাদাগাদি করে ট্রাকে চাপলাম — তিল ধারণের জায়গা ছিল না!' তানাবাই উদ্দীপিত হয়ে স্মরণ করল। 'উৎসবের দিনে লোকে

যে রকম করে আমি সেই ভাবে লাল পতাকা হাতে গাড়ির কেবিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা অমনি অমনি স্রেফ বিনা কাজে স্টেশানে চলে গেলাম, সেখান থেকে রেললাইন ধরে গেলাম অন্য একটি স্টেশানে, কাজাখস্তানে। পার্কে বিয়ার খেলাম। যাতায়াতের গোটা রাস্তায় গান গাইলাম। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন বেঁচে আছে — সবাই যুদ্ধে মারা গেছে। আর... শোন, রাতের বেলায়ও আমি ঐ লাল পতাকাটা হাত ছাড়া করি নি। রাতে আর সেটা কার চোখে পড়ে? তা সত্ত্বেও আমি পতাকা হাতছাড়া করলাম না... ওটা ছিল আমার পতাকা। গান গেয়েই চললাম, মনে আছে গাইতে গাইতে গলা ভেঙে গেল... আজকাল আর আমরা গাই না কেন চোরো?'

'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তানাবাই, এখন আর মানায় না...'

'না আমি সে কথা বলছি না — আমাদের গান গাওয়ার সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছেলেছোকরারা? এই ত আমি ছেলের বোর্ডিং স্কুলে গিয়েছিলাম। ওখানে তার কী শিক্ষা হবে? এই বয়স থেকেই জানে ওপরওয়ালাকে কী করে তোয়াজ করতে হয়। বলে, বাবা তুমি হেডমাস্টারের জন্য মাঝে মাঝে ঘোড়ার দুধ নিয়ে এসো। কেন? পড়াশুনায় মন্দ নয়... কিন্তু ওদের গান কেমন করে তা যদি শুনতিস। ছেলেবেলায় আমি আলেক্‌সান্দ্রভ্‌কায় ইয়েফ্রেমভের বাড়িতে কাজ করতাম, ইস্টারের সময় তিনি আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েরাও সকলে আড়ষ্ট হয়ে দু'হাত দু'পাশে ঝুলিয়ে মঞ্চে দাঁড়ায়, তাদের মুখগুলো পাথরের মতো, গান গায় যেন রুশী গির্জায়। একঘেয়ে ব্যাপার... এটা আমার ভালো লাগে না। মোট কথা আজকাল অনেক কিছুই আমার কাছে দুর্বোধ্য, তোর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলা দরকার... জীবন থেকে পিছিয়ে পড়েছি, সব জিনিস বুঝতে পারি না।'

'ঠিক আছে, তানাবাই। এ বিষয়ে পরে কথা বলা যাবে, সময় করে নেব।' চোরো তার কাগজপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরতে লাগল। 'কেবল বেশি দুশ্চিন্তা করিস না। আমার কথা যদি বলিস, আমার বিশ্বাস আছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে: যত কঠিনই হোক না কেন আমরা উঠব, আমাদের স্বপ্ন সফল হতে দেখব...' সে বেরিয়ে যেতে যেতে কথাগুলো বলল। চৌকাঠে পা দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল, মনে হতে বলল: 'শোন, তানাবাই, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সেদিন দেখছিলাম তোর বাড়িটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। তুই দেখাশোনা করিস না। তুই সব সময় পাহাড়ে পাহাড়ে, বাড়িতে কর্তা বলতে কেউ নেই, যুদ্ধের সময় জায়দার তোকে ছাড়া একাই এর চেয়ে ভালো অবস্থায় রেখেছিল। তুই গিয়ে একবার দ্যাখ। বলিস কী দরকার, বসন্তকালে মেরামতের জন্য যা হোক সাহায্য করা যাবে। আমাদের সামানসুর গরমের ছুটিতে এসেছিল, ও পর্যন্ত সহ্য করতে পারল না। কাস্তে নিয়ে বলল, তানাবাই চাচার উঠোনের আগাছা কেটে সাফ করব। অস্তর খসে পড়েছে, কাচ ভাঙা, ও বলল ঘরের ভেতর চড়াই পাখিরা উড়ছে — যেন ফসল মাড়াইয়ের জায়গা।'

'ঘরের ব্যাপারে তুই ঠিকই বলেছিস। সামানসুরকেও ধন্যবাদ। কেমন পড়াশুনা করছে?'

'এই ত সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। আমার ত মনে হয় পড়াশুনা ভালোই করছে। তুই ছেলেছোকরাদের কথা বললি না, আমি আমার নিজের ছেলে দিয়ে বিচার করে দেখছি — মনে হয় আজকালকার ছেলেছোকরারা খারাপ না। ওর কথাবার্তা থেকে দেখছি ওদের ইনস্টিটিউটের ছেলেরা কাজের আছে। তবে হ্যাঁ, সময়ে বোঝা যাবে। ছেলেছোকরারা শিক্ষিত হচ্ছে, নিজেদের সম্পর্কে ভাববে...'

চোরো আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল, আর তানাবাই চলল নিজের বাড়ি দেখতে। উঠোনের চারদিকটা চক্কর মারল। পায়ের নীচে মর্মর আওয়াজ তুলল শুকনো ঝুরঝুরে আগাছা, গ্রীষ্মকালে ইনস্টিটিউটের ছাত্র — চোরোর ছেলে যা কেটে গিয়েছিল। তার লজ্জা হচ্ছিল এই ভেবে যে বাড়িটা কর্তার অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে। অন্যান্য পশুপালকের বাড়িতে রয়ে গেছে তাদের আত্মীয়স্বজন কিংবা দেখাশোনার কেউ না কেউ আছে। কিন্তু তার আপন দুই বোন অন্য গাঁয়ে বাস করে, ভাই কুলুবাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়, আর জায়দারের নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই। এই কারণেই বাড়ি পরিত্যক্ত হয়ে আছে। আবার পশুপাল চরানোর কাজ, এবারে ভেড়া চরানো। তানাবাই অবশ্য এখনও ইতস্তত করছে, কিন্তু মনে মনে জানে যে চোরো তাকে রাজী করাবেই, তানাবাই তাকে না বলতে পারবে না, চিরকাল যেমন মেনে নেয় তেমনি মেনে নেবে।

সকালবেলা গাঁ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে সদরের দিকে যাত্রা করা হল। নতুন 'গাজ' মার্কা তিনটনী ট্রাকটা সকলের ভালো লাগল। "চলেছি রাজার মতো," পশুচারণকারীরা ঠাট্টা করে বলল। তানাবাইও খুশী — বহুদিন তার গাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয় নি — বলতে গেলে সেই যুদ্ধের সময় থেকে। তখন মার্কিন 'স্টুডিবেকারে' চড়ে স্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়ার পথে পথে ঘোরা হয়েছে। ট্রাকগুলো ছিল বিশাল, তাদের তিনটে করে চাকার দন্ড। "এই রকম ট্রাক যদি আমাদের থাকত!" তানাবাই তখন ভেবেছিল। "বিশেষ করে পাহাড়ের নীচ থেকে ফসল বয়ে আনার জন্য। এরকম গাড়ি

কোথাও মার খাবে না।" সে নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিল যুদ্ধ শেষ হলে আমাদেরও হবে। বিজয়ের পর সব হবে!..

খোলা ট্রাকে, হাওয়ায় কথাবার্তা তেমন জমল না। সকলেই বেশির ভাগ চুপচাপ, শেষ পর্যন্ত তানাবাই ছেলেছোকরাদের উদ্দেশ্য করে বলল:

'ওহে ছেলেরা, গান ধর। আমাদের দিকে, বুড়োদের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ? তোমরা গাও, আমরা শুনি।'

ওরা গান ধরল। গোড়ার দিকে তেমন হল না, পরে বেশ চলল। চলতে আনন্দ লাগছিল। "এই ত বেশ," তানাবাই ভাবল। "আরও ভালো। আর সত্যিকারের ভালো যেটা সেটা হল এই যে শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের মিটিংয়ে নিয়ে চলছে। সম্ভবত ওরা বলবে কী ভাবে কী চলছে, যৌথখামারের কী করা যায়। ওপরওয়ালারা ত আমাদের চেয়ে ভালোই জানেন। আমাদের এখানে কী আছে আমরা তা জানি — এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওরা ধরিয়ে দেবে, দেখতে দেখতে আমরাও আমাদের এখানে নতুন করে কাজ ধরব..."

সদরে গোলমাল, লোকের ভিড়। ট্রাক, টানাগাড়ি, বহু জিন দেওয়া ঘোড়া ক্লাবের কাছের সমস্ত চত্বরটা ছেয়ে ফেলেছে। খাবার আর চায়ের ফেরিওয়ালারাও বাদ নেই। ধোঁয়া আর কালি উঠছে, আগন্তুকদের উদ্দেশে হাঁকডাক চলছে।

চোরো ইতিমধ্যেই এসে অপেক্ষা করছিল।

'তাড়াতাড়ি নেমে পড়, চলে এসো। যে যার জায়গায় বস। শিগ্গিরই শুরু হবে। তানাবাই, কোথায় চললি তুই?'

'আমি এক্ষুনি আসছি,' জিন দেওয়া ঘোড়ার দঙ্গল ভেদ করে যেতে যেতে তানাবাই বলল। ও গাড়ি থেকেই তার গুলসারিকে লক্ষ্য করেছে, এখন তার কাছে যাচ্ছে। সেই বসন্তকাল থেকে তাকে দেখে নি।

গুলসারি অন্যান্য ঘোড়ার মাঝখানে জিন বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার বিশেষত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল হাল্‌কা হলুদ রঙে, প্রশস্ত ও দৃঢ় পশ্চাদ্ভাগে এবং খটখটে মাথা আর তার ওপরে বাঁকা নাক ও গভীর কালো চোখ জোড়ায়।

'কেমন আছিস গুলসারি, কেমন আছিস রে?' তানাবাই ঠেলাঠেলি করে তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ফিসফিসে করে বলল। 'এখানে তোর কেমন কাটছে রে?'

গুলসারি চোখের তারা ঘুরিয়ে পুরনো মনিবকে স্বীকৃতি জানাল, নড়েচড়ে দাঁড়াল, চিঁহি হি করল।

'তোকে কিন্তু গুলসারি মন্দ দেখাচ্ছে না। দ্যাখ্ তোর বুক চওড়া হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে তুই খুব দৌড়ঝাঁপ করছিস। তখন তোর খারাপ লাগছিল, তাই না? জানি... ঠিক আছে রে, আরও ভালো হাতে পড়েছিস। ভালো হয়ে চল, সব ঠিক হয়ে যাবে,' গলায় ঝোলানো থলিতে অবশিষ্ট দানা হাতড়াতে হাতড়াতে তানাবাই বলল। তার মানে চোরো এখানে তাকে খিদেয় কষ্ট দেয় নি। 'আচ্ছা, তুই দাঁড়া, আমি চললাম।'

ক্লাবে ঢোকার মুখে দেয়ালে ঝুলছিল লাল সালুর ওপর লেখা: 'কমিউনিস্টরা — এগিয়ে যাও!' 'কম্‌সমোল — সোভিয়েত যুবসমাজের অগ্রবাহিনী!'

লোকে ঘনবদ্ধ হয়ে বিরতিকক্ষ ও হলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। দরজার কাছে চোরো এবং যৌথখামারের সভাপতি আলদানভ তানাবাইয়ের সঙ্গে দেখা করল।

'তানাবাই, একটু পাশে সরে এসো,' আলদানভ বলল। 'আমরা তোমার নাম লিখে ফেলেছি, এই তোমার লেখার প্যাড। তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। তুমি পার্টি সদস্য, আমাদের সেরা পশুপালক।'

'আমি আবারে কী নিয়ে বলব?'

'বলবে যে তুমি একজন কমিউনিস্ট হিশেবে ঠিক করেছ পিছিয়ে পড়া একটা বিভাগে কাজ করতে যাবে। তুমি মাদী ভেড়ার পাল দেখাশোনা করবে।'

'ব্যস্?'

'ব্যস্ কেন! বলবে তুমি কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ। বলবে, পার্টি ও জনগণের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি প্রতি একশটি মাদী ভেড়া থেকে যাতে একশ দশটি করে বাচ্চা জন্মায় এবং তারা যাতে রক্ষা পায় সেদিকে সচেষ্ট হব, প্রত্যেকের মাথা থেকে তিন কিলোগ্রাম করে পশম ছেঁটে বার করব।'

'ভেড়ার পাল চোখে না দেখে আমি বলব কী করে?'

'আরে ভাবনার কী আছে! ভেড়ার পাল ত পাবিই।' চোরো কথার সুর নরম করে বলল। 'যে রকম মনে ধরে সে রকম ভেড়া বেছে নিবি। ঘাবড়াস না। আর হ্যাঁ, বলবি যে কম্‌সমোল থেকে দু'জন কম বয়সী রাখালের কাজ দেখাশোনার ভার নিচ্ছিস।'

'কাদের?'

লোকে ঠেলাঠেলি করছিল। চোরো তালিকা দেখল।

'এশিম বলতবেকভ আর বেক্‌তাই জারলিকভের।'

'কিন্তু আমি ত তাদের সঙ্গে কথাই বলি নি, তারা এটাকে কী ভাবে নেবে?'

'আবার তোমার সেই কথা! তুমি আচ্ছা লোক ত! ওদের সঙ্গে তোমার কথা না বললেই নয়? না বললেই বা কী আসে যায়? ওরা যাবে কোথায়? তোমার সঙ্গে ওদের নাম লেখা হয়ে গেছে, কাজ যা হওয়ার হয়ে গেছে।'

'তা যা হওয়ার হয়েই যদি গিয়ে থাকে ত আমার সঙ্গে আর কথাবার্তা কেন?' তানাবাই এগিয়ে গেল।

'দাঁড়া,' চোরো তাকে আটকাল। 'সব কিছু তোর মনে আছে ত?'

'মনে আছে, মনে আছে,' তানাবাই পা চালাতে চালাতেই ঝোঁকের সঙ্গে বলল।

১৩

সন্ধে নাগাদ সভা শেষ হল। সদর ফাঁকা হয়ে গেল, লোকে যে যার জায়গায় চলে গেল: কেউ পাহাড়ে-পর্বতে পশুপাল দেখতে, কেউ বা ফার্মে, পাড়ায় ও গাঁয়ে।

তানাবাই অন্যান্যদের সঙ্গে ট্রাকে করে ফিরে চলল আলেক্সান্দ্রভ্কা চড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, স্তেপের মালভূমি ভেদ করে। তখনই অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। শরৎকাল। তানাবাই একটা কোনায় জায়গা করে নিল, কলার তুলে তার আড়ালে নিজস্ব ভাবনায় ডুবে গেল। সভা ত শেষ হল। সে নিজে অবশ্য কাজের কথা কিছুই বলে নি তবে অন্যদের কথা শুনেছে। দেখা যাচ্ছে সব কিছু ভালোভাবে চলতে গেলে আরও বহু পরিশ্রম করা দরকার। চশমা চোখে লোকটি, জেলা কমিটির সম্পাদক ঠিকই বলেছেন: "আমাদের জন্য কেউ রাস্তা-ঘাট তৈরী করে রাখে নি, নিজেদের করে নিতে হবে।" সেই তিরিশের দশক থেকেই ধরা যাক না কেন — এই ওপরে, এই নীচে, এই উত্থান, এই পতন... বোঝাই যাচ্ছে, যৌথখামার ব্যাপারটি সহজ নয়। তার নিজেরই ত এখন চুল অর্ধেক পেকে গেছে, সারাটা যৌবন কোথা দিয়ে কেটে গেল, কত কিছুই না সে দেখল, কত কিছুই না করল, আহাম্মকিও সে কতবারই না করেছে, কিন্তু বারবারই মনে হয়েছে এই বুঝি লক্ষ্যে পৌঁছে গেল, অথচ যৌথখামারের ঝক্কির আর শেষ নেই...

তা কী আর করা যাবে? — কাজ মানে কাজই। সম্পাদক মশাই ঠিকই বলেছেন — এক কালে, যুদ্ধের পর যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমনি ভাবে জীবন কখনই আপনা-আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে না। যতক্ষণ নিজে বেঁচে আছ ততক্ষণ তাকে সারা সময় কাঁধ দিয়ে ঠেলা মারতে হবে... কেবল প্রতিবার, যখনই তার ধারাল কোনাগুলো ঘুরে ফিরে আসবে তখন দেখবে গোটা কাঁধে তোমার কড়া পড়ে গেছে। তা কড়ায় কী আসে যায়? — তুমি যা করছ, অন্যেরা যা করছে তাতে মন ভরে থাকলেই হল, এসব মেহনত থেকে সুখ পাওয়া গেলেই হল... ভেড়ার পাল নিয়ে তার কাজ এখন কেমন চলবে কে জানে? জায়দার কী বলবে? মেয়েদের জন্য অন্তত কিছু মিঠাই কিনতে দোকানেও যাওয়ার সময় পাওয়া গেল না। ওদের কথা দিয়েছিল। প্রতি শ'য়ে একশ দশটা করে ভেড়ার বাচ্চা, তায় আবার মাথা পিছু তিন কিলোগ্রাম করে পশম — কথাটা বলা সহজ। প্রতিটি বাচ্চা ভেড়াকে জন্মাতে হবে, টিকে থাকতে হবে, অথচ ঝড়-বাদল আর হিম তার প্রতিবন্ধক। আর পশম? পশমের একটা আঁশ নিয়ে দেখ না, চোখেই ধরা পড়বে না — ফুঁ দিলে কোথায় যে উড়ে যাবে। কিলো-কিলো আর কোত্থেকে হবে? ওঃ, সে ত ওজনে সোনা! অথচ কেউ কেউ বোধহয় জেনেও জানে না এসব কী করে আসে...

চোরোই তাকে ঘুলিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্ত করে দিয়েছে... সে বলল, "তোকে বলতে হবে, তবে কেবল সংক্ষেপে বলবি, নিজের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে। এ বাদে অন্য কিছু বলবি না। আমার অন্তত তা-ই পরামর্শ।" তানাবোইও সে পরামর্শ শুনল। বক্তৃতামঞ্চে নেমে এমন ঘাবড়ে গেল যে মনের মধ্যে যা কিছু টগবগ করছিল সে সব আর কিছুই বলা হল না। বিড়বিড়

করে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বলে নেমে এলো। ভাবতেও লজ্জা করে। কিন্তু চোরো সন্তুষ্ট। চোরো এমন সাবধানী হয়ে গেল কেন? অসুস্থতার জন্য কি, না কি সে এখন আর যৌথখামারের বড়কর্তা নয় বলে? তানাবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার কী দরকার তার ছিল? না, কোথায় একটা যেন তার পরিবর্তন হয়েছে, কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। হয়ত এই কারণে যে সারা জীবন সভাপতি হয়ে সে যৌথখামার চালিয়েছে, সারাটা জীবন ওপরওয়ালার গালাগাল খেয়েছে। বোধহয় চালাক হতে শিখেছে...

"দাঁড়াও বন্ধু, তোমাকে একা পেলে কোন এক সময় দেখে নেব..." ভেড়ার চামড়ার কোটটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে তানাবাই ভাবল। ঠাণ্ডা, হাওয়া দিচ্ছে, বাড়ি পৌঁছুতে এখনও দেরি আছে। সেখানে আবার কী অপেক্ষা করছে কে জানে?..

চোরো দৌড়বাজ ঘোড়াটার পিঠে চেপে চলল। সে একা একা চলল, সঙ্গী-সাথীর জন্য অপেক্ষা করল না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বাড়ি যাওয়া চাই, বুকে কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। ঘোড়াকে তার নিজের চালে ছেড়ে দিল, ঘোড়াটা সারা দিন ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, এখন দৃঢ় পদক্ষেপে টগবগিয়ে চলল। দম দেওয়া যন্ত্রের মতো সান্ধ্য পথের ওপর খুরের চিহ্ন আঁকল। তার আগেকার সমস্ত অভ্যেসের মধ্যে কেবল দৌড়ের ঝোঁকটিই রয়ে গেছে। বাদ বাকি আর সব কিছুর সমাধি ঘটেছে বহু আগে। সমাধি ঘটেছে যাতে সে জানতে পারে শুধুই জিন আর পথ। গুলসারি বেঁচে আছে দৌড়ের মধ্যে। সে দৌড়ায় বিবেকবানের মতো, অক্লান্তভাবে, যেন লোকে তার কাছ থেকে

যা ছিনিয়ে নিয়েছে তার নাগাল সে ধরতে পারবে। দৌড়ায় কিন্তু তার নাগাল আর কখনই পায় না।

পথে হাওয়ায় চোরো একটু হালকা বোধ করল। বুকের ব্যথাটা কমে গেল। মোটের ওপর সে মিটিংয়ে সন্তুষ্ট, জেলা কমিটির সম্পাদকের ভাষণ তার খুব ভালো লেগেছে, তাঁর কথা সে অনেক শুনেছে বটে, কিন্তু তাঁকে দেখল এই প্রথম। তা সত্ত্বেও পার্টি সংগঠক চোরো কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। মনের মধ্যে খচখচ করছিল। সে ত তানাবাইয়ের ভালোই চেয়েছিল। বলতে গেলে কি এ ধরনের সভা-সমিতির অন্ধি-সন্ধি তার জানা আছে, সে জানে কোথায় কী বলতে হয় আর কী বলা উচিত নয়। সে ঠেকে শিখেছে। তানাবাই তার কথা শুনল বটে, কিন্তু এটা বুঝতে চাইল না। মিটিংয়ের পর তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। গাড়িতে চেপে বসল, মুখ ফিরিয়ে নিল। অভিমান করল। ওঃ, তানাবাই, তানাবাই! তুই একেবারেই সাদাসিধে, জীবন তোকে কিছুই শেখায় নি। তুই দেখছি কিছুই জানিস না, কিছু লক্ষ্যও করিস না। বয়সকালে যেমন ছিলি তেমনই রয়ে গেলি। তুই জানিস শুধু কোপ মারতে। আরে সে কাল আর নেই। এখন সবচেয়ে বড় কথা হল কী ভাবে বলা, কার সামনে বলা, আর কথা শুনতে হওয়া চাই অন্য সকলের কথার মতো কালোপযোগী, সেখানে কোন রকম অস্পষ্টতা ও জড়তা থাকলে চলবে না, তাকে হতে হবে লেখার মতো মসৃণ। তা হলে সব ঠিক থেকে যাবে। কিন্তু তানাবাই, তোকে যদি তোর খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দিতাম তা হলে আর দেখতে হত না, তার জন্য আমাদের জবাবদিহিও করতে হত। প্রশ্ন উঠত: "আপনারা নিজেদের সংস্থার সদস্যদের কী শিক্ষা দিচ্ছেন? এটা কেমন ধারা শৃঙ্খলা? এ কী বিশৃঙ্খলা!" ওঃ, তানাবাই, তানাবাই...

১৪

সেই একই রাত, যখন তাদের দু'জনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে পথে। বুড়ো মানুষ আর বুড়ো ঘোড়া। গিরিখাতের প্রান্তে ক্যাম্পফায়ার জ্বলছে। তানাবাই আবার উঠে মুমূর্ষু গুলসারির গায়ে জড়ানো ভেড়ার চামড়ার কোটটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। আবার গুলসারির শিয়রে এসে বসছে। সে মনে মনে তার সারা জীবন খতিয়ে দেখে। বছর, বছর আর বছর — যেন টগবগে ঘোড়ার দৌড়... আর তখন, সে বছর, সেই হেমন্তে, শীতের শুরুতে যখন সে মেষপালক হয়ে ভেড়ার পাল চরাতে গেল তখন কী হল?..

১৫

গোটা অক্টোবর পাহাড়ী জায়গা ছিল খটখটে ও সোনালী। কেবল গোড়ার দিকে দিন দুয়েক বর্ষণ হয়েছিল, ঠান্ডা পড়েছিল, কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু তার পর এক রাতের মধ্যে দুর্যোগ কোথায় উড়ে চলে গেল, সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে তানাবাই পিছু হটে যায় আর কি — পাহাড়গুলো টাটকা তুষারের টোপর মাথায় তার দিকে এগিয়ে এসেছে! তুষার তাদের কী চমৎকার মানাচ্ছে! তারা তাদের অকলঙ্ক নির্মলতা নিয়ে আলো ছায়ায় সুস্পষ্ট রেখা এঁকে আকাশের নীচে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন বিধাতা সবে তাদের সৃষ্টি করেছেন। ঐ যেখানে তুষার পড়ে আছে, সেখানে শুরু নিঃসীম নীল রেখা। আর তার গহনে, তার দূর-বহুদূর নীলিমায় ফুটে উঠছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর মায়া। আলো ও টাটকা হাওয়ার

প্রাচুর্যে তানাবাই কেমন জড়সড় হয়ে গেল, তার মন কেমন কেমন করতে লাগল। আবার মনে পড়ল তার কথা যার কাছে সে যেত গুলসারির পিঠে চেপে। দৌড়বাজ ঘোড়াটা যদি হাতের কাছে থাকত তাহলে সে তাতে চেপে বসত, আনন্দে ও উল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে সে সকালের এই শুভ্র তুষারের মতো তার কাছে এসে হাজির হত...

কিন্তু সে জানত এটা স্বপ্নমাত্র... তা হোক, জীবনের অর্ধেক স্বপ্নে কেটে যায়, আর সেই কারণেই হয়ত জীবন এমন মধুর। হয়ত এই কারণেই সে দামী যে যা স্বপ্নে দেখা যায় তার সবটা, সবটাই সফল হয় না। সে পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকাল, ভাবল সব লোক একই রকম ভাবে সুখী বলে মনে হয় না। একেক জনের একেক রকম ভাগ্য। আর তাতে আছে নিজস্ব আনন্দ, নিজস্ব দুঃখ, যেমন একই পাহাড়ের ওপর একই সময়ে আছে আলো ও ছায়া। এতেই ত জীবনের পূর্ণতা... "সে নারী হয়ত আর আমার জন্য অপেক্ষা করছে না। এমন ত হতে পারে যে পাহাড়ের ওপর টাটকা তুষার দেখে তাকে ওর মনে পড়েছে..."

মানুষের বয়স বাড়তে থাকে কিন্তু মন তা বলে হার মানতে চায় না, থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, গলা চড়ায়।

তানাবাই ঘোড়ায় জিন চাপাল, ভেড়ার খোঁয়াড় খুলল। বৌ তাঁবুর ভেতর ছিল — তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল:

'জায়দার, আমি ভেড়াগুলোকে চরাতে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কাজকর্ম সারা হতে হতে ফিরে আসব।'

ভেড়ার পাল খুদে পা ফেলে তড়বড়িয়ে চলল, কেবল পিঠ আর মাথার স্রোত খাড়াই বেয়ে চলেছে। আশেপাশের পশুচারণকারীরাও ইতিমধ্যে যার যার ভেড়ার পাল চরাতে

বার করে এনেছে। এখানে-সেখানে ঢাল আর উপত্যকা বয়ে ভেড়ার পাল চলেছে ধরণীর অফুরন্ত দান — তৃণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। শরতের পাহাড়ে বাদামী ও কটা রঙের বিচিত্র তৃণভূমির মধ্যে তারা ছাইরঙা ও সাদা রঙের দঙ্গল বেঁধে চরে বেড়াতে লাগল।

আপাতত সবই ভালো। তানাবাইয়ের ভাগ্যে খারাপ ভেড়ার পাল জোটে নি — মাদী ভেড়াগুলো দুবার-তিনবার বাচ্চা বিইয়েছে। পাঁচশ ভেড়া, পাঁচশ ঝামেলা। বিয়োনোর পর তারা হবে দ্বিগুণেরও বেশি। তবে বিয়োনো, মেষপালকের কঠিন মেহনত শেষ হতে এখনও দেরি আছে।

ঘোড়ার পালের চেয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে কাজ করা অবশ্যই সুবিধের, তা হলেও তানাবাই চট করে অভ্যস্ত হতে পারে নি। ঘোড়ার মতো আর কী আছে! লোকে অবশ্য বলে ঘোড়া লালন-পালনের আর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। গাড়ি চালু হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে ঘোড়া আর লাভজনক নয়। এখন বড় জিনিস ভেড়া পালন — পশম, মাংস, ভেড়ার চামড়া। এরকম কড়াক্রান্তি হিসাবে তানাবাইয়ের বিরক্তি ধরে যায়, যদিও সে বুঝতে পারে কথাটার মধ্যে সত্যি আছে।

ভালো মন্দা ঘোড়ার তত্ত্বাবধানে একটা ভালো ঘোড়ার পাল থাকলে তাকে কখন-সখন কিছু সময়ের জন্য, অর্ধেক দিনের জন্য, এমন কি আরও বেশি সময়ের জন্য ছেড়ে রেখে নিজের অন্যান্য কাজ করতে চলে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভেড়া নিয়ে আর কিছু করার উপায় নেই। দিনের বেলায় তাদের সঙ্গে হাঁট আর হাঁট, আবার রাত হল ত পাহারা দাও। মেষপালক ছাড়াও ভেড়ার পালের সঙ্গে আরও একজন লোক থাকার কথা, কিন্তু তানাবাইয়ের তা জোটে নি। ফলে জুটেছে অখন্ড কাজ — ফুরসৎ নেই, বিশ্রাম নেই। জায়দারকে রাতের

পাহারাদার হিশেবে ধরা হয়েছিল, কেবল দিনের বেলায় সে মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে ভেড়াগ্নলোকে একটু-আধটু দেখে যেতে পারত, মাঝরাত অবধি বন্দ্নক হাতে খোঁয়াড়ের কাছে ঘোরাঘ্নরি করত, তারপর তানাবাইকে নিজেই এসে চৌকি দিতে হত। ইব্রাহিম আবার এখন যৌথখামারে গোটা পশ্নপালন বিভাগের কর্তা, সব ব্যাপারেই সে নিজের পক্ষে য্নক্তি বার করত।

'আপনার জন্যে একটা লোক যোগাড় করি কোত্থেকে বল্নন ত?' ম্নখখানা বিষণ্ণ করে সে বলে। 'আপনি ত বিচক্ষণ লোক। অল্পবয়সীরা সব পড়াশ্ননা করছে। আর যারা করছে না তারা ভেড়া নিয়ে কোন কথা শ্ননতে পর্যন্ত চায় না, শহরে চলে যায়, রেলের কাজ করে, খনির কাজে কোথাও চলে যায়। কী করি ভেবে কূল পাচ্ছি না। আপনার একটি ভেড়ার পাল — তাতেই আপনি কাতরাচ্ছেন। তা হলে আমার অবস্থা? আমার কাঁধের ওপর গোটা পশ্নপালন ব্যবস্থার ভার। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ব দেখছি। ব্থাই এ কাজ নিলাম, ব্থাই। আপনার ঐ বেক্তাইয়ের মতো লোকজন নিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করে দেখ্নন। তার আব্দার হল রেডিও দাও, সিনেমা দেখাও, কাগজ দাও, নতুন তাঁব্ন দাও, সপ্তাহে সপ্তাহে আমার এখানে দোকান নিয়ে এসো। তা যদি না হয় ত যেদিকে দ্ন'চোখ যায় চলে যাব। আপনি তার সঙ্গে অন্তত একটু কথা বলে দেখ্নন না!..'

ইব্রাহিম মিথ্যে বলে নি। সে যে এত উ'চুতে উঠছে তার জন্য সে নিজেই খ্নশী নয়। আর বেক্তাইয়ের ব্যাপারটাও সত্যি। তানাবাই মাঝে মাঝে সময় বার করতে পারলে তার তত্ত্বাবধানাধীন কম্সমোল সদস্য দ্ন'জনের সঙ্গে দেখা করতে আসত। এশিম বলত্বেকভ ছিল নরম-তরম গোছের ছোকরা,

যদিও তেমন চটপটে নয়। আর বেক্‌তাই ছিল সুন্দর, সুঠাম, কিন্তু তার কালো টেরছা চোখ জোড়ার মধ্য থেকে ফুটে বের হত ক্রোধ। তানাবাইয়ের সঙ্গে সে দেখা করত গোমড়া মুখে, তাকে বলত:

'তুমি আর এই নিয়ে ছুটোছুটি করে মরো না। বরং নিজের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে একটু সময় কাটাও। আর আমার ওপর নজর রাখার মতো লোক তুমি ছাড়াও অনেক আছে।'

'তা এতে কিছু খারাপ হবে নাকি?'

'খারাপ হোক আর না-ই হোক — তোমার মতো লোক আমি পছন্দ করি না। তোমরাই কাজ কাজ করে মরলে। কেবল হুর্‌রে আর হুর্‌রে! অথচ মানুষের জীবন নিজেরা ত জানলেই না, আমাদের বাঁচতে দিলে না।'

'তুই ছোঁড়া ঠিক ওভাবে নিস না,' তানাবাই কোনক্রমে নিজেকে সামলে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'আমাকে ওরকম খোঁচাস না বলছি। এটা তোর ব্যাপার নয়। কাজ কাজ করে মরলাম আমরা, তুই না। তার জন্য আফসোসও করি না। তোদের জন্যই কাজ করে মরলাম। তা যদি না করতাম তাহলে দেখা যেত এখন তুই কী ভাবে কথাবার্তা বলতিস। সিনেমা বা খবরের কাগজ ত দূরের কথা নিজের নামই জানতিস না। তোর একটিই নাম থাকত, তিন অক্ষরের নাম — গোলাম!

তানাবাই বেক্‌তাইকে পছন্দ করত না, যদিও এরকম সরাসরি কথার জন্য মনে মনে কোথায় যেন গোপনে তাকে শ্রদ্ধাও করত। ওর চরিত্রের তেজ বৃথাই যাচ্ছে। তানাবাইয়ের খারাপ লাগে এই দেখে যে ছেলেটা বয়ে যাচ্ছে... তারপর তাদের পথ যখন আলাদা আলাদা হয়ে গেল তখন ঘটনাচক্রে শহরে তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়ে গেলেও তানাবাই তাকে কিছু বলল না, তার কথা শোনার জন্য দাঁড়ালও না।

শীত সবে পড়েছে...

শীত তার সাদা রঙের হিংস্র মাদী উটের পিঠে চেপে দ্রুত ছুটে এলো, রাখালদের নাজেহাল করে চলল তাদের অসতর্কতার জন্য।

গোটা অক্টোবর ছিল খটখটে, সোনামোখা। আর নভেম্বরে ঝট করে নেমে পড়ল শীত।

তানাবাই সন্ধেবেলায় ভেড়াগুলোকে নিয়ে এসে খোঁয়াড়ে বন্ধ করল, মনে হল সবই ঠিক আছে। কিন্তু মাঝরাতে বৌ তাকে ডেকে তুলল:

'ওঠ, তানাবাই, আমি একেবারে জমে গেলাম। বরফ পড়ছে।'

তার হাতদুটো ঠান্ডা কন্‌কন্ করছে, সারা গায়ে ভিজে বরফের গন্ধ। বন্দুকটাও ভিজে আর ঠান্ডা।

বাইরে ধবধবে রাত। ঘন হয়ে বরফ ঝরে পড়ছে। ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ের মধ্যে শুয়ে ছটফট করছিল, অনভ্যাসবশত 'মাথা নাড়াচ্ছিল, গলা খাঁকারি দিচ্ছিল, বরফ ঝাড়া দিচ্ছিল, এদিকে বরফ পড়ছে ত পড়ছেই। "রোসো, তোমাকে নিয়ে আমাদের এখনই কী হয়েছে!" ভেড়ার চামড়ার কোটটা গায়ে আরও শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে তানাবাই ভাবল, "সকাল সকাল, বেশ সকাল সকাল এবারে তোমার আগমন হয়েছে, শীত। এর ফল কী? — ভালো না খারাপ? হয়ত বা পরে, শেষের দিকে কিছুটা রেয়াত করবে, কী বল? কেবল ঐ বাচ্চা হওয়ার সময়টায় যদি সরে দাঁড়াও। এছাড়া আমাদের আর কোন অনুরোধ নেই। আপাতত আপন কাজ করে যাও। সে অধিকার তোমার আছে, কাউকে জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই..."

সদ্যোজাত শীত আঁধারে নিঃশব্দে দ্রুত কাজ করে চলল যাতে ভোরবেলায় সকলে হাঁ হয়ে যায়, এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দেয়।

পাহাড়গুলো এখনও বিশাল কালো আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। শীতে তাদের কিছু আসে যায় না। রাখালেরা তাদের পশুপাল নিয়ে ছুটোছুটি করুক। আর পাহাড় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকবে।

সেই স্মরণীয় শীত শুরু হল, তবে তার মনে যে কী ছিল তা তখনও কারও জানা ছিল না।

বরফে মাটি ঢাকা পড়ে রইল, কয়েক দিন বাদে আরেও বরফ পড়ল, তার পর আরও, আরও এবং শেষকালে তা পশুচারণকারীদের হেমন্তকালের চারণভূমি থেকে উৎখাত করে দিল। ভেড়ার পালগুলো এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল, গিরিখাতে, শান্ত এবং অল্প বরফ ঢাকা জায়গায় আশ্রয় খুঁজতে লাগল। শুরু হল পশুচারণকারীদের সুপ্রাচীন কলাকৌশল — যেখানে অন্য লোকে হাল ছেড়ে দিয়ে বলত বরফ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই সেখানে ভেড়ার পালের জন্য খাবার খুঁজে বার করা। এই জন্যই না তারা রাখাল!.. মাঝে-মাঝে ওপরওয়ালা কেউ এসে হাজির হন, একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, এক গাদা এটা-সেটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তড়বড় করে পাহাড়ী এলাকা থেকে ফিরে চলে যান। আর রাখাল আবারও একা রয়ে যায় শীতের মুখোমুখি।

তানাবাইয়ের বারবার ইচ্ছে হত কোন রকমে সময় করে একবার যৌথখামারে যায়, জেনে আসে ভেড়াগুলোর বাচ্চা বিয়োনোর সময় নিয়ে তারা কী ভাবছে, সব কিছু করা হয়েছে কি না, সব জিনিস মজুদ আছে কি না। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল কোথায়! নিশ্বাস ফেলারই অবসর নেই। জায়দার একবার ছেলের কাছে বোর্ডিং স্কুলে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বেশি সময় কাটায় নি: সে জানত যে তাকে ছাড়া তানাবাই খুবই অসুবিধেয় পড়বে। তানাবাই তখন ভেড়ার পাল চরায় মেয়েদের

সঙ্গে নিয়ে। ছোট মেয়েটিকে নিজের সামনে জিনের ওপর বসিয়ে দিত, তাকে জড়িয়ে নিত পশুলোমের কোটের নীচে, মেয়েটার ওম লাগত, আমেজ লাগত, আর বড়টা ঠাণ্ডায় জমে যেত — সে বসত ঘোড়ার পেছন দিকে, বাবার পেছনে। চুল্লীর আগুনও তখন অন্য রকম ভাবে জ্বলত, তাতে ঘরের কোন আরাম পাওয়া যেত না।

পর দিন মা ফিরে আসতে যা হল! বাচ্চারা তার কাঁধে ঝুলে পড়ল, জোর করে তাদের ছাড়িয়ে নিতে হল। না না — বাবা অবশ্যই বাবা, কিন্তু মাকে ছাড়া সে-ও তা নয়।

এইভাবে সময় চলল। শীতটা দেখা দিল চঞ্চল রূপে নিয়ে — এই চেপে ধরে, এই ঢিলে দেয়, বার দুয়েক বরফ-ঝড় হয়েছিল, তার পর থেমে গেল, বরফ গলল। এতেই তানাবোই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ভেড়াগুলোর বাচ্চা বিয়োনোর সময় যদি একটু গরম-গরম থাকে ত ভালো, কিন্তু তা যদি না হয়?

ইতিমধ্যে মাদী ভেড়াগুলোর পেট আরও ভারী হয়ে এলো। কারও কারও, যাদের পেটের বাচ্চা বড়সর কিংবা যমজ, তাদের পেট এখনই ঝুলে পড়তে লাগল। গর্ভবতী মাদী ভেড়াগুলোর পক্ষে পা ফেলা কঠিন হয়ে পড়ল, তারা সন্তর্পণে পা ফেলতে থাকে, শরীর বেজায় কাহিল। পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। আশ্চর্যের কিছু নেই — গর্ভে ভ্রূণ যখন বড় হচ্ছে, যখন তারা মা'র শরীর থেকে রস সংগ্রহ করছে তখনই প্রতিটি ঘাস খুঁজে পেতে বার করতে হচ্ছে বরফের তলা থেকে। রাখালদের কাজ সকাল সন্ধেয় মা-ভেড়াগুলোকে খাওয়ানো, বাইরে থেকে পাহাড়ে পশুখাদ্য নিয়ে আসা, অথচ যৌথখামারের গোলায় সব চাঁছাপোঁছা। কাজে ব্যবহারের ঘোড়ার জন্য দানা ও যই ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রতিদিন সকালে খোঁয়াড় থেকে ভেড়াগুলোকে বার করার সময় তানাবাই মাদী ভেড়াগুলোকে পরীক্ষা করে দেখত, তাদের পেট আর বাঁট হাতে বুলিয়ে দেখত। মনে মনে আঁচ করে দেখল, সব কিছু যদি ভালোয় ভালোয় হয়ে যায় তা হলে ভেড়ার বাচ্চার ব্যাপারে সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবে, কিন্তু পশমের ব্যাপারে সম্ভবত কথা রাখতে পারবে না। শীতে রোঁয়া ভালোমতো জন্মায় নি, কোন কোন ভেড়ার পশম পাতলা পাতলা হয়ে গেছে, ঝরে পড়তে শুরু করেছে — সেই একই কথা বলতে হয় — ভালো করে খাওয়ানো দরকার ছিল। তানাবাই ভুরু কোঁচকায়, রাগ করে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। চোরোর কথা শোনার জন্য মনে মনে নিজেকে কোন রকম গ্যালাগালি দিতে আর বাকি রাখল না। দিব্যি করেছি। মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়েছি। বলেছি আমি সামনের সারির কর্মী, হ্যানা-ত্যানা — আরও কত কিছু, বলেছি পার্টি আর মাতৃভূমির সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি। অন্তত এটাও যদি না বলতাম তাছাড়া এখানে পার্টি আর মাতৃভুমির কথাই বা ওঠে কেন। সাধারণ গেরস্থালীর ব্যাপার। কিন্তু তা বললে ত চলবে না... দস্তুর! দরকারে-অদরকারে পদে পদে আমরা এই কথাগুলো ছুঁড়ে মারি কেন?..

কী আর করা যাবে? নিজেরই দোষ। ভেবে-চিন্তে দেখে নি। অন্যের কথা মতো চলতে লাগল। ওদের আর কি — ওরা কোন না কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে, দুঃখ হয় কেবল চোরোর জন্য। ওর কপালটাই মন্দ। এক দিন ভালো থাকে ত দু'দিন অসুস্থ। সারাটা জীবন ব্যস্ততা, লোককে বুঝিয়ে বলা, আশা-ভরসা দেওয়া, কিন্তু লাভ কী? এখন সতর্ক হয়েছে, বেছে বেছে কথা বলছে। অসুস্থ ত অবসর নিলেই পারে...

শীত চলতে লাগল তার নিজস্ব চালে — কখনও রাখালদের আশা-ভরসা দেয়, কখনও বা তাদের ভয় দেখায়। তানাবাইয়ের পালে দুটো মাদী ভেড়া না খেতে পেয়ে ধুঁকে মারা গেল। তার অধস্তন, অল্পবয়সী পশুপালক দু'জনেরও বেশ কিছু করে ভেড়া গেল। কিন্তু এটা কোন ব্যতিক্রম নয়। শীতে গোটা দশেক মাদী ভেড়া যাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। বড় ঘটনা অপেক্ষা করে ছিল সামনে, বসন্ত আসার মুখে।

হঠাৎ গরম শুরু হয়ে গেল। ভেড়াদের বাঁটগুলো সঙ্গে সঙ্গে টসটসে হয়ে উঠল। তাকালেই চোখে পড়ে তারা একেবারে হাড় জিরজিরে, কোনক্রমে পেট টেনে নিয়ে চলছে, বাঁটের মুখগুলো গোলাপী হয়ে আসছে, ফুলে উঠছে দিনে দিনে ত নয়, যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কী করে কে জানে? কোথা থেকে এমন শক্তি আসে? এমন কথা শোনা গেল যে কার যেন কয়েকটি মাদী ভেড়া ইতিমধ্যে বাচ্চা দিয়েছে। তার মানে পাল দেওয়ার সময় ঠিকমতো দেখা হয় নি। এটা ছিল প্রথম সংকেত। দুয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভেড়ার বাচ্চাগুলো নাশপাতির মতো ঝরে পড়বে। গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার জো। রাখালের বড় দুর্ভোগের কাল শুরু হয়ে যাবে! প্রতিটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য সে উদ্বেগ বোধ করবে, যে দিন থেকে সে ভেড়া চরানোর কাজ নিয়েছে সে দিনটিকে সে শাপ-শাপান্ত করবে, আবার ভেড়ার বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারলে, বাচ্চাগুলো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শীতের উদ্দেশে তাদের পুচ্ছ আন্দোলন করলে তার আনন্দের আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু কেবল সব যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায়, যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায়! যেন লোকের সামনে থেকে মুখ লুকোতে না হয়...

বাচ্চা বিয়োনোর সময় সাহায্যের জন্য যৌথখামার থেকে

লোক পাঠানো হল — এই কাজে যে সব মহিলাকে গাঁ থেকে বার করা সম্ভব হল তাদের অধিকাংশই নিঃসন্তান ও বয়স্থা। তানাবাইয়ের পালে পাঠানো হল দু'জনকে। তারা বিছানাপত্র, তাঁবু আর মালপত্র নিয়ে হাজির হল। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এরকম সাহায্য করার লোক অন্তত সাত জন দরকার ছিল। ইব্রাহিম আশ্বাস দিল ভেড়ার পালকে যখন প্রসবের জন্য পঞ্চতরু উপত্যকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের পাওয়া যাবে, কিন্তু আপাতত এ-ই যথেষ্ট।

ভেড়ার পালগুলোর মধ্যে নড়াচড়া দেখা দিল, তারা নেমে আসতে লাগল আরও নীচে, পাহাড়ের পাদদেশে, প্রসবের জন্য বিশেষ জায়গায়। এশিম বলত্‌বেকভকে তানাবাই অনুরোধ জানাল সে যেন মেয়েদের ঐ জায়গা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাদের থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে, তানাবাই ততক্ষণ ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ভোর থাকতে থাকতে তাদের গোটা একটা কারাভান পাঠিয়ে দিল, আর নিজে ভেড়াগুলোকে জড় করে তাদের স্বচ্ছন্দ গতিতে ছেড়ে দিল যাতে মাদী ভেড়াগুলোকে বাচ্চা পেটে দিয়ে চলতে অসুবিধে না হয়। তার পর তাকে পঞ্চতরু উপত্যকার অভিমুখী এই পথটিকেই আরও দু'বার পার হতে হবে, অধস্তনদের সাহায্য করতে হবে।

ভেড়াগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল, তাদের একটু তাড়া দেওয়ারও উপায় নেই। তানাবাইয়ের কুকুরটা অবধি বিরক্ত হয়ে উঠল, পাশে পাশে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

সূর্য পাটে যেতে বসেছে, কিন্তু তাপ দিচ্ছিল। ভেড়ার পাল যতই পাহাড়ের পাদদেশের দিকে নামছিল ততই গরম লাগছিল। রোদে গাছগাছড়া অংকুরিত হয়ে উঠছিল।

পথে কিছুটা দেরি হয়ে গেল — এই প্রথম একটা ভেড়া বাচ্চা বিয়োল। এমনটা হওয়ার কথা নয়, তানাবাই মুষড়ে

পড়ল, নবজাতকের নাক ও কান ফুঁ দিয়ে সাফ করতে লাগল। বাচ্চা বিয়োনোর সময় আরও এক সপ্তাহ বাদে শুরু হওয়ার কথা। অথচ কাণ্ডটা দেখ!

পথে আরও বাচ্চা জন্মাতে শুরু করবে না কি? অন্যগুলোকে পরীক্ষা করে দেখল — না, দেখে ত মনে হয় না। নিশ্চিন্ত হল, মনে মনে একটু একটু খুশিও হল। মেয়েরা তার প্রথম ভেড়ার বাচ্চা দেখে খুশি হবে। প্রথম বাচ্চা সব সময়ই আদরের। বাচ্চাটাও ভালো বলেই মনে হল — রঙটা সাদা, চোখের পলকগুলো কালো, কালো রঙের খুর। পালে গোটা কয়েক আধা রুক্ষ পশমওয়ালা ভেড়া ছিল, তাদেরই একটা বাচ্চা দিয়েছে। এই ধরনের ভেড়ার বাচ্চাগুলো সচরাচর শক্ত সমর্থ গোছের ও রোমশ হয়, সূক্ষ্ম পশমওয়ালা ভেড়ার বাচ্চাগুলো প্রায় উলঙ্গ হয়ে জন্মায়, কিন্তু এরা সে রকম নয়।

'তা তুই যখন তাড়াহুড়োই করলি, তখন দুনিয়ার দিকে চোখ মেলে দ্যাখ না হয়,' তানাবাই মৃদুস্বরে বলল। 'আমাদের জন্য সুখ নিয়ে আয়। নিয়ে আয় তোর মতো আরও অনেককে — এত জনকে, যেন পা ফেলার আর জায়গা না থাকে, যেন তোদের সকলের গলার আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়, যেন তোরা সকলে মিলেমিশে থাকিস!' সে ভেড়ার বাচ্চাটাকে মাথার ওপর তুলে ধরল। 'এই দেখ, ভেড়াদের রক্ষাকর্তা, এ হল আমাদের প্রথম, আমাদের সহায় হও!'

চার দিকে পাহাড় আর পাহাড়, মৌন পাহাড়।

তানাবাই ভেড়ার বাচ্চাটাকে তার পশুলোমের কোটের মধ্যে ঢেকে নিয়ে ভেড়াগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে চলল। মা-ভেড়াটা উদ্বিগ্ন হয়ে পেছন পেছন ছুটছিল আর ডাকছিল।

'চলে আয়, চলে আয়!' তানাবাই তাকে বলল। 'এখানে ও আর কোথায় যাবে?'

কোটের ভেতরে বাচ্চাটা শুকিয়ে ঝরঝরে হল, তার শরীর গরম হল।

সন্ধে নাগাদ তানাবাই ভেড়ার পালকে নির্দিষ্ট জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে এলো।

ততক্ষণে সকলেই যে যার মতো জায়গা করে নিয়েছে, তাঁবু থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাহায্য করার জন্য যে দুটি মেয়েলোক এসেছে তারা তাঁবুর সামনে কাজে ব্যস্ত। দেখা যাচ্ছে স্থান বদলের পাট চুকে গেছে। এশিমকে দেখা গেল না। ও হ্যাঁ, সে ত বোঝাই উট নিয়ে চলে গেছে — কাল তার নিজেরই জায়গায় উঠে যাওয়ার কথা। সব ঠিক আছে।

কিন্তু এর পর তানাবাই যা দেখতে পেল তাতে সে থ বনে গেল — এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ভালো কিছু সে অবশ্য আশা করে নি, কিন্তু প্রসবের জন্য তৈরী ছাউনিটার শণের চালা পচা ও ধবসে পড়া হবে, ছাউনির বেড়া শতচ্ছিদ্র হবে, তাতে কোন জানলা-দরজা থাকবে না এবং ঘরের ভেতর বাতাস এলোমেলো বইতে থাকবে — না, এটা সে আশা করে নি। চারপাশে কোথাও বরফ ছিল না বললেই হয়, অথচ ছাউনির ভেতর তুষারের স্তূপ।

কোন এক কালে ইঁট-পাথরে গড়া খোঁয়াড়টাও বিধবস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তানাবাইয়ের মন এমন খারাপ হয়ে গেল যে সে চেয়েও দেখল না ভেড়ার বাচ্চা পেয়ে মেয়েরা কেমন আনন্দ করছে। সে বাচ্চাটাকে ওদের হাতে গছিয়ে দিয়ে চার দিক ভালো করে দেখতে গেল। যেদিকেই চোখ পড়ে সর্বত্র ঐ একই রকম অব্যবস্থা — এমন হাল দুনিয়ায় কদাচ দেখতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেই যুদ্ধের সময় থেকে এখানে সব কিছুই পরিত্যক্ত, লোকে কোনক্রমে ভেড়ার বাচ্চা বিয়োনোর কাজ সেরে যাবতীয় আর সব বৃষ্টি-বাদল ও বাতাসের হাতে

ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। ঘরের চালের ওপর শোচনীয় অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছে পচা বিচালির স্তূপ, ইতস্তত ছড়ানো খড়ের গাদা — এক কোণে পড়ে থাকা জোয়ারের আটার দুটো বস্তা আর এক পেটি লবণের কথা বাদ দিলে গোটা পালের বাচ্চা ও ধাড়ি ভেড়ার জন্য এ-ই হল মোট খাদ্য, মোট তৃণশয্যা। ঐ কোণেই পড়ে ছিল কাচভাঙা কয়েকটি লণ্ঠন, কেরোসিনের মরচে ধরা কেঁড়ে, দুটো কোদাল আর ভাঙা পিচফর্ক। তানাবাইয়ের বড়ই ইচ্ছে হচ্ছিল কেরোসিন ঢেলে গোটা জায়গাটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যায়...

তানাবাই চলতে চলতে গত বছরের গোবর আর বরফের জমাট স্তূপে হোঁচট খেতে লাগল, কী বলবে ভেবে কূল পায় না। কথা খুঁজে পায় না। বাতুলের মতো ঘুরে ফিরে কেবল একটি কথাই বলে চলল: "কী করে যে এমন সম্ভব!.. কী করে যে এমন সম্ভব!.. কী করে যে এমন সম্ভব!.."

তারপর সে ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় জিন চাপাল। জিন চাপাতে চাপাতে তার হাত কাঁপতে লাগল। এখন সে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে মাঝরাতে সকলকে ডেকে তুলবে এবং কী যে করবে তা সে নিজেই জানে না! ঐ ইব্রাহিমটার, সভাপতি আলদানভ আর চোরোর কলার চেপে ধরবে: কোন ছাড়াছাড়ি নেই! তারা যখন ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে তখন ওর কাছ থেকেও ভালো ব্যবহার পাবে না! সহ্যের সীমা আছে!..

'দাঁড়াও বলছি!' জায়দার ছুটে এসে লাগাম চেপে ধরল। 'কোথায় যাচ্ছ? অমন কাজও করো না। নামো, আমার কথা শোন!'

কিন্তু কিসের কী? তানাবাইকে ঠেকায় কে?

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' লাগাম ছিনিয়ে নিতে নিতে বৌকে ধাক্কা দিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতে মারতে সে চেঁচাতে লাগল। 'ছেড়ে দাও বলছি! আমি ওদের খুন করব! খুন করব!'

'ছাড়ব না! কাউকে খুন করতে চাও? আমাকে খুন কর।'

সেই মুহূর্তে জায়দারের সাহায্যের জন্য কাজের মহিলারা ছুটে এলো, মেয়েরাও ছুটে এলো, সকলে মিলে কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

'আব্বা! আব্বা! যেও না!'

তানাবাই ঠান্ডা হল, কিন্তু তখনও যাওয়ার চেষ্টা ছাড়ে না।

'আমাকে আটকিও না, দেখতে পাচ্ছ না এখানকার হাল? দেখতে পাচ্ছ না পোয়াতি ভেড়াগুলোর দশা? কাল আমরা ওদের কোথায় রাখব? চালা কোথায়? খাবার কোথায়? সবগুলো মরে-হেজে যাবে। কে জবাবদিহি করবে? আমাকে যেতে দাও!'

'দাঁড়াও, একটু শোনই না হয়। ভালো কথা, না হয় তুমি গেলে, গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি, তুলকালাম বাধিয়ে তুললে। তাতে হবেটা কী? আজ পর্যন্ত যখন কিছুই করতে পারে নি তার মানে ওদের এ ব্যাপারে কোন সামর্থ্যই নেই। কিছু বানানোর মতো মালমশলা থাকলে যৌথখামার কী আর নতুন ঠাঁই তৈরি করে দিত না?'

'কিন্তু চাল ত ঠিক করা যেত? দরজা কোথায়? জানলাই বা কোথায়? চার দিকে সবই ভাঙাচোরা, চালাঘরের ভেতরে বরফ, বছর দশেকের মধ্যে নাদ সাফ করা হয় নি! আর বল দেখি এই পচা খড় কুটোয় কত দিন চলবে? বাচ্চাগুলোর জন্যেও এই রকম বিচুলি? বিছানোর জন্যে খড় পাবে কোত্থেকে?

ভেড়ার বাচ্চাগুলো আবর্জনার মধ্যে পচে মরুক, তাই না? তাই চাও না কি? সরে যাও!'

'যথেষ্ট হয়েছে, তানাবাই. স্থির হও। তুমি কি সকলের চেয়ে বেশি বোঝ না কি? আমরা আর সকলেরই মতো। তুমি আবার মরদ না কি?' বৌ তাকে লজ্জা দিয়ে বলল। 'সময় থাকতে থাকতে বরং ভেবে দেখ কী করা যায়। ওরা মরুক গে। আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, আমাদেরই যা করার করতে হবে। পথে আসতে আসতে ওখানে, নীচু জায়গাটায় আমি বনগোলাপের ঘন ঝাড় দেখে এসেছি, অবশ্য কাঁটায় ভর্তি — কিন্তু কেটে নিয়ে চাল ছেয়ে ফেলতে পারি, ওপরে গোবর লেপে দেওয়া যাবে। আর ঘরে বিছানোর জন্যে আগাছা কেটে নিতে হবে। আবহাওয়া ডুবিয়ে না দিলে কোন রকমে পারে পেয়ে যাব'খন...'

এসময় কাজের মেয়েলোক দু'জনও তানাবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তানাবাই জিন থেকে নেমে রাগে ওদের সকলের গায়ে থু থু ছিটিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল। ভারী অসুখের পর মাথাটা যে রকম ঢলে পড়ে থাকে সেই ভাবে মাথা নীচু করে বসে রইল।

বাড়ির সবাই চুপ। কথাবার্তা বলতে ভয় করছিল। জায়দার ঘুঁটের আঁচ থেকে কেটলি তুলে নিয়ে বেশ কড়া করে চা ভেজাল, হাত ধোয়ার জন্য স্বামীকে বদনা করে জল এনে দিল। পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে দিল, কোথা থেকে যেন কিছু মিঠাই আর হলুদ চাকতি করা জমাট ঘিয়ের টুকরো যোগাড় করে এনে থালার ওপর রাখল। সাহায্যকারিণীদের ডাকা হল, সকলে মিলে চা পান করতে বসল। ওঃ এই মেয়েমানুষগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না! পেয়ালা করে চা খায়, এটা-ওটা নানা কথা বলে — যেন নেমন্তন্ন খেতে বসেছে।

তানাবাই চুপ করে রইল, চা পানের পর বেরিয়ে এসে খোঁয়াড়ের ধবসে পড়া ইঁট-পাথর ঠিকঠাক করতে লাগল। কাজ এখানে পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু রাতের বেলায় ভেড়াগুলোকে রাখার জন্য অন্তত কিছু ত করতেই হয়। মহিলা দু'জনও বেরিয়ে এসে কাজে যোগ দিল। এমন কি তানাবাইয়ের মেয়েরাও পাথর বয়ে আনার চেষ্টা করতে ছাড়ল না।

'দৌড়ে বাড়ি চলে যা,' তানাবাই তাদের বলল।

তার লজ্জা করছিল। সে চোখ না তুলেই ইঁট-পাথর টানতে লাগল। চোরোর কথাটাই ঠিক: জায়দার না থাকলে ডাকাবুকো স্বভাবের ফলে তানাবাইয়ের মুণ্ডুটা যে কবে খসে পড়ত!..

১৬

পরদিন তানাবাই চারণভূমি বদলের ব্যাপারে তার অধস্তনদের সাহায্য করতে গেল, তার পর সারাটা সপ্তাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেল। এমন অবস্থা আর কখনও হয়েছিল বলে সে মনেও করতে পারল না — হয়ত বা হয়েছিল রণাঙ্গনে, যখন দিনরাত ধরে তারা প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে। কিন্তু সেখানে তা করে গোটা রেজিমেন্টের সঙ্গে, ডিভিশনের সঙ্গে, সেনাদলের সঙ্গে। আর এখানে — সে নিজে, তার বৌ আর সাহায্যকারিণীদের একজন। দ্বিতীয় জন কাছে-পিঠে ভেড়া চরাচ্ছিল।

সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াল চালাঘরের নাদ সাফ করা এবং বনগোলাপের ডালপালা কেটে আনা। দেখা গেল, ঝোপগুলো ঘন আর কাঁটায় গিজগিজে। তানাবাইয়ের গোটা বুটজোড়া ক্ষতবিক্ষত হল, তার ফৌজী ওভারকোটটার দফারফা

হল — সারা গা কাঁটায় ছেয়ে গেছে। বনগোলাপের কাটা ডালপালা দড়িতে বেঁধে টেনে আনতে হল, কেননা কাঁটা আছে বলে ঘোড়ার পিঠে চাপান যায় না, নিজেও পিঠে করে বয়ে আনা সম্ভব নয়। তানাবাই শাপ-শাপান্ত করতে লাগল — নামেই পঞ্চতর্‌ উপত্যকা, অথচ সেখান থেকে পাঁচটা গ্‌ঁড়িও খ্‌ঁজে পাওয়া ভার। দ্‌মড়ে বেঁকে ত্রিভঙ্গ অবস্থায়, ঘর্মাক্ত কলেবরে তারা ঐ জঘন্য কাঁটাঝোপকে দড়ি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো, ওগ্‌লোর চাপে চালাঘরের দিকে চষা জমির মতো পথ আঁকা হয়ে গেল। মেয়েলোকদের জন্য তানাবাইয়ের দ্‌ঃখ হতে লাগল, কিন্তু কিছ্‌ই করার নেই। উদ্বেগ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছিল। সময় গোনা গাঁথা, আকাশের দিকেও তাকিয়ে দেখতে হয় — সেখানে অবস্থাটা কেমন? বরফ ঝরলে এসবের আর কোন অর্থই থাকবে না। বারবার সে তার বড় মেয়েকে ভেড়ার পালের কাছে ছ্‌টে গিয়ে জেনে আসতে বলে বিয়োনো শ্‌র্‌ হয়ে গেল কিনা।

নাদ সাফ করার ব্যাপারটি বড়ই শোচনীয়। এত বেশি পরিমাণ গাদা হয়ে ছিল যে মাস ছয়েকেও সে আবর্জনা দ্‌র হওয়ার নয়। ভালো চালার নীচে শ্‌কনো, ঠাসা ভেড়ার নাদা পড়ে থাকলে তা পরিষ্কার করেও স্‌খ। কাটা কাটা স্তর এক একটি নিরেট পিন্ড হয়ে বেরিয়ে আসে। বড় বড় চাঙ্গড়ায় তাকে শ্‌কোনোর জন্য জমা করে রাখা হয়। ভেড়ার নাদের উত্তাপ সোনার মতো স্নিগ্ধ ও খাঁটি, রাখালেরা শীতকালের ঠান্ডায় তা জ্বালিয়ে আগ্‌ন পোহায়। কিন্তু নাদ যদি এখানকার মতো বৃষ্টি কিংবা বরফের নীচে পড়ে থাকে তবে তা নিয়ে ঝামেলা করার চেয়ে কষ্টকর আর কিছ্‌ই হতে পারে না। হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। কিন্তু সময় দাঁড়িয়ে নেই। রাতে ধোঁয়া ওঠা লণ্ঠন জ্বালিয়ে তারা ঠেলায় করে ঠান্ডা, এঁটেল, সীসের মতো

ভারী আবর্জনা বয়ে আনতে লাগল। দু'দিন দুই রাত এই কাজ চলছে।

পেছনের উঠোনে ইতিমধ্যে বিরাট এক ডাঁই নাদ জড় হল, অথচ চালাঘরে এখনও অঢেল কাজ পড়ে রয়েছে। সম্ভাব্য বাচ্চাগুলোর জন্য চালাঘরের অন্তত একটা কোণও যাতে সাফ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ওরা তাড়াহুড়ো করতে লাগল। কিন্তু সমস্ত মাদী ভেড়া আর তাদের বাচ্চাদের ঠাঁই হওয়ার পক্ষে এই বিরাট গোটা চালাঘরটাই যেখানে যথেষ্ট নয় সেখানে একটা কোণায় কী হবে? — একেক দিনেই ত বিশ-তিরিশটা করে ভেড়ার বাচ্চা জন্মাবে! "কী হবে?" — ঠেলায় নাদ চাপাতে চাপাতে, তা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে, তার পর আবার ফিরে আসতে আসতে তানাবাই কেবল একথাই ভাবতে লাগল, মাঝরাত অবধি, ভোরবেলা অবধি অবিরাম এই ভাবে চলল। গা ঘুলিয়ে উঠল। হাতদুটো অবশ হয়ে গেল। তায় আবার বাতাসে লণ্ঠন থেকে থেকে নিভে যায়। সুখের কথা এই যে সাহায্যকারিণীরা কোন অভিযোগ করল না, তানাবাই ও জায়দারের মতোই কাজ করে চলল।

এক দিন এক রাত কেটে গেল, তারপর আরও এক দিন এক রাত আরও এবং আরও। অথচ তারা নাদ সাফ করে চলছে, দেয়ালের ও চালের ফুটো বন্ধ করছে ত করছেই। এক দিন রাতে ঠেলা নিয়ে চালাঘর থেকে বের হওয়ার সময় তানাবাইয়ের কানে এলো খোঁয়াড়ে ভেড়ার বাচ্চার ডাক, তার উত্তরে মা-ভেড়া পায়ে ঠকঠক আওয়াজ তুলে তারস্বরে ডাকছে। "শুরু হয়ে গেল!" তানাবাইয়ের বুকটা দমে গেল।

'শুনেছ?' তানাবাই বৌয়ের দিকে ফিরে বলল।

তারা তৎক্ষণাৎ নাদভর্তি ঠেলা ফেলে লণ্ঠন হাতে করে খোঁয়াড়ে ছুটল।

লণ্ঠনের মিটমিটে অস্বচ্ছ আলো ভেড়ার পালের গায়ে এদিক-ওদিক ঘোরানে হল। কোথায় ওটা? ঐ ত কোণায়! মা-ভেড়াটা ইতিমধ্যেই সদ্যোজাত বাচ্চার ছোট্ট থরথর শরীর চাটছিল। জায়দার তাকে তুলে আঁচলের নীচে জড়িয়ে নিল। ভালো কথা যে সময় মতো আসতে পেরেছে, তা না হলে ঐ খোঁয়াড়েই জমে মারা যেত। পাশে দেখা যাচ্ছে আরও একটি ভেড়া বাচ্চা দিয়েছে। ওটার হয়েছে যমজ। ওগুলোকে তানাবাই রাখল তার বর্ষাতির আড়ালে। আরও গোটা পাঁচেক ভেড়া শুয়ে শুয়ে প্রসববেদনায় চাপা আর্তনাদ করছিল। তার মানে শুরু হয়ে গেল। সকালের দিকে এরাও বাচ্চা দেবে। সাহায্যকারিণীদের ডাকা হল। যে সব ভেড়ার বাচ্চা হয়েছে সেগুলোকে তারা খোঁয়াড় থেকে বার করে আনতে লাগল যাতে চালাঘরের যে কোণটি ইতিমধ্যে কোন রকম সাফ করা হয়েছে সেখানে ওগুলোর জায়গা করা যায়।

তানাবাই দেয়ালের ধারে খড়কুটো বিছিয়ে দিল, মাতৃদুগ্ধের প্রথম আস্বাদে পরিতৃপ্ত শাবকগুলোকে শুইয়ে দিল, তাদের গায়ে বস্তা ঢাকা দিল। ঠাণ্ডা। মা-ভেড়াগুলোকেও ওখানে আনা হল। তারপর সে ঠোঁট কামড়ে ভাবতে লাগল। ভেবেই বা লাভ কী? একমাত্র আশা এই যে হয়ত সব কিছু কোন না কোন ভাবে হয়ে যাবে। কত কাজ, কত ঝামেলা... খড়কুটোও যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকত, কিন্তু তা-ও নেই। ইব্রাহিম এ ব্যাপারেও একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ বার করবে। বলবে রাস্তাঘাট ছাড়া পাহাড়ে খড় বয়ে আনার চেষ্টা করে দেখ না।

ওঃ, যা হওয়ার তা হবে! তাঁবুতে গিয়ে গোলা কালির একটা টিন নিয়ে এলো। একটা ভেড়ার বাচ্চার পিঠে আঁকল দুই আর যমজের এক একটির পিঠে — তিন। মা-ভেড়াগুলোকে ঔ রকম নম্বরি করল। তা না হলে যখন তারা শয়ে শয়ে

গিজগিজ করবে তখন কার কোনটা বোঝার চেষ্টা করে দেখ একবার। রাখালের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সময় এলো বলে!

সে সময় শুরু হল অকস্মাৎ, নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে — যেমন হয়ে থাকে প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে, যখন ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে অথচ আটকানোর কিছু নেই। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ট্রেঞ্চের ভেতর, সরার উপায় নেই, কেননা কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। দুয়ের এক — হয় কোন অলৌকিক কারণে সংঘর্ষে টিকে যাবে, নয়ত মারা যাবে।

সকালবেলায় ভেড়ার পালকে চারণভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে তানাবাই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, চুপচাপ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, যেন নিজের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। তার প্রতিরক্ষা ছিল জরাজীর্ণ, অপদার্থ ধরনের। কিন্তু তাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। পিছু হটার কোন জায়গা নেই। দুই টিলার মাঝখানে ঠাসাঠাসি করে আছে এক আঁকাবাঁকা ছোট উপত্যকা ও অগভীর স্রোতস্বিনী, তাদের পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আরও উঁচু পাহাড়-পর্বত, তাদের পেছনে আছে আরও উঁচু উঁচু বরফ ঢাকা চুড়ো। সাদা ঢালের ওপরে কালো চকচক করছে নগ্ন শিলারাশি আর ওদিকে নিরেট বরফের চাদরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পর্বতশ্রেণীতে চলেছে শীতের প্রকোপ। হাত বাড়ালেই সে শীত ও জায়গা ছুঁতে পারে। একটু নড়েচড়ে উঠে মেঘরাশিকে নীচের দিকে ফেলে দিলেই হল — উপত্যকা আঁধারে ডুবে যাবে তার আর পাত্তা মিলবে না।

আকাশ ছিল ধূসর, স্যাঁতসেঁতে ধূসর আবছায়ায় ঢাকা। নীচ থেকে বাতাস বইছিল। চারদিক নির্জন। পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। ভয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসছে। এদিকে ধসে পড়া চালাঘরের মধ্যে ভেড়ার বাচ্চার ডাক শোনা যাচ্ছে।

এই মাত্র পাল থেকে আরও গোটা দশেক ভেড়াকে আলাদা করা হয়েছে — ওগুলো শিগ্‌গিরই বাচ্চা বিয়োবে।

ভেড়ার পাল ধীরে ধীরে চলল যৎসামান্য খাদ্যের সন্ধানে। সেখানে, চারণভূমিতেও এখন ওদের চোখে চোখে রাখা দরকার। শিগ্‌গিরই বাচ্চা দেবে তেমন কোন লক্ষণও ভেড়া সব সময় প্রকাশ করে না। হঠাৎ হয়ত ধপ করে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ে খালাস করল। নজর এড়িয়ে গেলে ভেড়ার বাচ্চা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জমে যাবে, তখন আর তার বাঁচার কোন আশা নেই।

তানাবাই টিলার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। শেষকালে ধুত্তোর বলে হাত নেড়ে সে চালাঘরের দিকে পা বাড়াল। সেখানে কাজ এখনও অঢেল — ইতিমধ্যে আরও কিছু অন্তত করে ফেলা দরকার।

পরে ইব্রাহিম এলো, কিছু আটা সে নিয়ে এসেছে — চোখের চামড়া নেই... বলে কিনা, তা আপনাদের জন্যে রাজপুরী কোত্থেকে পাব? যৌথখামারে যেমন চালাঘর ছিল তেমন চালাঘরই আছে। অন্য রকম আর নেই। এখনও কমিউনিজমে পেঁছাই নি।

লোকটার ওপর ঘুসি পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে তানাবাই অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল।

'এ নিয়ে তোমার ঠাট্টা মস্করা কেন? আমি কাজের কথা বলছি, কাজ নিয়ে ভাবছি। আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।'

'আপনি বুঝি মনে করেন আমি ভাবি না? আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে কোন একটা পালের জন্যে আর আমাকে দিতে হচ্ছে সব কিছুর জন্যে, আপনার জন্যে, বাকি আর সকলের জন্যে, পশুপালন ব্যবস্থার জন্যে। আপনি কি

ভাবছেন আমার পক্ষে সহজ!' বলেই তানাবাইকে অবাক করে দিয়ে ধূর্ত ইব্রাহিম দু'হাতে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে বলল: 'আমাকে জেলে যেতে হবে! জেলে যেতে হবে! কোথাও কিছু পাবার উপায় নেই। লোকে সাময়িক ভাবে সাহায্যের জন্যও এগিয়ে আসতে চায় না। আমাকে খুন কর, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল, আমি আর কিছুই পারি না। আমার থেকে কেউ যেন কিছু আশা না করে। মিছিমিছি আমি এ কাজ নিতে গেলাম...'

এই বলে সরল তানাবাইকে রীতিমতো অস্বস্তির মধ্যে ফেলে সে চলে গেল। আর তাকে সেখানে দেখাই যায় নি।

আপাতত প্রথম একশটি ভেড়া বাচ্চা দিল। উপত্যকার আরও ওপরের দিকে ছিল এশিম ও বেক্‌তাইয়ের ভেড়ার পাল — সেখানে বাচ্চা বিয়োনো এখনও শুরুই হয় নি, কিন্তু তানাবাই এখনই অনুভব করল যে একটা বিপর্যয় এগিয়ে আসছে। প্রৌঢ়া সাহায্যকারিণীটি, যে এখন সব সময়ই ভেড়ার পাল চরায় আর তানাবাইয়ের ছয় বছর বয়সী বড় মেয়েটি — এদের বাদ দিলে যে ক'জন ছিল তারা সকলে — তিন জন বয়স্ক মানুষ মিলে হিমশিম খেয়ে যেতে লাগল ভেড়ার বাচ্চা তুলে এনে ধোয়াপোঁছা করে মা-ভেড়াদের কাছে নিয়ে আসতে, হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ওদের গরম রাখতে, নাদ সাফ করতে আর ঘরে বিছানোর জন্য শুকনো ডালপালা বয়ে আনতে। এদিকে শোনা যেতে লাগল ক্ষুধার্ত ছানাগুলোর আর্তনাদ — মায়ের দুধে তাদের কুলোচ্ছিল না, মা-ভেড়াগুলো হয়ে গেছে হাড্ডিসার, তাদের

খাওয়ানোর মতোও কিছু ছিল না। সামনে আরও কী আছে কে জানে?

পশুপালকেরা দিন আর রাত চর্কির মতো বন্‌বন্‌ ঘুরে চলল, বাচ্চা জন্মাচ্ছে ত জন্মাচ্ছেই — নিশ্বাস ফেলার অবসর নেই, কোমর টান করার জো নেই।

আর গতকাল আবহাওয়া তাদের কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল! হঠাৎ বেজায় ঠাণ্ডা পড়ে গেল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, জমাট তুষারের কণা ঝরে পড়ল। সব আঁধারে ডুবে গেল, কালো হয়ে এলো...

কিন্তু দেখতে দেখতে মেঘ কেটে যেতে গরম পড়তে লাগল। বাতাসে বসন্তের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। "আল্লাহ করুন, হয়ত বসন্ত দেখা দেবে। কেবল একটু শক্ত পায়ে দাঁড়ালেই না হয়! নইলে যখন এদিক-ওদিক নড়বড় করতে থাকে তার চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না," খড়ের সঙ্গে গর্ভমোচনের পর অবশিষ্ট জলীয় আবর্জনা ঝেঁটিয়ে সাফ করতে করতে তানাবাই ভাবল।

বসন্ত এলো, কেবল তানাবাই তাকে যে রূপে আশা করেছিল সে রূপে নয়। রাতে অকস্মাৎ সে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করল বৃষ্টি, কুয়াসা আর তুষারপাত দিয়ে। নিজের সমস্ত পরিমাণ আর্দ্রতা ও শীতলতা নিয়ে সে ভেঙ্গে পড়ল চালাঘরের ওপর, তাঁবু আর খোঁয়াড়ের ওপর, চারদিকের যাবতীয় জিনিসের ওপর। বরফ জমা কাদাটে মাটি জলধারা আর ডোবায় ফুলে ফেঁপে উঠল। পচা চালা ভেদ করে বসন্তের সে বন্যা চুঁইয়ে পড়ল, দেয়াল ধুয়ে দিয়ে চালাঘর ডুবিয়ে দিতে চলল, সেখানকার বাসিন্দাদের হাড়মাস ভেদ করে কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে লাগল। সবাইকে সচকিত করে তুলল। ভেড়ার বাচ্চাগুলো জলের মধ্যে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে,

মাদী ভেড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চা বিয়োচ্ছে আর আর্তনাদ করছে। সদ্যোজাত শাবকগুলো ভূমিষ্ঠ হতে না হতে বসন্তের কনকনে জল তাদের মন্ত্রস্নান করে দিচ্ছে।

লোকজন বর্ষাতি গায়ে লণ্ঠন হাতে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তানাবাইয়ের ছুটোছুটির অন্ত নেই। এক জোড়া তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো অন্ধকারে তার বিরাট বিরাট বুট ডোবার ওপর দিয়ে, জলে ধোয়া নাদের ওপর দিয়ে ছুটল। তার বর্ষাতির ধারগুলো আহত পাখির ডানার মতো ঝটপট করতে লাগল। তার গলা ভেঙ্গে গেল, সে নিজের উদ্দেশে আর অন্যদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল:

'ঝটপট্ শাবলটা দাও! কোদাল দাও! এখানে নাদ স্তূপ কর! জল আটকাও!'

চালাঘরের ভেতর তোড়ে জলের ধারা ছুটছে — তাকে অন্তত কিছুটা একপাশে সরিয়ে দেওয়া দরকার। হিমে জমা মাটি কেটে সে নালা তৈরি করল।

'আলো দাও! এখানে আলো দাও! দেখছ কী হাঁ করে!'

এদিকে রাত কুয়াসার চাদরে ঢাকা। বরফ আর বৃষ্টি মুষলধারে পড়ছে। কিছুতেই আর স্রোত থামানোর উপায় নেই।

তানাবাই তাঁবুতে ছুটে গেল। আলো জ্বালাল। এখানেও চারদিক থেকে জল পড়ছে। অবশ্য চালাঘরের মতো অবস্থা নয়। বাচ্চারা ঘুমিয়ে ছিল, তাদের কম্বল ভিজে গেছে। তানাবাই বিছানা সমেত বাচ্চাদের পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এক কোণে সরিয়ে দিয়ে তাঁবুর অনেকখানি জায়গা খালি করে দিল। বাচ্চাদের গায়ে ওপর থেকে এক টুকরো পশম ফেলে দিল যাতে তলার কম্বলটা ভিজে না যায়, তার পর ছুটে বেরিয়ে এসে চালাঘরে উপস্থিত মেয়েদের চেঁচিয়ে বলল:

'ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে তাঁবুতে নিয়ে এসো!' সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও চালাঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

কিন্তু তাঁবুতে আর তাদের ক'টার জায়গা হতে পারে? ডজন কয়েক, তার বেশি বৈ নয়। বাকিগুলোকে কোথায় রাখা যায়? ওঃ, অন্তত যত বেশি সম্ভব যদি বাঁচানো যেত...

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এলো। এদিকে আকাশ থেকে অঝোর ধারাবর্ষণের আর কামাই নেই। খানিকটা শান্ত হয়ে আসে, পরক্ষণেই এই বৃষ্টি এই তুষারপাত, এই তুষারপাত এই বৃষ্টি...

ভেড়ার বাচ্চায় তাঁবু ঠাসাঠাসি। তারা অবিরাম ডেকে চলেছে। দুর্গন্ধে টেকা ভার। জিনিসপত্র গাদা করে একটা জায়গায় রেখে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আর তানাবাইরা নিজেরা উঠে এসেছে সাহায্যকারিণীদের তাঁবুতে। বাচ্চারা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে কাঁদছে।

মেষপালকের দুঃসময় ঘনিয়ে এলো। সে নিজের অদৃষ্টকে শাপ দেয়, দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে এবং সব কিছুকে গালাগাল করে। তার আহার নেই, নিদ্রা নেই, সে শেষ শক্তি নিয়ে কাজ করে আপাদমস্তক ভিজে ভেড়াদের মধ্যে, ঠাণ্ডায় অসাড় ভেড়ার বাচ্চাদের মধ্যে। এদিকে স্যাঁতসেঁতে চালাঘরে মড়ক লেগে গেছে। এখানে তার আগমন কঠিন ছিল না — ধসে পড়া চাল ভেদ করে, শার্সি ছাড়া জানলা ও পাল্লা ছাড়া দরজা ভেদ করে — যেখান দিয়ে খুশি ঢুকে পড়লেই হল। সে এসেই ভেড়ার বাচ্চা ও দুর্বল মাদী ভেড়াগুলোকে সাফ করতে লাগল। মেষপালক নীলচে মড়াগুলোকে বার করে আনে, একেকবারে কয়েকটি করে তাদের চালাঘরের পেছনে স্তূপ করে।

রাস্তায়, খোঁয়াড়ের মধ্যে বৃষ্টিতে আর বরফে ভিজতে ভিজতে ঝুলন্ত পেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গর্ভিণী ভেড়ার

দল। আজ-কালের মধ্যেই তারা বিয়োবে। বৃষ্টি তাদের ঝাপ্টা মারছে, চোয়ালের মাংসপেশীতে খিঁচুনি ধরে। ভিজে সপ্সপে পশম দলা পাকিয়ে ঝুলতে থাকে...

ভেড়াগুলো আর চারণভূমিতে যেতে চায় না। এই হিমে আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে চরার জায়গা কোথায়?! প্রৌঢ়া সাহায্যকারিণীটি মাথায় বস্তা ফেলে তাদের খেদায় কিন্তু তারা দৌড়ে পিছু হটে যায়, যেন খোঁয়াড়টা তাদের কাছে স্বর্গরাজ্য। প্রৌঢ়া কাঁদতে কাঁদতে তাদের জড় করে, আবার খেদায়, কিন্তু ওরা আবার দৌড়ে পিছু হটে। তানাবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। এই নির্বোধ ভেড়াগুলোকে লাঠির বাড়িতে পাট পাট করা যেত, কিন্তু ওরা গর্ভিণী যে! অন্যদের ডাকে, সকলে মিলে কষ্টেসৃষ্টে ভেড়ার পালকে চারণভূমিতে নিয়ে যায়।

এই বিপর্যয় যে দিন থেকে শুরু হল সেদিন থেকে তানাবাই সময়ের হিসাব হারাল, তার চোখের সামনে কত যে সদ্যোজাত মেষশাবক প্রাণ হারাচ্ছে সে হিসাবও হারাল। বেশির ভাগই জন্মাচ্ছিল জোড়ায় জোড়ায়, এমন কি তিনটি তিনটি করে। এই সব সম্পদই নষ্ট হতে বসেছে। সব শ্রম পণ্ড। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল আর সেই দিনই কাদায় ও নাদগোলা জলে মারা যাচ্ছিল। বাদবাকি যারা বেঁচে রইল তারা কাশতে লাগল, তাদের গলা ভেঙ্গে গেল, পেটের গোলমাল শুরু হল, তারা একে অন্যকে নোংরায় মাখামাখি করে ফেলল। বৎসহারা মাদী ভেড়াগুলো হাঁকডাক করে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করল, যারা প্রসব বেদনায় শুয়ে ছটফট করছিল তাদের মাড়িয়ে দিল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিক, অদ্ভুত কী একটা ছিল। ওঃ, তানাবাই কী দারুণ ভাবেই না চাইছিল বিয়োনোটা যেন অন্তত খানিকটা ধীরগতিতে হয়! তার ইচ্ছে করছিল এই

আহাম্মক ভেড়াগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে: "থাম! আর বিয়োস নে! থাম!"

কিন্তু মাদী ভেড়াগুলো যেন চক্রান্ত করে একের পর এক বিইয়ে চলেছে, বিইয়েই চলেছে, বিইয়েই চলেছে!..

তার মনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর, অশুভ আক্রোশ গুমরে উঠতে লাগল। গুমরে উঠতে লাগল আর সেই সঙ্গে তার দু'চোখ ছেয়ে নামল ঘৃণার কালো আঁধার — এ ঘৃণা তার সেই সবের প্রতি যা এখানে, এই ধস পড়া চালার ঘরের মধ্যে ঘটছে, এ ঘৃণা ভেড়াগুলোর প্রতি, নিজের প্রতি, নিজের জীবনের প্রতি, যার জন্য সে এখানে কঠিন বরফের গায়ে দিশেহারা মাছের মতো মাথা খুঁড়ে মরছে — সে সবের প্রতি।

সে যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। নিজের ভাবনা-চিন্তা তাকে বুদ্ধিভ্রংশ করে দিচ্ছে, সে তাদের তাড়িয়ে দেয়, অথচ তারা পিছু হটে না, মনের মধ্যে চেপে বসে, মাথায় চেপে বসে: "এসব কেন? কার দরকার? ভেড়া যখন আমরা রক্ষাই করতে পারি না তখন তা পালতে যাওয়া কেন? এর জন্য দোষী কে? কে? জবাব দাও, কে? তুই, আর তোরই মতো যারা বাচাল, তারা। বললি কিনা আমরা সব কিছু তুলব, লক্ষ্যমাত্রায় পেঁছাব, তা ছাড়িয়ে যাব, কথা দিচ্ছি। বলি ভালো। এই ত এখন মরা ভেড়ার বাচ্চাগুলো তোল, বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আয়। ডোবায় ঐ যে মাদী ভেড়াটা মরল তাকে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে যা। নিজেকে দ্যাখো, দ্যাখো তুই কেমন..."

বিশেষ করে রাতের বেলায় ভেড়ার মুতে আর নোংরায় যখন হাঁটু অবধি প্যাঁচপ্যাঁচ্ করতে থাকে তখন নিজের মনে জ্বালা ধরানো তিক্ত এই চিন্তাগুলোয় তার শ্বাস রোধ হয়ে আসে। ওঃ, ভেড়ার বাচ্চা বিয়োনোর এই বিনিদ্র রাতগুলো! পায়ের নীচে পচা নাদের জলা, ওপর থেকে জল পড়ছে। চালাঘরের

ভেতরে বাতাস খেলছে যেন খোলা মাঠের মধ্যে, লণ্ঠন নিভে যায়। তানাবাই হাতড়ে হাতড়ে চলে, হোঁচট খায়, সদ্যোজাত মেষশাবকগুলো যাতে পায়ের চাপে পিষে না যায় তার জন্য তানাবাই চার হাত-পায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে, লণ্ঠন খুঁজে বার করে, জ্বালায় এবং তার আলোয় দেখতে পায় নাদায় আর রক্তে মাখামাখি নিজের কালো কালো ফোলা ফোলা হাত।

নিজেকে অনেক দিন সে আয়নায় দেখে নি। তার জানা ছিল না যে চুল পেকে গেছে, সে ভয়ঙ্কর বুড়োটে হয়ে গেছে। এখন থেকে সে বুড়ো — এই তার আখ্যা। একথা, নিজের কথা ভাবার মতো অবকাশ তার ছিল না। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। না নিজেকে, না অন্যদের — এক মুহূর্তও সোয়াস্তি সে দেয় নি। ব্যাপার খুবই শোচনীয় দেখে সে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা সাহায্যকারিণীকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিল:

'তাড়াতাড়ি গিয়ে চোরোকে খুঁজে বার কর। ওকে বলবে যেন এক্ষুনি চলে আসে। আর যদি না আসে তা হলে জানাবে আমার চোখের সামনে যেন কখনো না আসে।'

সন্ধে নাগাদ সে ফিরে এলো, তার সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপে, ঠাণ্ডায় সে নীল হয়ে গেছে। জিন থেকে কোন রকমে গড়িয়ে বলল:

'উনি অসুস্থ। বিছানায় পড়ে আছেন। বললেন, মরতে মরতে হলেও দুয়েক দিন বাদে আসবেন।'

'এই অসুখ থেকে যেন আর ওকে উঠতে না হয়!' তানাবাই গালাগাল দিয়ে বলল।

জায়দারের ইচ্ছে ছিল তাকে ঠাণ্ডা করে, কিন্তু সাহস হল না, তেমন অবস্থা ছিল না।

তিন দিনের দিন আবহাওয়া পরিষ্কার হতে লাগল। মেঘের দল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেল, কুয়াসা পাহাড়ের ওপর

উঠে গেল। বাতাস শান্ত হল। কিন্তু আর কিছু করার নেই। গর্ভিণী ভেড়াগুলো ওই ক'দিনে এত রোগা হয়ে গেছে যে তাদের দিকে তাকাতেও ভয় করে। সরু সরু ঠ্যাঙের ওপর ফোলা পেট কঙ্কালসার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাদের দুধ দেবে কোত্থেকে! আর যেগুলো বাচ্চা দিয়েছে এবং যে সব বাচ্চা এখনও বেঁচে আছে তাদের ক'টাই বা গরম কাল অবধি টিকে থেকে সবুজ ঘাস পেয়ে গায়ে গতরে হতে পারবে? আজ হোক কাল হোক রোগে ওরা নিকেশ হয়ে যাবে। আর তা যদি না-ও হয় ওগুলো থেকে না পাওয়া যাবে পশম, না মাংস...

আবহাওয়া পরিষ্কার হতে না হতেই আর এক বিপদ — মাটি জমে যেতে লাগল। কঠিন বরফের চাদরে মাটি ঢেকে যাবে। যা হোক দুপুরের দিকে জমাট ভাবটা ছাড়ল। তানাবোই খুশি হল: কোন রকমে বাঁচানো গেলেও যেতে পারে। আবার কোদাল, পিচ্‌ফর্ক ও ঠেলা নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল। একটুখানি হলেও চালাঘরে ঢোকার মতো ব্যবস্থা করতে হয়, ওখানে পা ফেলারও উপায় নেই। তবে সে কাজ বেশিক্ষণ করা গেল না। মাতৃহীন দুধের বাচ্চাগুলোকে নিঃসন্তান মাদী ভেড়াদের কাছে দিতে হয়। ঐ মাদী ভেড়াগুলো আবার এটা মেনে নিচ্ছে না, অন্যদের বাচ্চা কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। ভেড়ার বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আর্তনাদ করছে। আঙ্গুল পেলে ঠাণ্ডা ঠোঁটে তা-ই আঁকড়ে ধরে চোষে। খেদিয়ে দিলে বর্ষাতির মলিন প্রান্ত চুষে আর কিছু রাখে না। খেতে চায়। দলটা কাঁদতে কাঁদতে পিছু নেয়।

যতই কাঁদ আর বুক ফেটে মরে যাও না কেন — এই মহিলাদের কাছ থেকে এবং নিজের ছোট্ট মেয়েটার কাছ থেকে আর কত দাবি করা যেতে পারে? ওরা কোন রকমে পায়ে খাড়া হয়ে আছে। আজ কত দিন হল তাদের গায়ের বর্ষাতি

ত শুকোতেই পারছে না। তানাবাই তাদের কিছু বলে না। কেবল একবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলা প্রৌঢ়া সাহায্যকারিণীটি ভেড়ার পালকে খেদিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে এলো, ভাবল তানাবাইকে সাহায্য করা হল। তানাবাই দৌড়ে বেরিয়ে এলো ওখানকার অবস্থাটা দেখার জন্য — দেখে মাথা চড়ে গেল — ভেড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একে অন্যের গায়ের লোম চিবুচ্ছে। তার মানে পালে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে। তানাবাই ছুটে এসে মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কী রে বুড়ি! চোখে দেখতে পাস না? চুপ করে আছিস যে বড়? ভাগ এখান থেকে! ভেড়ার পাল বার করে নিয়ে যা। থামতে দিলে হবে না। ওদের লোম চিবুতে দিবি না। হাঁটুক। এক মুহূর্তও যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। নইলে খুন করে ফেলব!'

বিপদের ওপর বিপদ — এক মাদী ভেড়া যমজ বাচ্চা দিয়েছে, কিন্তু সে বাচ্চাদের নিচ্ছে না। তাদের ঢুঁ মারছে, নিজের কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না, লাথি মারছে। বাচ্চাগুলো মা'র কাছে আসছে, পড়ে যাচ্ছে, কাঁদছে। এমন ঘটনা তখনই ঘটে যখন আত্মরক্ষার নৃশংসতম আইন বলবৎ হয়, যখন মা নিজে বাঁচার তাগিদে সহজাত প্রবৃত্তিবশত দুধের বাচ্চাকে দুধ দিতে অস্বীকার করে, যেহেতু অপরের পুষ্টিসাধনের ক্ষমতা তার দেহের নেই। এই ব্যাপারটি সংক্রামক ব্যাধির মতো। একটা ভেড়া দৃষ্টান্ত দেখালেই হল — সকলেই তার অনুসরণ করবে। তানাবাই সতর্ক হয়ে গেল। সে আর তার মেয়ে মিলে অনাহারে ক্ষিপ্ত মাদী ভেড়াটাকে ও তার বাচ্চাগুলোকে উঠোনে, খোঁয়াড়ের মধ্যে খেদিয়ে নিয়ে এলো, ওখানে ভেড়াটা যাতে বাচ্চাগুলোকে দুধ দেয় তার চেষ্টা চলতে লাগল। প্রথমে

তানাবাই নিজে ভেড়াটাকে ধরল, তার মেয়ে বাচ্চাগুলোকে কাছে এনে ধরল। কিন্তু মা-ভেড়াটা ঘুরে, পাক খেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে লাগল। মেয়েটা কিছু করতে পারল না।

'আব্বা, ওরা চুষতে পারে না।'

'পারে, পারে, তুই আসলে একেবারেই আনাড়ি।'

'বাঃ, দেখ না, ওরা পড়ে যাচ্ছে।' মেয়েটা প্রায় কেঁদে ফেলে।

'ধর দেখি, আমি নিজে দেখছি!'

কিন্তু ছোট্ট মেয়েটির শক্তি আর কত! তানাবাই বাচ্চাগুলোকে বাঁটের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে কি ধরে নি, বাচ্চাগুলো মাই সবে চুষতে শুরু করেছে, অমনি ভেড়াটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল — মেয়েটাকে পায়ের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। তানাবাইয়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। মেয়ের গালে সে চর কষিয়ে দিল। এর আগে ছেলেমেয়েদের কখনও মারে নি, কিন্তু এখন আর মেজাজ রাখতে পারল না। মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তানাবাই চলে গেল। কোন দিকে না তাকিয়ে সে গটগট করে চলে গেল।

খানিকটা পায়চারি করে ফিরে এলো, বুঝতে পারল না মেয়ের কাছে কী করে ক্ষমা চাওয়া যায়, মেয়ে কিন্তু নিজেই ছুটে এলো:

'আব্বা, ও বাচ্চাগুলোকে নিয়েছে। আমি আর মা মিলে বাচ্চাগুলোকে বাঁটের মুখে ধরেছি। ও আর ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না।'

'বাঃ, চমৎকার বেটী। সাবাস।'

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভার হাল্‌কা হয়ে গেল। ব্যাপার তেমন একটা খারাপ বলে আর মনে হচ্ছে না। বাদবাকি যেগুলো রয়ে গেল সেগুলোকে হয়ত এখনও বাঁচানো যাবে। দেখ দেখি আবহাওয়াও ভালো হয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ যদি সত্যিকারের

বসন্ত এসে পড়ে আর মেষপালকের অশুভ দিনগুলো দূর হয়ে যায়? আবার সে উঠে পড়ে কাজে লাগবে। কাজ, কাজ আর কাজ — একমাত্র এখানেই, এতেই নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।

যৌথখামারের অফিস থেকে হিসাব নেওয়ার জন্য এক ছোকরা ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হল। শেষ কালে সময় হল। সে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করল। তানাবাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল গালাগাল দিয়ে ওটার ভূত ভাগিয়ে দেয়। কিন্তু ওকে বলে আর কি হবে?..

'এত দিন কোথায় ছিলে?'

'কোথায় ছিলাম মানে? এখানে-ওখানে ভেড়ার পালের হিসাব নিচ্ছিলাম। আমি একা, পেরে উঠি না।'

'অন্যদের খবর কী?'

'এর থেকে ভালো নয়। এই তিন দিনে অনেক মরেছে।'

'রাখালরা কী বলছে?'

'কী আর বলবে? গালাগাল করছে। কেউ কেউ কথাই বলতে চায় না। বেক্‌তাই ত আমাকে উঠোন থেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। রেগে কাঁই, ওর ধারে কাছে ঘেঁসা যায় না।'

'হুঁ। আমি ওর কাছে যাওয়ার সময়ই করে উঠতে পারলাম না। একটু সময় পেলেই গিয়ে দেখে আসব ভাবছি। আর তুমি?'

'আমি আবার কী? হিসাব নিচ্ছি।'

'তা সাহায্য কিছু মিলবে?'

'মিলবে। শুনেছি চোরো কাজে যোগ দিয়েছেন। একসার ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই খড়বিচুলি পাঠিয়েছেন, আস্তাবল থেকে সব বার করে নেওয়া হয়েছে — বলছেন, ঘোড়াগুলোই বরং মরুক। শোনা যাচ্ছে গাড়িগুলো পথে কোথায় আটকে পড়েছে, রাস্তাঘাটের দশা ত ঐ।'

'রাস্তাঘাট! আগে কী ভেবেছিল? চিরটা কালই আমাদের এই রকম। আর এই গাড়ি দিয়ে আমাদের এখন লাভই বা কী? ভালো, আমি ওদের ঠিকই দেখে নেব!' তানাবাই রাগে গরগর করতে লাগল। 'জিজ্ঞেস করো না। নিজে গিয়ে দেখ, শোন, লিখে নাও। আমার এখন কিছুতেই কিছু আসে-যায় না!' কথাবার্তায় ছেদ টেনে তানাবাই চালাঘরে ঢুকল প্রসবের ব্যাপারে সাহায্য করতে। আজ আরও গোটা পনেরো ভেড়া বাচ্চা বিইয়েছে।

তানাবাই এদিক-ওদিক ঘুরে সদ্যোজাত বাচ্চাগুলোকে তুলে তুলে আনে, তাকিয়ে দেখে ছোকরা তার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিচ্ছে:

'আপনার ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে রিপোর্টে সই করুন।'

না তাকিয়ে সই করল। এমন জোরে দাগ কাটল যে পেন্সিলটা মট্ করে ভেঙে গেল।

'চলি তাহলে। কিছু জানাতে হবে কি? বলুন।'

'আমার কিছুই বলার নেই।' পরক্ষণেই কিন্তু ছোকরাকে ধরে বলে, 'যাবার পথে বেক্তাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যেও। ওকে বলবে কাল দুপুরের দিকে একবার যাব'খন।'

তানাবাই বৃথাই উদ্বেগ বোধ করছিল। বেক্তাই তার ওপর টেক্কা মারল। নিজেই এলো, আর এলো মানে কী...

সে রাতে আবার বাতাস বইল, তুষারপাত হল, তেমন ঘন না হলে সকাল নাগাদ মাটি তুষারকণায় সাদা ধবধবে হয়ে গেল। খোঁয়াড়ে ভেড়াগুলো সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল — তারাও কণায় ঢাকা পড়ে গেল। এখন আর তারা শুয়ে পড়ছে না। তারা গাদাগাদি হয়ে অচল অবস্থায় নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খাদ্যাভাব রীতিমতো দীর্ঘকাল চলেছে, দীর্ঘকাল বসন্ত শীতের সঙ্গে যুঝেছে।

চালাঘরে ঠান্ডা। বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া চাল ভেদ করে পেঁজা তুষার ঝরে পড়ছে, লণ্ঠনের ম্যাটমেটে আলোয় তুষারকণা ঘুরে ঘুরে ধীরে ধীরে নীচে ঠান্ডায় জমে যাওয়া মা-ভেড়া আর বাচ্চাদের গায়ে পড়ছে। এদিকে তানাবাই ভেড়াদের মাঝখানে সমানে কাজ করে চলেছে, হত্যাকান্ডের পর লড়াইয়ের ময়দানে শবসৎকার বাহিনীর সৈন্যদের মতো সে নিজের কর্তব্য পালন করছে। নিজের ভয়ঙ্কর ভাবনা-চিন্তা এতক্ষণে তার অভ্যেস হয়ে গেছে, রোষ পরিণত হয়েছে নির্বাক ক্রোধে। বুকের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। জল-কাদার ওপর বুটের ছপছপ শব্দ তুলে সে হাঁটতে থাকে, নিজের কাজ করে চলে এবং থেকে থেকে এই রাতের মুহূর্তগুলোতে তার কেবলই মনে হতে থাকে নিজের অতীত জীবন...

এক কালে সে রাখাল বালকের কাজ করত। সে আর তার ভাই কুলুবাই তাদের এক আত্মীয়ের ভেড়া চরাত। বছর ঘুরতে দেখা গেল কাজের বিনিময়ে তারা কেবল দু'মুঠো অন্ন পাচ্ছে। মনিব তাদের ঠকিয়েছে। কথা পর্যন্ত বলতে চাইল না। ছেঁড়া চটি পায়ে, নিজেদের নগণ্য পোঁটলা পুঁটলি কাঁধে নিয়ে তারা খালি হাতে সেখান থেকে চলে গেল। চলে যেতে যেতে তানাবাই মনিবের উদ্দেশে তর্জনগর্জন করে বলল: "বড় হয়ে তোকে দেখে নেব।" কুলুবাই কিন্তু কিছু বলল না। সে ছিল তানাবাইয়ের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। সে জানত যে ওতে মনিব থোরাই ভয় পাবে। নিজে মনিব হতে পারলে, গোরু ভেড়া ও জমি জমার মালিক হতে পারলে আলাদা ব্যাপার। "মনিব হলে নিজের কর্মচারীদের কক্ষনো ফাঁকি দেব না," কুলুবাই সে সময় বলেছিল। সে বছর এখানেই দু'ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কুলুবাই অন্য এক জোতদারের

মেষপালকের কাজ করতে গেল, আর তানাবাই গেল আলেক্সান্দ্রভ্কায়, ওখানে বসবাসকারী ইয়েফ্রেমভ নামে এক রুশীর জমিতে খেত মজুরের কাজ করতে। লোকটা তেমন একটা ধনী চাষী ছিল না — সম্বলের মধ্যে তার ছিল এক জোড়া বলদ, এক জোড়া ঘোড়া আর নিজের চাষের জমি। সে ফসল বুনত, আউলিয়ে-আতা শহরের যাঁতাকলে গম নিয়ে যেত। নিজে সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করত। তার কাছে থেকে তানাবাই বেশির ভাগই বলদ আর ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করত। লোকটা কড়া ছিল, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ছিল না এমন কথাও বলা যায় না। উচিত বেতন দিত। কিরগিজদের জাতভাইরাই গরিব কিরগিজদের চিরকাল শোষণ করে আসছিল, তাই তারা রুশ মনিবদের কাছে কাজ করা বেশি পছন্দ করত। তানাবাই রুশ ভাষা বলতে শিখল, ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আউলিয়ে-আতা শহরে যেত, দুনিয়ার সঙ্গে তার একটু-আধটু পরিচয়ও হল। এমন সময় বিপ্লব ঘটে গেল। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তানাবাইদের কাল এলো।

তানাবাই গ্রামে ফিরে এলো। শুরু হল আরেক জীবন। সে জীবন তাকে আকর্ষণ করল, টেনে নিয়ে গেল, তার মাথা ঘুরিয়ে দিল। জমি, মুক্তি আর অধিকার — সবই রাতারাতি এসে গেল। সে খেত মজুর কমিটিতে নির্বাচিত হল। ঐ সময় চোরোর সঙ্গে তার আলাপ। চোরো ছিল শিক্ষিত, অল্পবয়সীদের সে লিখতে এবং বানান করে করে পড়তে শেখাত। লেখা-পড়া জানা তানাবাইয়ের খুব দরকার ছিল — হাজার হোক খেত মজুর কমিটির সদস্য ত বটে! কম্‌সমোল সেলে ভর্তি হল। এখানেও চোরো আর সে একসঙ্গে কাজ করে। একই সঙ্গে পার্টিতে ভর্তি হয়। সবই নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে, গরিব

লোকজন ওপরে উঠে আসে। যৌথীকরণ শ্বর্ হতে তানাবাই মনে প্রাণে সে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। কৃষকদের নতুন জীবনের জন্য, জমি-জমা, গোর্-ভেড়ার পাল, শ্রম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে সর্বসাধারণের হয় সেই জন্য তানাবাই যদি সংগ্রাম না করে ত কে করবে? কুলাকের দল নিপাত যাক! সে এক নিদার্ণে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কাল! দিনের বেলায় — জিনের ওপর, রাতে — সভা-সমিতি। কুলাকদের তালিকা তৈরি করা হল। জোতদার, মোল্লা এবং অন্যান্য যাবতীয় বড়লোকদের খেতের আগাছার মতো নির্মূল করা হতে লাগল। নতুন শস্য যাতে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে তার জন্য খেত পরিষ্কার করা দরকার। জোতদার উচ্ছেদের তালিকায় কুল্বাইয়ের নামও উঠল। তানাবাই যখন জোরে কদমে ছুটছে, যখন সভা-সমিতি করছে তার দাদা তত দিনে নিজের পথ করে নিয়েছে। এক বিধবাকে বিয়ে করে ঘর-সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তার এখন গোর্-ভেড়ার পাল আছে এক জোড়া ঘোড়া, একটা দ্ধালো মাদী ঘোড়া, ঘোড়ার বাচ্চা, লাঙ্গল, হালের মই এবং আরও অনেক কিছু। ফসল কাটার সময় সে লোক রাখে। সে বড়লোক হয়েছে বলা না গেলেও তাকে গরিব বলা চলে না। তার দিনকাল জবর চলছিল এবং সে কাজও জবর করছিল।

গ্রাম সোভিয়েতের বৈঠকে কুল্বাইয়ের প্রসঙ্গ উঠতে চোরো বলল:

'একটু ভেবে দেখা যাক কমরেডরা। আমরা ওকে উচ্ছেদ করব কিনা। কুল্বাইয়ের মতো লোকেরা যৌথখামারের কাজে এলেও আসতে পারে, কেননা ও নিজে ত এসেছে গরিব ঘর থেকে। শত্রুতামূলক প্রচারে সে নামে নি।'

নানা জনের নানা মত। কেউ 'পক্ষে' কেউ বা 'বিপক্ষে'। তানাবাই এখনও কিছু বলে নি। সে গম্ভীর হয়ে বসে ছিল।

সৎভাই হলেও ভাই ত বটে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেতে হয়। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা খারাপ ছিল না, যদিও দেখা-সাক্ষাৎ হত কদাচিৎ। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। যদি সে বলে ওকে ছেড়ে দাও, তা হলে অন্যদের বেলায় কী হবে — প্রত্যেকেরই পক্ষ সমর্থনকারী, আত্মীয় খুঁজে পাওয়া যাবে। যদি বলে নিজেরাই বিবেচনা কর, তা হলে লোকে ভাববে আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে।

লোকে অপেক্ষা করে রইল সে কী বলে। ওরা অপেক্ষা করছে দেখেই তানাবাই আরও নির্দয় হয়ে উঠল:

'তুই বরাবরই এই রকম, চোরো!' তানাবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'কাগজে কেতাবি লোকজনের কথা লেখে — যাদের ওরা নাম দিয়েছে বুদ্ধিজীবী না কী যেন। তুইও তা-ই। তোর সব সময়ই সন্দেহ, ভয় — কী জানি যদি ভুলচুক হয়ে যায়। সন্দেহের কী আছে? লিস্টিতে যখন আছে — তার মানে কুলাক! কোন ক্ষমা নেই! সোভিয়েত রাজের খাতিরে আমি নিজের বাপকেও মায়া-মমতা করব না। আর ও আমার ভাই — একথা ভেবে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। তোমরা না করলে আমি নিজেই ওকে উচ্ছেদ করব।'

পর দিন কুলুবাই তার কাছে এলো। তানাবাই তার প্রতি কোন সৌজন্য দেখাল না, হাত বাড়াল না।

'আমাকে জোতদার উচ্ছেদের দলে ফেলছিস কেন? আমরা কি একসঙ্গে খেত মজুরের কাজ করি নি? জোতদার তোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কি উঠোন থেকে বার করে দেয় নি?'

'এখন তার আর কোন অর্থ নেই। তুই নিজেই জোতদার হয়েছিস।'

'আমি আবার জোতদার কিসের? আমি নিজের মেহনতে এসব উপার্জন করেছি। তাতেও আমার আক্ষেপ নেই। সব

কিছু নিয়ে নাও। কেবল, আমাকে কুলাকেদের দলে ফেলা কেন? মাথার ওপর খোদা আছেন — তানাবাই।'

'কিছু যায় আসে না। তুই শ্রেণীশত্রু। যৌথখামার গড়তে হলে আমাদের কাজ হবে তোকে উচ্ছেদ করা। তুই আমাদের পথের বাধা, আমাদের কাজ হবে তোকে পথ থেকে দূর করা...'

এটাই ছিল তাদের শেষ কথাবার্তা। আজ বিশ বছর হল তাদের মধ্যে কোন বাক্যালাপ নেই। কুলুবাইকে যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হল তখন গাঁয়ে কতই না গুজব ও রটনা শোনা গেল!

নানা রকম গালগল্প। লোকে এমন কথাও বলাবলি করতে লাগল যে কুলুবাইকে যখন দুই ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়ার প্রহরায় গাঁ থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে মাথা নীচু করে চলছিল, সে কোন দিকে তাকাচ্ছিল না, কারও সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করল না। কিন্তু গাঁ থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি সে কচি গমের ওপর — অর্থাৎ যৌথখামারের প্রথম রবিশস্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, গমগুলোকে গোড়া থেকে টেনে উপড়ে আনতে থাকে, পায়ের তলায় পিষে ধামসাতে থাকে — যেন একটা ফাঁদে পড়া জন্তু। পাহারাদাররা গায়ের জোরে তাকে কাবু করে সেখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আর যেতে যেতে নাকি সে অঝোরে কাঁদে এবং তানাবাইকে শাপ-শাপান্ত করে।

তানাবাই এসব কথা তেমন বিশ্বাস করে নি। "শত্তুরদের গালগল্প — এই করে আমার মনে কষ্ট দিতে চায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি. এত সহজেই যদি কাবু হতাম!" তানাবাই নিজেকে বোঝাল।

ঠিক ফসল কাটার আগে তানাবাই এক দিন খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারিফ করছিল এই দেখে যে সে বছর ফসল

চমৎকার হয়েছে, শিষের পর শিষ গর্বভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় চোখে পড়ল গম খেতের মধ্যে ঠিক সেই জায়গাটা যেখানে কুলবাই মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেখানে সে কচি ফসল পায়ে মাড়িয়েছিল ও গোড়া থেকে তুলে ফেলেছিল। চার দিকে গমের শিষ দেয়ালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর ও জায়গাটায় যেন ষাঁড়ের লড়াই হয়ে গেছে — সব পায়ে মাড়ানো, দোমড়ানো, শুকিয়ে ঝরঝরে, আগাছায় ভর্তি। দেখামাত্রই তানাবাই ঘোড়া থামাল।

'ওঃ, বদমাইশ কোথাকার!' সে রাগে জ্বলে উঠে বিড়বিড় করে বলল। 'যৌথখামারের ফসলের ওপর হাত তুলিস! তার মানে তুই ঠিকই জোতদার। তা ছাড়া আর কী!..'

এই ভাবে সে ঘোড়ার পিঠে অনেকক্ষণ নীরবে ও বিষণ্ণ হয়ে থেমে রইল, তার দু'চোখে গভীর চিন্তার ছাপ, তারপর কোন দিকে না চেয়ে সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। এর পর অনেক দিন -- যত দিন না গম কাটা হল, যত দিন গোরু-ভেড়ার খুরের নীচে পড়ে ফসলের কাটা গোড়া মাটির সঙ্গে মিশে না গেল তত দিন সে এই অস্বস্তিকর জায়গাটাকে এড়িয়ে যেত, পাশ কাটিয়ে যেত।

তখন কম লোকই তানাবাইয়ের পক্ষ সমর্থন করে। বেশির ভাগ তার নিন্দা করে বলত: "ভগবান যেন না করেন — এমন ভাই যেন না হয়। এর চেয়ে আত্মীয়স্বজন একেবারে না থাকাও ভালো।" কেউ কেউ আবার কথাগুলো তার মুখের ওপরই বলত। আর সত্যি কথা বলতে গেলে কি লোকে তখন তার কাছ থেকে পিছিয়ে এলো। একেবারে খোলাখুলিভাবে অবশ্য নয়, কিন্তু ওকে প্রার্থী দাঁড় করাতে তারা আর ভোট দিল না। এই ভাবে অল্প অল্প করে সক্রিয় সদস্যপদ থেকে সে খারিজ হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের পক্ষে এই

বলে কৈফিয়ত দিত যে জোতদাররা যৌথখামার পোড়াচ্ছে, গুলি করে লোকজন মারছে, আর সবচেয়ে বড় কথা হল যৌথখামার শক্তি সঞ্চয় করছে, বছরের পর বছর কাজ ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। একেবারে অন্য এক জীবন শুরু হয়েছে। না, তখন যে এসব করা হয়েছিল তা বৃথা নয়।

তানাবাই অতীতের একেবারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব কিছু স্মরণ করল। তার সমস্ত জীবন যেন রয়ে গেছে সেখানে, সেই আশ্চর্য সময়ের মধ্যে, যখন যৌথখামার শক্তি সঞ্চয় করছিল। আবার তার মনে পড়ল লাল ওড়না জড়ানো সামনের সারির কর্মী মেয়েটিকে নিয়ে বাঁধা সেকালের সেই গান, মনে পড়ল যৌথখামারের প্রথম ছোট ট্রাকের কথা এবং সেই সঙ্গে রাতে লাল পতাকা হাতে সে কী করে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাও।

রাতে তানাবাই চালাঘরে ঘুরতে লাগল, বিরক্তিকর কাজ করতে করতে নিজের বেদনাদায়ক ভাবনা-চিন্তায় ডুবে গেল। এখন কেন তা হলে সব টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে? এমনও ত হতে পারে যে ওরা ভুল করেছে, যে পথে যাওয়ার কথা সে পথে যায় নি? না, তা হতে পারে না, হতে পারে না! পথ ঠিকই ছিল। তা হলে? ওরা কি গুলিয়ে ফেলল? দিশেহারা হয়ে গেল? কখন, কী ভাবে তা ঘটল? এই ধর না কেন এখনকার প্রতিযোগিতা — প্রতিশ্রুতি দিলে, তা খাতায় লেখা হয়ে গেল, কিন্তু তুমি কী ভাবে কী করছ, তোমার কেমন চলছে — এ নিয়ে মোটেই কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আগেকার দিনে ছিল লাল আর কালো বোর্ড, রোজ কত আলাপ-আলোচনা আর তর্কবিতর্কই না চলত: কে লাল বোর্ডে, কে কালো বোর্ডে — লোকের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন ওরা বলছে ওসব সেকেলে, অচল। কিন্তু তার বদলে কী আছে?

ফাঁকা বুলি, প্রতিশ্রুতি। আর কাজের বেলায় কিছুই নয়। এমন কেন হল? এর জন্য দায়ী কারা?

কূলকিনারাহীন ভাবনা-চিন্তায় তানাবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একটা উদাসীন হতবুদ্ধি ভাব তাকে পেয়ে বসল। তার হাত আর চলে না। মাথা ব্যথা করতে লাগল। ঘুম পেয়ে গেল। সে দেখত পেল অল্পবয়সী সাহায্যকারিণীটি দেয়ালে ঠেলে দিল। দেখতে পেল তার আরক্ত চোখদুটি বুঁজে আসছে, সে ঘুমের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ধীরে ধীরে পিছলে পড়ে যেতে লাগল এবং শেষে মাটিতে বসে পড়ে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। তানাবাই তাকে আর জাগাল না। সেও দেয়ালে হেলান দিল, সেও ধীরে ধীরে নীচে পিছলে পড়ে যেতে লাগল, নিজেকে সে কিছুতেই সামলাতে পারল না, সামলাতে পারল না তার কাঁধের স্তূপকার ভার, যে ভার তাকে নীচে, আরও নীচে টানছে...

একটা চাপা গোলমাল এবং মাটির ওপর আঘাতের কেমন একটা থপ্‌থপ্‌ আওয়াজে তানাবাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়ে ইতস্তত দ্রুত পলায়মান ভেড়ার দল তার পা মাড়িয়ে ছুটছে। ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে সে লাফিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে এসেছে।

'তানাবাই, তানাবাই, বাঁচাও,' বৌ তাকে ডাকল।

সাহায্যকারিণীরা জায়দারের কাছে ছুটে এলো, আর তানাবাই ছুটল তাদের পিছু পিছু। তাকিয়ে দেখে জায়দার চালাঘরের একটা ভাঙ্গা আড়ার নীচে চাপা পড়েছে। ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালসুদ্ধ চালের একটি প্রান্ত খসে গেছে, পচা চালের ভারে আড়া ধসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুম উধাও হল।

'জায়দার!' তানাবাই চেঁচিয়ে উঠল, আড়ার নীচে কাঁধ গলিয়ে ঝটকা মেরে তুলল।

জায়দার হামা দিয়ে বেরিয়ে এসে কাতরাতে লাগল। মহিলারা বিলাপ করতে করতে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। তানাবাই ভয়ে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল, সে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিল, কাঁপা কাঁপা হাতে গরম জামার নীচে বৌয়ের শরীর স্পর্শ করে দেখল।

'কী হয়েছে তোমার? কী হয়েছে?'

'ওঃ, কোমর! কোমর!'

'চোট লেগেছে? এস ত সবাই!' চোখের পলকে সে গা থেকে বর্ষাতি খুলে নিল, জায়দারকে তার ওপর শুইয়ে সকলে মিলে ধরাধরি করে চালাঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো।

তাঁবুতে এসে ভালো করে দেখল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কিছুই নেই। কিন্তু চোটটা ভালো মতোই লেগেছে। জায়দার নড়তে-চড়তে পারছিল না।

জায়দার কেঁদে উঠল:

'এখন কী হবে? এমন সময় কিনা আমার এই দশা? তোমরা এখন কী করে চালাবে!'

"হা আল্লা!" তানাবাই মনে মনে বলল। "বেঁচে গেছে যে এতেই আনন্দ হওয়া উচিত। অথচ ও কিনা এই সব ভেবে মরছে! কাজ চুলোয় যাক! আহা, বেচারি ভালোয় ভালোয় সেরে উঠলে হয়..."

তানাবাই ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'সব ঠিক আছে জায়দার, চিন্তার কিছু নেই! তুমি উঠে দাঁড়ালেই হল। আর কিছুর জন্যে আমি গ্রাহ্য করি না, চালিয়ে নেওয়া যাবে...'

ওরা সকলেই এখন সবে সংবিৎ ফিরে পেয়ে হুড়োহুড়ি করে জায়দারকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করতে লেগে গেল।

এতে যেন জায়দারের বেদনার উপশম হল। সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে হেসে উঠল।

'ঠিক আছে। তবে এমন হল বলে কিন্তু আমার ওপর তোমরা রাগ করো না। আমি বেশি দিন পড়ে থাকব না। দিন দুয়েক বাদে উঠে দাঁড়াব, দেখো।'

মহিলারা জায়দারের বিছানা পাততে এবং ঘরের আগুন জ্বালাতে লাগল, আর তানাবাই ফিরে চলল চালাঘরে, এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে কানের পাশ দিয়ে একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

সদ্যপড়া নরম বরফে ঢাকা সাদা ঝকঝকে সকাল। চালাঘরের মধ্যে তানাবাই দেখতে পেল আড়ার নীচে থে'তলে মরা মাদী ভেড়া। কিছুক্ষণ আগেও এটা তাদের নজরে পড়ে নি। দুধের বাচ্চাটা মরা ভেড়ার বাঁটে মাথা দিয়ে গুঁতো মারছে। তানাবাই আরও শিউরে উঠল, তার আরও আনন্দ হল এই ভেবে যে বৌ বেঁচে গেছে। মা-হারা বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে সে তার জন্য অন্য এক মা খুঁজতে গেল। তারপর আড়ার নীচে ঠেকা লাগাতে লাগাতে খুঁটি দিয়ে দেয়ালটাকে একটু পোক্ত করে তুলতে তুলতে তার বারবার মনে হতে লাগল বৌ কেমন আছে একবার গিয়ে দেখা দরকার।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখতে পেল কিছু দূরে একপাল ভেড়া বরফের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কোন এক মেষপালক সেগুলোকে তার কাছে খেদিয়ে নিয়ে আসছে। এ আবার কার ভেড়ার পাল? লোকটা ভেড়ার পাল এখানে নিয়ে আসছে কেন? দুটো ভেড়ার পাল মিশে একাকার হয়ে যাবে, এ কেমন ব্যাপার? তানাবাই সেই অদ্ভুত লোকটাকে সতর্ক করে দিতে গেল যে সে অন্যের জায়গায় ঢুকে পড়েছে।

কিছুটা কাছে এগিয়ে এসে সে দেখতে পেল ভেড়ার পাল খেদিয়ে আনছে বেক্‌তাই।

'অ্যাই, বেক্‌তাই, তুই না কি?'

বেক্‌তাই কোন উত্তর দিল না। সে চুপচাপ ভেড়ার পালকে তার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, ভেড়াগুলোর পিঠে ছড়ি মারতে লাগল। "আরে এই পোয়াতি ভেড়াগুলোকে ও এমন করে মারছে কেন!" তানাবাই বিরক্ত হল।

'তুই কোত্থেকে? কোথায় চল্‌লি? শুনছিস?'

'সেখান থেকে, যেখানে আমি আর নেই। আর কোথায় তা নিজেই দেখতে পাচ্ছ।' বেক্‌তাই তার কাছে এগিয়ে এলো। ওর কোমরে কষে দড়ি বাঁধা, দস্তানাজোড়া বর্ষাতির নীচে বুকের কাছে গোঁজা।

ছড়িটাকে পেছনে ধরে সে কয়েক পা আগে থেমে পড়ল, কিন্তু কোন রকম সম্ভাষণ করল না। সে রাগে থুথু ফেলল, গরগর করতে করতে বরফের ওপর থুথু পা দিয়ে চট্‌কাল। মাথাটা পেছন দিকে হেলাল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গল — মনে হয় যেন তার অল্পবয়সী, সুন্দর মুখের ওপর আঠা দিয়ে লাগান, তাতে তার মুখটা কালো দেখাচ্ছে। বনবেড়ালের মতো তার চোখজোড়া ঘৃণা আর চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি করছে। সে আরও একবার থুথু ফেলল, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছড়িটা ভালো করে আঁকড়ে ধরে ভেড়ার পালের উদ্দেশে হাঁকাল:

'নাও। ইচ্ছে হয় গুনে নাও, না হলে গুনো না। তিনশ পঁচাশিটা আছে।'

'তার মানে?'

'চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছি — মানে? কোথায়?'

'কোথাও একটা হবে।'

'তা আমি কী করব?'

'তুমি আমার ওপরওয়ালা যে!'

'তাতে কী? দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায়? কোথায় চললি তুই?' অধস্তন মেষপালকটি কী মতলব এ'টেছে তা মাত্র এখন তানাবাইয়ের মাথায় ঢুকল। তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, দম আটকে আসতে লাগল, সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এটা কী রকম?' তানাবাই বিভ্রান্ত হয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল।

'এই, যে রকম দেখছে। যথেষ্ট হয়েছে। আমি তিত-বিরক্ত হয়ে গেছি। আর নয়, আশ মিটেছে।'

'আরে তুই কী বলছিস তা বুঝতে পারছিস? আজ-কালের মধ্যে তোর ভেড়ার পাল বিয়োবে! এটা কী করে সম্ভব?'

'সম্ভব। আমাদের সঙ্গে যখন এরকম সম্ভব তখন আমাদের পক্ষেও এটা করা সম্ভব। বিদায়!' বেক্‌তাই ছড়িটাকে মাথার ওপর ঘুরিয়ে সর্ব শক্তিতে সেটাকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

তানাবাই আতঙ্কে হতবাক। সে কোন কথা খুঁজে পেল না। এদিকে বেক্‌তাই কোন দিকে না তাকিয়ে পা বাড়াল।

'ভেবে দ্যাখ, বেক্‌তাই!' তানাবাই তার পেছন পেছন ছুটল। 'এরকম করা ঠিক নয়। তুই কী করছিস নিজেই ভেবে দ্যাখ! শুনছিস?'

'বাদ দাও!' বেক্‌তাই অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমিই ভাব। আমি মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমি অন্যদের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নই। আমিও শহরে কাজ করে রোজগার করতে পারি। এই ভেড়াগুলোকে নিয়ে আমি এখানে মরতে যাব কেন? দানা নেই, চালাঘর নেই, মাথার ওপর ছাউনি নেই। বাদ দাও! যাও মাথা ঠুকে মর, নাদায় ডুবে মর। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখ, চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখ। শিগ্‌গিরই

এখানে মারা যাবে। এতেও সাধ মেটে না। আবার স্লোগান আওড়ায়! অন্যদেরও নিজের পেছনে পেছনে টানার মতলব। পোঁ ধরা পেয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!' এই বলে সে সাদা অক্ষত বরফ এত জোরে মাড়িয়ে পা বাড়াল যে তার পায়ের ছাপগুলো মুহূর্তের মধ্যে জলে ভরে উঠে কালো হয়ে গেল...

'বেক্‌তাই, তুই আমার কথা শোন!' তানাবাই ছুটে গিয়ে তাকে ধরল। 'আমি তোকে সব বুঝিয়ে বলব।'

'অন্য জায়গায় বুঝিয়ে বল গে। আহাম্মকদের খোঁজ কর।'

'থাম, বেক্‌তাই। কথা আছে।'

বেক্‌তাই শোনার কোন ইচ্ছে প্রকাশ করল না, সে হাঁটতে লাগল।

'জেলে যাবি!'

'এভাবে বাঁচার চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো!' বেক্‌তাই এবারে আর পিছু না ফিরে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল।

'তুই ফেরারী!'

বেক্‌তাই এগিয়েই চলল।

'এধরনের ফেরারীদের যুদ্ধের সময় গুলি করে মারা হত।'

বেক্‌তাই এগিয়েই চলল।

'থাম বলছি!' তানাবাই ওর আস্তিন টেনে ধরল।

বেক্‌তাই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে সামনের দিকে চলতে লাগল।

'যেতে দেব না, যাওয়ার অধিকার নেই!' তানাবাই ওর কাঁধ ধরে মুচড়ে দিল। হঠাৎ চারদিকের সাদা বরফ ঢাকা পাহাড়গুলো চোখের সামনে দুলে উঠে ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল। চোয়ালের নীচে আচমকা ঘুসি খেয়ে সে টালমাটাল হয়ে পড়ে গেল।

যখন সে চক্কর খাওয়া মাথাটা তুলল, ততক্ষণে বেক্‌তাই টিলার আড়ালে চলে গেছে।

তার পেছন পেছন চলেছে কালো কালো পায়ের ছাপের একমাত্র মালা।

'ছোকরা ডুবল, ডুবল,' তানাবাই চার হাতে পায় ভর দিয়ে উঠে আর্তনাদ করে উঠল। তানাবাই উঠে দাঁড়াল। তার হাত নোংরায় আর বরফে ছেয়ে গেছে।

সে দম ফেলল। বেক্‌তাইয়ের ভেড়ার পাল জড় করে ক্ষুণ্ণ মনে সেগুলোকে নিজের কাছে নিয়ে চলল।

১৭

দুই ঘোড়সওয়ার গাঁ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলেছে। এক জনের ঘোড়ার রঙ তামাটে, অন্য জনের — বাদামী। তাদের ঘোড়ার লেজ শক্ত গিঁট পাকানো — অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। বরফ মেশানো কাদা প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করছে, ঘোড়ার খুরের নীচ থেকে জল কাদা চারদিকে ছিট্‌কে পড়ছে।

গুলসারির মুখে শক্ত লাগাম — সে উৎসাহে পা ফেলে চলেছে। মনিব অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকায় গুলসারিকে দীর্ঘ দিন অচল অবস্থায় থাকতে হয়। তবে এখন তার পিঠে চেপে চলেছে মনিব নয়, এক অজানা লোক — তার গায় চামড়ার ওভারকোট এবং ওপরে চাপানো ক্যানভাসের বর্ষাতি, সেটা আবার ফুলে ঢোল। তার পোশাক থেকে রঙ আর রবারের গন্ধ বেরোচ্ছে। পাশে চলেছে চোরো, অন্য একটা ঘোড়ার পিঠে। ঘটনাটা এই যে সদর থেকে কোন কমরেড এলে চোরো তাকে নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দিত। আর সত্যি বলতে গেল কী কে তার পিঠে বসেছে তাতে গুলসারির কিছু আসে যায় না।

তাকে যখন ঘোড়ার পাল থেকে, আগেকার মনিবের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয় তার পর থেকে বহু লোক তার পিঠে চড়ে গেছে। ভালো-মন্দ — নানা ধরনের লোক। তাদের কেউ জিনের ওপর ভালো বসতে পারে, কেউ বা ভালো নয়। বেপরোয়া সওয়ারদের হাতেও সে পড়েছে। ওঃ ঘোড়ার পিঠে চাপলে তাদের মাথা যেন ঘুরে যায়! পুরো দমে ছুটিয়ে দেয়, তারপর আচমকা লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াকে পেছনের দু'পায়ে খাড়া করে, আবার ছুটায়, আবার কষে লাগাম টানে। নিজেই জানে না কী করছে, একমাত্র উদ্দেশ্য — সকলে যেন দেখে সে দৌড়বাজ ঘোড়ায় চেপে চলেছে। গুলসারি এখন সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেবল আস্তাবলে দাঁড়িয়ে পচে না মরলেই হল। তার মধ্যে এখনও রয়ে গেছে আগের সেই উৎসাহ — দৌড়, দৌড় আর দৌড়। আর কাকে সে বয়ে নিয়ে চলছে তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোন ঘোড়ায় চলেছে তা সওয়ারের কাছে মোটেই নগণ্য নয়। তামাটে রঙের দৌড়বাজ ঘোড়াটা তাকে চড়তে দেওয়া হয়েছে — তার মানে তাকে সম্মান করে, ভয় পায়। গুলসারি শক্তিশালী ও সুন্দর। সওয়ার তাতে চেপে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।

এ যাত্রায় গুলসারির পিঠে চেপে চলেছেন আঞ্চলিক অভিশংসক সেগিজবায়েভ — তাঁকে যৌথখামার দেখার ভার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁর সঙ্গী হয়েছে যৌথখামারের পার্টি সংগঠক — এটাও তাঁর প্রতি সম্মানের নিদর্শন। পার্টি সংগঠক চুপ করে আছে, সম্ভবত ভয় পাছে: মেষপালন বিভাগে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা খারাপ কিনা! খুবই খারাপ। তা চুপচাপ থাকুক গে। ভয় পাক না। আবোল-তাবোল কথাবার্তায় কাজ কী? -- ঊর্ধ্বতনদের সামনে অধস্তনদের মুখ বুজেই থাকা উচিত। তা না হলে কোন শৃঙ্খলাই থাকবে না। এমনও কেউ

কেউ আছে যারা নিজেদের অধস্তনদের সঙ্গে মাখামাখি করতে ইতস্তত বোধ করে না, ফল হয় এই যে ঐ অধস্তনদের কাছ থেকেই তারা এমন ঝাড় খায় যে অবস্থাটা হয় তুলো ধ্নো হওয়ার মতো। শাসনভার — একটা বড় কাজ, দায়িত্বের কাজ. সকলের কাঁধে সে ভার সয় না।

দৌড়বাজ ঘোড়ার চালের তালে তালে জিনের ওপর দ্লতে দ্লতে এই সব ভাবতে ভাবতে সেগিজবায়েভ চলছিল, তার মেজাজ যে খারাপ ছিল এমন কথা বলা যায় না, যদিও যাচ্ছিল মেষপালকদের পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে এবং জানত যে সেখানে প্রীতিকর বিশেষ কিছ্ দেখতে পাবে না। শীতে আর বসন্তে সংঘাত বেধেছে. কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না এবং এই সংঘাতে সবচেয়ে বেশি দ্র্ভোগ ভেড়ার পালের — বাচ্চাগ্লো মরছে, মরছে অনাহারে হাড্ডিসার মাদী ভেড়া-গ্লো. কিন্তু কিছ্ করার নেই। প্রতি বছরই ত এরকম হয়ে থাকে। একথা সকলে জানেও। কিন্তু তাকে যখন ভার দিয়ে পাঠানো হয়েছে তখন কারও না কারও কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করতে হয় বৈকি! আর মনের কোন এক গহন আঁধারে তার একথাও জানা ছিল যে অণ্ডলে মড়কের উঁচু হার তার পক্ষে কাজেরই হবে। সে একজন আণ্ডলিক অভিশংসক — পশ্পালন ব্যাপারের দায়দায়িত্ব তার নয়, শেষ পর্যন্ত তা বর্তায় অণ্ডল কমিটি ব্যুরোর একজন সদস্যের ওপর মাত্র। প্রধান সম্পাদক — সে-ই ত দায়ী। লোকটা এখনও নতুন, এ অণ্ডলে বেশি দিন হল আসে নি. মাথা ঘামাক না। আর সে. সেগিজবায়েভ দেখবে। ঐ ওপরওয়ালারাও দেখ্ন বাইরে থেকে সম্পাদক করে পাঠিয়ে তাঁরা ভুল করেছেন কিনা। ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন সেগিজবায়েভ দ্ঃখ পায়. তাকে বাদ দিয়ে বাইরের একজনকে ঐ বহাল করা হল — এটা সে ভালো মনে নিতে পারল না।

বহু কাল হল সে এখানে অভিশংসকের কাজ করছে, মনে হয় একাধিকবার সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। যাক গে, বন্ধুবান্ধব তার আছে, দরকার হলে তারা তাকে সমর্থন করবে। আর নয়, আর নয়, এবারে তাকে পার্টির কাজে চলে আসতে হয়, অভিশংসকের চেয়ারে অনেক দিন বসা হল... দৌড়বাজ ঘোড়াটা ভালোই, জাহাজের মতো দোলা দিচ্ছে, জল-কাদা — কোন কিছুতেই গ্রাহ্যি নেই। পার্টি সংগঠকের ঘোড়াটা ত ইতিমধ্যে ঘামের সাদা ফেনায় নেয়ে উঠেছে, অথচ এটা সবে ভিজতে শুরু করেছে...

এদিকে চোরো ভাবছে তার নিজের ভাবনা। তাকে রীতিমতো রুগ্ণ দেখাচ্ছে। তার অবসন্ন মুখ হলদেটে আবরণে ছেয়ে গেছে, চোখদুটো কোটরে চলে গেছে। বহু বছর যাবৎ বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে ততই অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। তার ভাবনা-চিন্তাগুলোও ছিল বেদনাদায়ক। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে তানাবাইয়ের কথাই ঠিক। সভাপতি হৈচৈ চিৎকার-চেঁচামেচি করছে কিন্তু তাতে লাভ কিছু হচ্ছে না। বেশির ভাগ সময় সে পড়ে থাকে সদরে, সব সময়ই সেখানে তার কী সব কাজ। পার্টি মিটিংয়ে ওর প্রসঙ্গটা ওঠানো উচিত ছিল, কিন্তু অঞ্চল কমিটি থেকে তাতে বলা হচ্ছে অপেক্ষা করতে। অপেক্ষা করার আবার কী আছে? শোনা যাচ্ছে আলদানভ নিজেই নাকি ছেড়ে দিতে চাইছে, হয়ত সেই কারণে? তা ছেড়ে দিলেই ত হয়। চোরোর নিজেরও উচিত ছেড়ে দেওয়া। তাকে দিয়ে কী লাভ হচ্ছে? সব সময় অসুস্থ। সামানসুর ছুটিতে এসেছিল, সেও পরামর্শ দিচ্ছে ছেড়ে দিতে। ছেড়ে ত দেওয়া যায়, কিন্তু বিবেক? সামানসুরের ছেলেটা বোকা নয়, এখন সে সব ব্যাপার বাপের চেয়েও ভালো বোঝে। কী ভাবে কৃষিখামার চালানো উচিত এই নিয়ে সে

সব সময় আলাপ আলোচনা করে। ওদের যা শেখানো হচ্ছে কালে হয়ত তা ঘটবে. কিন্তু তত দিনে বাপ আর থাকবে না বলেই মনে হয়। নিজের দুর্ভাগ্য থেকে তার নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। নিজের কাছ থেকে নিস্তারের, নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া লোকে বলবেই বা কী? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আশা-ভরসা দিয়েছিল, যৌথখামারকে ঋণে ভরাডুবি করে দিল আর নিজে এখন কিনা বিশ্রাম নিতে চলল? না, তার বিশ্রাম নেই, বরং শেষ পর্যন্ত দেখবে। সাহায্য আসবে, এ রকম বেশি দিন চলতে পারে না। কেবল যত তাড়াতাড়ি আসে। আর সে সাহায্য হওয়া চাই সত্যিকারের, এ লোকটা যেমন সাহায্য করছে তেমন নয়। বলছে অব্যবস্থার জন্য বিচার হবে! তা বিচার কর না! কিন্তু দণ্ড দিয়ে ত আর ভুল সংশোধন করা যায় না। চলেছেন ভ্রূকুটি করে, যেন ওখানে, পাহাড়ে আছে কেবল অপরাধী আর তিনি একাই যৌথ-খামারের জন্য লড়ছেন... অথচ এসবে তার থোড়াই মন, কেবল ভড়ং দেখানো হচ্ছে। কিন্তু একবার বলে দেখ না!

১৮

ধূসর আঁধারে ঢাকা পড়ে ছিল বিশাল বিশাল পাহাড়। সূর্য তাদের ভুলে গেছে, ক্ষুব্ধ দৈত্য-দানবের মতো তারা থমথমে কালো মুখ ঊর্ধ্বে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বসন্তের অবস্থা ভালো নয়। সর্বত্র স্যাঁতসেঁতে ও ঘোলাটে।

তানাবাই তার চালাঘরে হিমশিম খাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা, দম আটকে আসে। এক সঙ্গে কয়েকটি করে ভেড়া বাচ্চা দিচ্ছিল, বাচ্চাগুলোকে রাখার কোন জায়গা নেই। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েও কোন লাভ নেই। চিৎকার, ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি। সকলেই খাদ্য চায়, জল চায়, মাছির মতো মড়ক

লেগে গেছে। এদিকে বৌ মাজা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। উঠতে চায়, কিন্তু সিধে হতে পারে না। যা হওয়ার হোক গে। আর শক্তি নেই।

বেক্‌তাইয়ের ব্যাপারটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না, তার প্রতি একটা অসহায় ক্রোধ তানাবাইয়ের বুকে চেপে বসে আছে। কারণ এই নয় যে সে চলে গেল — জাহান্নামে যাক, এও নয় যে নিজের ভেড়ার পাল গছিয়ে দিল, যেমন ভাবে কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে, — আজ হোক কাল হোক ওরা কাউকে না কাউকে পাঠাবে, ভেড়াগুলোর ভার নেবে, কিন্তু তানাবাইয়ের রাগ এই কারণে যে বেক্‌তাইকে এমন কোন জুতসই জবাব দিতে পারল না যাতে সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যায়, যাতে বাছাধন দুনিয়ার হালচাল টের পায়। সে দিনের ছোকরা! নাকে শিকনি গড়ায়! আর তানাবাই হল বহু কালের কমিউনিস্ট, সারাটা জীবন যৌথখামারের জন্য খেটেছে, সে কিনা উপযুক্ত জবাব দেওয়ার মতো কথা খুঁজে পেল না। শিকনি পড়া ছেলেটা মেষ পালকের ছড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। এমন হতে পারে তা কি তানাবাই কখনও ভাবতে পেরেছিল! সে কি ভাবতে পেরেছিল যে তার সাধের কাজকে কেউ উপহাস করবে?

"যথেষ্ট হয়েছে!" তানাবাই নিজেকে সংযত করতে চাইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই ভাবনার উদয় হয়।

আরও একটা ভেড়ার বাচ্চা হল — যমজ, সুন্দর দুটো বাচ্চা। কিন্তু এদের নিয়ে কী উপায়? ভেড়াদের বাঁট শূন্য, তা ছাড়া দুধ হবেই বা কোত্থেকে? তার মানে ও দুটোও মারা যাবে! ওঃ, কী বিপদ, কী বিপদ! ঐ ত ওখানে সিটকে মড়াগুলো পড়ে আছে। তানাবাই লাশ জড় করে নিয়ে ফেলে দিতে চলল, তার মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো।

'আব্বা, বড় কর্তারা আমাদের কাছে আসছে।'

'আসুক গে,' তানাবাই বিড়বিড় করে বলল। 'তুই যা, মা'র কাছে গিয়ে বস।'

চালাঘর থেকে বেরিয়ে তানাবাই দুই ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। "ও! গুলসারি!" তানাবাই খুশি হল। বুকের ভেতর পুরনো তন্ত্রী বেজে উঠল। "কত দিন দেখা হয় নি! দ্যাখ দেখি, কেমন চলছে, সেই আগের মতোই!" এক জন ছিল চোরো। অন্য জন, যে গুলসারির পিঠে চেপে আসছিল, তার গায়ে ছিল চামড়ার ওভারকোট — তাকে তানাবাই চিনতে পারল না। সদর থেকে কেউ হবে।

"আরে আরে, এগিয়ে এসো দেখি! শেষকালে সময় হল!" তানাবাই বিদ্বেষ মেশানো আনন্দ নিয়ে মনে মনে বলল। এখানে সে অভিযোগ করতে পারে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে কান্নাকাটি করতে পারে, কিন্তু না, সে ঘ্যানঘ্যান করবে না, ওরা নিজেরাই লজ্জায় লাল হোক। এই কি বিচার! মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এখন কিনা দেখতে এসেছেন...

ওরা কখন কাছে আসবে তার জন্য তানাবাই অপেক্ষা করল না, সে চালাঘরের পেছনে কোনায় গিয়ে মরা বাচ্চাগুলো গাদা মেরে ফেলে দিয়ে এলো। ধীরে সুস্থে ফিরল।

ওরা ততক্ষণে উঠোনে এসে গেছে। ঘোড়াগুলো ভারী নিশ্বাস ফেলছে। চোরোকে কেমন যেন করুণ আর অপরাধী অপরাধী দেখাচ্ছিল। সে জানে যে বন্ধুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর গুলসারির পিঠে যে লোকটা বসে ছিল তার চেহারাটা রাগী রাগী, ভয়ঙ্কর, সে সম্ভাষণ পর্যন্ত করল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'জঘন্য! সর্বত্রই এরকম! দেখ, এখানে কী সব কান্ডকারখানা ঘটছে!' সে রেগে চোরোর উদ্দেশে বলল।

তারপর তানাবাইয়ের দিকে ফিরল: 'এটা কী ব্যাপার, কমরেড?' তানাবাই যেখানে মরা দুধের বাচ্চাগুলোকে ফেলেছে সেদিকে মাথা নেড়ে দেখাল। 'কেমন কমিউনিস্ট হে যে তোমার ভেড়ার বাচ্চা মারা যাচ্ছে?'

'ওরা বোধহয় জানে না যে আমি কমিউনিস্ট,' তানাবাই খোঁচা দিল, যেন আচমকা তার ভেতরের একটা স্প্রিং ভেঙ্গে গেল এবং হঠাৎই একটা উদাসীন ও তিক্ত ভাব তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

'কী?' সেগিজবায়েভের মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। সে চুপ করে গেল। 'প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?' শেষ অবধি কথা খুঁজে পেয়ে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য গুলসারির মুখের লাগাম টেনে সে বলল।

'দিয়েছিলাম।'

'সেখানে কী বলেছিলে?'

'মনে নেই।'

'এই জন্যই ত তোমার ভেড়ার বাচ্চা মরছে!' সেগিজবায়েভ চাবুকের হাতল তুলে আবার সেই দিকই দেখিয়ে দিল এবং এই বেয়াদপ রাখালটিকে একটা শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে ঝটকা মেরে রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রথমে সে চোরোকে নিয়ে পড়ল: 'দেখছেন কী? লোকে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত জানে না। পরিকল্পনা বানচাল করে দিচ্ছে, পশুপাল ধ্বংস করছে! আপনি এখানে আছেন কী করতে? কমিউনিস্টদের কী শিক্ষা দিচ্ছেন? ও কেমন কমিউনিস্ট? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি!'

চোরো মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। সে দু'হাতে ঘোড়ার লাগাম কচলাতে লাগল।

'যেমন হয়ে থাকে,' তানাবাই চোরোর হয়ে শান্ত গলায় উত্তর দিল।

'বটে, বটে, যেমন হয়ে থাকে! তুই হলি অনিষ্টকারী! তুই যৌথখামারের সম্পদ নষ্ট করছিস। তুই জনগণের শত্রু। তোর জায়গা জেলখানায়, পার্টিতে নয়! প্রতিযোগিতা নিয়ে মস্করা করছিস!'

'হুঁ হুঁ, জেলখানায় আমার জায়গা, জেলখানায়,' তানাবাই ঐরকম শান্তস্বরেই স্বীকার করল। অপমানে, তিক্ততায় এবং ধৈর্যের মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ায় ভেতরে ভেতরে জ্বলন্ত ক্ষিপ্ততায় ফেটে পড়া দমকে তার ঠোঁট জোড়া হাসিতে নেচে উঠল। 'তার পর!' ঠোঁটের কাঁপুনি চাপার চেষ্টা করতে করতে সেগিজবায়েভের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল। 'আর কী বলার আছে?'

'এরকম করে কথা বলছিস কেন তানাবাই?' চোরো হস্তক্ষেপ করল। 'কী দরকার? সব ব্যাপার বুঝিয়ে বল।'

'ও! তার মানে, তোর কাছেও বুঝিয়ে বলতে হবে? তুই এখানে কী করতে এসেছিস, চোরো?' তানাবাই চেঁচিয়ে উঠল। 'তুই কী করতে এসেছিস? আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি! এই কথা বলতে কি যে আমার এখানে ভেড়ার বাচ্চা মরছে? আমি নিজেই জানি! এই কথা বলতে কি যে আমি গুয়ে-গোবরে গলা ডুবিয়ে বসে আছি? আমি নিজেই জানি। বলতে এসেছিস যে আমি যৌথখামারের জন্য মাথা কুটে মরে সারা জীবন বোকামি করেছি? তাও আমি জানি!..'

'তানাবাই! তানাবাই! মাথা ঠান্ডা কর!' চোরোর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে জিন থেকে লাফিয়ে নামল।

'ভাগ!' তানাবাই ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। 'প্রতিশ্রুতির

নিকুচি করেছি, নিকুচি করেছি আমার সারা জীবনের! হট্! আমার ঠাঁই জেলখানায়। চামড়ার কোট গায়ে এই নয়া খাপ্পাখাঁটাকে এখানে নিয়ে এসেছিস কী করতে? আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে? আমাকে জেলে দেওয়ার জন্যে? ওরে নচ্ছার, জেলে পোর দেখি!' তানাবাই একটা কিছু হাতে তোলার উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল, দেয়ালের গায়ে পিচফর্কটাই দেখতে পেয়ে তা-ই হাতে তুলে নিয়ে সেগিজবায়েভের দিকে ধাওয়া করল। 'ভাগ বলছি এখান থেকে, হতচ্ছাড়া! সরে পড়!' এখন বিলকুল বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে সে সামনের দিকে পিচফর্ক দোলাতে লাগল।

বেজায় রকম ভয় পেয়ে সেগিজবায়েভ হতবুদ্ধি হয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে টানতে লাগল, পিচফর্ক ক্ষিপ্র ঘোড়ার মাথায় আঘাত করে ঝনঝন শব্দে ছিটকে গিয়ে আবার তার মাথায় পড়ল। তানাবাই ক্রোধবশত বুঝতে পারছিল না কেন গুলসারির মাথা এমন থরথর করে কাঁপছে, কেন কাড়িয়াল তার লাল তপ্ত মুখের মধ্যে এমন কেটে বসছে, কেন ঘোড়ার চোখদুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে এমন বিভ্রান্ত ও ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তার সামনে দপদপ করছে।

'হট্, সরে যা গুলসারি! এই চামড়া গায়ে খাপ্পাখাঁটাকে একবার দেখে নি!' নির্দোষ গুলসারির মাথায় আঘাতের পর আঘাত হানতে হানতে তানাবাই গর্জে উঠল।

অল্পবয়সী সাহায্যকারিণীটি ইতিমধ্যে ছুটে এসে তার দু'হাত ধরে ঝুলে পড়ল, চেষ্টা করল পিচফর্ক কেড়ে নিতে, কিন্তু তানাবাই তাকে ঝট্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। চোরো ততক্ষণে লাফিয়ে জিনে উঠে বসেছে।

'পেছন ফেরা যাক! পালানো দরকার! মেরে ফেলবে!'

চোরো সোগিজবায়েভকে তানাবাইয়ের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তানাবাই চোরোর দিকে পিচফর্ক নাড়াল, দুই ঘোড়-সওয়ারই ঘোড়ার রাশ আলগা করে দিয়ে উঠোন থেকে পিট্‌টান দিল। কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাদের পিছু নিল, ঘোড়ার রেকাব আর লেজ ধরে টানাটানি করল।

তানাবাইও তাদের পেছন পেছন দৌড়াল, হোঁচট খেতে খেতে ছুটন্ত অবস্থায় কাদামাটি তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল, তখনও তার চিৎকার চলছে:

'আমার ঠাঁই জেলে? জেলে! ভাগ! ভাগ এখান থেকে! আমার ঠাঁই জেলে! জেলে!'

তারপর ফিরল — তখনও বিড়বিড় করছে, হাঁসফাঁস করছে: "আমার ঠাঁই জেলে, জেলে!" পাশে পাশে কুকুরটা চলেছে বুক ফুলিয়ে — ভাবটা এরকম যে সে তার কর্তব্য পালন করেছে। সে আশা করছিল প্রভু তাকে বাহবা দেবে, কিন্তু তানাবাই তার দিকে ফিরেও তাকাল না। লাঠিতে ভর দিয়ে টলতে টলতে জায়দার মুখোমুখি এগিয়ে এলো — ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'এ তুমি কী করলে? এ কী করলে? '

'খাম্‌কা।'

'খাম্‌কা কী? খাম্‌কা নয়ত কী!'

'খাম্‌কা গুলসারিকে পেটালাম।'

'আরে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে না কি? জান, তুমি কী কান্ড বাধিয়েছ?'

'জানি। আমি অনিষ্টকারী। আমি জনগণের শত্রু,' হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, তারপর চুপ করে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে নুয়ে পড়ে সরবে ফুঁপিয়ে উঠল।

'শান্ত হও, শান্ত হও,' তানাবাইয়ের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বৌ তাকে বলল, কিন্তু তানাবাই মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকিয়ে কাঁদছে ত কাঁদছেই। জায়দার তানাবাইকে এর আগে কখনও কাঁদতে দেখে নি...

১৯

এই অস্বাভাবিক ঘটনার তিন দিন পর পার্টির অঞ্চল কমিটির ব্যুরো বসল।

তানাবাই বাকোসভ অভ্যর্থনা কক্ষে বসে অপেক্ষা করছিল, কখন অফিস ঘরে তার ডাক পড়বে — বন্ধ দরজার ওপাশে তখন তাকে নিয়েই কথাবার্তা চলছিল। এ কয়দিন সে মনে মনে বহু আন্দোলন করেছে কিন্তু কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি সে দোষী কি না। এটা সে বুঝেছিল যে সরকারী প্রতিনিধির গায়ে হাত তুলে সে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছে, কিন্তু ব্যাপারটা কেবল এই নিয়ে হলে সব সহজ হয়ে যেত। নিজের অন্যায় আচরণের জন্য সে যে কোন রকম শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সে যৌথখামারের জন্য তার সমস্ত মনোবেদনা ফাঁকায় ছড়িয়ে দিয়েছে, নিজের যাবতীয় উদ্বেগ আর ভাবনা-চিন্তাকে কলুষিত করেছে। এখন কে তাকে বিশ্বাস করবে? কে এখন তাকে বুঝতে পারবে? "হয়ত বা বুঝলেও বুঝতে পারে?" তার মনের মধ্যে একটা আশা ঝলক দিয়ে উঠল। "এবারের শীতের কথা, চালাঘর আর তাঁবুর কথা, পশুখাদ্যের অভাবের কথা, আমার বিনিদ্র রজনীর কথা, বেক্তাইয়ের কথা — সব বলব... ওরাই বুঝুক — এভাবে কাজ চালানো উচিত কি না।" যে ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য এখন আর ওর আপসোস হল না। "আমাকে ওরা শাস্তি দিক,"

সে মনে মনে ভাবল, “এতে হয়ত অন্যদের পক্ষে কাজ করা আরও সহজ হবে। হয়ত এর পর ওরা পশুপালকদের দিকে নজর দেবে, আমাদের জীবনযাত্রা আর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাববে।” কিন্তু যে অভিজ্ঞতা তার ঘটে গেছে, এক মিনিট বাদে তা মনে পড়ে যেতেই সে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং হাতের মুঠো পাথরের মতো শক্ত করে দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে সে জিদ করে আপন মনে বলল: “না, আমি কোন অন্যায় করি নি, কোন অন্যায় করি নি!'' কিন্তু তারপরই আবার সন্দেহের মধ্যে পড়ল...

এখানে, এই অভ্যর্থনা কক্ষেই ইব্রাহিমও কেন যেন বসে ছিল। ''এটার আবার এখানে কী দরকার? যেন ভাগাড়ে শকুন উড়ে এলো,'' তানাবাই রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ইব্রাহিম চুপ করে ছিল, সে তানাবাইয়ের নত মস্তকের দিকে চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“এত দেরি করছে কেন?” চেয়ারে বসে উশখুশ করতে করতে তানাবাই ভাবল। “আর কেন? — মারবে-কাটবে যা করার করে ফেল না!'' ওদিকে দরজার ওপাশে সকলেই এসে জমায়েত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কয়েক মিনিট আগে সব শেষে চোরো এসে অফিস ঘরে ঢুকে গেল। হাইবুটের পায়ায় লেপটে থাকা লোমের গোছা দেখে তানাবাই তাকে চিনতে পারল। ওখানে লেগে ছিল তামাটে রঙের দৌড়বাজ ঘোড়ার হলদেটে চুল। ''খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে দেখা যাচ্ছে, গুলসারি ঘেমে নেয়ে উঠেছে,'' তানাবাই ভাবল, কিন্তু সে মাথা তুলল না। ঘোড়ার গায়ের বিন্দু বিন্দু ঘামে বুটিদার এবং পায়ায় কয়েক গোছা চুল লেপটানো বুটজোড়া ইতস্তত ভাবে তানাবাইয়ের সামনে একটু থেমে গিয়ে দরজার আড়ালে অন্তর্ধান করল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, শেষকালে অফিস ঘর থেকে মহিলা সেক্রেটারী উঁকি মেরে বলল:

'আসুন, কমরেড বাকাসভ।'

তানাবাই চমকে উঠে দাঁড়াল, বুকের ভেতরে কান-ফাটান ঢিপ্‌ঢিপ্‌ শব্দ অনুভব করল এবং কানের মধ্যে অবিরাম গোলাবর্ষণের তালে তালে সে অফিস ঘরের দিকে চলল। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। এখানে যারা বসে আছে তাদের মুখগুলো সে আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছে না বললেই চলে।

'বসুন।' অঞ্চল কমিটির প্রধান সম্পাদক কাশকাতায়েভ লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন।

তানাবাই বসল, ভারাক্রান্ত হাতদুটোকে হাঁটুর ওপর রেখে অপেক্ষা করতে লাগল কখন চোখের এই অস্পষ্টতা কেটে যাবে। তারপর টেবিল বরাবর চোখ মেলে দেখল। প্রধান সম্পাদকের ডান দিকে বসেছে সেগিজবায়েভ — চোখে মুখে উদ্ধত ভঙ্গি। এই লোকটার প্রতি ঘৃণায় তানাবাই এমন ফুঁসে উঠল যে তার চোখের সামনে এতক্ষণ যে কুয়াশার ভাবটা ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। টেবিলের পাশে যারা যারা বসে ছিল তাদের সকলের মুখ তীক্ষ্ন ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে আঁধার কালো মুখ ছিল সেগিজবায়েভের — লাল টকটকে, আর সবচেয়ে ফ্যাকাসে, একেবারে রক্তশূন্য — চোরোর। সে বসে ছিল শেষের দিকে, তানাবাইয়ের কাছাকাছি। টেবিলের সবুজ বনাতের ওপর তার সরু সরু হাত স্নায়বিক দৌর্বল্যবশত কাঁপছে। যৌথখামারের সভাপতি আলদানভ চোরোর উলটো দিকে বসে ছিলেন, সশব্দে ফোঁসফোঁস করছিলেন, ভ্রূকুটি করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। যে মামলাটি উঠছে তার প্রতি সভাপতি মশাই নিজের

মনোভাব গোপন করছেন না। অন্যেরা মনে হয় এখনও অপেক্ষায় রয়েছে। অবশেষে প্রধান সম্পাদক ফাইলের কাগজপত্র থেকে মুখ তুললেন।

'কমিউনিস্ট বাকাসভের ব্যক্তিগত আচরণ সংক্রান্ত কেসটা আলোচনা করা যাক,' কথাগুলো বেশ চেপে চেপে উচ্চারণ করে তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, যদি অবশ্য কমিউনিস্ট বলা যায়,' কে যেন বাঁকা হাসি হেসে শ্লেষ করল।

"ক্ষেপে আছে!" তানাবাই মনে মনে বলল। "ওদের কাছ থেকে ক্ষমার আশা নেই। তা ছাড়া আমি ক্ষমার আশা করতেই বা যাব কেন? আমি কি অপরাধী না কি?"

তানাবাইয়ের জানা ছিল না যে তার বিষয়ের মীমাংসাকে কেন্দ্র করে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ গোপন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, দুই পক্ষই এই দুঃখজনক ঘটনাকে নিজের নিজের কাজে লাগাতে প্রস্তুত। এক পক্ষ — তার প্রতিনিধি সেগিজবায়েভ এবং সেগিজবায়েভের সমর্থকরা — যাচাই করে দেখতে চায় নতুন সম্পাদকের প্রতিরোধক্ষমতা, দেখতে চায় প্রাথমিক ব্যবস্থা হিশেবে অন্তত তাকে হাত করা যায় কি না। অপর পক্ষ — যার প্রতিনিধি স্বয়ং কাশকাতায়েভ — আন্দাজ করতে পেরেছে যে সেগিজবায়েভ তার এই পদটির প্রতি তাগ করছে; এ পক্ষের চিন্তা কী করে নিজের গা বাঁচিয়ে এই বিপজ্জনক লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা যায়।

অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মশাই সেগিজবায়েভের পেশ করা বিবরণী পাঠ করলেন। তাতে 'শ্বেত প্রস্তর' যৌথখামারের মেষপালক তানাবাই বাকাসভ কথায় এবং আচরণে যে যে অপরাধ করেছে সে সবের বিশদ বর্ণনা আছে। বিবরণীতে

এমন কিছুই ছিল না যা তানাবাই অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তার সুরে এবং যে ভাষায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে সে হতাশ হয়ে পড়ল। এই ভয়ঙ্কর কাগজটির সামনে নিজের সম্পূর্ণ অসহায়তার কথা চিন্তা করে তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল। দেখা গেল সেগিজবায়েভের বিবরণী স্বয়ং সেগিজবায়েভের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এর বিরুদ্ধে পিচফর্ক হাতে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। তানাবাই আত্মপক্ষ সমর্থনে যে সব কথা বলবে বলে ঠিক করেছিল সে সবই চোখের পলকে ধসে পড়ল, তার নিজের চোখেই সেগুলোর আর কোন তাৎপর্য রইল না, হয়ে দাঁড়াল নিজের দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দশা নিয়ে একজন রাখালের এক তুচ্ছ অভিযোগ। সে বোকা ছাড়া আর কী? এই ভয়ানক কাগজের সামনে তার কৈফিয়তের দাম কী? সে কার সঙ্গে লড়বে বলে ভেবেছিল?

'কমরেড বাকাসভ, ব্যুরোর সদস্য কমরেড সেগিজবায়েভ তাঁর বিবরণীতে যে সব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তার সত্যতা আপনি স্বীকার করছেন কি?' বিবরণী পাঠ শেষ করার পর কাশকাতায়েভ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' চাপা গলায় তানাবাই জবাব দিল।

সকলে চুপ। মনে হল সবাই এই কাগজটার ভয়ে আড়ষ্ট। আলদানভ সন্তুষ্ট হয়ে, টেবিলের ধারে যারা বসেছিল, তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, ভাবটা এই — দেখছ ত কাণ্ডকারখানা।

'ব্যুরোর সদস্য কমরেডরা, যদি অনুমতি করেন, আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দু'-এক কথা বলি,' সেগিজবায়েভ দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে বলতে শুরু করল। 'কোন কোন কমরেড কমিউনিস্ট বাকাসভের কার্যকলাপকে হয়ত নিছক গুণ্ডামি আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন — আমি কিন্তু শুরুতেই এ

ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দিতে চাই। ঘটনাটা যদি তা-ই হত তা হলে, বিশ্বাস করুন আমি প্রশ্নটি ব্যুরোর সামনে হাজির করতাম না — গুন্ডাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্য ব্যবস্থা আমাদের আছে। ব্যাপারটা অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমার মানহানি নিয়ে নয়। আমার পেছনে আছে পার্টির অঞ্চল কমিটির ব্যুরো, বলতে পারেন এক্ষেত্রে গোটা পার্টি এবং পার্টির মর্যাদা হানি আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আর সবচেয়ে বড় কথা — এসব থেকে প্রমাণিত হচ্ছে কমিউনিস্টদের মধ্যে ও পার্টির বাইরের লোকজনের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজ পরিচালনায় গাফিলতি, ভাবাদর্শগত কাজে অঞ্চল কমিটির মারাত্মক ত্রুটি। বাকাসভের মতো সাধারণ কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমাদের সকলকে দায়ী হতে হবে। আমাদের সকলকেই ভেবে দেখতে হবে সে একাই এরকম, না তার সমভাবাপন্ন আরও কেউ আছে। যে কথাগুলো সে বলেছে তার তাৎপর্য একবার ভেবে দেখুন — "চামড়ার কোট গায়ে নয়া খাঞ্জাখাঁ!" কোটের প্রসঙ্গ বাদই দিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাকাসভের মতে, আমি, সোভিয়েত নাগরিক, পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি — নয়া খাঞ্জাখাঁ, জমিদার, জনগণের শোষক! বুঝুন একবার! আপনারা বুঝতে পারছেন এর তাৎপর্য কী, এরকম কথার পেছনে কী ধরনের চিন্তাধারা লুকিয়ে আছে? আমার মনে হয় টীকা নিষ্প্রয়োজন... এখন মামলার অন্য দিকটি দেখা যাক। 'শ্বেত প্রস্তর' খামারে পশুপালনের চরম দুরবস্থা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। বাকাসভ ভাব দেখাল সে তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে — এরকম কুৎসিত কথার জবাবে আমি তাকে অনিষ্টকারী ও জনগণের শত্রু বলি, বলি যে তার ঠাঁই পার্টিতে নয়, জেলখানায়। স্বীকার করছি যে তাকে অপমান করেছি, তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার

জন্যও আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এখন আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে ঠিকই বলেছি। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি না, বরং আবার বলছি, বাকাসভ — বিপজ্জনক, শত্রুভাবাপন্ন লোক...'

জীবনে তানাবাইয়ের কত অভিজ্ঞতাই না হল! শুরু থেকে শেষ অবধি যুদ্ধে ছিল, কিন্তু আজ বুকের ভেতরটা যেমন আর্তনাদ করে উঠছে তেমন আর্তনাদ যে সেখান থেকে উঠতে পারে তা সে কখনও ভাবে নি। এই আর্তনাদ কানে অবিরাম কামানের গর্জন তুলছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডটা উঠছে নামছে, গুড়ি মেরে ওপরে উঠছে, সরসর করে নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু গোলা তাকে সরাসরি তাগ করে চলেছে! "ওঃ!" তানাবোইয়ের মাথার ভেতরটা দপ্‌দপ করতে লাগল, "যা আমার জীবনের অর্থ ছিল, আমার সমস্ত কাজের অর্থ ছিল সে সব কোথায় গেল? এই শোনার জন্য না কি আমাকে বাঁচতে হল যে আমি হলাম জনগণের শত্রু! অথচ আমি ভেবে মরছিলাম কোন এক চালাঘরের জন্য, কতকগুলো ভেড়ার বাচ্চার জন্য, বিপথগামী বেক্‌তাইয়ের জন্য। কার দরকারে?.."

'আমার বিবরণীর সিদ্ধান্তগুলো আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,' সেগিজবায়েভ কথাগুলোকে ঠাসবুনুনিতে বাঁধতে বাঁধতে বলে চলল। 'বাকাসভ আমাদের ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে, আমাদের যৌথখামারকে ঘৃণা করে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে ঘৃণা করে, এসবে তার বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য নেই, সে আমাদের গোটা জীবনকে ঘৃণা করে। এটা সে একেবারে খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করেছে যৌথখামারের পার্টি সংগঠক কমরেড সাইয়াকভের উপস্থিতিতে। তা ছাড়া তার কার্যকলাপ ফৌজদারী দন্ডবিধিমতেও দন্ডনীয় — সরকারী প্রতিনিধি

চাকুরীগত কর্তব্য পালন করতে গেলে সে তাঁর ওপর আক্রমণ করে। আমার অনুরোধ আমার কথাগুলো ঠিকমতো বোঝার চেষ্টা করুন, আমার অনুরোধ আদালতে, কৈফিয়ত তলব করার উদ্দেশ্যে বাকাসভের ওপর সমন জারি করা হোক এবং তাকে যেন এখান থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। তার অপরাধ হুবহু আটান্ন ধারার আওতায় পড়ে। আর পার্টির কর্মী হিশেবে বাকাসভের থাকার ব্যাপারে, আমার মতে, কোন কথাই উঠিতে পারে না!..'

সেগিজবায়েভের জানা ছিল যে তার দাবিটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে, তবে তার ভরসা ছিল এই যে ব্যুরো যদি তানাবাই বাকাসভকে আদালতে সোপর্দ করার প্রয়োজন বোধ নাও করে ত পার্টি থেকে তার বহিস্কারের ব্যাপারটি অন্তত সুনিশ্চিত। এই দাবিকে সমর্থন না করার আর কোন উপায়ই কাশকাতায়েভের নেই এবং এতে সেগিজবায়েভের প্রতিষ্ঠা আরও বাড়বে।

'কমরেড বাকাসভ, আপনার আচরণ সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে?' কাশকাতায়েভের কণ্ঠে এবারে বিরক্তি ঝরে পড়ল।

'কিছুই বলার নেই। সবই বলা হয়ে গেছে,' তানাবাই উত্তর দিল। 'দেখা যাচ্ছে আমি অনিষ্টকারী ছিলাম, জনগণের শত্রু ছিলাম এবং আছি। সুতরাং আমি কী ভাবছি তা জানার দরকার কী? নিজেরাই বিচার করুন. আপনারা ভালো জানেন...'

'আপনি কি নিজেকে সৎ কমিউনিস্ট বলে ভাবেন?'

'এখন আর তা প্রমাণ করা যাবে না।'

'আপনি কি নিজের অপরাধ স্বীকার করছেন?'

'না।'

'আপনি কি নিজেকে সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করেন?'

'না, বরং তার উলটো — সকলের চেয়ে মুর্খ।'

'অনুমতি করুন আমি বলি।' বুকে কম্‌সমোলের ব্যাজ আঁটা একটা অল্পবয়সী ছেলে উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত সকলের চেয়ে সে বয়সে ছোট, পাতলা গড়নের, মুখটা রোগাটে, তাকে এখনও ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখায়।

মাত্র এখনই তানাবাই তাকে লক্ষ্য করল। "বলে যাও, বলে যাও খোকা, কোন দয়া-মায়া করো না," তানাবাই মনে মনে তার উদ্দেশে বলল। "আমিও এক সময় এরকমই ছিলাম, কোন দয়া-মায়া করতাম না।"

সঙ্গে সঙ্গে দূরের মেঘের ফাঁকে আলোর ঝলকের মতো সে দেখতে পেল পথের পাশে গমখেতের সেই জায়গাটা, যেখানে কুলুবাই কাঁচ গমগাছ উপড়ে ফেলেছিল, পায়ের তলায় পিষেছিল। ঘটনাটাকে সে পরিষ্কার দেখতে পেল, তৎক্ষণাৎ সব কিছু তার কল্পনার দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল, তানাবাই কে'পে উঠল, মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত চিৎকার গুমরে উঠল।

কাশকাতায়েভের কণ্ঠস্বরে সে সংবিৎ ফিরে পেল।

'বলুন, কেরিমবেকভ...'

'কমরেড বাকাসভের আচরণ আমি অনুমোদন করছি না। আমার মনে হয় পার্টির উচিত তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। কিন্তু কমরেড সেগিজবায়েভের সঙ্গেও আমি একমত নই।' কেরিমবেকভ কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা সংবরণ করল। 'বরং আমি মনে করি কমরেড সেগিজবায়েভের নিজের প্রসঙ্গটিও আলোচিত হওয়া উচিত...'

'বাঃ, চমৎকার!' কে যেন মাঝখান থেকে বলে উঠল। 'আপনাদের কম্‌সমোলের এই কি নিয়মকানুন না কি?'

'নিয়মকানুন সব জায়গায়ই এক,' কেরিমবায়েভ আরও উত্তেজিত হয়ে, মুখ লাল করে বলল। সে একটু থেমে যুতসই কথা খুঁজতে লাগল, নিজের বিব্রতভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎই মরিয়া হয়ে রাগে ফেটে পড়ল: 'একজন যৌথখামারীকে, মেষপালক ও পুরনো কমিউনিস্টকে অপমান করার কী অধিকার আপনার আছে? আপনি আমাকে একবার জনগণের শত্রু বলে দেখুন দেখি... আপনি তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই যে যৌথখামারে পশুপালনের অবস্থা দেখে আপনি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন, কিন্তু আপনি কি এটা ভেবে দেখেছেন যে মেষপালক আপনার চেয়ে কম বিচলিত ছিলেন না? আপনি যখন তাঁর কাছে এলেন তখন কি জানতে চেয়েছেন যে তাঁর জীবনযাত্রা কেমন চলছে, কাজকর্ম কেমন চলছে? ভেড়ার বাচ্চাগুলো কেন মরছে? না, আপনারই বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর গালিগালাজ বর্ষণ করতে থাকেন। যৌথখামারগুলোতে ভেড়ার বাচ্চা হওয়ার পর্বটা যে কী কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটে তা কারও অজানা নেই। আমি প্রায়ই ওসব জায়গায় ঘুরেছি, আমার লজ্জা করে, নিজেদের কম্‌সমোল মেষপালকদের সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করি এই কারণে যে আমরা তাদের কাছে দাবি করি অনেক, অথচ সাহায্য, বলতে গেলে করিই না। দেখুন না যৌথখামারগুলোর চালাঘরের কী অবস্থা, আর পশুখাদ্য? আমি নিজে পশুপালকের ছেলে। আমি জানি ভেড়ার বাচ্চা মারা যাওয়ার অর্থ কী। ইনস্টিটিউটে আমাদের শেখানো হয়েছে এক রকম আর কাজের জায়গায় দেখছি সব চলছে সাবেকি ধরনে। এসব দেখে মনে ব্যথা লাগে!..'

'কমরেড কেরিমবেকভ,' সেগিজবায়েভ তাকে বাধা দিয়ে বলল। 'আমাদের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করবেন না, আবেগ

এমন একটা জিনিস যাকে অনেক দূর টানা যায়। তথ্য চাই, তথ্য, আবেগ নয়।'

'মাফ করবেন, এটা ফৌজদারী অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নয়, আমরা বিচার করছি আমাদের পার্টি কমরেডের বিষয়,' কেরিমবেকভ বলে চলল। 'একজন কমিউনিস্টের ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। তাই আসুন, একটু তলিয়ে দেখা যাক কমরেড বাকাসভ কেন এমন আচরণ করলেন। তাঁর কার্যকলাপ অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু যে বাকাসভ ছিলেন যৌথখামারের সেরা পশুপালকদের একজন, তিনি কী করে এই পর্যায়ে নামলেন?'

'বসুন,' কাশকাতায়েভ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন। 'আপনি মূল প্রসঙ্গ থেকে আমাদের বিচ্যুত করে নিয়ে যাচ্ছেন, কমরেড কেরিমবেকভ। আমার মনে হয় কমিউনিস্ট বাকাসভ যে মারাত্মক অপরাধ করেছে এটা এখানে সকলের কাছে একেবারে স্পষ্ট। এরকম কী করে চলতে পারে? এমন জিনিস কে কোথায় শুনেছে? আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির ওপর কেউ পিচফর্ক নিয়ে হামলা করবে এটা আমরা বরদাস্ত করব না, আমাদের কর্মীদের মর্যাদা কেউ নাশ করবে এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কমরেড কেরিমবেকভ, আপনি বরং হৃদয় আর আবেগের বাজে কচকচানি বাদ দিয়ে কম্‌সমোলের কাজে মাথা ঘামালে ভালো করতেন। আবেগ এক জিনিস আর কাজ অন্য জিনিস। বাকাসভ যা করেছে তা আমাদের সতর্ক না করে পারে না এবং বলাই বাহুল্য, পার্টিতে তার স্থান নেই। কমরেড সাইয়াকভ, যৌথখামারের পার্টি সংগঠক হিশেবে আপনি কি এই বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন করেন?' তিনি চোরোকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, সমর্থন করি,' চোরো ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

তার মুখ ফ্যাকাসে। 'কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই...'

'আর ব্যাখ্যা করে বলার কী আছে?'

'প্রথমত, আমার অনুরোধ আমরা আমাদের পার্টি সংগঠনে বাকাসভের ব্যাপারটি আলোচনা করি।'

'এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অঞ্চল কমিটির ব্যুরোর সিদ্ধান্ত পরে পার্টি সংগঠনের সদস্যদের জানিয়ে দিলেই হল। আর কী আছে?'

'আমি বলতে চাই...'

'আর কী বলার আছে, কমরেড সাইয়াকভ? বাকাসভের পার্টিবিরোধী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ। এখানে আর ব্যাখ্যা করে বলার কিছু নেই। আপনিও এ ব্যাপারে দায়ী। কমিউনিস্টের শিক্ষার কাজে আপনি যে অব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনাকেও দোষী সাব্যস্ত করব। আপনি কেন কমরেড সেগিজবায়েভকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যাতে উনি প্রশ্নটাকে ব্যুরোর সামনে না রাখেন? ধামা চাপা দেওয়ার তালে ছিলেন? লজ্জা করে না! বসুন!'

তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশানের অধিকর্তা ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সম্পাদক কেরিমবেকভকে সমর্থন করলেন। একটা সময় এমনও মনে হল যে তাঁরা তানাবাইকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু সে নিজে এমন ভেঙ্গে পড়েছে এবং হতাশ হয়ে পড়েছে যে কারও কথাই আর শুনছিল না। সে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করছিল: "যা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম সে সব কোথায় গেল? আমাদের ওখানকার ভেড়ার পাল-টালের ব্যাপারে এখানে কারও কোন আগ্রহ আছে বলে ত মনে হয় না। কী বোকামিই না আমি করেছি! যৌথখামারের জন্য, ভেড়া আর ভেড়ার বাচ্চার জন্য নিজের জীবন নষ্ট করলাম। এসব আর এখন ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

এখন আমি বিপজ্জনক লোক। মরুক গে! যা করার হয় কর — এ থেকে যদি ভালো হয় ত আমার দুঃখ নেই। এসো, আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। আমার এখন একটাই পরিণতি, যা অস্ত্র আছে ছাড়, মায়া-মমতা করো না...''

যৌথখামারের সভাপতি আলদানভ ভাষণ দিলেন। সভাপতির মুখভঙ্গি আর হাবভাব থেকে তানাবাই দেখতে পেল লোকটা কাকে যেন গালিগালাজ করছে, কিন্তু ঠিক কাকে, তা তানাবাইয়ের বোধগম্য হল না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শুনতে পেল "পায়ের বেড়ি... গুলসারি...'' এই কথাগুলো।

'...তারপর কী হল ভাবতে পারেন?' আলদানভের কণ্ঠস্বরে বিক্ষোভ। 'আমরা ঘোড়াটার পায়ে বাধ্য হয়ে বেড়ি পরাতে ও আমার মাথা ভেঙ্গে দেবে বলে খোলাখুলি ভাবে হুমকি দেয়। কমরেড কাশকাতায়েভ, ব্যুরোর সদস্য কমরেডরা, যৌথখামারের সভাপতি হিশেবে আমার অনুরোধ — বাকাসভের হাত থেকে আমাদের রেহাই দিন। তার ঠাঁই সত্যি সত্যিই জেলখানা। সব পদস্থ কর্মচারীর ওপর তার আক্রোশ। কমরেড কাশকাতায়েভ, বাকাসভ আমাকে উদ্দেশ্য করে যে হুমকি দিয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে এমন সাক্ষীসাবুদ পাশের ঘরেই হাজির আছে। তাদের ডাকতে হবে কি?'

'না, তার কোন দরকার নেই.' কাশকাতায়েভ বিরক্তির সঙ্গে ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন। 'এটাই যথেষ্ট। বসুন।'

তারপর ভোট শুরু হয়ে গেল।

'এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে যে কমরেড বাকাসভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক। "পক্ষে" কে কে?'

'এক মিনিট, কমরেড কাশকাতায়েভ।' কেরিমবেকভ আবার ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। 'ব্যুরোর সদস্য কমরেডরা, এতে কি

আমাদের মারাত্মক ভুল হবে না? আমার প্রস্তাব অন্য — বাকাসভ ব্যক্তিগত ভাবে যে কাজ করেছেন তাকে কঠোর নিন্দা বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সেই সঙ্গে পার্টি সদস্য হিশেবে, মানুষ হিশেবে কমিউনিস্ট বাকাসভের মর্যাদা হানি ঘটানোর জন্য, অঞ্চল কমিটির ভারপ্রাপ্ত কর্মী হয়ে কাজে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য ব্যুরোর সদস্য সেগিজবায়েভকেও নিন্দা করা।'

'বাগাড়ম্বর!' সেগিজবায়েভ চিৎকার করে উঠল।

'শান্ত হোন, কমরেডরা,' কাশকাতায়েভ বললেন। 'আপনারা উপস্থিত আছেন অঞ্চল কমিটির ব্যুরোতে, নিজেদের বাড়িতে নয়, অনুরোধ করছি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।' এখন সব কিছু নির্ভর করছে তাঁর ওপর, অঞ্চল কমিটির প্রধান সম্পাদকের ওপর। সেগিজবায়েভ যেমন আঁচ করেছিল, ব্যাপারটা তিনি সেভাবেই ঘোরালেন। 'বাকাসভের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না,' তিনি বললেন, 'তবে পার্টিতে তার জায়গা অবশ্যই হতে পারে না — কমরেড সেগিজবায়েভ খুব খাঁটি কথাই বলেছেন। বিষয়টি ভোটে রাখা যাক। বাকাসভকে পার্টি থেকে বার করার পক্ষে কে কে?'

ব্যুরোর সদস্য ছিলেন সাত জন। তিন জন হাত তুললেন বিতাড়নের পক্ষে, তিন জন — বিপক্ষে। বাকি রইলেন কাশকাতায়েভ নিজে। একটু থমকে তিনি 'পক্ষে' হাত তুললেন। তানাবাই এসব কিছুই দেখতে পেল না। সে তার ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তখনই জানতে পারল যখন শুনতে পেল কাশকাতায়েভ সেক্রেটারীকে বলছেন:

'সভার বিবরণীতে লিখুন: অঞ্চল কমিটির ব্যুরোর সিদ্ধান্তক্রমে কমরেড বাকাসভ তানাবাই পার্টির সদস্যপদ হইতে বিতাড়িত হইলেন।'

"ব্যস্, সব চুকে গেল!" তানাবাই আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে মনে মনে বলল।

'আমি কিন্তু জোর দিয়ে বলছি সেগিজবায়েভ সম্পর্কে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হোক,' কেরিমবেকভ দমল না।

বিষয়টাকে ভোটে না রেখে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যেত, কিন্তু কাশকাতায়েভ ভোটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে তাঁর একটা গোপন ফন্দি ছিল।

'কমরেড কেরিমবেকভের প্রস্তাবের পক্ষে কে কে? অনুগ্রহ করে হাত তুলুন।'

আবার তিন তিন। এবারেও কাশকাতায়েভ চতুর্থ ব্যক্তি হয়ে হাত তুললেন এবং সেগিজবায়েভকে নিন্দার হাত থেকে বাঁচালেন। "বলা যায় না এই অনুগ্রহটাকে ও বুঝতে পারবে কিনা, এর দাম দেবে কিনা। কে বলতে পারে?.. লোকটা কুটিল, ধড়িবাজ।"

লোকজন চেয়ারে নড়ে চড়ে উঠে ঘর ছাড়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। তানাবাই ভাবল এখানেই বুঝি সব শেষ, তাই সেও নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে কারও দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'বাকাসভ, আপনি কোথায় চললেন?' কাশকাতায়েভ তাকে থামালেন। 'আপনার পার্টি কার্ড রেখে যান।'

'রেখে যেতে হবে?' যা ঘটেছে কেবল এখনই তার সবটা তানাবাইয়ের মাথায় ঢুকল।

'হ্যাঁ। টেবিলের ওপর রাখুন। এখন আপনি পার্টির সদস্য নন, তাই কার্ড সঙ্গে রাখার অধিকার আপনার নেই...'

তানাবাই পার্টি কার্ডের জন্য জামার ভেতরে হাত বাড়াল। ঘরে টুঁ শব্দটি নেই — তানাবাই অনেকক্ষণ ধরে হাতড়ে চলছে।

কার্ডটা ছিল বেশ তলার দিকে, তার কোর্তার নীচে, ভেতরের গরম জামার নীচে, জায়দারের হাতে সেলাই করা চামড়ার বটুয়ার মধ্যে। কাঁধ বরাবর একটা বেল্‌ট লাগিয়ে তানাবাই বটুয়াটাকে তার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখত। শেষকালে সে বটুয়া টেনে বার করল, বুকের উত্তাপে উষ্ণ পার্টি কার্ডটা বার করল, নিজের শরীরের গন্ধমাখা গরম কার্ডটাকে কাশকাতায়েভের সামনে ঠান্ডা, পালিশ করা টেবিলের ওপর রাখল। রাখতে গিয়ে তানাবাই কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল — যেন তার নিজেরই ঠান্ডা লাগছে। এবারেও কারও দিকে না তাকিয়ে সে বটুয়াটাকে কোর্তার নীচে গুঁজতে গুঁজতে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

'কমরেড বাকাসভ,' পেছনে, টেবিলের ওধার থেকে কেরিমবেকভের সহানুভূতিসূচক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আপনি কি কিছু বলতে চান? আপনি ত এখানে কিছুই বলেন নি। হয়ত আপনাকে অসুবিধার মধ্যে চালাতে হয়েছে? আমরা আশা করি ফিরে আসার দরজা আপনার কাছে বন্ধ হয়ে যায় নি, আজ হোক কাল হোক, আপনি পার্টিতে ফিরে আসতে পারবেন। বলুন না, আপনি এখন কী ভাবছেন?'

তানাবাইয়ের কাঁধে ভেঙ্গে পড়া দুঃখের বোঝা কী ভাবে হালকা করা যায় এই অচেনা যুবকটি এখনও সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে দেখে তানাবাই যন্ত্রণা ও অস্বস্তির সঙ্গে তার দিকে মুখ ফেরাল।

'আমার কী বলার আছে?' সে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল। 'এখানে কথা বলে সকলের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। কেবল একটা কথাই বলতে পারি, আমি অন্যায় করি নি, আমি যদি হাত উঠিয়েও থাকি, এমন কি যদি খারাপ কথাও বলে থাকি, তবু

আমি কোন অন্যায় করি নি। এটা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ব্যস্, এই ত সব।'

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো।

'হুম্। তার মানে রাগটা পার্টির বিরুদ্ধে?' কাশকাতায়েভ বিরক্ত হয়ে বললেন। 'জেনে রাখ তাহলে কমরেড। পার্টি তোমাকে সৎ পথে পরিচালনা করছে, আদালতে বিচারের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাল, আর তুমি কিনা তাতেও সন্তুষ্ট নও, পার্টির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছ! তার মানে তুমি সত্যি সত্যিই পার্টি সদস্য নামের যোগ্য নও। তোমার ফিরে আসার দরজা খোলা থাকবে না আরও কিছু!'

তানাবাই শান্তভাবে অঞ্চল কমিটি থেকে বেরিয়ে এলো। তাকে অতিরিক্ত রকমের শান্তই দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে শান্ত ভাবের লক্ষণ ভালো ছিল না। দিনটি ছিল গরম, রোদমাখা, সন্ধে হয়ে আসছে। লোকজন হেঁটে ও ঘোড়ায় চড়ে যে যার কাজে চলেছে। ক্লাবের সামনের চত্বরটাতে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে। এসব দেখতে দেখতে তানাবাইয়ের অসহ্য লাগছিল, নিজেকেই নিজের কাছে অসহ্য লাগছিল। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় যেতে হয় পাহাড়ে, বাড়িতে। নয়ত আরও খারাপ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

ঘোড়া রাখার জায়গায় তার ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গুলসারি। বিশাল, দীর্ঘাঙ্গী ও শক্তিশালী গুলসারি। তানাবাই এগিয়ে আসতে সে এক পা ছেড়ে আরেক পায়ের ওপর দেহের ভার রাখল, শান্তভাবে ও আস্থাভরে গভীর কালো দুচোখ মেলে তানাবাইয়ের দিকে তাকাল। তানাবাই পিচফর্ক দিয়ে তার মাথায় কী ভাবে খোঁচা মেরেছিল গুলসারি ইতিমধ্যে তা ভুলে গেছে। ঘোড়ার পক্ষেই এটা সম্ভব।

'ভুলে যা, গুলসারি, রাগ করিস না।' তানাবাই ফিসফিস

করে বলল! 'আমার দুর্দশা বড় রকমের। খুব বড় রকমের দুর্দশা,' ঘোড়ার গলা জড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল, কিন্তু পথচারীদের সামনে লজ্জায় নিজেকে সামলে নিল, ডুকরে কাঁদল না।

তানাবাই নিজের ঘোড়ায় উঠে বাড়ির দিকে চলল।

আলেক্সান্দ্রভ্কা টিলা ছাড়ানোর পর চোরো তার নাগাল ধরল। পেছনে ধাবমান অশ্বের পরিচিত পদশব্দ শোনামাত্র তানাবাই অভিমানভরে ঠোঁট কামড়াল, তার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ফিরে তাকানোর প্রবৃত্তি হল না। নিজের প্রতি একটা অভিমান তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, দু'চোখে আঁধার ঘনিয়ে এলো। এককালে যে চোরোকে সে জানত ইদানীংকালের চোরো একেবারেই সে মানুষ নয়। আজকের ঘটনাই ধরা যাক না কেন — কাশকাতায়েভ গলা চড়াল কি চড়াল না অমনি চোরো পাঠশালার বাধ্য ছেলের মতো বসে গেল। এর পরে আর কী? লোকে ওকে বিশ্বাস করে, অথচ ও সত্যি কথা বলতে ভয় পায়। নিজেকে বাঁচিয়ে চলে, বেছে বেছে কথা বলে। এটা ওকে কে শেখাল? তানাবাই না হয় একজন অজ্ঞ লোক, সাধারণ পরিশ্রমী মানুষ, কিন্তু চোরো ত শিক্ষিত, সব জানে, সারা জীবন বড় বড় পদে কাজ করে আসছে। চোরো কি সত্যিই দেখতে পেল না যে সেগিজবায়েভ ও কাশকাতায়েভরা যা যা বলছে সে সব ঠিক নয়! দেখতে পেল না যে তাদের কথা বাইরে থেকে সুন্দর কিন্তু ভেতরে মিথ্যে আর ফাঁকা! ও কাকে ঠকাচ্ছে, কেন?

চোরো যখন তার নাগাল ধরল এবং উত্তেজিত দৌড়বাজ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তার পাশাপাশি চলতে লাগল তখনও কিন্তু তানাবাই ঘাড় ফেরাল না।

'তানাবাই, আমি ভাবলাম আমরা একসঙ্গে বের হব,' সে

দম ফেলতে ফেলতে বলল। 'এসে দেখি তুই ততক্ষণে চলে গেছিস...

'তুই কী চাস?' আগের মতোই তার দিকে না তাকিয়ে তানাবাই জিজ্ঞেস করল। 'নিজের পথ দ্যাখ।'

'শোন, কথা আছে। রাগ করিস না তানাবাই। বন্ধুতে বন্ধুতে, কমিউনিস্টে কমিউনিস্টে যে রকম কথাবার্তা হয় সে ভাবে কথা বলব,' চোরো কথা শুরু করে অর্ধেক পথে থেমে গেল।

'আমি তোর বন্ধু নই, তাছাড়া কমিউনিস্ট ত আর নই-ই। তুইও বহুকাল হল আর কমিউনিস্ট নোস। তুই ভান করিস...'

'তুই কি সত্যিই তাই বলতে চাস?' চোরো ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই, তা-ই বলতে চাই। বেছে বেছে কথা বলা এখনও শিখি নি। কী, কোথায় এবং কীভাবে বলতে হয় তাও জানি না। আচ্ছা, বিদায়। তোকে সোজা যেতে হবে, আমাকে পাশে বাঁক নিতে হবে।' তানাবাই তার ঘোড়াকে পথ থেকে মোড় ফেরাল এবং ফিরে না তাকিয়ে, বন্ধুর মুখের দিকে ঐ রকমই একবারও না তাকিয়ে মাঠ বরাবর সোজা পাহাড়ের দিকে চলল।

ও দেখতে পেল না চোরো কেমন মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কীভাবে সে হাত বাড়িয়ে বন্ধুকে থামাতে চেয়েছিল, কীভাবে সে তারপর কুঁকড়ে গিয়ে বুক চেপে ধরল এবং দৌড়বাজ ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর পড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে ঘন ঘন বাতাস নিতে লাগল।

'আমার খারাপ লাগছে,' হৃৎপিণ্ডের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চোরো ক্ষীণকণ্ঠে বলল। 'ওঃ, খারাপ লাগছে!' চোরোর গলা ভেঙ্গে গেল, সে নীল হয়ে গিয়ে

হাঁসফাঁস করতে লাগল। 'শিগ্‌গির বাড়ি চল গ্‌লসারি, শিগ্‌গির।'

অন্ধকার, জনমানবশ্‌ন্য স্তেপভূমির ওপর দিয়ে দৌড়বাজ গ্‌লসারি তাকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলল, লোকটার কণ্ঠস্বর তাকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল, তার ভেতরে ভয়ংকর, মারাত্মক কী একটা শোনা যাচ্ছিল। গ্‌লসারি তার দ্‌'কান পেছনে হেলিয়ে দিয়ে ভয়ে ছ্‌টতে ছ্‌টতে নাক দিয়ে আওয়াজ করতে লাগল। এদিকে জিনের ওপর লোকটা যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে, দাঁত খিঁচিয়ে দ্‌'হাতে চেপে ধরেছে ঘোড়ার কেশর। ধাবমান গ্‌লসারির ঘাড়ের ওপর লাগাম আলগা হয়ে এদিক-ওদিক দ্‌লছে।

২০

সে দিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছে, তানাবাই তখনও পাহাড়ে পৌঁছ্‌তে পারে নি, এমন সময় গাঁয়ের রাস্তায় এক ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছ্‌টিয়ে চলতে চলতে আতঙ্কিত কুকুরগ্‌লোর সাড়া জাগিয়ে তুলল।

'অ্যাই, বাড়িতে কে আছ? বেরিয়ে এসো!' সে ঘরে ঘরে হাঁক পাড়তে লাগল। 'পার্টি মিটিংয়ে চলে এসো, খামারের অফিসে।'

'ব্যাপার কী? এত জর্‌রী কেন?'

'জানি না,' লোকটা উত্তর দেয়। 'চোরো ডেকে পাঠিয়েছে। বলেছে তাড়াতাড়ি আসতে।'

চোরো নিজে এই সময় অফিসে বসে ছিল। তার কাঁধদ্‌টো টেবিলের দিকে ঝুলে পড়েছে, কুঁজো হয়ে বসে সে ঘন ঘন

নিশ্বাস ফেলছে, জামার নীচে পাঁচ আঙ্গুলে শক্ত করে বুক চেপে ধরে আছে। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। সবজে আভা ধরা মুখে ঠাণ্ডা ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠেছে, চোখদুটো কোটরে বসে গিয়ে কালো কালো গর্তের মতো দেখা যাচ্ছে। থেকে থেকে তার ঘোর লাগছে, আবার তার মনে হচ্ছে দৌড়বাজ ঘোড়া তাকে নিয়ে অন্ধকার স্তেপের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, সে তানাবাইকে ডাকে, কিন্তু তানাবাই জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো কতকগুলো কথা ছুঁড়ে দিয়ে বিদায় নেয়, ফিরে তাকায় না। তানাবাইয়ের কথাগুলো হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়...

পার্টি সংগঠক কিছুক্ষণ আস্তাবলে খড়ের গাদার ওপর পড়ে ছিল, সেখান থেকে তাকে ধরাধরি করে এ জায়গায় নিয়ে আসা হয়। সহিসদের ইচ্ছে ছিল, তাকে বাড়িতে রেখে আসে, কিন্তু চোরো রাজি হল না। সে গাঁয়ের কমিউনিস্টদের ডেকে আনার জন্য একজন লোককে পাঠিয়ে তাদের অপেক্ষায় সময় গুনতে লাগল।

যে মেয়েটি পাহারায় ছিল সে বাতি জ্বালিয়ে চোরোকে একা রেখে সামনের ঘরে চুল্লীর ধারে ঘুর ঘুর করতে লাগল, মাঝে মাঝে ভেজানো দরজা দিয়ে উঁকি মেরে চোরোকে দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর মাথা নাড়ে।

চোরো লোকজনের অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু সময় কাটতে থাকে বিন্দু বিন্দু করে। পৃথিবীতে তার আর যেটুকু সময় আছে প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে তা পীড়াদায়ক তিক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে অন্তর্ধান করছে এবং এর মূল্য সে অনুভব করল আজই — এত কাল কাটিয়ে আসার পর। নিজের দিন আর বছরের প্রতি তার খেয়াল ছিল না, সে দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ সে পায় নি, সেগুলো অন্তর্ধান করেছে

শ্রমে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। জীবনে সবই যে পাওয়া গেছে তা নয়, ইচ্ছেমতো সব কিছু পাওয়া যায় নি। সে চেষ্টা করেছে, লড়াই করেছে, কিন্তু কোনা-ঘুপচি এড়ানোর জন্য, কঠিন পথ যাতে না মাড়াতে হয় তার জন্য কোথাও কোথাও পশ্চাদপসরণ করেছে। কিন্তু তাতেও সে পার পায় নি। যে শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষ সে এড়িয়ে চলছিল সেই শক্তি তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে এবং এখন আর পিছু হটার কোন জায়গা নেই, পথ শেষ হয়ে আসছে। ওঃ যদি একটু আগে থাকতে তার টনক নড়ত, যদি একটু আগে থাকতে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে জীবনের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত...

এদিকে সময় অযথা এক একটি তিক্ত বিন্দু পাত করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। লোকেজন এতক্ষণ আসছে না কেন! কতক্ষণ ওদের অপেক্ষা করতে হবে!

"সময় পাওয়া গেলে হয়," চোরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবল। "সব কিছু বলার মতো সময় পাওয়া গেলে হয়!" একটা অব্যক্ত, মরিয়া চিৎকারে সে প্রস্থানোদ্যত জীবনকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। সে নিজেকে দমন করে রাখছিল, প্রস্তুত হচ্ছিল শেষ সংগ্রামের জন্য। "সব বলব। বলব ঘটনাটা কী ছিল, ব্যুরো কী ভাবে চলেছিল, তানাবাইকে কী ভাবে পার্টি থেকে তাড়ানো হল। লোকে জানুক, অঞ্চল কমিটির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত নই। লোকে জানুক, তানাবাইকে পার্টি থেকে বার করার ব্যাপারে আমি একমত নই। আলদানভ সম্পর্কে যা যা আমি ভাবি, সব বলব। আমার পরে না হয় ওর বক্তব্য শুনুক। কমিউনিস্টরাই সিদ্ধান্ত নিক। নিজের সম্পর্কে সব বলব, বলব আমি কেমন লোক, বলব আমাদের যৌথখামার সম্পর্কে, তার লোকজন সম্পর্কে... সময় পাওয়া

গেলে হয়, শিগ্‌গির শিগ্‌গির এসে পড়লেই ত হয়, শিগ্‌গির শিগ্‌গির..."

প্রথমে ছুটে এলো ওষুধ নিয়ে তার বৌ। দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

'তোমার কি মাথার ঠিক আছে? সভাসমিতির সাধ এখনও মেটে নি বুঝি? বাড়ি চল। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। হায় আল্লা, নিজের কথাটা অন্তত ভাব!'

চোরো কানেই তুলতে চায় না। সে ওষুধ গিলতে গিলতে বৌকে হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। গেলাসে দাঁতের ঠকঠক আওয়াজ হল, জল ছলকে বুক বয়ে পড়তে লাগল।

'ঠিক আছে, এখন সুস্থ বোধ করছি,' স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস ফেলার চেষ্টা করতে করতে সে বলল। 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর, পরে আমাকে নিয়ে যাবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যাও।'

রাস্তা থেকে লোকজনের পায়ের আওয়াজ কানে যেতে চোরো টেবিলের ধারে সিধে হয়ে বসল, যন্ত্রণা দমন করে নিল, নিজের শেষ কর্তব্য বলতে সে যা বিবেচনা করেছে তা পালনের জন্য সে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করল।

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার, চোরো?' লোকে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না। এখন বলব, সকলে এগিয়ে আসুক,' সে উত্তর দিল।

এদিকে সময় অযথা এক একটি তিক্ত বিন্দু পাত করে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

সদস্যরা একত্র হলে পার্টি সংগঠক চোরো সাইয়াকভ টেবিলের পাশে উঠে দাঁড়াল, মাথা থেকে টুপি খুলল এবং পার্টি মিটিংয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করল...

২১

তানাবাই রাতে নিজের বাড়ি ফিরে এলো। জায়দার লণ্ঠন হাতে উঠোনে বেরিয়ে এলো। সে অপেক্ষা করছিল, চোখ বুলিয়ে তানাবাইকে দেখল।

প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারল কী বিপদ তার স্বামীর ঘটেছে। তানাবাই নীরবে ঘোড়ার লাগাম আর জিন খুলছিল, জায়দার আলো ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তানাবাই তাকে কিছুই বলল না। "শহরে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এলেও হত, হয়ত মনটা একটু হালকা হত," জায়দার ভাবল, আর তানাবাই চুপ করে আছে ত আছেই, তার নীরবতা আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছিল। এদিকে জায়দার ভাবছিল তাকে সুসংবাদ দেবে — কিছুটা পশুখাদ্য, খড় আর যবের আটা এসেছে, একটু গরম পড়েছে, ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে মাঠে চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখনই ঘাস ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

'বেক্‌তাইয়ের ভেড়ার পাল ওরা নিয়ে গেছে। নতুন এক রাখালকে পাঠিয়েছে,' বৌ বলল।

'জাহান্নামে যাক ওরা, বেক্‌তাই, ভেড়ার পাল আর তোর রাখাল...'

'কাহিল লাগছে?'

'কাহিল লাগছে কী? পার্টি থেকে বার করে দিয়েছে!'

'আস্তে আস্তে, বাইরের ঐ মেয়েরা শুনতে পাবে!'

'আস্তে বলার কী আছে? আমার ঢাকাঢাকির কী আছে? বার করে দিয়েছে কুকুরের মতো, এই ত। এটাই আমার দরকার ছিল। তোমারও দরকার ছিল। এও যথেষ্ট নয়। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দেখছ কী?'

'যাও, বিশ্রাম কর।'

'তোমাকে বলে দিতে হবে না।'

তানাবাই চালাঘরের ভেতর গেল। সে ভেড়াগুলোকে দেখল। তারপর খোঁয়াড়ে গেল, সেখানেও অন্ধকারে খানিক পায়চারী করল, আবার চালাঘরে ফিরে এলো। কোথায় যাবে ভেবে কূল পায় না। খেতে অস্বীকার করল, কথাবার্তাও বলতে চায় না। এক কোণে খড়ের গাদা পড়ে ছিল, সে তার ওপর গড়িয়ে পড়ে অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। জীবন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা — সবই অর্থ হারিয়ে ফেলল। এখন আর সে কিছুই চায় না। সে বাঁচতে চায় না, ভাবতে চায় না, আশেপাশের কিছু দেখতে চায় না।

এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, ঘুমোনোর চেষ্টা করল, চেষ্টা করল সব ভুলে যেতে, কিন্তু কিসের কী? — নিজের কাছ থেকে কোথায় পালাবে? আবার মনে পড়তে লাগল বেক্‌তাই চলে যাচ্ছে, তার পেছন পেছন সাদা বরফের ওপর পড়ছে কালো কালো পায়ের ছাপ, বেক্‌তাইয়ের কথার উত্তরে তানাবাই কিছুই বলতে পারছে না, মনে পড়তে লাগল দোড়বাজে গুলসারির পিঠে বসে সেগিজবায়েভের চিৎকার, তানাবাইয়ের উদ্দেশে তার জঘন্য গালিগালাজ, তাকে জেলে দেওয়ার হুমকি, তার পর দেখতে পেল অঞ্চল কমিটির ব্যুরোতে তাকে হাজির করা হয়েছে অনিষ্টকারী এবং জনগণের শত্রু হিশেবে, আর এখানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি, তার গোটা জীবনের পরিসমাপ্তি। আবার তার ইচ্ছে হল পিচফর্ক বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ধেয়ে যায় রাত্রির বুকে, প্রাণপণে চেঁচায় সমস্ত বিশ্বসংসারের উদ্দেশে, যতক্ষণ না গড়িয়ে কোন এক খাতে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় মটকে যায়।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে ভাবতে লাগল, এভাবে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরাই ভালো!..

ঘুম যখন ভাঙল তখন মাথা ভার হয়ে আছে। কয়েক মিনিট সে বুঝে উঠতে পারল না, কোথায় আছে, তার কী হয়েছে। পাশে ভেড়াগুলো খক্ খক্ কাশছে, ভেড়ার বাচ্চাগুলো ডাকছে। তার মানে সে চালাঘরে শুয়ে আছে। বাইরে ফরসা হয়ে এসেছে। কেন ওর ঘুম ভাঙল, কেন? এ ঘুম একেবারে না ভাঙলেই ভালো হত। মরণ ছাড়া আর কী গতি অছে? আত্মহত্যা করা উচিত...

...পরে সে নদী থেকে আঁজলাভরে জল পান করল। ঠান্ডা কনকনে জল, তার সঙ্গে মুড়মুড়ে বরফের পাতলা টুকরো। জল কলকল শব্দে তার কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছিল, আবার সে জল তুলে মুখে দিল, জল পড়ে গা ভিজে গেল। একটু দম নিয়ে সংবিৎ ফিরে পেল এবং একমাত্র তখনই তার মনে হল আত্মহত্যার এই পরিকল্পনা নেহাৎই অর্থহীন, এই আত্মনিগ্রহ নেহাৎই বোকামি। জীবন মানুষের একবারই আসে, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কি উচিত? সেগিজবায়েভদের দাম কি এতই? না, তানাবাই এখনও বাঁচবে, সে এখনও পাহাড় টলিয়ে দিতে পারে।

ফিরে এসে সে বন্দুক ও কার্তুজের বেল্‌ট লুকিয়ে রাখল এবং সারা দিন খুব খাটল। তার ইচ্ছে হল বৌয়ের সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে আর সাহায্যকারিণীদের সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহার করে, তারা যদি কোন সন্দেহ করে বসে এই ভেবে নিজেকে সামলে নিল। ওরাও আগের মতো কাজ করে চলল, যেন বিশেষ কিছু ঘটে নি, সব ঠিক আছে। তানাবাই এর জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল, সে কোন কথা না বলে কাজ করতে লাগল। সে চারণভূমিতে গেল, ভেড়ার পালকে ঘরে নিয়ে আসতে সাহায্য করল।

সন্ধেবেলায় আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি কিংবা তুষারপাত, কিছু না কিছু একটা হবে। চারদিক কুয়াসোয় ছেয়ে গেল, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হল। আবার ভাবতে হচ্ছে কী করে ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচানো যায়। আবার চালাঘর সাফ করা দরকার, আবার যাতে মড়ক শুরু না হয় তার জন্য খড় বিছিয়ে দেওয়া দরকার। তানাবাইকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, কিন্তু যা হয়ে গেছে তা সে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, চেষ্টা করছিল মন ঠিক রাখতে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, এমন সময় উঠোনে এক ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাব হল। জায়দার বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করল। তাদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা হল। তানাবাই তখন চালাঘরের ভেতরে কাজ করছিল।

'এক মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসো গো,' বৌ তাকে ডাকল। 'তোমার কাছে একজন এসেছে।' জায়দার যে ভাবে ডাকল তাতে ব্যাপারস্যাপার ভালো বলে তার মনে হল না।

বেরিয়ে এলো। সম্ভাষণ করল। লোকটা তাদের পাশের ক্যাম্পের মেষপালক।

'ও, আইত্‌বাই নাকি? ঘোড়া থেকে নাম। কোত্থেকে?'

'গাঁ থেকে। কাজে ওখানে গিয়েছিলাম। তোমাকে জানাতে বলল: চোরো খুব অসুস্থ। বলেছে তুমি যেন চলে এসো।'

"আবার সেই চোরো!" অপমানের জ্বালাটা প্রায় নিভে এসেছিল, আবার তা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। ওকে দেখতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

'আমি কি ডাক্তার নাকি? ও চিরকেলে রুগী। ওকে ছাড়া এখানেই আমার ভাবনা-চিন্তার জিনিসের কোন অভাবে নেই। এই ত, আবহাওয়া খারাপ হতে চলল।'

'সে তোমার ব্যাপার, যাবে কি না যাবে তা তুমি নিজে

জান। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে বললাম। চলি। আমার দেরি করলে চলবে না। রাত হয়ে এলো।'

আইত্‌বাই ঘোড়া ছেড়ে দিল, তারপর আবার লাগাম একটু টেনে ধরল।

'তা হলেও একবার ভেবে দেখ। অবস্থা খারাপ। ছেলেকে ইনস্টিটিউট থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। লোকে ওর জন্য স্টেশানে চলে গেছে।'

'খবরের জন্য ধন্যবাদ। তবে, আমি যাচ্ছি না।'

'যাবে,' জায়দার লজ্জায় বিব্রত হয়ে বলল। 'ভাববে না, ও যাবে।'

তানাবাই চুপ করে রইল। আইত্‌বাই উঠোন থেকে বেরিয়ে গেলে সে ক্ষেপে গিয়ে বৌকে বলল:

'আমার হয়ে উত্তর দেওয়ার এই অভ্যেসটা ছাড় ত। আমি নিজেই জানি। বলেছি যাব না — তার মানে যাব না।'

'ভেবে দেখ, এ তুমি কী বলছ!'

'ভেবে দেখার কিছুই নেই। যথেষ্ট হয়েছে। এত বেশি ভেবে ফেলেছি যে শেষ অবধি পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিল। আমার কেউ নেই। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারও আমার দরকার নেই। একা একাই টেঁসে যাব!' খুব বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়িয়ে ও চালাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু মনে শান্তি নেই। মাদী ভেড়াগুলোর প্রসবে সাহায্য করতে করতে, ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে টেনে এনে কোণায় রাখতে রাখতে, চিৎকাররত ভেড়ার পালকে গালাগাল করতে করতে, তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে সে বিড়বিড় করে চলল:

'অনেক আগেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে আর এত ভোগান্তি হত না। সারা জীবন রোগে ভুগছে, কাতরাচ্ছে, বুক চেপে ধরে বসে পড়ছে, অথচ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার

নাম নেই। বড়কর্তা হয়েছেন! এর পর আর তোর মুখ দেখার প্রবৃত্তি নেই। তা বাপু, আমার ওপর রাগে কর আর যাই কর, আমিও রেগে আছি...'

বাইরে রাত। অল্প অল্প করে তুষার ঝরে পড়ছে, চারদিকে এমন দারুণ নিঃশব্দতা যে পেঁজা তুষারকণাগুলো থেকে থেকে মাটির ওপর পড়ার সময় তার ঝিরঝির শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়।

তানাবাই তাঁবুতে গেল না, বৌয়ের সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চলল। জায়দারও এলো না। "ঠিক আছে, বসে থাক," তানাবাই মনে মনে বলল। "তোমার কথায় তাই বলে যাচ্ছি না। এখন আমার কাছে সবই সমান। চোরো আমার অপরিচিত। ওর পথ এক, আমার আরেক। আমরা বন্ধু ছিলাম, কিন্তু এখন আর নই। আমি যদি তার বন্ধুই হতাম ত তখন ও কোথায় ছিল? না, এখন আমার কাছে সব সমান..."

জায়দার তবু এলো। তাকে এনে দিল বর্ষাতি, নতুন বুট, বেল্ট, দস্তানা এবং যে টুপি সে ঘোড়ার চড়ার সময় পরত সেই টুপি।

'পর,' জায়দার বলল।

'খামকা চেষ্টা করছ। আমি কোথাও যাব না।'

'সময় নষ্ট করো না। কিছু একটা ঘটে গেলে পরে সারা জীবন পস্তাবে।'

'আমি পস্তাতে যাব না। ওর কিছুই হবে না। কিছু দিন পড়ে থাকলেই সেরে উঠবে। প্রথম বার নয়।'

'শোন, আমি কখনও কোন ব্যাপারে তোমাকে অনুরোধ করি নি। কিন্তু এখন অনুরোধ করছি। তোমার অভিমান আমাকে দাও, তোমার দুঃখ আমাকে দাও। যাও। যদি মানুষ হও ত যাও।'

'না।' তানাবাই তার জিদ বজায় রেখে মাথা নাড়ল। 'যাব না। এখন আমার কাছে সবই সমান। তুমি ভাবছ ভদ্রতা আর কর্তব্যের কথা। ভাবছ, লোকে কী বলবে? কিন্তু এখন আমি ওসবের গ্রাহ্য করি না।'

'ভালো করে ভেবে দেখ। আমি চললাম আগুনটা দেখে আসতে — জ্বলন্ত কয়লা আবার কম্বলের ওপর পড়ে না যায়।'

জায়দার তানাবাইয়ের জামাকাপড় রেখে চলে গেল, কিন্তু তানাবাই জায়গা থেকে নড়ল না। সে এক কোণে বসে রইল, কিছুতেই নিজের মনের বাধাকে জয় করতে পারছিল না, চোরোকে যে সব কথা সে বলেছিল তা ভুলতে পারছিল না। আর এখন "সেলাম আলেকুম, দেখতে এলাম, শরীর কেমন আছে? কোন কাজে সাহায্য লাগবে কি?" না, এটা সে করতে পারবে না, তার ধাতে নেই।

জায়দার ফিরে এলো।

'তুমি এখনও জামাকাপড় পর নি?'

'জ্বালাতন করো না। বলেছি — যাব না...'

'ওঠ বলছি!' জায়দার রাগে চেঁচিয়ে উঠল। আশ্চর্য এই যে তানাবাই তার হুকুমে সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। জায়দার তানাবাইয়ের দিকে পা বাড়াল, লণ্ঠনের আবছা আলোয় তার দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছিল যন্ত্রণা আর ধিক্কার। 'তুমি যদি পুরুষ মানুষ না হও, তুমি যদি মানুষ না হও, যদি বুড়ো হাবড়া মাগী হও তা হলে আমিই তোমার হয়ে যাব, আর তুমি এখানে বসে বসে মুখের লালা ঝরাও! আমি এক্ষুনি যাব। যাও জলদি ঘোড়ায় জিন চাপাও।'

তানাবাই তার বৌয়ের কথা মতো ঘোড়ায় জিন চাপাতে গেল। বাইরে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ঝরছে। অন্ধকার যেন একটা

নিঃশব্দ, মন্থরগতি নাগরদোলার মতো, গভীর খাঁড়ির জলের মতো চারদিকে পাক খেয়ে চলেছে। পাহাড়গুলো আলাদা করে দেখা যায় না — অন্ধকার। "আর এক শাস্তি! এই রাত-বিরাতে জায়দার একা এখন কোথায় যাবে?" অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে জিন লাগাতে লাগাতে সে ভাবল। "অথচ বলে লাভ নেই। না। জায়দার ক্ষান্ত হবে না। মেরে-কেটে ফেললেও না! কিন্তু ও যদি পথ হারিয়ে ফেলে? তা, নিজেই নিজেকে দোষ দিক গে..."

ঘোড়ায় জিন লাগাতে লাগাতে তানাবাইয়ের নিজেরই লজ্জা হতে লাগল: "আমি একটা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নই। ঘা খেয়ে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি! সকলের সামনে আমি জাঁক করে দেখাচ্ছি — দেখ, আমি কত দুঃখী, আমার অবস্থা কেমন খারাপ। বৌটাকেও জেরবার করে দিয়েছি। ওর অপরাধ কী? ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছি? ভালো কিছু আমার চোখেই পড়ে না। আমি একটা অপদার্থ লোক। জানোয়ার ছাড়া আর কী?"

তানাবাই ইতস্তত করতে লাগল। নিজের কথা থেকে সরে দাঁড়ানোও সহজ নয়। গম্ভীর মুখে চোখ মাটিতে নামিয়ে সে পেছনে ফিরে গেল।

'জিন লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তৈরি হও।' জায়দার তার হাতে বর্ষাতি তুলে দিল।

তানাবাই নীরবে পোশাক পরতে লাগল, তার মনে আনন্দ হল এই ভেবে যে বৌ প্রথম মিটমাট করে নিল। তবু দেখানোর জন্য নিজের দরটা একটু বাড়াল:

'না হয় কাল সকালেই যাই?'

'না, এক্ষুনি রওনা হও। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

শান্ত জলস্রোতের মতো পাক খেয়ে খেয়ে পাহাড়ে রাত নামল। শেষ বসন্তের বড় বড় তুষারকণা মৃদুমন্দ গতিতে মাটির ওপর ঝরে পড়ছে। অন্ধকার ঢালের মধ্য দিয়ে তানাবাই একা একা চলেছে তার বন্ধুর ডাকে — যে বন্ধুকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মাথা, কাঁধ, দাড়ি আর হাত। তানাবাই বরফ ঝাড়ল না, সে স্থির হয়ে জিনের ওপর বসে রইল। এই অবস্থায় ভাবতে সুবিধা। সে ভাবল চোরোর কথা, সেই সব বিষয় সম্পর্কে যা তাদের দু'জনকে এত কাল একসঙ্গে বেঁধেছিল, যখন চোরো তাকে লেখাপড়া শেখায়, যখন তারা ঢোকে কম্‌সমোলে, তারপর পার্টিতে। তার মনে পড়ল ওরা একসঙ্গে খাল তৈরির কাজ করে এবং চোরোই প্রথম খবরের কাগজ নিয়ে এসে দেখায় তাতে তানাবাইয়ের ছবিসুদ্ধ তার ওপর লেখা বেরিয়েছে, চোরোই প্রথম তাকে অভিনন্দন জানায়, তার করমর্দন করে।

তানাবাইয়ের মন নরম হয়ে গলে যেতে লাগল, একটা বেদনাদায়ক অস্থিরতার ভাব তাকে আচ্ছন্ন করল: "ও কেমন আছে? হয়ত সত্যি সত্যিই ওর অবস্থা খুব খারাপ? তা নইলে ছেলেকে ডাকতে যাবে কেন? না কি কিছু বলতে চায়? পরামর্শ করতে চায়?.."

তখন ফরসা হয়ে আসছে। আগের মতোই বাতাসে ঘুরছে বরফের কণা। তানাবাই ঘোড়াটাকে তাড়া দিল, জোর কদমে ছুটিয়ে দিল। শিগ্‌গিরই ঐ টিলাগুলোর ওপারে, নীচু জায়গাটায় চোখে পড়বে গাঁ। চোরো ওখানে কী অবস্থায় আছে কে জানে? যত শিগ্‌গির পারা যায় পেঁছানো দরকার।

এমন সময় ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গ্রামের দিক থেকে

ভেসে এলো দূরাগত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। একটা চিৎকার উঠে খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, তারপর হঠাৎ থেমে গেল। তানাবাই ঘোড়ার লাগাম টানল, বাতাসে কান পাতল। না, কিছুই শোনা যায় না। হয়ত সে ভুল শুনেছে।

ঘোড়া তানাবাইকে নিয়ে গেল টিলার ওপর। নীচে, তার সামনে, বরফে ঢাকা সাদা সাদা সব্জি খেতের মাঝখানে, রিক্ত বাগিচাগুলোর মাঝখানে গাঁয়ের রাস্তাঘাট — এত সকাল বলে এখনও জনমানবহীন; কেউ কোথাও নেই। কেবল একটা উঠোনের ধারে লোকজনের জমাট কালো ভিড়, গাছপালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিন চাপানো ঘোড়ার দঙ্গল। এটা চোরোর বাড়ির উঠোন। ওখানে এত লোকের জমায়েত কেন? কী হয়েছে? তবে কি...

রেকাবের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তানাবাই কাঁপতে কাঁপতে নিশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে গিলে ফেলল এক রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া, তারপর সে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ রাস্তার নীচের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। "এ হতে পারে না। তা কী করে সম্ভব? হতে পারে না!" বুকের ভেতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল যে তার মনে হতে লাগল ওখানে সম্ভবত যা ঘটে গেছে তার জন্য সে-ই দায়ী। চোরো, তার একমাত্র বন্ধু চোরো, চির বিচ্ছেদের আগে শেষ দেখার জন্য তাকে আসতে অনুরোধ করেছিল, আর ও কিনা গোঁ ধরে, জেদ করে বসে রইল, নিজের অভিমান নিয়ে রইল। এরপর আর তাকে কী বলা যায়? বৌ কেন তার চোখে মুখে থুথু ছিটাল না? মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ অনুরোধের চেয়ে বড় শ্রদ্ধার জিনিস দুনিয়ায় আর কী থাকতে পারে?

আবার তানাবাইয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল স্তেপের সেই পথ, যে পথের ওপর দৌড়বাজ গুলসারির পিঠে চেপে

চোরো তার নাগাল ধরেছিল। তানাবাই তখন তাকে কী জবাব দিয়েছিল? এর জন্য তানাবাই নিজেকে ক্ষমা করবে কী করে?

নিজের অপরাধ ও লজ্জার ভারে নুয়ে পড়ে তানাবাই আচ্ছন্নের মতো বরফ ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল, এমন সময় সামনে, চোরোর বাড়ির উঠোনের পেছনে দেখতে পেল ঘোড়সওয়ারদের একটা বিরাট দল। ঘোড়সওয়াররা নীরবে দঙ্গল বেঁধে এগিয়ে আসছে, ঘোড়ার ওপর দুলতে দুলতে হঠাৎ ওরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জোরে বিলাপ করে উঠল:

'ওইবাই, বাউরিমাই! ওইবাই, বাউরিমাই!'*

"কাজাখরা এলো," তানাবাই আঁচ করল, বুঝতে পারল আশা করার আর কিছু নেই। পড়শী কাজাখরা এসেছে নদীর ওপার থেকে — তারা চোরোর জন্য বিলাপ করছে, যেমন লোকে বিলাপ করে ভাইয়ের জন্য, পড়শীর জন্য, তাদের আপন জনের জন্য, সারা তল্লাটের একজন নামী মানুষের জন্য। "ভাই, তোমাদের ধন্যবাদ জানাই," সেই মুহূর্তে তানাবাই মনে মনে বলল। "আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে আমরা বিপদে ও শোকে একসঙ্গে, বিয়েতে ও আমোদ ফুর্তিতে একসঙ্গে। কাঁদ, আমাদের সঙ্গে কাঁদ!"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাদের অনুসরণে সকালের গাঁ সচকিত করে তীক্ষ্ন হৃদয়বিদারক ধ্বনি তুলল:

'চোরো-ও-ও! চোরো-ও-ও! চোরো-ও-ও!'

সে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, জিনের ওপর এই বাঁয়ে, এই ডাইনে ঝুলতে লাগল, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তার বন্ধুর জন্য — যে বন্ধু এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে।

---

* ওইবাই, বাউরিমাই — মৃতের জন্য শোকের অভিব্যক্তি। — সম্পাঃ

এই ত বাড়ির উঠোন, এই ত বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে গুলসারি, তার গায়ে কালো চাদর। তার গায়ে বরফ ঝরছে, গলে যাচ্ছে। গুলসারি প্রভুহারা হয়েছে। এই জন্য পিঠের জিন খুলে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

তানাবাই ছুটছে — ঘোড়ার কেশরের গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে, উঠছে, আবার পড়ছে। চারদিকে লোকেজনের মুখ কুয়াসার মতো ঝাপসা একাকার, কান্নাকাটি। তানাবাই শুনতেই পেল না যখন কে একজন বলে উঠল:

'তানাবাইকে জিন থেকে নামাও। ওকে চোরোর ছেলের কাছে নিয়ে যাও।'

কয়েক জোড়া হাত তার দিকে এগিয়ে এলো, ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল, ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

'ক্ষমা কর আমাকে, চোরো, ক্ষমা কর!' তানাবাই কাঁদছিল।

উঠোনে বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল চোরোর ছেলে, ইনস্টিটিউটের ছাত্র সামানসুর। সে জলভরা চোখে তানাবাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল, ওরা কাঁদতে কাঁদতে একে অন্যকে আলিঙ্গন করল।

'তোর বাপ নেই, আমার চোরো নেই! আমাকে মাফ কর চোরো, আমাকে মাফ কর!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে তানাবাইয়ের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

তারপর তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে তানাবাই মেয়েদের মধ্যে, তার পাশেই দেখতে পেল ওকে, বিউবিউজানকে। বিউবিউজান তার দিকে তাকাল, নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। তানাবাই আরও জোরে ফুঁপিয়ে উঠল।

তানাবাই কাঁদল সব কিছুর জন্য, যা যা হারিয়েছে তার

জন্য, চোরোর জন্য, চোরোর কাছে সে যে অপরাধ করেছে তার জন্য, পথে সে তার উদ্দেশে যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল তা যে ফিরিয়ে নিতে পারল না তার জন্য, সে কাঁদল সেই নারীর জন্য — যে আজ পাশে দাঁড়িয়ে আছে অচেনার মতো, কাঁদল সেই প্রেমের জন্য, সেই ঝড়ের রাতের জন্য, কাঁদল এই জন্য যে সে নারী রয়ে গেল নিঃসঙ্গ, এই জন্য যে এখন তার ওপর বয়সের ছাপ পড়েছে; তানাবাই কাঁদল, তার গুলসারির জন্য — যে আজ শোকের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কাঁদল নিজের অপমান ও দুঃখের কথা স্মরণ করে, কাঁদার মতো যে যে ঘটনায় এযাবৎ কাঁদে নি, সেসবের জন্য।

'ক্ষমা কর, চোরো, আমাকে ক্ষমা কর!' সে বারবার বলে চলল। এই বলে সে যেন ঐ নারীর কাছেও ক্ষমা চাইছে।

তার ইচ্ছে হচ্ছিল বিউবিউজান এগিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়, কিন্তু সে এগোল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

তানাবাইকে সান্ত্বনা দিল অন্যেরা:

'আর নয় তানাবাই। চোখের জলে কোন কাজ হবে না, শান্ত হও।'

এতে তানাবাইয়ের শোক ও দুঃখ আরও উথলে উঠল।

২২

দুপুরের পর চোরোকে কবর দেওয়া হল। সূর্যের ঘোলাটে গোলকটা স্থির মেঘপুঞ্জের ম্লান স্তর ভেদ করে ফিকে আলো দিচ্ছিল। বাতাসে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল নরম ভিজে ভিজে তুষারকণা। সাদা মাঠের ওপর দিয়ে গভীর কালো রঙের নিঃশব্দ

নদীর ধারার মতো চলেছে শবযাত্রা। এই নদীর যেন হঠাৎ এখানে আবির্ভাব ঘটেছে এবং হঠাৎই যেন এই প্রথম সে তার খাত তৈরি করে চলেছে। আগে আগে পাশের তক্তা ঝোলানো একটা ট্রাকের ওপর সাদা কফিনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চোরোর মরদেহ। পাশে বসে ছিল তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজন। আর সকলে পেছন পেছন চলছিল ঘোড়ার পিঠে চেপে। ট্রাকের পেছনে দুজন চলছিল হেঁটে — পুত্র সামানসুর আর তানাবাই; তানাবাই লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল মৃত বন্ধুর ঘোড়া, দৌড়বাজ গুলসারিকে — গুলসারির পিঠে খালি জিন চাপানো।

গ্রামের বাইরের পথ মোলায়েম মসৃণ তুষারে ঢাকা। ঘোড়ার খুরের চাপে চওড়া গভীর কালো রেখা কেটে অতঃপর সে পথ শবযাত্রাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করল — যেন চোরোর অন্তিম পথ নির্দেশ করছে। পথ চলে গেছে টিলার ওপর কবরখানার দিকে। চোরোর কাছে এখানেই তার পরিসমাপ্তি — আর ফেরার পথ নেই।

গুলসারিকে লাগাম ধরে নিয়ে যেতে যেতে তানাবাই মনে মনে বলল: "গুলসারি, আমরা আমাদের চোরোকে হারালাম। ও নেই, ও আর নেই... তুই তাহলে তখন আমাকে চেঁচিয়ে থামালি না কেন? খোদা তোকে ভাষা দেন নি। কিন্তু আমি ত মানুষ, আমি কিনা তোর চেয়ে, একটা ঘোড়ার চেয়েও অধম! আমি বন্ধুকে রাস্তায় ত্যাগ করলাম, ফিরে তাকালাম না, ভেবেও দেখলাম না কী করছি। আমি চোরোকে খুন করেছি, খুন করেছি আমার কথার ঘা দিয়ে..."

কবরখানায় যাওয়ার পথে তানাবাই সারা রাস্তা চোরোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। গোর দেওয়ার সময় সামানসুরের সঙ্গে গর্তে নেমে চোরোর দেহ চিরকালের

জন্য ধরণীর গর্ভে শুইয়ে দিতে দিতে তানাবাই চোরোর উদ্দেশে আবার বলল:

'ক্ষমা করিস আমায়, চোরো। বিদায়। শুনতে পাচ্ছিস, চোরো? আমাকে ক্ষমা কর!..'

কবরে মুঠো মুঠো মাটি পড়ল, তারপর চারদিক থেকে কোদালভর্তি মাটি অজস্রধারায় তার ওপর ঝরে পড়ল। গর্ত বুঁজে গিয়ে টিলার ওপর নতুন একটা ঢিবি গড়ে উঠল।

'ক্ষমা কর, চোরো!..'

শেষকৃত্যের পর সামানসুর তানাবাইকে একান্তে ডেকে বলল:

'আপনার সঙ্গে একটা দরকার আছে তানাবাই চাচা, একটু কথা বলতে চাই।'

লোকজন, ধূমায়মান সামোভার এবং জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে তারা চলল। খিড়কি দিয়ে তারা বাগানে বেরিয়ে এলো। নালার ধার বরাবর হেঁটে তারা সব্‌জি বাগানের পেছনে একটা হেলে পড়া গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। গাছটার ওপর বসল। দু'জনেই চুপ — যে যার নিজের কথা ভাবছে। "এই ত জীবন," তানাবাই মনে মনে ভাবল, "সামানসুরকে ছোট দেখেছি, আর এখন কত বড় হয়ে গেছে। শোকে সে সাবালক হয়ে উঠেছে। এখন চোরোর জায়গা নিয়েছে। এখন আমরা সমান-সমান। তা-ই ত হয়ে থাকে। ছেলেরা বাপের জায়গা নেয়। ছেলেরা বংশধারা বজায় রাখে, পরিবারের কাজ চালিয়ে যায়। আল্লা করুন, ও যেন ওর বাপের মতোই হয়। ও যেন আরও এগিয়ে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় যেন আমাদের চেয়ে বড় হয়, যেন নিজে সুখী হয়, অন্যদেরও সুখী করে। আমরা ত এই জন্যই বাপ, আমরা ত এই আশায়ই ছেলেদের

জন্ম দিই যাতে ওরা আমাদের চেয়ে ভালো হয় — এটাই ত আসল কথা।"

'সামানসুর, তুই হলি পরিবারের বড় ছেলে,' তানাবাই বুড়োদের মতো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল। 'এখন তুই চোরোর জায়গা নিয়েছিস, তোর কথা শোনার জন্যে আমি তৈরী — যেমন শুনতাম চোরোর কথা।'

'আব্বা আমাকে যা বলে গেছেন তা আপনাকে জানাতে চাই, চাচা,' সামানসুর বলল।

ছেলের কথার টানে অবিকল বাপের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গি ধরতে পেরে তানাবাই চমকে উঠল এবং এই প্রথম সে আবিষ্কার করল যে সামানসুর দেখতে তার বাপের মতো, অল্পবয়সী চোরোর মতো — যে চোরোকে তার ছেলে জানে না, কিন্তু যাকে তানাবাই জানত, মনেও করতে পারে। এই কারণেই না লোকে বলে থাকে, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মরে না যতক্ষণ তাকে মনে রাখার মতো লোকজন বেঁচে থাকে?

'কী বলবি, বল সামানসুর।'

'আমি যখন এসে পৌঁছুই আব্বা তখনও বেঁচে। তিনি যখন মারা যান তার একঘণ্টা আগে গতকাল রাতে আমি পৌঁছুতে পারি। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে অবধি তাঁর পুরো জ্ঞান ছিল। উনি আপনার জন্য খুব অপেক্ষা করছিলেন। বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন: "তানাবাই কোথায়? এখনও আসে নি?" আমরা ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে আপনি রওনা দিয়েছেন, এই এসে পড়লেন বলে। মনে হচ্ছিল আব্বা আপনাকে কিছু বলতে চান। কিন্তু বলার সময় আর হল না।'

'হ্যাঁ, সামানসুর, হ্যাঁ, আমাদের দেখা হওয়ার দরকার ছিল। খুবই দরকার ছিল। আমার সারা জীবন আপসোস থেকে যাবে। আমারই দোষ। আমিই দেরি করে ফেললাম।'

'আব্বা তাই বললেন, আমি যেন আপনাকে জানিয়ে দিই। বললেন, বাছা, তুই তানাবাইকে বলবি যে আমি তার কাছে ক্ষমা চাই, বলবি ও যেন মনের মধ্যে রাগ পুষে না রাখে, আর ও নিজে যেন আমার পার্টি কার্ড অঞ্চল কমিটিতে গিয়ে জমা দিয়ে আসে। বললেন, তানাবাই যেন নিজের হাতে আমার কার্ড জমা দেয় — ওকে বলতে ভুলবি না। তারপর ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। মরার সময় তিনি এমন ভাবে তাকিয়ে ছিলেন ঠিক যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন। আব্বা কাঁদতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কথা আর তখন বোঝা যাচ্ছিল না।'

তানাবাই কোন উত্তর দিল না। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে দাড়িতে বিলি কাটতে লাগল। চোরো চলে গেছে। চোরোর সঙ্গে নিয়ে গেছে তানাবাইয়ের অর্ধেক, নিয়ে গেছে তার জীবনের একটা অংশ।

'একথা জানানোর জন্যে ধন্যবাদ, সামানসুর। তোর বাপকেও ধন্যবাদ,' তানাবাই শেষকালে সামলে উঠে বলল। 'কিন্তু কেবল একটা ব্যাপারে আমার বাধ-বাধ ঠেকছে। তুই জানিস, আমাকে পার্টি থেকে বার করে দিয়েছে?'

'জানি।'

'পার্টি থেকে খেদানো আমি কী করে পার্টি কার্ড নিয়ে অঞ্চল কমিটিতে যাব? আমার ত সে অধিকার নেই।'

'জানি না, তানাবাই চাচা। নিজেই ঠিক করুন। আব্বা আমার কাছে যে অন্তিম ইচ্ছে প্রকাশ করে গেছেন তা আমাকে পালন করতেই হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি যা চেয়েছিলেন তা করুন।'

'আমি মনে প্রাণে চাই। কিন্তু দেখছিস ত আমার কী

বিপদ ঘটে গেছে। তুই নিজে নিয়ে গেলে ভালো হয় না, সামানসুর?'

'না, ভালো হয় না। আব্বা জানতেন তিনি কী অনুরোধ করছেন। উনি যদি আপনাকে বিশ্বাস করে থাকেন, ত আমি কেন করব না? অঞ্চল কমিটিতে বলবেন, এটা ছিল আমার পিতা চোরো সাইয়াকভের অন্তিম ইচ্ছা।'

খুব ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে থাকতে তানাবাই গাঁ থেকে বের হল। গুলসারি, নামজাদা দৌড়বাজ গুলসারি, কী বিপদের সময়, কী সুখের সময় — সমান নির্ভরযোগ্য ঘোড়া গুলসারি সওয়ার নিয়ে ছুটে চলেছে, খুরের চাপে পথ থেকে আল্‌গা আল্‌গা হয়ে পড়ছে বরফ জমা কাদামাটি। এবারে গুলসারি নিয়ে যাচ্ছে তানাবাইকে। তানাবাই চলেছে তার মৃত বন্ধু, কমিউনিস্ট চোরো সাইয়াকভের বিশেষ আজ্ঞা নিয়ে।

সামনে ধরণীর অদৃশ্য প্রান্তরেখার ওপর ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে ভোরের আলো। উষার গর্ভে জন্ম নিচ্ছে নতুন দিন। তা বেড়ে উঠছে ওখানে, ঐ ধূসর তমসার মধ্যে...

গুলসারি ছুটছিল সেদিকে, উষার দিকে, দিগন্তে যে তারাটি এখনও নেভে নি সেই নিঃসঙ্গ ও উজ্জ্বল তারার দিকে। নির্জন ফাঁপা রাস্তার ওপর সে একা একা বাজিয়ে চলেছে টগবগে খুরের ছররা। বহুকাল গুলসারির পিঠে চেপে যাওয়ার সুযোগ তানাবাইয়ের হয় নি। গুলসারির গতি আগের মতোই তীব্র ও সমতালের। বাতাস তার কেশরে হুটোপুটি খাচ্ছে, সওয়ারের মুখে ঝাপ্‌টা দিচ্ছে। খাসা ঘোড়া বটে গুলসারি, তার শক্তি এখনও অটুট আছে।

সারাটা পথ তানাবাই ভাবতে ভাবতে চলল, ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পেল না কেন পার্টি থেকে খেদানো তার

মতো একজন লোককেই চোরো মারা যাওয়ার আগে অঞ্চল কমিটিতে নিজের পার্টি কার্ড নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে গেল। ওর মতলবটা কী ছিল। নাকি ও ভেবেছিল পরীক্ষা করবে? এমনও হতে পারে যে এর মধ্য দিয়ে ও প্রকাশ করতে চেয়েছিল তানাবাইকে পার্টি থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে তার মতভেদ? এখন আর এটা জানার কোন উপায় নেই, চেষ্টা করেও বার করা যাবে না। ও আর কখনই কিছু বলবে না। "আর কখনই না!" — এই কথাগুলো কী নিদারুণই না হতে পারে! এর পরে আর কোন কথা নেই...

আবার ভিড় করে এলো নানা ভাবনা-চিন্তা, আবার জেগে উঠল সেই সব বিষয় যা সে ভুলে যেতে চেয়েছিল, চিরকালের জন্য মন থেকে দূর করতে চেয়েছিল। না, দেখা যাচ্ছে এখনও সব কিছু শেষ হয় নি। সে নিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে এখনও আছে চোরোর শেষ ইচ্ছে। তানাবাই চোরোর পার্টি কার্ড নিয়ে আসবে, তাদের কাছে বলবে ওর কথা, চোরোর কথা, বলবে সব কথা, বলবে চোরো সকলের কাছে কেমন মানুষ ছিল, তানাবাইয়ের নিজের কাছে কেমন ছিল। সেই সঙ্গে নিজের কথাও বলবে, কেননা চোরো আর সে — একই হাতের দুটো আঙ্গুল।

লোকে জানুক, তারা তাদের যৌবনে কেমন ছিল, কেমন ধারা জীবন তারা কাটিয়েছে। হয়ত ওরা বুঝতে পারবে তানাবাইকে চোরোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক হয় নি — চোরোর জীবদ্দশায় না, পরেও না। কেবল ওরা যদি তানাবাইয়ের কথা ভালো করে শুনত, কেবল তাকে নিজের বক্তব্য বলতে দিত।

তানাবাই মনে মনে কল্পনা করল সে অঞ্চল কমিটির সম্পাদকের ঘরে ঢুকে তার টেবিলের ওপর চোরোর পার্টি কার্ড

রাখবে এবং তাকে সব কিছু বলবে। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে, ক্ষমা চাইবে, কেবল যদি তাকে পার্টিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কেননা পার্টি ছাড়া তার জীবন বৃথা, পার্টি ছাড়া সে নিজেকে ভাবতেই পারে না।

কিন্তু ওরা যদি বলে বসে পার্টি থেকে খেদানো লোক ও কোন অধিকার বলে পার্টি দলিল বয়ে নিয়ে এসেছে? "কমিউনিস্টের পার্টি কার্ড তোর ছোঁয়া উচিত হয় নি, এই কাজে হাত দেওয়া তোর উচিত হয় নি। তুই ছাড়া আরও অন্য লোক পাওয়া যেত।" কিন্তু এটা ত ছিল চোরোর নিজের অন্তিম বাসনা! মারা যাওয়ার সময় সে সকলের সামনে তা জানায়। তার ছেলে সামানসুর একথার সত্যতা সমর্থন করবে। "তাতে কী? মানুষ মরার সময় ঘোরের মধ্যে, অচৈতন্য অবস্থায় কত কিছুই না বলতে পারে!" তখন ও কী জবাব দেবে?

এদিকে গুলসারি বরফঢাকা রাস্তার ওপর সুরেলা আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে, স্তেপ পার হয়ে চলে আসছে আলেক্সান্দ্রভ্কা ঢালের দিকে। গুলসারি তানাবাইকে ঝটিতি পেঁছে দিল। তানাবাই লক্ষ্যই করল না কী ভাবে চলে এসেছে।

তানাবাই যখন সদরে এসে পেঁছুল তখন অফিস-কাছারিতে সবে কাজ শুরু হচ্ছে। কোথাও দেরি না করে সে ঘামে ভেজা গুলসারিকে সোজা অঞ্চল কমিটির অফিসের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল, খুঁটিতে বাঁধল, গায়ের ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে চলল — উত্তেজনায় তখন তার বুক দুর দুর করছে। ওরা কী বলবে? ওকে কী ভাবে নেবে? করিডর ফাঁকা। গাঁ থেকে এখনও দঙ্গল বেঁধে লোকজন এসে পেঁছোয় নি। তানাবাই কাশকাতায়েভের অভ্যর্থনা ঘরে ঢুকল।

'সালাম,' তানাবাই মহিলা সেক্রেটারীকে বলল।

'সালাম।'

'কমরেড কাশকাতায়েভ ঘরে আছেন?'

'আছেন।'

'আমি তাঁর কাছে এসেছি। আমি ''শ্বেত প্রস্তর'' যৌথখামারের রাখাল — আমার পদবী ব্যকাসভ,' তানাবাই বলতে শুরু করল।

'আপনাকে আবার চিনি না!' সে মুচকি হেসে বলল।

'তা হলে তাঁকে গিয়ে বলুন যে আমাদের পার্টি সংগঠক চোরো সাইয়াকভ মারা গেছেন আর মারা যাওয়ার সময় তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন তাঁর পার্টি কার্ড অঞ্চল কমিটিতে দিয়ে আসি। তাই আমি এসেছি।'

'ঠিক আছে। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।'

সেক্রেটারী কাশকাতায়েভের ঘরে তেমন একটা বেশিক্ষণ ছিল না, কিন্তু এর মধ্যেই তানাবাই তার অপেক্ষা করতে করতে আর পারে না, হয়রান হয়ে পড়ল।

'কমরেড কাশকাতায়েভ ব্যস্ত আছেন,' সেক্রেটারী তার পেছনে কাশকাতায়েভের ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করতে করতে বলল। 'উনি বলেছেন সাইয়াকভের পার্টি কার্ড রেজিস্ট্রেশন অফিসে জমা দিতে। অফিসটা ঐ ওখানে, করিডর ধরে ডান দিকে।'

''রেজিস্ট্রেশন অফিস... করিডর ধরে ডান দিকে।'' কী ব্যাপার? তানাবাইয়ের বোধগম্য হল না। তারপর এক লহমায় সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে তার মন ভেঙ্গে গেল। এটা কী করে সম্ভব? সব কিছু কি এতই সহজ? আর সে কিনা ভেবেছিল...

'তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, গিয়ে তাঁকে বলুন। আমার কথাটা জরুরী।'

সেক্রেটারী ইতস্তত করে কাশকাতায়েভের ঘরে ঢুকল, তারপর ফিরে এসে আবার বলল:

'উনি খুব ব্যস্ত।' বলেই সহানুভূতির সঙ্গে নিজে যোগ করল: 'আপনার সঙ্গে কথাবার্তা ত চুকে গেছে।' তারপর আরও নীচু গলায় বলল: 'উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি বরং চলেই যান।'

তানাবাই করিডর ধরে চলল, ডান দিকে ঘুরল। দরজার ওপরে লেখা আছে 'রেজিস্ট্রেশন অফিস'। দরজার গায়ে জানলা। তানাবাই ঠকঠক আওয়াজ করল। জানলা খুলে গেল।

'কী চান?'

'পার্টি কার্ড জমা দিতে এসেছি। আমাদের পার্টি সংগঠক চোরো সাইয়াকভ মারা গেছেন। ''শ্বেত প্রস্তর'' যৌথখামার থেকে আসছি।'

বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো চামড়ার যে বটুয়াটাতে তানাবাই এই সেদিনও নিজের পার্টি কার্ড রাখত আজ তাতে করেই সে নিয়ে এসেছে চোরোর পার্টি কার্ড। কোর্তার নীচ থেকে বটুয়াটাকে টেনে বার করতে তার যতক্ষণ লাগল রেজিস্ট্রেশন অফিসের পরিচালিকা ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জানলার ফাঁক দিয়ে সে কার্ডটি বাড়িয়ে দিল। "বিদায়, চোরো!"

সে চেয়ে চেয়ে দেখল, মহিলা একটা লেজারে পার্টি কার্ডের নম্বর, চোরোর নাম ও পদবী এবং পার্টিতে ভর্তি হওয়ার বছর লিখলেন — চোরোর শেষ স্মৃতি। তারপর তানাবাইকে লেজারে সই করতে বললেন।

'ব্যস্?' তানাবাই জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, চলি।'

'আচ্ছা।' জানলা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

তানাবাই রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সে ঘোড়ার বাঁধন খুলতে লাগল।

'ব্যস্, গুলসারি,' সে ঘোড়াকে উদ্দেশ্য করে বলল। 'সব চুকে গেল।'

অক্লান্ত গুলসারি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল গাঁয়। বসন্তের বিশাল স্তেপ তাদের দিকে ছুটে এলো ঘোড়ার খুরের তালে তালে দম্‌কা হাওয়া তুলে। কেবল ঘোড়ার দৌড়েই উপশম হতে লাগল, শান্ত হয়ে আসতে লাগল তানাবাইয়ের মনের কষ্ট।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় তানাবাই পাহাড়ে তার বাড়িতে ফিরে এলো।

বৌ নীরবে তার কাছে এগিয়ে এলো, ঘোড়ার লাগাম ধরল।

সে তানাবাইকে হাত ধরে জিন থেকে নামতে সাহায্য করল।

তানাবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করল, তার কাঁধের ওপর মাথা রেখে ভেঙ্গে পড়ল। জায়দারও কাঁদতে কাঁদতে তাকে আলিঙ্গন করল।

'চোরোকে আমরা কবর দিয়ে এসেছি! চোরো আর নেই, জায়দার। আমার বন্ধু নেই!' এই বলে তানাবাই আবার অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

তারপর সে চুপচাপ তাঁবুর পাশে একটা পাথরের ওপর বসে রইল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল একা একা থাকে। তুষারে ঢাকা সাদা পর্বতশ্রেণীর দাঁতাল চুড়োর আড়াল থেকে ধীরে ধীরে

চাঁদ উঠছে — তানাবাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল তাকিয়ে তাকিয়ে চন্দ্রোদয় দেখে। তাঁবুর ভেতরে বৌ বাচ্চাদের রাতের শোয়ার আয়োজন করছিল। চুলায় আগুনের চড়বড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর তেমির-কোমুজের তারে বেজে উঠল হৃদয় বিদারক গীত। মনে হল বাতাস যেন উৎকণ্ঠায় হু হু আর্তনাদ করছে, যেন কেউ কাঁদতে কাঁদতে করুণ সুরের কোন এক গান গাইতে গাইতে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, আর চারদিকে সব মৌন, রুদ্ধশ্বাসে সব নীরব হয়ে আছে, যেন মানুষের শোক ও বিষাদের বারতা বয়ে নিয়ে কেবল ছুটে চলেছে এক নিঃসঙ্গ কণ্ঠস্বর। সে ছুটছে, তার জানাও নেই নিজের দুঃখ নিয়ে কোথায় যাবে, জানা নেই এই নীরবতা ও নির্জনতার মধ্যে কী ভাবে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে, কেউই সাড়া দিচ্ছে না। সে একা একা কাঁদছে, নিজেই নিজের কান্না শুনছে। তানাবাই বুঝতে পারল বৌ তাকে বাজিয়ে শোনাচ্ছে 'বুড়ো শিকারীর গান'...

...অনেক অনেক কাল আগে এক বুড়োর এক ছেলে ছিল — তরুণ, সাহসী শিকারী। বাপ নিজে হাতে ছেলেকে শিকারের কঠিন বিদ্যা শেখায়। ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে গেল।

ছেলের হাত ফস্‌কাতো না। কোন জীবন্ত প্রাণীই তার অব্যর্থ ও মারাত্মক গুলি থেকে নিস্তার পেত না। সে পাহাড়ের আশেপাশের সমস্ত পশুপাখি মেরে সাফ করে দিল। গর্ভিনী-দের সে দয়া করত না, কচি বাচ্চাগুলোকেও দয়া করত না। সে ছাগবংশের আদি জননী ছাইরঙা ছাগীর গোটা পাল ধ্বংস করে দিল। রয়ে গেল ছাইরঙা ছাগী আর বুড়ো ছাইরঙা ছাগল। ছাইরঙা ছাগী তরুণ শিকারীর কাছে অনুনয়-বিনয় করল সে যেন বুড়োকে দয়া করে, তাকে যেন না মারে, যাতে

তাদের বংশধারা বজায় থাকে। কিন্তু শিকারী সে কথা কানে দিল না, সে অব্যর্থ গুলির আঘাতে বিশাল ছাইরঙা ছাগকে ধরাশায়ী করল। ছাগলটা চুড়ো থেকে গড়িয়ে পড়ল। তখন ছাইরঙা ছাগী আর্তনাদ করে উঠল, সে শিকারীর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল: "আমার বুকে গুলি কর। আমি জায়গা থেকে নড়ছি না। তবে তোর হাত ফস্‌কাবে — আর এটাই হবে তোর শেষ গুলি ছোঁড়া!" বুড়ি ছাইরঙা ছাগীর মুখে পাগলের প্রলাপ শুনে তরুণ শিকারী হেসে উঠল। সে লক্ষ্য স্থির করল। গুলির গুড়ুম আওয়াজ হল। ছাইরঙা ছাগী কিন্তু পড়ল না। গুলিটা এসে বিঁধল কেবল তার সামনের পায়ে। শিকারী ঘাবড়ে গেল — এমন আর কখনও ঘটে নি। "দেখলি ত?" ছাইরঙা ছাগী তার দিকে ফিরে বলল। "আমি খোঁড়াচ্ছি — এখন এই অবস্থায়ই আমাকে ধরার চেষ্টা কর দেখি!" তরুণ শিকারী উত্তরে হেসে উঠল: "ঠিক আছে পালানোর চেষ্টা করে দ্যাখ না। তবে পাকড়াও যখন করব তখন আর কোন ক্ষমা-ঘেন্নার আশা করিস না। ওরে ঘেয়ো বুড়ি, বাচাল, তোর টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলব!"

খোঁড়া ছাইরঙা ছাগী দৌড়াতে লাগল, শিকারী — তার পেছন পেছন। অনেক দিন ও অনেক রাত ধরে, চুড়ো আর খাড়াইয়ের ওপর দিয়ে, বরফ আর পাথরের ওপর দিয়ে এই পিছু ধাওয়া চলল। না, ছাইরঙা ছাগী ধরা দেয় না। শিকারী অনেক আগেই তার বন্দুক ফেলে দিয়েছে, পোশাক তার গায়ে শতচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে। সে খেয়ালই করে নি যে ছাইরঙা ছাগী তাকে নিয়ে এসেছে দুর্গম চূড়ায়, যেখান থেকে না আছে ওপরে ওঠার পথ, না নীচে নামার, যেখান থেকে না পারা যায় বয়ে উঠতে, না পারা যায় লাফিয়ে নামতে। ছাইরঙা ছাগী এখানেই তাকে থামিয়ে এই বলে অভিশাপ দিল: "এখান

থেকে তোকে আর জীবনে ফিরে যেতে হবে না, তোকে কেউ বাঁচাতেও পারবে না। আমি আমার মরা বাচ্চাদের শোকে, নিজের বংশ লোপ পাওয়ার শোকে যেমন কাঁদছি, তোর বাপও তোর শোকে তেমনি কাঁদ্বক। ব্বড়ি ছাইরঙা ছাগী, ছাগবংশের আদি জননী যে রকম আর্তনাদ করছি, তোর বাপও তেমনি পাথরে ঢাকা পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে, ঠান্ডা পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে একা একা কাঁদ্বক। তোকে অভিশাপ দিচ্ছি কারাগ্বল, অভিশাপ দিচ্ছি...” ছাইরঙা ছাগী কাঁদতে কাঁদতে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

তর্বণ শিকারী রয়ে গেল মাথা ঘ্বরে যাওয়ার মতো সেই খাড়াইয়ের ওপর। সে পাথরের গায়ে ম্বখ লেপ্টে সর্ব খাঁজে দাঁড়িয়ে থাকে, এদিক-ওদিক তাকাতে ভয় হয় — না ওপরে না নীচে, না ডাইনে না বাঁয়ে — কোথাও তার পা ফেলার উপায় নেই। না দেখা যায় আকাশ, না মাটি।

এদিকে বাপ তাকে সর্বত্র খ্বঁজে বেড়াচ্ছে। কোন পাহাড়ে উঠে দেখতে সে বাকি রাখল না। শেষকালে যখন পায়ে চলা পাহাড়ী পথের ওপর তার পরিত্যক্ত বন্দ্বকটি দেখতে পেল তখন ব্বঝতে পারল ছেলে বিপদে পড়েছে। সে ছ্বটতে লাগল শৈলমালা ঘেরা খাতের ওপর দিয়ে, অন্ধকার গিরিদরীর ওপর দিয়ে। “কারাগ্বল, কোথায় তুই? কারাগ্বল সাড়া দে!” কিন্তু উত্তরে পাথরের পাহাড় পাথরের গ্বমগ্বম আওয়াজ তুলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, তারই কথায় উত্তর দেয়: “কোথায় তুই, কারাগ্বল? সাড়া দে!..”

“এখানে আমি, আব্বা!” হঠাৎ ওপর থেকে একটা কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এলো। ওপরের দিকে তাকিয়ে ব্বড়ো দেখতে পেল তার ছেলে উঁচু, দ্বর্গম শিখরে, কাকের ছানার মতো

একটা খাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সারা দুনিয়ার দিকে পিঠ রেখে, মাথা ঘোরানোর উপায় নেই।

"আহা, বেচারি আমার, তুই ওখানে কী করে?" বাপ আঁতকে উঠল।

"ওকথা জিজ্ঞেস করো না, আব্বা," ছেলে উত্তর দিল। "আমি এখানে আমার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। ছাইরঙা বুড়ি ছাগী আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিয়েছে। আমি আজ অনেক দিন হল এখানে দাঁড়িয়ে, সূর্যের মুখ দেখতে পাই না, আকাশ দেখি না, মাটিও দেখি না। তোমার মুখও দেখতে পাচ্ছি না, আব্বা। আমাকে দয়া কর, আব্বা। আমাকে মেরে ফেল, আমাকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দাও, তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করছি। আমাকে মেরে ফেল, কবর দাও।"

বাপ আর কী করে? কাঁদে, এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, আর ছেলে অনবরত মিনতি করে চলে: "আমাকে শিগ্‌গির মেরে ফেল। গুলি কর, আব্বা! আমাকে দয়া কর, গুলি কর!" সন্ধে অবধি বাপ মনস্থির করতে পারল না। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করল। বন্দুক পাথরে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে ছেলের দেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে বিদায় সঙ্গীত গাইল।

হত্যা তোরে করেছি রে, পুত্র কারাগুল।
ধরণীতে আজি আমি একা, ওরে পুত্র কারাগুল।
ভাগ্য মোরে দিল সাজা, পুত্র কারাগুল,
দিল দুখ, ওরে মোর পুত্র কারাগুল।
শিখাইনু কেন হায়, নিজ হাতে, পুত্র কারাগুল,
শিকারীর বৃত্তি তোরে, পুত্র কারাগুল?

বিনাশ করিলি কেন, পুত্র কারাগুল,
যতেক পশু ও পাখি, জীবকুল, পুত্র কারাগুলে?
প্রাণে বাঁচা, বংশবৃদ্ধি — প্রাণীদের সাধ ছিল, পুত্র কারাগুল,
কেন বৃথা জীবনাশ করেছিস, পুত্র কারাগুল?
ধরণীতে আজি আমি একা, ওরে পুত্র কারাগুল।
সাড়া কেহ দেয় না রে, পুত্র কারাগুল,
একা করি অশ্রুপাত, পুত্র কারাগুল।
হত্যা তোরে করেছি রে, পুত্র কারাগুল —
নিজ হাতে হত্যা তোরে করেছি রে, পুত্র কারাগুল...

...তানাবাই তাঁবুর পাশে বসে বসে প্রাচীন কিরগিজীয় লোকসঙ্গীত শুনতে লাগল, তাকিয়ে দেখল মৌন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ের ওপরে ধীরে ধীরে চাঁদ ভেসে উঠছে, তুষারাচ্ছন্ন তীক্ষ্ম চূড়ার ওপর, স্তূপাকার শৈলরাশির ওপর ঝুলছে। তানাবাই আবার তার মৃত বন্ধুর উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

জায়দার তখনও তেমির-কোমুজে বাজিয়ে চলেছে বড় দরের শিকারী কারাগুলের উদ্দেশে শোকসঙ্গীত:

হত্যা তোরে করেছি রে, পুত্র কারাগুল,
ধরণীতে আজি আমি একা, ওরে পুত্র কারাগুল...

২৩

ভোর হয় হয়। মুমূর্ষু গুলসারির শিয়রে জ্বালানো আগুনের ধারে বসে বসে বুড়ো তানাবাই মনে করতে লাগল, তারপর কী ঘটেছিল।

কেউই জানত না যে তানাবাই সে সময় জেলা সদরে

গিয়েছিল। এটা ছিল তার শেষ চেষ্টা। তানাবাই আঞ্চলিক অধিবেশনে জেলা কমিটির সম্পাদকের ভাষণ শুনেছে। তার ইচ্ছে ছিল সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের বিপর্যয়ের কথা আগাগোড়া বলে। তানাবাইয়ের বিশ্বাস উনি হয়ত তাকে বুঝতে পারবেন, সাহায্য করবেন। চোরোও তাকে ভালো বলত, অন্যেরাও তার প্রশংসা করত। ঐ সম্পাদক মশাইকে যে অন্য জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে সে সংবাদ তানাবাই পেল পরে, জেলা কমিটিতে আসার পর।

'আপনি কি শোনেন নি?'

'না।'

'কিন্তু আপনার যদি খুব জরুরী কাজ থাকে ত আমি আমাদের নতুন সম্পাদক মশাইকে জানাতে পারি, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করলেও করতে পারেন,' অভ্যর্থনা কক্ষে মহিলা কর্মীটি বললেন।

'না, ধন্যবাদ,' তানাবাই তাতে রাজি না হয়ে বলল। 'আমি এসেছিলাম আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। আমি ওঁকে জানতাম কিনা, উনিও আমাকে জানতেন। তা নইলে আর ব্যতিব্যস্ত করতে যেতাম না। মাফ করবেন, আচ্ছা চলি।' তানাবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মনের মধ্যে সত্যি সত্যিই এই বিশ্বাস নিয়ে যে সে ঐ সম্পাদককে ভালো মতো জানত, আর সম্পাদকও তাকে, পশুপালক তানাবাই বাকাসভকে, ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। আর না চেনারই বা কী আছে? তারা একে অন্যকে জানলেও জানতে পারত, সম্মান করলেও করতে পারত — এতে তার কোন সন্দেহ ছিল না, তাই ত সে অমন কথা বলেছে।

তানাবাই বাস স্টেশানের দিকে রওনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে

রাস্তা ধরে চলেছে। একটা বীয়ার স্টলের কাছে দু'জন শ্রমিক বীয়ারের খালি পিপে ট্রাকে তুলছিল। তাদের একজন ট্রাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যে লোকটি পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে তার কাছে ওপরে তুলে দিচ্ছিল, তানাবাই পাশ দিয়ে যেতে সে দৈবাৎ তার দিকে ঘুরে তাকালো, তাকিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল, তার মুখচোখের ভাব বদলে গেল। লোকটা হল বেক্তাই। তক্তার ওপর পিপেটা আটকে ধরে রাখতে রাখতে সে বনবেড়ালের মতো তার কুতকুতে চোখ মেলে বিদ্বেষভরে এক দৃষ্টিতে তানাবাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল তানাবাই কী বলে।

'আরে, তুই ওখানে কি ঘুমিয়ে পড়লি না কি?' ট্রাকের মধ্যে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে বিরক্ত হয়ে বেক্তাইকে বলল।

পিপেটা গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে লাগল আর বেক্তাই তা আটকে ধরতে ধরতে ভারে নুইয়ে পড়ল কিন্তু তানাবাইয়ের মুখের ওপর থেকে তার দৃষ্টি আর সরে না। তানাবাই কোন সম্ভাষণ করল না। "তুই তাহলে এখানে জুটেছিস আচ্ছা, এখানে জুটেছিস দেখছি! ভালো। কিছুই বলার নেই। বীয়ারের কাজে লেগেছিস," তানাবাই ভাবল, তারপর আর দেরি না করে এগিয়ে চলল। "কিন্তু ছোঁড়াটা ত গোল্লায় যাবে দেখছি!" এই ভেবে তানাবাই আবার পায়ের গতি শ্লথ করে দিল। "ভালো লোক হতে পারত, কথা বলে দেখব না কি?" তানাবাইয়ের ইচ্ছে হল ফেরে, বেক্তাইয়ের জন্য তার দুঃখ হল। বেক্তাই যা করছে সে সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতে সে রাজি, কেবল ও যদি একবার ভেবে, চিন্তে দেখে। কিন্তু তানাবাই তা করল না। সে বুঝল, বেক্তাই যদি জেনে থাকে যে তাকে পার্টি থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলে আর কোন কথাবার্তাই

হবে না। এই মুখ-আলগা ছোঁড়াটা কোন একটা ছুতো পেয়ে তাকে নিয়ে উপহাস করবে, তার ভাগ্যকে নিয়ে এবং, যে কাজে তার নিজের আস্থা রয়ে গেছে তা নিয়ে উপহাস করবে — এটা তানাবাই চায় না। তাই সে কিছু না বলেই চলে গেল।

পথে একটা মোটর গাড়ি ধরে তাতে চেপে তানাবাই শহর ছেড়ে চলল, যেতে যেতে বেক্তাইয়ের কথাই ভাবতে লাগল। সে ভুলতে পারল না গড়ানো পিপের ভারে নুইয়ে বেক্তাই কী করে দাঁড়িয়ে ছিল, কী ভাবে কোন কিছুর প্রত্যাশায় এক দৃষ্টিতে তানাবাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আরও পরে বেক্তাইয়ের যখন বিচার হয় তখন তানাবাই আদালতে এই মাত্র বলেছিল যে বেক্তাই ভেড়ার পাল ছেড়ে চলে যায়। সে আর কিছুই বলে নি। তার বড় ইচ্ছে ছিল, বেক্তাই শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু বেক্তাই তার ধার কাছ দিয়েও গেল বলে মনে হয় না।

‘ছাড়া পাওয়ার পর আমার কাছে আসিস। পরে কী করা যায় আমরা ভেবে-চিন্তে দেখব,’ তানাবাই বেক্তাইকে বলল। বেক্তাই কোন উত্তর দিল না, চোখ পর্যন্ত তুলল না। তানাবাই তার কাছ থেকে সরে এলো। পার্টি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, সকলের সামনে অপরাধী-অপরাধী মনে হয়। কেমন যেন দমে গেছে। জীবনে কখনও ভাবে নি যে এমন ঘটবে। কেউই অবশ্য তাকে মুখের ওপর কিছু বলে নি, তবু সে লোকজন এড়িয়ে চলত, কথাবার্তা এড়িয়ে চলত, বেশির ভাগই চুপ করে থাকত।

২৪

দৌড়বাজ ঘোড়া গুলসারি মাটিতে মাথা গুঁজে অনড় হয়ে আগুনের কাছে শুয়ে আছে। তার দেহ থেকে ধীরে ধীরে প্রাণ নির্গত হচ্ছে। গলার ভেতরে ঘড়ঘড়, ভাঙা আওয়াজ হচ্ছে, চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে, নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, সে অপলক দৃষ্টিতে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে, লাঠির মতো টান টান তার পাগুলো কাঠ হয়ে আসছে।

তানাবাই গুলসারিকে বিদায় জানাল, তাকে শেষ কথা বলল: "তুই একটা মস্ত ঘোড়া ছিলি, গুলসারি। তুই আমার বন্ধু ছিলি, গুলসারি। তুই তোর সঙ্গে আমার জীবনের সেরা সময়গুলো নিয়ে যাচ্ছিস, গুলসারি। তোর কথা আমার সব সময় মনে থাকবে, গুলসারি। এখনও, তুই থাকতে থাকতেই তোর কথা মনে করছি, কেননা তুই মরছিস, আমার সাধের ঘোড়া গুলসারি। কোন এক সময় পরপারে তোর দেখা পাব। কিন্তু সেখানে তোর খুরের টগবগ আওয়াজ শুনতে পাব না, কারণ সেখানে রাস্তা নেই, মাটি নেই, ঘাস নেই, জীবন নেই। কিন্তু আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন তোর মরণ নেই কেননা আমি তোকে মনে রাখব গুলসারি। তোর খুরের আওয়াজ আমার প্রিয় গান হয়ে থাকবে..."

তানাবাই এ সব কথা ভাবছিল। সে বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল এই ভেবে যে দৌড়বাজ ঘোড়ার দৌড়ের মতো সময়ও ছুটে চলে গেছে। ওরা দু'জনেই কেমন যেন তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল। হয়ত তানাবাইয়ের পক্ষে নিজকে বুড়ো বলে ভাববার সময় এখনও হয় নি। কিন্তু মানুষ ত তার বয়সের ভারে ততটা বুড়িয়ে যায় না যতটা বুড়িয়ে যায় এই বোধ থেকে যে সে

বুড়ো, তার সময় চলে গেছে, এখন কোন রকমে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা...

এখন, এই রাতেও, যখন তার দৌড়বাজ ঘোড়াটা মারা যাচ্ছে তখন তানাবাই নতুন করে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে আক্ষেপ করল এই ভেবে যে এত তাড়াতাড়ি সে বার্ধক্যের কাছে নতি স্বীকার করেছে, সে ঐ লোকটার পরামর্শ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নি — লোকটা দেখা যাচ্ছে তার কথা ভোলে নি, নিজে তাকে খুঁজে বার করেছে, নিজেই তার কাছে এসেছে।

পার্টি থেকে তানাবাই বিতাড়িত হওয়ার বছর সাতেক বাদে ঘটনাটা ঘটে। তানাবাই তখন ঘুরে ঘুরে সারিগোউ গিরিসঙ্কটে যৌথখামারের জমিজমা তদারকির কাজ করত, সেখানেই সে তার বুড়ি জায়দারকে নিয়ে দরওয়ানের কুটীরে বাস করত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বাইরে চলে যায়, তারপর তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলে কারিগরি বিদ্যালয় শেষ করে সদরে কাজ পায়, তারও এখন নিজের পরিবার আছে।

একবার গরমকালে তানাবাই নদীর ধারে ঘাস কাটছিল। দিনটি ছিল গরম আর ঝলমলে — ঘাস কাটার পক্ষে প্রশস্ত। গিরিখাতে সব চুপচাপ। ফড়িং আর গুবরে পোকার ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তানাবাইয়ের পরনে বুড়োদের ধরনে সাদা ঢোলা পাত্‌লুন, তার ওপর ঝুলছে গায়ের জামা। সে কাস্তের ঝনঝন আওয়াজের পেছন পেছন পা ফেলছে আর সমান ঘন গোছা ধরে ঘাস কেটে কেটে ফেলছে। মনের আনন্দে কাজ করে চলেছে। তার খেয়ালই নেই একটা জিপ গাড়ি এসে তার অদূরে থামল এবং গাড়ি থেকে দু'জন লোক নেমে এসে তার দিকে এগিয়ে গেল।

'সেলাম আলেকুম! আল্লাহ আপনার সহায় হোন!' তানাবাই

তার পাশেই শুনতে পেল। সে ঘুরে তাকিয়ে ইব্রাহিমকে দেখতে পেল। ইব্রাহিম সেই আগের মতোই ছটফটে, গালফোলা, ভুঁড়িওয়ালা। ইব্রাহিম আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলল: 'এই যে আমরা আপনাকে খুঁজে বার করলাম তানাবাই চাচা। অঞ্চল কমিটির সম্পাদক নিজে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।'

"ওঃ ধূর্ত শেয়াল আর কাকে বলে!" তানাবাই মনে মনে ওর তারিফ না করে পারল না। "নিজের জায়গা সব সময়ই ঠিক খুঁজে পায়। দেখ দেখি কেমন ব্যস্তসমস্ত ভাব। একেবারে দয়ার অবতারটি। সকলেরই কাজে লাগবে, সকলেরই সেবা করবে!"

'আলেকুম সেলাম!' তানাবাই ওদের করমর্দন করল।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?' ইব্রাহিমের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সে জিজ্ঞেস করল — তখনও নিজের শক্ত মুঠো থেকে তানাবাইয়ের হাত সে ছাড়ে নি।

তানাবাই চট করে উত্তর দিতে পারল না। "কোথায় ওকে দেখেছি?" সে মনে মনে ভেবে দেখার চেষ্টা করল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন খুবই চেনা কেউ, অথচ এটাও ঠিক যে সে লোকের চেহারার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যুবক, স্বাস্থ্যবান, রোদে পোড়া, তার চোখের দৃষ্টি অকপট, দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তার পরনে ছাইরঙা ক্যাম্বিশের পোশাক, মাথায় খড়ো টুপি। "শহুরে কেউ হবে," তানাবাই ভাবল।

'ইনি হলেন কমরেড...' ইব্রাহিম বলতে গেল।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি নিজেই বলব,' তানাবাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, মনে মনে হাসল। 'চিনতে পেরেছি বাছা। চিনব না মানে! তোমাকে দেখে খুশি হলাম।'

লোকটি ছিল কেরিমবেকভ — কম্‌সমোলের সেই সম্পাদক যে তানাবাইকে পার্টি থেকে বার করার সময় সাহস করে তাকে সমর্থন জানিয়েছিল।

'তা চিনতে যখন পারলেন, তখন আসুন, কথা বলা যাক। আসুন, নদীর ধার দিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক। আর আপনি ততক্ষণ কাস্তেটা নিয়ে ঘাস কাটুন,' কেরিমবেকভ ইব্রাহিমের উদ্দেশে বলল।

ইব্রাহিম সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে গায়ের কোট খুলতে লাগল।

'নিশ্চয়ই, তা আর বলতে, কমরেড কেরিমবেকভ!'

তানাবাই ও কেরিমবেকভ ঘাস কাটার জায়গাটা পেরিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বসল।

'আপনি হয়ত আঁচ করতে পারছেন কী জন্য আপনার কাছে এসেছি,' কেরিমবেকভ এই বলে কথা শুরু করল। 'আপনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আপনি আগের মতোই শক্তসমর্থ, ঘাস কাটছেন — তার মানে শরীর ভালো আছে। দেখে আমার ভালো লাগল।'

'হ্যাঁ বল বল। আমারও ভালো লাগছে তোমাকে দেখে।'

'ব্যাপারটা তা হলে আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি। এখন আপনি নিজেই জানেন যে অনেক অদল-বদল ঘটে গেছে। অনেক কিছু বেশ সুষ্ঠুভাবে চলছে।'

'জানি। সে ত একশ'বার সত্যি। আমাদের যৌথখামার দিয়েই বিচার করা যায়। কাজকর্ম যেন আগের চেয়ে ভালো চলছে। বিশ্বাসই হয় না। কিছু দিন আগে পণ্ডতরু উপত্যকায় গিয়েছিলাম, ওখানেই আমি সে বছর রাখালের কাজ করতে গিয়ে নাকাল হয়েছিলাম। দেখে হিংসে হল। নতুন চালাঘর উঠেছে। খাসা চালাঘর, টালিতে ছাওয়া, শ পাঁচেক ভেড়ার ঠাঁই

হতে পারে। রাখালের জন্য বাড়িও তৈরি হয়েছে দেখলাম। পাশেই গোলাবাড়ি, আস্তাবল। আগে যা ছিল তা মোটেই নয়। অন্য সব শীতের ক্যাম্পেও ঐ একই রকম ব্যবস্থা। গাঁয়েও লোকজন নিজেদের জন্য ঘর বাড়ি তৈরি করছে। যখনই যাই তখনই দেখি রাস্তায় একটা না একটা নতুন বাড়ি উঠেছে। আল্লাহ করুন, এমন যেন চলতে থাকে।'

'আমাদের কাজই হল এ ব্যাপারে যত্ন নেওয়া। যেমনটি দরকার এখনও সব তেমন হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কালে হবে। আপনার কাছে আমি এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। পার্টিতে ফিরে আসুন। আপনার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করব। ব্যুরোতে আপনার সম্পর্কে কথা উঠেছিল। কথাটা এই যে কখনও না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো।'

তানাবাই চুপ করে রইল। বিব্রত বোধ করল। যেমন আনন্দ হল তেমনি মনের মধ্যে সে একটা তিক্ততাও অনুভব করল। অতীতের সব কথা মনে পড়ে গেল, অপমান তার হৃদয়ের গভীরে গাঁথা হয়ে আছে। অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার ইচ্ছে হল না, ইচ্ছে হল না ঐ নিয়ে ভাবতে।

'ভালো কথার জন্য ধন্যবাদ,' তানাবাই অঞ্চল কমিটির সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাল। 'বুড়োকে যে ভুলে যাও নি তার জন্য ধন্যবাদ।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলল: 'আমি এখন বুড়োহাবড়া লোক। আমাকে দিয়ে আর পার্টির এখন কী হবে? আমি পার্টির কী কাজই বা করতে পারি? আমি আর কোন কিছুর যোগ্য নই। আমার সময় চলে গেছে। তুমি মনে কিছু করো না। আমাকে ভাবতে দাও।'

তানাবাই বহুকাল কিছু স্থির করতে পারল না, কাল যাব, পরশু যাব করে ব্যাপারটা বারবার স্থগিত রাখল, এদিকে সময়ও এগিয়ে চলল। দীর্ঘসূত্রতা তাকে পেয়ে বসল।

শেষ কালে এক দিন সে মনস্থির করে ফেলল, ঘোড়ায় জিন চড়াল, যাত্রা করল, কিন্তু অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এলো। কেন? নিজেই বুঝতে পারছিল যে ফিরে আসাটা বোকামি হয়েছে। নিজেই নিজেকে বলল: "বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছি।" সবই বুঝতে পারল, কিন্তু নিজের ব্যাপারে কিছু সুরাহা করতে পারল না।

স্তেপে সে ছুটন্ত ঘোড়ার খুর থেকে ধূলিরেখা উড়তে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে গুলসারিকে চিনতে পারল। ইদানীং সে ওকে কদাচিৎ দেখতে পায়। দৌড়বাজ ঘোড়া গ্রীষ্মের শুকনো স্তেপে ছুটন্ত সাদা রেখা এঁকে দিচ্ছিল। তানাবাই দূর থেকে লক্ষ্য করে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। আগে খুরের নীচ থেকে যে ধুলো উঠত তা কখনই গুলসারির নাগাল পেত না। একটা কালো রঙের ক্ষিপ্র পাখির মতো সে ছুটে চলে যেত, পেছনে পড়ে থাকত ধূলিকণার দীর্ঘ পুচ্ছ। আর এখন ধুলো থেকে থেকে মেঘের মতো গুলসারির দিকে গড়িয়ে আসছে, তাকে জড়িয়ে ফেলছে। সে সামনের দিকে ছুটে চলছে কিন্তু কিছু ক্ষণ পরই আবার নিজেরই ওঠানো ধুলোর ঘন কুণ্ডলীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। না, এখন আর সে ঐ ধূলিরাশি ভেদ করতে পারছে না। তার মানে রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে, ওর হয়ে গেছে। "তোর অবস্থা খারাপ, গুলসারি," তানাবাই বিষণ্ণ হয়ে ভাবল।

তানাবাই মনে মনে কল্পনা করতে লাগল ধুলোর মধ্যে ঘোড়াটার দম আটকে আসছে, তার পক্ষে ছুটতে অসুবিধা হচ্ছে, এদিকে সওয়ার রাগে তার পিঠে চাবুক কষে যাচ্ছে। তানাবাই তার চোখের সামনে দেখতে পেল গুলসারির বিভ্রান্ত

চোখজোড়া, অনুভব করল সে প্রাণপণে ধুলোর কুণ্ডলী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তানাবাইয়ের চিৎকার ঘোড়সওয়ারের কানে না যাওয়াই সম্ভব — দূরত্বটা ছিল অনেকখানি — তবু তানাবাই চেঁচিয়ে উঠল: 'দাঁ-ড়া-ও, ঘোড়া অমন করে ছুটিও না!' বলেই লোকটার পথ আটকানোর জন্য সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর গেল না, শিগ্‌গিরই থেমে গেল। লোকটা যদি তাকে বুঝতে পারে ত ভালো, আর যদি না বোঝে? যদি উত্তরে ওকে বলে বসে: "তোর তাতে কী? কোথাকার তুই আমার গুরুমশাই এলি রে! যেমন খুশি তেমনি চড়ব। কেটে পড়, আহাম্মক বুড়ো কোথাকার!''

ইতিমধ্যে গুলসারি চলে যাচ্ছিল আরও দূরে — তার গতি অসমান ও বাধ বাধ; সে কখনও ধুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তানাবাই অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে ফিরে চলল। "আমাদের দৌড় শেষ হয়েছে, গুলসারি,'' সে বলল। "আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আর আমাদের দিয়ে কার কী কাজ হবে? আমিও এখন আর দৌড়বাজ নই। গুলসারি, এখন আমাদের রয়ে গেছে শেষের দিন গোনা...''

এক বছর পর তানাবাই গুলসারিকে দেখতে পেল মালগাড়ির সঙ্গে জোতা অবস্থায়। আবার তানাবাই মনে কষ্ট পেল। এক কালের দৌড়বাজ এই বুড়ো জাত ঘোড়াটার এমনই অদৃষ্ট যে তাকে পোকায় কাটা গলবন্ধনী পরে একটা ঝরঝরে গাড়ি টানতে হচ্ছে — এ দেখলে দুঃখ না হয়ে পারে? তানাবাই মুখ ঘুরিয়ে নিল, তার দেখতে ইচ্ছে হল না।

তারপর তানাবাই তাকে আরও একবার দেখতে পায়। জাঙ্গিয়া আর ছে'ড়া গেঞ্জি পরনে একটা বছর সাতেকের ছেলে তার পিঠে চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা খালি পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে গ‍্ুতো মেরে চলছিল, নিজে ঘোড়া চালাচ্ছে এই আনন্দে সে গর্বের ভঙ্গিতে পিঠের ওপর বসে ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাচ্চাটা এই প্রথম ঘোড়ায় চেপে চলেছে, তাই তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট ও বাধ্য এমন একটা মরকুটের পিঠে — যেমন হয়েছে এক কালের দৌড়বাজ ঘোড়া গ‍ুলসারির অবস্থা।

'দাদ‍ু এই দেখ!' ছেলেটা বাহাদ‍ুরী করে ব‍ুড়ো তানাবাইকে বলল। 'আমি চাপায়েভ! আমি এখন নদী পার হব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যা দেখি কেমন!' তানাবাই ওকে উৎসাহ দিল।

সাহস করে লাগাম ধরে টানাটানি করতে করতে ছেলেটা নদীতে নেমে পড়ল, কিন্তু ঘোড়া যখন জলের মধ্য দিয়ে ওপারের দিকে চলতে লাগল তখন আর তাল সামলাতে না পেয়ে ঝুপ্ করে জলে পড়ে গেল।

'মা-গো!' ছেলেটা ভয়ে কে'দে ফেলল।

তানাবাই ওকে জল থেকে টেনে তুলল, বয়ে ঘোড়ার কাছে নিয়ে এলো। গ‍ুলসারি শান্তভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, সে পালা করে তার শরীরের ভার একবার এ পায়ে, আরেক বার ও পায়ে রাখছিল। "ঘোড়ার পা চিব‍ুচ্ছে — বোঝা যাচ্ছে অবস্থা একেবারেই শোচনীয়," তানাবাই ভাবল। সে ছেলেটাকে ব‍ুড়ো ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল।

'চলে যা, আর পড়িস না।'

গ‍ুলসারি শ্লথ ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে চলল।

আর এই হল শেষবার — দৌড়বাজ গ‍ুলসারি আবার

তানাবাইয়ের হাতে পড়ার পর, যখন মনে হচ্ছিল বুড়ো বুঝি তাকে উদ্ধার করে এনে পায়ে দাঁড় করিয়েছে, শেষবার সে তাকে আলেক্সান্দ্রভ্কায় বয়ে নিয়ে গেছে আর এখন রাস্তার মধ্যে মরছে।

তানাবাই গিয়েছিল ছেলে আর ছেলের বৌয়ের কাছে তার নাতির, ওদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে। তাদের জন্য সে উপহার নিয়ে আসে একটা আস্ত ভেড়ার মাংস, এক বস্তা আলু, রুটি এবং জায়দারের নিজের হাতের তৈরী নানা রকম খাবার। তানাবাই পরে বুঝতে পারল জায়দার কেন আসতে চায় নি, অসুস্থতার অজুহাত দেখাল। কারও কাছে না বললেও মনে মনে সে বৌমাকে পছন্দ করে না। ছেলে এমনিতেই পরনির্ভরশীল, দুর্বল প্রকৃতির, তায় আবার বৌটার শরীরে কোন দয়ামায়া নেই, তার বড় দাপট। ঘরে বসে বসে স্বামীর ওপর যেমন খুশি তেমনি হুকুম জারি করে। এমন লোকও আছে যারা অন্যের মনে আঘাত দিতে, তাকে অপমান করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কারও ওপর এক হাত নেওয়া, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা।

এবারে তা-ই ঘটল। ছেলের নাকি পদোন্নতি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে কেন যেন তার না হয়ে অন্য আর একজনের হয়। এতেই তার বৌ সম্পূর্ণ নিরপরাধ বুড়োর ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল:

'ভেড়ার পাল আর ঘোড়ার পাল নিয়েই যখন সারা জীবন কাটাতে হল তখন পার্টিতে ঢুকতে গিয়েছিলে কেন? তা-ই বা বলব কি, শেষের দিকে ত খেদিয়েই দিল, এখন তার ফলে তোমার ছেলেরও চাকরীতে কোন উন্নতি নেই। সারা জীবন ঐ একই কাজে বসে থাকবে। তোমরা পাহাড়-পর্বতের মধ্যে

বাস কর — তোমাদের, বুড়ো-বুড়ির আর কী দরকার, এদিকে তোমাদের জন্য আমরা মরছি।'

এই রকম আরও নানা কটুকাটব্য...

এসে তানাবাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। ছেলের বৌকে কোন রকমে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমতা আমতা করে বলল:

'ব্যাপারটা যদি তা-ই হয় ত আমি অনুরোধ করব ওরা যেন আবার আমাকে পার্টিতে নেয়।'

'ওখানে তোমাকে না হলে আর চলছে না! তোমার জন্যে ওরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে! এমন বুড়োহাবড়াকে ছাড়া কি আর চলে?' ছেলের বৌ ফোঁস করে উঠল।

যদি তার নিজের ছেলের বৌ না হয়ে অন্য কেউ হত তা হলে কি আর তানাবাই এমন সব কথা সহ্য করত? কিন্তু নিজের লোক, খারাপ হোক, ভালো হোক ফেলে ত আর দেওয়া যায় না। বুড়ো চুপ করে রইল, কোন তর্ক করল না, বলল না যে তার স্বামীর পদোন্নতি না হওয়ার কারণ বাপের অপরাধ নয়, তার কারণ এই যে সে নিজে একটা অপদার্থ আর বৌ জুটেছে এমন যার কাছ থেকে যে কোন সুস্থ মানুষের যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাওয়া উচিত। লোকে কি আর অমনি অমনি বলে: "ভালো ঘরণী মন্দ স্বামীকে করবে মাঝারি, মাঝারিকে — ভালো, আর ভালোকে — বিশ্ববিখ্যাত।" কিন্তু এবারেও বুড়োর ইচ্ছে হল না বৌয়ের সামনে ছেলেকে লজ্জা দেয়, ওরা বরং ভাবুক যে অপরাধটা তারই।

এই কারণেই তানাবাই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। ওদের কাছে থাকার প্রবৃত্তি তার হল না।

"বোকা তুই, বোকা!" এখন ও আগুনের পাশে বসে মনে মনে ছেলের বৌকে গালাগাল দিতে লাগল। "এমন মানুষও

হয়! না আছে কোন ভক্তিশ্রদ্ধা, না আছে অন্যের ওপর দয়া মায়া। আছিস কেবল নিজেকে নিয়ে। সকলকেই বিচার করিস নিজের মাপকাঠি দিয়ে। তোর মতো হয়ে আর আমার কাজ নেই। আমি এখনও দরকারী, দরকারী থাকবও...”

২৫

সকাল হয়ে আসছিল। মাটির ওপর পাহাড়ের শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, চারদিকে স্তেপ স্পষ্ট হয়ে আসছে, প্রসারিত হচ্ছে। খাতের ধারে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের ছাইচাপা আঁচ ধিকিধিকি জ্বলছে। পাশে কাঁধের ওপর পশুলোমের কোট ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাকা চুলা-দাড়িওয়ালা বুড়ো। এখন আর গুলসারিকে ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই। গুলসারি চলে গেছে অন্য জগতে, সে এখন সামিল হয়েছে আল্লাহর পশুপালে... ধরাশায়ী ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে তানাবাই হাঁ হয়ে গেল — এই নাকি গুলসারি! খিঁচুনির ফলে সে কাত হয়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে পড়ে আছে, মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে গভীর খাঁজ — লাগামের দাগ। তার আড়ষ্ট পাগুলো টান টান হয়ে উঁচিয়ে আছে, ফাটা ফাটা খুরের ওপর লেগে আছে ক্ষয়ে যাওয়া নাল। আর সেগুলো এই মাটিতে পড়বে না, তাদের ছাপ পথে পড়বে না। এখন যেতে হয়। তানাবাই শেষবারের মতো ঘোড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার ঠাণ্ডা চোখের পাতা নামিয়ে দিল, লাগামটা তুলে নিয়ে আর ফিরে তাকাল না, এগিয়ে চলল।

স্তেপের মধ্য দিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলল। চলল, নিজের দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তা মনে মনে আন্দোলন করতে করতে। ভাবত

লাগল, সে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তার দিন ফুরিয়ে আসছে। চঞ্চল ডানামেলা পাখির ঝাঁক থেকে যে পাখিটা আলাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার মতো নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরতে সে চায় না। সে মরতে চায় উড়তে উড়তে, সে চায় যাদের সঙ্গে এক বাসায় সে বড় হয়ে উঠেছে, যাদের সঙ্গে এক পথ সে ধরেছিল, তারা তার মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে তাকে বিদায় জানায়।

তানাবাই ঠিক করল, "সামানসুরকে লিখব। চিঠিতে এই কথাই লিখব: দৌড়বাজ ঘোড়া গুলসারিকে মনে আছে? মনে থাকা উচিত। ওর পিঠে চেপে আমি তোর বাপের পার্টি কার্ড অঞ্চল কমিটিতে নিয়ে গিয়েছিল্যম। তুই নিজেই আমাকে ওখানে পাঠিয়েছিলি। এই গত রাতে আমি আলেক্সান্দ্রভ্কা থেকে ফিরছিলাম, পথে আমার গুলসারি মারা গেল। সারা রাত ঘোড়ার পাশে বসে রইলাম, নিজের গোটা জীবন নিয়ে মনে মনে আলোচনা করলাম। এক সময় আমিও গুলসারির মতো পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ব। বাছা সামানসুর, তুই আমাকে পার্টিতে ফিরে আসতে সাহায্য কর। আমার আর বেশি দেরি নেই। আমি যা ছিলাম তা হতে চাই। এখন আমি বুঝতে পারছি তোর বাপ চোরো অঞ্চল কমিটিতে তার পার্টি কার্ড নিয়ে যাওয়ার ভার অমনি অমনি আমাকে দেয় নি। তুই তার ছেলে, তুই আমাকে, বুড়ো তানাবাই বাকাসভকে জানিস..."

তানাবাই লাগামটা কাঁধের ওপর ফেলে স্তেপের ওপর দিয়ে চলল। তার গাল বয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, দাড়ি ভিজিয়ে দিল। সে চোখের জল মুছল না। এ চোখের জল গুলসারির শোকে। বুড়ো চোখের জল ভেদ করে তাকাল নতুন প্রভাতের দিকে — ছাইরঙের নিঃসঙ্গ একটা হাঁস দ্রুত

উড়ে চলেছে পাহাড়ের পাদদেশের ওপর দিয়ে। ছাইরঙা হাঁসটা তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে ঝাঁকের নাগালে ধরার জন্য।

'ওড়, ওড়!' তানাবাই ফিসফিস করে বলল। 'ডানা ভেরে যাওয়ার আগেই সাথীদের নাগাল ধর।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: 'বিদায়, গুলসারি!'

সে চলতে চলতে শুনতে পেল সেই প্রাচীন গানের সুর।

...দিনের পর দিন মা-উট ছুটে বেড়ায়, খোঁজে, ডাকে তার সন্তানকে। কাজলকালো চোখ, আমার বাছা তুই কোথায়? বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে উপছে পড়ছে দুধ, ভেসে যাচ্ছে পা বয়ে। কোথায় তুই? সাড়া দে! দুধ উপছে পড়ছে বাঁট থেকে, ভরা বাঁট থেকে। উপছে পড়ছে সাদা দুধ...

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

১৯৮৭ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে

ভ্সেভলোদ নেস্তাইকো। দুই ইয়ারের যত কান্ড ॥ দুটি উপাখ্যান

ইউক্রেনীয় শিশু সাহিত্যিক ভ্সেভলোদ নেস্তাইকো — অসংখ্য রূপকথা ও এড্ভেঞ্চার গল্পের লেখক।

বর্তমান সংকলনে আছে দুটি উপাখ্যান: 'আজব এড্ভেঞ্চার' ও 'ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি'।

দুই বন্ধুর খুবই সাধ বিখ্যাত হওয়া। কিন্তু খ্যাতি বারবার এসে তাদের হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। শেষকালে তারা ঠিক করল একটা নির্জন দ্বীপে পালিয়ে যাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চেকোস্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য দেশে এই বইটি ব্যাপক পরিচিত। সোভিয়েত জনগণের বহু ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে।

১৯৮৮ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে
প্রকাশিত হবে

আলেক্সেই তল্‌স্তয়। গারিনের মরণরশ্মি ॥ উপন্যাস

বইখানা আলেক্সেই তল্‌স্তয়ের (১৮৮৩-১৯৪৫) বিজ্ঞানভিত্তিক কল্প-উপন্যাস। উপন্যাসটি সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম ক্ল্যাসিক-সৃষ্টি। প্রধান চরিত্র — প্রাণঘাতী রশ্মির উদ্ভাবক ইঞ্জিনিয়র গারিন। বিশের দশকের শুরুতে যে-ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তারই মতাদর্শবাদীদের বিচারের কথা বহুলাংশে স্মরণ করিয়ে দেয় গারিনের দর্শন।

নায়ক বিশ্বপ্রভুত্বের অভিলাষী, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে নির্বাক ক্রীতদাসে পরিণত করা তার স্বপ্ন।

এ ধরনের দাবি যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসার এবং সমস্ত রকম সাম্রাজ্যবাদী হঠকারিতার ধ্বংস যে অনিবার্য লেখক বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে তা দেখিয়েছেন।

চিঙ্গিস আইৎমাতভ — বহুজাতিক সোভিয়েত গদ্যসাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও ভাস্বর শিল্পী। সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন পুরস্কার ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-বিজয়ী চিঙ্গিস আইৎমাতভের বহু রচনা সোভিয়েত ও বিদেশী পাঠকমহলে বহুল পরিচিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম অঙ্গরাজ্য কির্গিজিয়ার পাহাড় আর স্তেপ আইৎমাতভের জন্মস্থান। তাঁর সেই জন্মস্থানের প্রতি, সেই রুক্ষ অথচ সুন্দর অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় পরিকীর্ণ তাঁর রচনাগুলি।
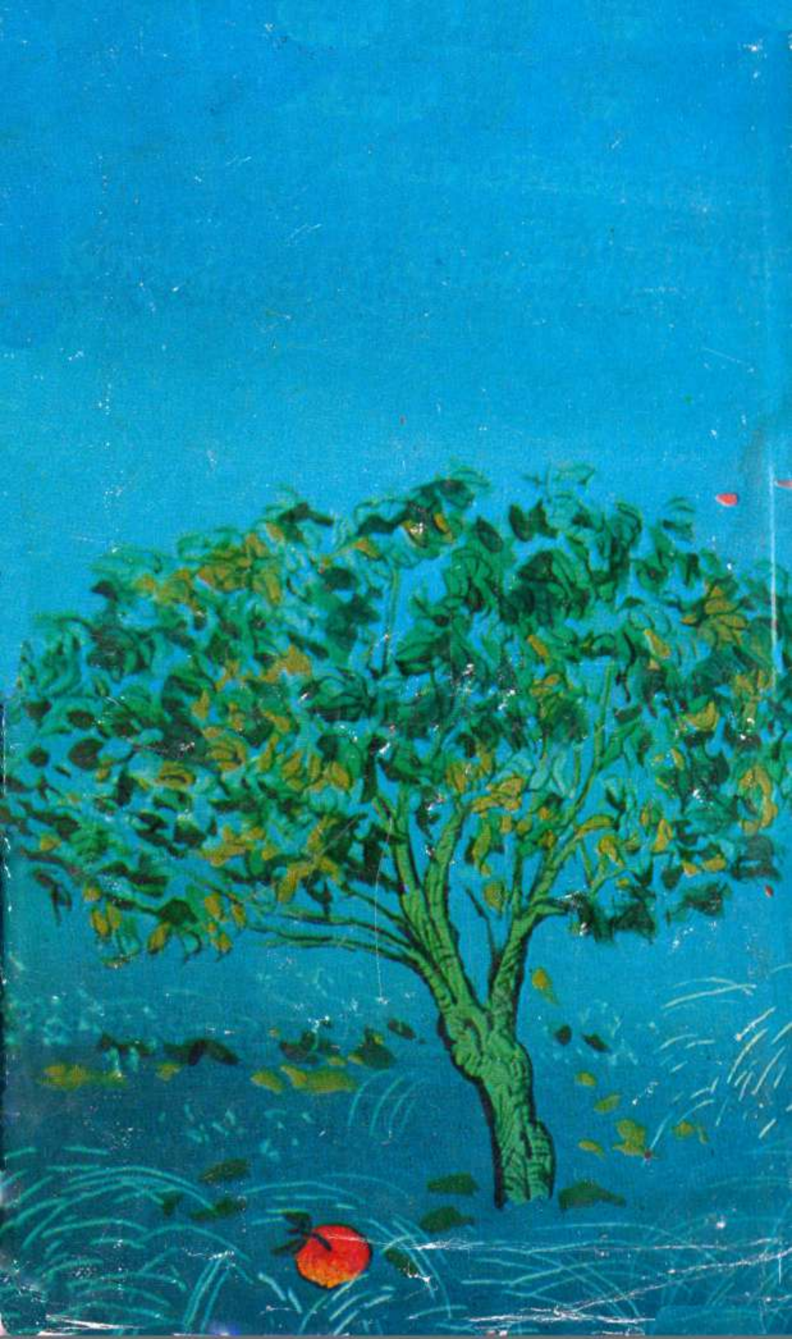
আমাদের এই রচনাসংকলনে স্থান পেয়েছে চিঙ্গিস আইৎমাতভের তিনটি উপাখ্যান। সোভিয়েত শাসনক্ষমতার আমলে মধ্য এশিয়ার যে-কালপর্ব অতিবাহিত হয়, সেখানকার মানুষের সামনে যে-নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত যারা বিভিন্ন রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাসের দাস ছিল তারা যে আত্মিক শক্তি হৃদয়ঙ্গম করে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান সংকলনভুক্ত রচনাগুলির বিভিন্ন চরিত্রের জীবনকাহিনীতে।